দ্য গ্রেট গেইম

মুহাম্মাদ আতীক উল্লাহ





বিসমিল্লাহ	১১
কারেক্টারিস্টিকস অব লিডার	১৪
কারেক্টারিস্টিকস অব প্রাইম মিনিস্টার	২০
দি আর্ট অব ওয়ার	২৭
আর্ট অব ওয়ার	৩০
চাণক্যনীতি	৩৯
চাণক্যের সমালোচনা	৫৩
দ্য প্রিন্স	৫৪
দ্য প্রিন্সের ব্যাপারে আপত্তি	৬৫
শেষ কথা	৬৬
রিপাবলিক	৬৭
সূচনা	৬৮
শিক্ষার সিলেবাস	৭০
শ্রমিকশ্রেণি	৭৩
ইউটোপিয়া	৭৮
দি ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশন	৮৯
কিছু প্রশ্ন	৯২
তৃতীয় ভুলধারণা	৯৩
বইয়ের সমালোচনা	৯৭
নাইট টেম্পলার ও ফিম্যাসনারি	৯৯
রথচাইল্ড পরিবার	১১৩

ইউরোপ কেন উন্নত? ১৩১
ইউরোপ কীভাবে চার্চকে পরাজিত করেছিল? ১৩১
উপমহাদেশে সামরিক অভ্যুত্থান ১৪৬
প্রথম ভুল ১৪৭
দ্বিতীয় ভুল ১৫০
কেন? ১৫৪
পাকিস্তান'স নিউক্লিয়ার প্রোগ্রাম ১৬৫
পরমাণু বোমা তৈরির গোড়ার কথা ১৭৮
দ্য ফল অব ইউনাইটেড স্টেটস ১৯৩
প্রথম কার্যকর পদক্ষেপ ১৯৫
শক্তিটা কীভাবে অর্জিত হয়েছিল? ১৯৬
এরা টাকা কোথায় পেতেন? ১৯৬
মেহনতের দ্বিতীয় ধাপ ১৯৭
কীভাবে? ২০০
তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ২০২
মার্শাল প্ল্যান ২১৫
আফগানি গাড়ি ২৮৪
অপারেশন সানরাইজ ২৯৩
দ্য গ্রেট গেইম ৩২১
দ্বিতীয় খেলোয়াড় ৩২৩
প্রথম পদক্ষেপ ৩২৫
দ্বিতীয় পদক্ষেপ ৩২৭

তৃতীয় পদক্ষেপ	৩২৭
তৃতীয় খেলোয়াড়	৩২৭
প্রথম পদ্ধতি	৩২৮
দ্বিতীয় পদ্ধতি	৩৩০
তৃতীয় পদ্ধতি	৩৩২
জিয়াং কৌশল	৩৩৩
স্টিফেন সুর কর্মকৌশল	৩৩৭
সুবিনের নতুন চাল	৩৪৩
প্যাসিফিক ওশন	৩৫৮
স্পেসওয়ার-মহাকাশ যুদ্ধ	৩৬৮
নির্বাচন কারসাজি	৩৮২
জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ	৩৯৩
নেভাল ওয়ার : নৌযুদ্ধ	৪০২
তাইওয়ান : তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘনঘটা	৪১৩
তাইওয়ানের অবস্থান	৪১৩
তাইওয়ানের ইতিহাস	৪১৩
তাইওয়ানের উন্নতি ও উত্থান	৪১৫
তাইওয়ান নিয়ে চীন ও আমেরিকার পলিসি	৪১৭
দীমুকারাতিসলাম	৪৩১

বিসমিল্লাহ

১. প্রথমেই বলে রাখি, এই বই কোনো ইতিহাসগ্রন্থ নয়, গবেষণাপত্র নয়; এটি গল্পের বই। আমরা বিভিন্ন বিষয়ে গল্প করেছি। গল্পগুলো আমরা নানা উৎস থেকে সংগ্রহ করেছি। বিশেষ করে ইউটিউবের বিভিন্ন চ্যানেল থেকে। শুনে শুনে, দেখে দেখে লেখার কারণে লেখাগুলো অনেক সময় সাবলীল থাকেনি। তারপরও আমাদের বিশ্বাস, কিছু পাঠকের কাছে আমাদের গল্পগাছা ভালো লাগবে, বইয়ের পেছনে সময় ব্যয় করাটা বৃথা যাবে না।

২. আরেকটা কথাও পরিষ্কার ভাষায় বলে রাখা জরুরি, এ বই আমাদের যোগ্যতার ফসল নয়; অনুসন্ধিৎসার নির্যাস বলা যেতে পারে। নানা বিষয়ে জানার আগ্রহ একেবারে ছোটবেলা থেকে। বইয়ে বর্ণিত বিষয়গুলো নিয়ে বালকবেলা থেকেই পড়াশোনা চলে আসছে। এতদিনকার পড়াশোনাকে সুবিন্যস্তাকারে ছাপার অক্ষরে আনার ইচ্ছা দীর্ঘদিনের। নানা সীমাবদ্ধতার কারণে ইচ্ছার বাস্তবায়ন করা যাচ্ছিল না। ভেতরে জমে থাকা পড়াশোনাকে প্রকাশ্যে আনার জন্য হন্যে হয়ে একটা ছাঁচ খুঁজছিলাম। আল্লাহ মিলিয়ে দিয়েছেন। পাক-ভারত-আরব ও পশ্চিমের কয়েকজন ইউটিউবার হুবহু না হলেও প্রায় কাছাকাছি 'বিন্যাসে' আমাদের প্রিয় বিষয়গুলো সাজিয়ে-গুছিয়ে প্রকাশ করেছেন। সমস্যা ছিল, তাদের চিন্তা, ধর্ম ও আদর্শ নিয়ে। তাদের কাছ থেকে তথ্য নেওয়া গেলেও তত্ত্ব নেওয়া যাচ্ছিল না। সবাই যে যার ধর্ম ও আদর্শের অনুকূলে তথ্য ও তত্ত্ব সাজিয়ে উপস্থাপন করেছেন। কেউ কেউ কট্টর সেকুলার ধাঁচে বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। তাদের উপস্থাপিত তত্ত্ব-তথ্যের শরীর থেকে ধর্ম ও আদর্শের বাতাবরণ সরিয়ে নিজের অনুকূল 'পোশাক' পরিয়ে উপস্থাপন করতে হয়েছে। আবারো বলি, এই লেখাগুলো আমাদের গবেষণা বা পড়াশোনার নির্যাস নয়; খোঁজাখুঁজির ফসল। আমরা আরবি, বাংলা, উর্দু, ইংরেজি, ফারসি ও হিন্দি ভাষার বিভিন্ন বক্তার কথাকে আমাদের মতো করে লেখ্যরূপ দিয়েছি, ব্যস এটুকুই। আমরা লেখাগুলোর 'বাহক', ধারক নই। ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার করজোড় অনুরোধ থাকল।

৩. বিভিন্ন ব্যক্তির জীবন, কথা ও বক্তব্য তুলে ধরার উদ্দেশ্য হলো, অন্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি কাদেরকে তাদের পূর্বপুরুষ ভাবে—এটা দেখানো। আমরা কারো চরিত্র বা চিন্তার বিশ্লেষণে যাইনি। তাদের ব্যাপারে ইসলাম কী বলে—সেটাও দেখাতে যাইনি। এ বইটা চূড়ান্ত নয়, আরো খণ্ড আসবে; ইনশাআল্লাহ।

৪. বইয়ের অনেক লেখায় নিছক বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও অবস্থাননির্দেশক বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়নি। আমরা আসলে আলাপ-আলোচনার একটি সফর শুরু করেছি। আলোচনার শিরোনাম হতে পারে, ইসলামি রাজনীতি, ইসলামি শাসনব্যবস্থা ও ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথে প্রচলিত ব্যবস্থাগুলোর তুলনামূলক পর্যালোচনা। তাই এ বইয়ের কোনো বিষয়ের সাথে একমত হতে না পারলে ধৈর্য ধরার বিনীত অনুরোধ থাকল। বলাবাহুল্য, তুলনামূলক পর্যালোচনায় উভয়পক্ষের বক্তব্য তুলে ধরা আবশ্যক। সানজু, চাণক্য, ম্যাকিয়াভেলি, প্লেটো, ইউটোপিয়াতে যেসব চিন্তা আছে, সেসবের বেশ কিছু চিন্তার সাথে আমরা মোটেও একমত নই। দ্বিমতপোষণের কথাটা আমরা লেখায় বলিনি। শুধু তাদের কথাগুলো বলে গেছি। আমাদের অবস্থান তাহলে কী? নিঃসন্দেহে খিলাফাহ। যা কিছু খিলাফাহর বিপরীত, আমরা তার সাথে একমত নই। তাহলে খিলাফাহ কী? পরবর্তী খণ্ডগুলোতে আমরা ধীরে ধীরে সেদিকে অগ্রসর হবো, ইন শা আল্লাহ।

৫. চারিদিকে ইসলামি শাসন, খিলাফাহ, ইমারাহ নিয়ে আলাপ শুরু হয়েছে। আমরাও আল্লাহর নাম নিয়ে আলাপ শুরু করলাম। আলাপটা যেন একপেশে আর একঘেয়ে না হয়, এজন্য আমরা অন্যদের 'রাষ্ট্রচিন্তা' কেমন, সেটাও আলাপে উঠিয়ে আনার চেষ্টা করেছি। এই খণ্ডে কিছু এসেছে, আগামী খণ্ডে আরো কিছু আসবে, ইনশাআল্লাহ।

৬. খবিস-শয়তানের কাজ হলো, মানুষের বিরুদ্ধে লেগে থাকা; মানুষকে বিভ্রান্ত করা। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মানুষের দোষত্রুটি ও খুঁত বের করা। সূরা নাসে যাদেরকে খান্নাস বলা হয়েছে। নিজ দলের বিপরীত কথা কেউ কিছু বলছে কিনা, কিছু মানুষ সেটাই হরদম খুঁজে বেড়ায়। কল্পনাতেও তারা দলীয় বয়ানের শত্রু খোঁজে। উম্মাহর এখন সুস্থ-সুবোধ মানুষ দরকার। হ্যাঁ, দরদি-দিলের সমালোচনা লেখকের জন্য পরম পাওয়া। যৌক্তিক সমালোচনা রব্বে কারীমের অপার রহমত।

৭. বইটার অন্যতম অসম্পূর্ণতা কী? হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন : আল মুকাদ্দিমা। বইয়ে যে ধরনের লেখা সন্নিবেশিত হয়েছে, সেখানে আল মুকাদ্দিমা আর ইবনে খালদুন অপরিহার্য ও অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়ার কথা ছিল। জি, আগামী খণ্ডে আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এই মুসলিম গ্র্যান্ডমাস্টারকে হাজির করার চেষ্টা করব। এছাড়া ইউটোপিয়ারও বহু আগে লেখা, হাই ইবনে ইয়াকজান নিয়েও আমাদের পর্যবেক্ষণ থাকবে। ইউরোপিয়ান রাষ্ট্রচিন্তকদের চিন্তার সমাহার থাকবে, ইনশাআল্লাহ।

৮. 'দ্য গ্রেট গেইম' মূলত একটি সফরের সূচনা। রাব্বে কারীম তাওফিক দিলে এই সফর অব্যাহত থাকবে। ইন শা আল্লাহ। সিরিজের পরবর্তী বইগুলোর সম্ভাব্য নাম,

২. *শেইপিং দ্য ওয়ার্ল্ড*। (মধ্যপ্রাচ্যের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ)।
৩. *দ্য মুসলিম কোল্ডওয়ার*। (মুসলিম বিশ্ব, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্ব)।
৪. *দ্য গ্র্যান্ড ডিজাইন*। (চীন, পাক, ভারত ও বাংলাসহ উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস)
৫. *দ্য কুরআনিক স্টেইট* (দ্য ইসলামিক স্টেইট)। (খিলাফাহব্যবস্থা ও কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মুসলিম নেতা-সেনাপতির যোগ্যতা, বৈশিষ্ট্য ও করণীয়।)।

৯. চাঞ্চল্যকর সব বিষয়ের জগতে আগাম নিমন্ত্রণ। আমাদের এই সিরিজটা একবার পড়া থাকলে বিশ্ব রাজনীতি, সমকালীন জিওপলিটিকস সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা মাথায় থাকবে। আর হ্যাঁ, আমাদের সবটুকু প্রয়াস প্রাথমিকদের জন্য। এ বইগুলো অভিজ্ঞজনের জন্য নয়।

১০. রব্বে কারীম বইয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ভাই-বোনদের মেহনত কবুল করে নিন। বইয়ের ভুলক্রটি মাফ করে দিন। বইটিসহ পুরো সিরিজকে উম্মাহর জন্য উপকারী বানিয়ে দিন। আমিন।



কারেক্টারিস্টিকস অব লিডার[১]

একজন নেতার কী কী গুণ-বৈশিষ্ট্য (কারেক্টারিস্টিকস) থাকা দরকার? কুরআনে বর্ণিত বিশ্বজয়ী শাসক যুলকারনাইন সম্পর্কিত আয়াতগুলো পড়লে বেশ কিছু চারিত্রিক ও বাহ্যিক গুণাবলি বের হয়ে আসে :

☞ এক. তামকিন। একজন নেতার তামকিন মানে ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠা থাকতে হবে। একজন নেতার হাতে নিজ এলাকায় আইন বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা থাকতে হবে। প্রয়োজনবোধে অন্য এলাকায়ও ক্ষমতা সম্প্রসারিত করার মতো লোকবল থাকতে হবে। তবেই তাকে পরিপূর্ণ নেতা বলা যাবে :

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ

'আমি তাকে জমিনে (তামকিন) শক্তি-ক্ষমতা-প্রতিষ্ঠা দান করেছিলাম।' (সূরা কাহাফ : ৮৪)

ইবরত (শিক্ষা) : শাসকের প্রধানতম শক্তি হলো 'তামকিন'। তামকিন মানে, দেশের ওপর নিরঙ্কুশ আধিপত্য ও ক্ষমতা। শাসনাধীন অঞ্চল নিজের পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণে না থাকলে দক্ষহাতে শাসন করা যায় না। দেশকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়া যায় না।

☞ দুই. ইলম-জ্ঞান হলো অগ্রগমনের মূল সোপান। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে ইলম-প্রযুক্তি জ্ঞানের কোনো বিকল্প নেই। একজন নেতাকে অবশ্যই জ্ঞান-ইলমের অধিকারী হতেই হবে, না হলে তার নেতৃত্ব বেশিদিন টিকবে না :

وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا

'আমি তাকে সবকিছুর উপকরণ দিয়েছিলাম।' (সূরা কাহাফ : ৮৪)

---

[১] লেখাটা 'আই লাভ কুরআন' বই থেকে নেওয়া। আগে পড়া থাকলে, এড়িয়ে যাওয়ার বিনীত অনুরোধ। একজন মুসলিম নেতার কী কী গুণ থাকা দরকার, একজন রাষ্ট্রনায়কের কী কী বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার—এ নিয়ে শীঘ্রই আমাদের একটি স্বতন্ত্র বই বের হবে। বইটিতে আমরা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে প্রায় আটাইশটি গুণ নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করেছি। বইটি পড়ার বিনীত নিবেদন থাকল। জাযাকুমুল্লাহ খইরন।

ইবরত : যুলকারনাইনকে আল্লাহ তাআলা দেশ শাসনের যাবতীয় উপকরণ দিয়েছিলেন। উপকরণের মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষা, প্রভাব-প্রতিপত্তি, নেতৃত্বগুণ, সাংগঠনিক দক্ষতা, শাসন ক্ষমতা—সবই ছিল। যুলকারনাইনকে এসব আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন—তার মানে এই নয়, যুলকারনাইন একদিন ঘুম থেকে উঠে আচানক নিজের মধ্যে এসব গুণের সমাহার দেখতে পেয়েছেন। আল্লাহ তাআলা দেওয়ার অর্থ, যুলকারনাইন ব্যক্তিগত সংগ্রাম-সাধনা করেছেন, বিনিময়ে আল্লাহ তাকে এসব দিয়েছেন। একজন শাসককেও যোগ্যতা অর্জনের জন্য নিবিড় অধ্যবসায় চালিয়ে যেতে হয়।

☞ **তিন.** ইলমকে কাজে পরিণত করা। ইলম শুধু শিখলেই চলবে না, তদনুযায়ী আমলও করতে হবে। কুরআন শুধু ইলমের কথা বলেই ক্ষান্ত হয়নি, সেটাকে কাজে পরিণত করার দিকেও জোর তাগিদ দিয়েছে। শুধু ইলম থাকাই একজন নেতার জন্য যথেষ্ট নয়, প্রায়োগিক দিকটাও অপরিহার্য :

فَأَتْبَعَ سَبَبًا

'সে একটি পথ (সবব)-এর অনুগামী হলো।' (সূরা কাহাফ : ৮৫)

ইবরত : যুলকারনাইন শুধু যোগ্যতা-অভিজ্ঞতা অর্জন করেই ক্ষান্ত হননি। আল্লাহ তাআলা তাকে যে যোগ্যতা দিয়েছিলেন, তিনি যে যোগ্যতাকে যথাযথ কাজে লাগিয়েছেন। যুলকারনাইনের কাছে দেশ শাসন করার মতো যা কিছু ছিল, সবই তিনি কাজে লাগিয়েছেন। যখন যা করা দরকার, করেছেন; যখন যেদিকে যাওয়ার দরকার, গিয়েছেন।

☞ চার. তাকওয়া ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা। একজন নেতা চলবেন সুস্পষ্ট নীতির ওপর। তার সব কাজের ভিত্তি থাকবে আল্লাহর প্রতিদানের আশা ও আল্লাহর শাস্তির ভয়। নিজের চাহিদামতো চলবেন না। প্রজাদেরকেও নিজের মতের ওপর ছেড়ে দিবেন না। তাদেরকেও প্রতিদান ও শাস্তির ভিত্তিতে পরিচালনা করবেন। আল্লাহ বলেছেন :

يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا

'যুলকারনাইন, (তোমার সামনে দুটি পথ) হয় তুমি তাদেরকে শাস্তি দিবে, নয়তো তাদের ব্যাপারে উত্তম ব্যবস্থা গ্রহণ করবে!' (সূরা কাহাফ : ৮৬)

ইবরত : একজন নেতার মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থাকতে হবে। ডিসিশন মেকিং একজন নেতার প্রধানতম গুণ। বিশেষ করে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ভীষণ জরুরি। শাস্তিদানের সময় ইনসাফ বজায় রাখাও জরুরি।

☞ পাঁচ. আদল-ইনসাফ। ন্যায়বিচারই হলো সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার মূল শর্ত। জুলুম-অবিচার শুধু অশান্তিই ডেকে আনে। জালেমকে আল্লাহ তাআলা কঠিন শাস্তি দিবেন মানুষকে নিরাপদ রাখার জন্য :

أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ

'আর যে কেউ সীমালঙ্ঘন (জুলুম) করবে, তাকে আমি শাস্তি দেবো।' (সূরা কাহাফ : ৮৭)

ইবরত : ইনসাফ ছাড়া দুনিয়া অচল। একটি দেশ ও জাতির উন্নতি-অগ্রগতির মূলে থাকে শাসকের ইনসাফ ও সুবিচার। দেশে ইনসাফ থাকলে আল্লাহর বরকত নেমে আসে।

☞ ছয়. কর্মশক্তি বৃদ্ধির জন্য উদ্বুদ্ধকরণ। ভালো কাজের স্বীকৃতি দিলে কর্মপ্রেরণাও বৃদ্ধি পায়। শিল্প-উৎপাদন বাড়ে। দুনিয়া ও আখেরাত—উভয় ক্ষেত্রেই কাজে নবপ্রাণের সঞ্চার হয়। যুলকারনাইনের মধ্যে এ গুণটা বিদ্যমান ছিল :

وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ ۖ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا

'যে ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে, সে উত্তম প্রতিদানের উপযুক্ত হবে এবং আমিও আদেশ দানকালে তাকে সহজ কথা বলব।' (সূরা কাহাফ : ৮৮)

ইবরত : দেশের শাসক হবেন জনগণের উৎসাহ-উদ্দীপনার কেন্দ্রবিন্দু। শাসককে দেখে জনগণ প্রেরণা পাবে। দেশে যখন ভালো কাজ, যোগ্যতা ও সততার যথাযথ মূল্যায়ন থাকবে, দেশের উৎপাদন হু হু করে বাড়তে থাকবে।

☞ সাত. ডায়নামিক (বহুমুখী) তৎপরতা। একজন নেতা হবেন অত্যন্ত তৎপর, গতিশীল ও উদ্যমী। কর্মক্ষেত্রে সদা বিচরণ করবেন। কেন্দ্রে বসে বসেই শুধু পরিচালনা করবেন না; স্থবির হয়ে থাকবেন না। তৃণমূল পর্যায়েও সশরীরে উপস্থিত হবেন। সংবাদবাহকের ওপর সবসময় নির্ভর করে থাকবেন না।

যুলকারনাইন বলতে গেলে বিশ্বের এমাথা-ওমাথা চষে বেড়িয়েছেন আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়নের জন্য :

حَتّٰۤی اِذَا بَلَغَ مَطۡلِعَ الشَّمۡسِ

'যেতে যেতে সূর্যাস্তের স্থানে পৌঁছল... ।' (সূরা কাহাফ : ৯০)

ইবরত : দেশের মানুষ তাদের শাসকের অনুসরণ করে থাকে। জনগণ যখন দেখে, দেশের শাসক তাদের জন্য দিনরাত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন, তারাও কর্মোৎসাহে টগবগ করতে থাকে।

☞ **আট.** যোগাযোগ ও অভিযোগ শ্রবণ। নেতা অবশ্যই অধীনস্থদের কথা শুনবেন। তাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করবেন। প্রজা ও তার মাঝে তৃতীয় ব্যক্তি থাকবে না। সর্বস্তরের মানুষের কথাই গুরুত্ব দিয়ে শুনবেন। মুখোমুখি। ফেস টু ফেস। ওয়াজহান লি-ওয়াজহিন। মুবাশারাতান। সরাসরি :

قَالُوۡا یٰذَا الۡقَرۡنَیۡنِ

'তারা বলল, হে যুলকারনাইন!... ।' (সূরা কাহাফ : ৯৪)

প্রজারা বলল, আপনি ইয়াজুজ ও মাজুজ থেকে বাঁচার জন্য, আমাদের ও তাদের মাঝে একটা দেয়াল বানিয়ে দিন। আমরা আপনাকে এর বিনিময়ে কর দিব। যুলকারনাইন তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বললেন :

مَا مَكَّنِّیۡ فِیۡهِ رَبِّیۡ خَیۡرٌ فَاَعِیۡنُوۡنِیۡ بِقُوَّۃٍ اَجۡعَلۡ بَیۡنَكُمۡ وَ بَیۡنَهُمۡ رَدۡمًا

'আল্লাহ তাআলা আমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন, সেটাই আমার জন্য শ্রেয়। তোমাদের কর দিতে হবে না।' (সূরা কাহাফ : ৯৫)

ইবরত : কুরআন এক গভীর সমুদ্র। এই গ্রন্থে আল্লাহ তাআলা কেয়ামত পর্যন্ত যাবতীয় সমস্যার সমাধান দিয়ে রেখেছেন। একেকটি আয়াতে সুপ্ত আছে হাজারো প্রশ্নের উত্তর। এ দুই আয়াতকে একটু গভীর দৃষ্টিতে দেখলে কিছু বৈশিষ্ট্য বের হয়ে আসে।

☞ **নয়.** অবৈধ আয়ের পথ বন্ধ করা। নেতার উচিত নয়, নিজের কাজের বিনিময়ে প্রজাদের কাছ থেকে বাড়তি কিছু গ্রহণ করা, উৎকোচ নেওয়া।

☞ **দশ.** দায়িত্ববোধ থাকা। নেতার মধ্যে অবশ্যই প্রখর টনটনে দায়িত্ববোধ

থাকতে হবে। প্রজার স্বার্থের প্রতি চৌকান্না থাকতে হবে। কোনো প্রকার প্রাপ্তিযোগের আশা ছাড়াই।

☞ এগারো. পরিচ্ছন্ন হাত, নির্লোভ মন। নেতা প্রজাদের প্রয়োজন বা চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে সুযোগ গ্রহণ করবেন না। প্রকল্প বাস্তবায়ন করার দোহাই দিয়ে তাদের সম্পদ লুট করার পাঁয়তারা কষবে না।

☞ বারো. মাজলুমের সাহায্য। মাজলুমকে সাহায্য করা অপরিহার্য একটি কাজ। ধর্মীয় দায়িত্ব। এখানে আর্থিক হিসাব-নিকাশের কোনো স্থান নেই। যুলকারনাইন তাই করেছেন।

☞ তেরো. সামষ্টিক-যৌথ কাজ। একা একাই কাজে না নেমে সবাইকে নিয়ে নামা। কাজে বরকত আসবে। গতি আসবে। যুলকারনাইন বলেছেন, তোমরা আমাকে সাহায্য করো (সূরা কাহাফ : ৯৫)।

☞ চৌদ্দ. কর্মী বুঝে দায়িত্ব বণ্টন। সবার দ্বারা সব কাজ হয় না। একজন নেতাকে বুঝতে হবে কার কী ক্ষমতা! কার কী যোগ্যতা! যুলকারনাইন সম্প্রদায়ের অবস্থা অনুযায়ী তাদেরকে কাজে নিয়োগ করেছিলেন। কায়িকশ্রম চেয়েছিলেন। জ্ঞান বা সম্পদের সাহায্য চাননি।

☞ পনেরো. সুস্পষ্ট নির্দেশ প্রদান। নেতা অবশ্যই সুস্পষ্ট ভাষায় আদেশ দিবেন। তিনি কী চান—তা পরিষ্কার ভাষায় খুলে বলবেন। যাতে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ না থাকে। যুলকারনাইন বললেন :

آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ

'তোমরা আমাকে লোহার পিণ্ড এনে দাও...। আগুনে হাওয়া দাও...।' (সূরা কাহাফ : ৯৬)

☞ ষোলো. সম্পদ ও কাঁচামালের যথাযথ ব্যবহার। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক জাতিকেই তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য দিয়ে দেন। মানুষের উচিত, সেসব উপকরণ যথাযথ কাজে লাগানো। যুলকারনাইন দেখলেন, সে সম্প্রদায়ের কাছে তামা ও লোহা আছে। তিনি তা দিয়েই প্রাচীর নির্মাণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন।

☞ সতেরো. শিক্ষাদান ও দিকনির্দেশনা। যুলকারনাইন তাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন, কিভাবে মজবুত দেয়াল নির্মাণ করতে হয়। যাতে ভবিষ্যতে নিজেরাই কাজ চালিয়ে নিতে পারে।

☞ **আঠারো.** হাতে-কলমে কাজ শিক্ষা দেওয়া। যুলকারনাইন তাদেরকে কাজে শরিক করেছিলেন। বাস্তবে হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়েছিলেন। নেতা কেবল আদেশদাতাই নন, শিক্ষকও বটে; কর্মীও।

☞ **উনিশ.** নেতা স্রেফ বক্তৃতা দিয়েই বেড়াবেন না, প্রজাদের স্বার্থে স্থাপনা নির্মাণ করবেন। এজন্য নিজের সার্বিক শক্তিকে যথাযথ কাজে লাগাবেন জনগণ থেকে চাঁদা তোলা আর একাউন্ট খোলা ছাড়াই। তবে স্বেচ্ছাশ্রম নিতে পারেন।

☞ **বিশ.** কম পরিশ্রমে বেশি লাভ। নেতা চেষ্টা করবেন অধিক ফলপ্রসূ ও সহজ পন্থা অবলম্বন করতে। যুলকারনাইন চাইলে পারতেন, দেয়াল নির্মাণ না করে ইয়াজুজ-মাজুজের সাথে লড়াই করে পরাজিত করতে। তাদের শক্তিকে নিঃশেষ করতে; কিন্তু তিনি সে পথে পা না বাড়িয়ে সহজ পথের দিকে গেলেন। প্রতিরোধ-দেয়াল নির্মাণে ব্রতী হলেন। যুদ্ধের চেয়ে এটা বেশি সুরক্ষিত। ফলদায়ক।

☞ **একুশ.** বিনয়, আল্লাহ অভিমুখিতা। সব কাজের তাওফিক আল্লাহই দান করেন। সব নেতারই এটা মনে রাখা দরকার। আমি কিছুই নই, নিমিত্ত মাত্র; কাজ তো আল্লাহই করান। কাজ শুরু না করেই নেমফলক হাঁকানো কাজের কথা নয়। যুলকারনাইন সবিনয়ে নিবেদন করেছেন :

هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي

'এটা আমার রবের রহমত!' (সূরা কাহাফ : ৯৮)'



কারেক্টারিস্টিকস অব প্রাইম মিনিস্টার

একজন রাষ্ট্রনায়কের কী কী গুণ থাকা উচিত?

সূরা ইউসুফে কত যে শিক্ষা লুকিয়ে আছে, কেয়ামত পর্যন্ত অধ্যয়ন করে গেলেও আহরণ ফুরোবে না। কুরআন কারিমে বর্ণিত ঘটনাগুলো আসলেই একেকটি সুগভীর সমুদ্র। কী নেই? ইলম, হেকমত, নসিহত, জীবনদর্শন, আকিদা, দিকনির্দেশনা, প্রতিপালনপদ্ধতি—সবই আছে। আছে বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি; আছে অপূর্ব সব কথোপকথন।

নিছক ইতিহাস বর্ণনা করা কুরআন কারিমের উদ্দেশ্য নয়; তেমন হলে অনেক খুঁটিনাটি তথ্য থাকত। কুরআন কারিমে সে ধরনের কোনো তথ্যবহুল (মানে সন-তারিখসহ) আলোচনা নেই। কুরআন কারিমের মূল উদ্দেশ্য কী?

-মানুষের হেদায়াত।

এই হেদায়াতের জন্য যতটুকু কথা বলা প্রয়োজন, কুরআনে ঠিক ততটাই আলোকপাত করা হয়েছে। বাকিটুকু অপূর্ব সংযমের সাথে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এই সংযমকেই অলংকার শাস্ত্রে বলা হয় 'ঈজায' (إيجاز)। একটি জাতিকে পরিপূর্ণরূপে সংগঠিত করার জন্য প্রয়োজন হয় দুটি উপাদানের :

এক. কর্মঠ কর্মীদল বা সুদক্ষ নেতৃত্ব কিংবা প্রজ্ঞাবান শাসক।

দুই. অভিজ্ঞ দিক-নির্দেশক পরিষদ।

সেই শাসক যদি নবী হন? তাহলে বিশ্লেষকগণ তাদের মধ্যে চল্লিশটারও বেশি গুণাবলি আবিষ্কার করেছেন। আর শাসক নবী না হয়ে সাধারণ কোনো মানুষ হলে তার মধ্যে চল্লিশটা গুণাবলির সবগুলোই থাকতে হবে—এটা জরুরি নয়। প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য থাকলেই চলবে।

হযরত ইউসুফ আ. ছিলেন একাধারে নবী ও শাসক। তার মধ্যেও সবগুলো বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। মুফাসসিরগণ কুরআন কারিম ঘেঁটে কিছু বৈশিষ্ট্য উদ্ধার করেছেন, যেগুলো ইউসুফ আ.-এর মধ্যে বিদ্যমান ছিল এবং কুরআনেও উল্লেখ আছে। নবুওয়াতের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, খেলাফতব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায়নি;

রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার সুযোগ শেষ হয়ে যায়নি। অতএব, হযরত ইউসুফের প্রতি নজর বোলানো যাক, একজন রাষ্ট্রপ্রধানের কী কী গুণ থাকা আবশ্যক?

✍ **(এক)** চারিত্রিক পবিত্রতা। আত্মসংবরণ ক্ষমতা। লোভের মুহূর্তে নিজেকে ধরে রাখার চিত্তশক্তি থাকতে হবে। সামনে পাপের সুযোগ এলেও নিজেকে ধরে রাখার শক্তি থাকতে হবে। সুযোগকে পায়ে দলে এড়িয়ে যাওয়ার মতো হিম্মত আর বুকের পাটা থাকতে হবে। ইউসুফ আ.-এর সামনেও সুযোগ এসেছিল। নির্জন ঘর। যুগশ্রেষ্ঠ সুন্দরী রাজজায়ার বিলোলিত কাতর মদির আহ্বান। সব পায়ে দলে ইউসুফ আ. দরজার দিকে ছুট দিলেন :

كَذٰلِكَ لِنَصۡرِفَ عَنۡهُ السُّوۡٓءَ وَالۡفَحۡشَآءَ ؕ اِنَّهٗ مِنۡ عِبَادِنَا الۡمُخۡلَصِيۡنَ

'আমি এরূপ করেছিলাম তার থেকে অসৎ কর্ম ও অশ্লীলতার অভিমুখ ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য। নিশ্চয় সে আমার মনোনীত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।' (সূরা ইউসুফ : ২৪)

✍ **(দুই)** প্রচণ্ড রাগ হলেও সহ্য করার ক্ষমতা থাকতে হবে। নিজের বিরুদ্ধে কেউ মিথ্যা অভিযোগ তুললেও হজম করার মতো সহনশীলতা থাকতে হবে। ক্রোধ সংবরণ ক্ষমতা একজন শাসকের প্রধানতম গুণ। ভাইয়েরা নির্জলা মিথ্যা বলল অম্লানবদনে; অথচ ইউসুফ আ. কিছুই বললেন না :

قَالُوۡۤا اِنۡ يَّسۡرِقۡ فَقَدۡ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ مِنۡ قَبۡلُ ۚ فَاَسَرَّهَا يُوۡسُفُ فِىۡ نَفۡسِهٖ وَلَمۡ يُبۡدِهَا لَهُمۡ ۚ قَالَ اَنۡتُمۡ شَرٌّ مَّكَانًا ۚ وَاللّٰهُ اَعۡلَمُ بِمَا تَصِفُوۡنَ

'ভাইয়েরা বলল, যদি বিন ইয়ামিন চুরি করে, তবে আশ্চর্যের কিছু নেই, কেননা এর আগে তার ভাইও চুরি করেছিল। তখন ইউসুফ তাদের কাছে প্রকাশ না করে চুপিসারে (মনে মনে) বললেন, এ ব্যাপারে তোমরা তো ঢের বেশি মন্দ আর তোমরা যা বলছ তার প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ সম্যক জ্ঞাত।' (সূরা ইউসুফ : ৭৭)

✍ **(তিন)** নরমের স্থানে নরম হওয়া, গরমের স্থানে গরম হওয়া। সবসময় কোমল হয়ে থাকলে রাষ্ট্র চলবে না। দুষ্ট লোকেরা সুযোগ গ্রহণ করতে কসুর করবে না। অপ্রয়োজনীয় ক্ষমা আর অপ্রয়োজনীয় কঠোরতা বিপদ ডেকে আনে।

وَلَمَّا جَهَّزَهُمۡ بِجَهَازِهِمۡ قَالَ ائۡتُوۡنِىۡ بِاَخٍ لَّكُمۡ مِّنۡ اَبِيۡكُمۡ ۚ اَلَا تَرَوۡنَ اَنِّىۡۤ اُوۡفِى الۡكَيۡلَ وَاَنَا خَيۡرُ الۡمُنۡزِلِيۡنَ

'ইউসুফ যখন তাদের সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিলো, তখন সে তাদেরকে বলল, (আগামীতে) তোমরা তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাইকেও আমার কাছে নিয়ে এসো। তোমরা কি দেখছ না, আমি পরিমাপপাত্র ভরে দিই এবং আমি উত্তম অতিথিপরায়ণও বটে।' (সূরা ইউসুফ : ৫৯)

এখানে ইউসুফ আ. অত্যন্ত দয়ালু। যারাই আসছে, মুঠোভরে নিয়ে যাচ্ছে। কাউকে ফেরাচ্ছেন না। আবার কঠোরও হচ্ছেন :

فَإِنْ لَّمْ تَأْتُوْنِيْ بِهٖ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِيْ وَلَا تَقْرَبُوْنِ

'তোমরা যদি তাকে আমার কাছে নিয়ে না আসো, তবে আমার কাছে তোমাদের জন্য কোনো রসদ থাকবে না। তখন তোমরা আমার কাছেও আসবে না।' (সূরা ইউসুফ : ৬০)

✍ (চার) আত্মবিশ্বাস থাকতে হবে। তবে সেটা হবে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের সাহায্যে। তাওয়াক্কুলবিহীন আবোলতাবোল আত্মবিশ্বাস বিপদ ডেকে আনবে :

قَالَ اجْعَلْنِيْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْاَرْضِ ۚ اِنِّيْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ

ইউসুফ বললেন, আপনি আমাকে দেশের অর্থ-সম্পদের (ব্যবস্থাপনা)-কার্যে নিযুক্ত করুন। নিশ্চিত থাকুন আমি রক্ষণাবেক্ষণ বেশ ভালো পারি এবং আমি (এ কাজের) পূর্ণ জ্ঞান রাখি। (সূরা ইউসুফ : ৫৫)

বাদশাহর দরবারে ইউসুফ আ. নিজেই নিজেকে পেশ করেছেন। কোনো সংকোচ ছাড়াই বলেছেন, আমি এই কাজের যোগ্য। আত্মবিশ্বাসের সাথেই বলেছেন।

✍ (পাঁচ) স্মৃতিশক্তি ও পর্যবেক্ষণশক্তি থাকতে হবে। শত্রু-মিত্র চিনতে হলে এটা থাকা আবশ্যক। পুরোনো স্মৃতি মনে না থাকলে শাসনকার্য পরিচালনা করা দুষ্করই বটে :

وَجَآءَ اِخْوَةُ يُوْسُفَ فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ

'(দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে) ইউসুফের ভাইয়েরা এলো এবং তারা তাঁর কাছে উপস্থিত হলো। ইউসুফ তাদেরকে চিনে ফেলল, কিন্তু তারা তাঁকে চিনল না।' (সূরা ইউসুফ : ৫৮)

ইবরত : সেই কবে ছোটবেলায় ভাইদের সাথে বিচ্ছেদ হয়েছে। ভাইয়েরা তাকে কূপে ফেলে দিয়েছিল। একদম শৈশবের ঘটনা। দীর্ঘদিন পর দেখেই চিনে ফেললেন ভাইদেরকে।

✍ (ছয়) চিন্তা-চেতনা স্বচ্ছ ধারালো আর নিষ্কলুষ হতে হবে, তাহলে স্বপ্ন ও কল্পনাও হবে ঝকঝকে :

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ

'ইউসুফ তাঁর পিতাকে বলেছিল, আব্বাজি, আমি (স্বপ্নযোগে) এগারোটি নক্ষত্র, সূর্য ও চন্দ্র দেখেছি। আমি দেখেছি, তারা সকলে আমাকে সেজদা করছে।' (সূরা ইউসুফ : ৪)

✍ (সাত) ইলমের তথা জ্ঞান আহরণের প্রস্তুতি, ইলমের প্রতি পিপাসা থাকা এবং ইলম অর্জনে সিদ্ধি লাভ করা। সর্বোপরি অর্জিত ইলমকে কাজে পরিণত করা একজন শাসক ও নেতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য :

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ

'আমি আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের দীন অনুসরণ করেছি। আমাদের এ অধিকার নেই যে, আল্লাহর সঙ্গে কোনো জিনিসকে শরিক করব। এটা (তাওহিদের আকিদা) আমাদের প্রতি ও সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহেরই অংশ; কিন্তু অধিকাংশ লোক (এ নেয়ামতের) শোকর আদায় করে না।' (সূরা ইউসুফ : ৩৮)

ইবরত : দীর্ঘদিন পরিবার থেকে দূরে ছিলেন; ভিন্ন এক পরিবেশে; অন্য এক আবহে! তবুও সত্যসন্ধান ও সত্যানুসরণে ছেদ পড়েনি। ছেলেবেলায় বাবার কাছ থেকে শিখে আসা আকিদা-বিশ্বাস ও জ্ঞানকে কাজে লাগিয়েছেন। আরো উৎকর্ষমণ্ডিত করে তুলেছেন। সেটাকে চর্চা করে করে তাওহিদের চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছিয়েছেন। এ ব্যাপারে তিনি সচেতনও ছিলেন।

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ

'হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে রাজত্বের অংশ দান করেছ

এবং আমাকে স্বপ্ন-ব্যাখ্যার জ্ঞান দ্বারাও আমাকে ধন্য করেছ!' (সূরা ইউসুফ : ১০১)

ইবরত : যা শিখেছেন, পরিপূর্ণ আস্থা আর 'তামকিনের' সাথেই শিখেছেন। নিজে কী জানেন, সেটা নিয়ে তার মনে কোনো দ্বিধা ছিল না। আর ইলম অর্জন যে আল্লাহর বিরাট একটা অনুগ্রহ, সেটা স্বীকার করতেও কসুর করেননি।

✍ (আট) শাসকের মনে দুর্বলের প্রতি দয়া থাকতে হবে। আচরণে সেটা প্রকাশও পেতে হবে। নিজে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে আসীন হলেও তার বিনয়ে কোনো ঘাটতি আসবে না। নগণ্য মানুষ হলেও তার ব্যবহারে কোনো তারতম্য হবে না। ইউসুফ নিজে রাজদরবারে লালিতপালিত হলেও কারাগারে সাধারণ দুই বন্দিকে কী মনোরম শব্দে সম্বোধন করেছেন :

يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ

'হে আমার কারা-সঙ্গীদ্বয়!' (সূরা ইউসুফ : ৩৯)

তারপর আপনজনের মতো 'কনসালটেন্সিতে' ব্রতী হয়েছেন :

لَا يَأْتِيْكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقٰنِهٖٓ اِلَّا نَبَّاْتُكُمَا بِتَاْوِيْلِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّاْتِيَكُمَا

'খাবার আসার আগেই আমি তোমাদের রহস্য বলে দেবো।' (সূরা ইউসুফ : ৩৭)

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ঝাঁপিও খুলে বসেছেন :

اِنِّيْ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

'যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না, আমি তাদের দীন বর্জন করেছি।' (সূরা ইউসুফ : ৩৭)

ইউসুফের অমায়িক আর আপন করা ব্যবহারে বন্দিদ্বয় মুগ্ধ হয়েছিল। তাদের ভক্তি গদগদ মন্তব্য :

اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ

'আমরা আপনাকে একজন ভালো মানুষ দেখছি!' (সূরা ইউসুফ : ৩৬)

✍ (নয়) প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেওয়ার গুণও একজন শাসকের থাকতে হবে। নইলে শাসনযন্ত্র নিয়ন্ত্রণে থাকবে না। জনগণ ফুঁসে উঠবে :

قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ۖ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ ۖ وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ

'ইউসুফ বললেন, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনা হবে না। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। তিনি সকল দয়ালু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দয়ালু।' (সূরা ইউসুফ : ৯২)

ইবরত : ভাইয়েরা অনেক বড় অপরাধ করেছিল। বৈমাত্রেয় ভাইকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল। বৃদ্ধ পিতাকে চরম মর্ম যাতনায় ভুগিয়েছিল; কিন্তু ইউসুফ সেসবকে ধর্তব্যের মধ্যে আনলেন না, মাফ করে দিলেন। উল্টো আল্লাহর কাছেও ক্ষমা চাইলেন।

✍ **(দশ)** পরিবার-পরিজনের দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। আত্মীয়স্বজনকে যথাযথ মূল্যায়ন করতে হবে। নিজে বড় হয়ে তাদেরকে ভুলে যাওয়া একজন শাসকের জন্য নিরাপদও নয় :

وَاْتُوْنِيْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ

'আর তোমাদের পরিবারের সকলকে আমার কাছে নিয়ে এসো!' (৯৩)

✍ **(এগারো)** একজন শাসককে কথা বলা জানতে হবে; বাগ্মী হতে হবে। কথার জাদুতে মানুষকে মুগ্ধ করার শক্তি থাকতে হবে :

فَلَمَّا كَلَّمَهٗ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ اَمِيْنٌ

'অতঃপর বাদশাহ যখন ইউসুফের সাথে কথা বলল, তখন বললো, আজ থেকে তুমি আমাদের কাছে অত্যন্ত মর্যাদাবান হলে। তোমার প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা রাখা হবে।' (সূরা ইউসুফ : ৫৪)

ইবরত : ইউসুফ আ. ছিলেন জেলে। প্যারোলে মুক্তি পেয়ে দরবারে এলেন। একবার কথা বলেই রাজা একেবারে 'ইমপ্রেসড'! মুগ্ধ।

✍ **(বারো)** শাসনকাজ চালাতে হলে সুষ্ঠু পরিকল্পনা থাকা জরুরি; উন্নয়নের একটা রোডম্যাপ থাকা আবশ্যক। বিভিন্ন খাতে নানা মেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা থাকা চাই। সুনির্দিষ্ট সময়-ফ্রেমের ভিশন থাকলে গতিশীল উন্নয়নের পালে হাওয়া লাগে। বিশেষত দারিদ্র্য দূরীকরণে শাসকের পদক্ষেপ হওয়া উচিত, বাস্তবমুখী ফলপ্রসূ আর জীবনঘেঁষা :

দ্য গ্রেট গেইম

فَمَا حَصَدْتُّمْ فَذَرُوْهُ فِيْ سُنْۢبُلِهٖٓ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَاْكُلُوْنَ

‘এ সময়ের ভেতর তোমরা যে শস্য গ্রহণ করবে তা শীষসমেত রেখে দিয়ো!’ (সূরা ইউসুফ : ৪৭)

ইউসুফ আ. মিশরের জন্য ‘চৌদ্দসালা’ খাদ্য-কর্মসূচি দিয়েছিলেন। এগ্রিকালচারাল রোডম্যাপ দিয়েছিলেন। পরে দেখা গেছে, ইউসুফ আ.-এর দূরদৃষ্টি কতটা সুদূরপ্রসারী ছিল! সেই কৃষি-প্রকৌশলের সুফল মিশর আজও ভোগ করছে।



দি আর্ট অব ওয়ার

সানজু, পৃথিবীর প্রথম মিলিটারি স্ট্র্যাটেজিস্ট। সানজুর আগে এ বিষয়ে আর কারো নাম জানা যায় না; এই অর্থে প্রথম। এই চায়নিজ দার্শনিক সর্বপ্রথম যুদ্ধকৌশলগুলোকে লিখিতরূপ দিয়েছিলেন। সামরিক কৌশলগুলোকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছিলেন। বইটি আজ পুরো বিশ্বে দি আর্ট অব ওয়ার নামে পরিচিত। পৃথিবীতে বর্তমানে এমন কোনো সমরবিদ নেই, যে এ বই পড়েনি। ৪৭৫ থেকে ২২১ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মাঝে সানজু এই সমরকৌশলগুলো লিপিবদ্ধ করেছিলেন। চীন তখন কয়েকটি রাজ্যে বিভক্ত ছিল। রাজ্যগুলোর মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ লেগেই ছিল। এগুলোর মধ্যে চারটি রাজ্য ইতিহাসে বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। সে চার রাজ্যের নাম যথাক্রমে চী (Qi), ওয়ে (Wei), চু (Chu) ও চিন (Qin)। সানজু ছিলেন চী রাজ্যের অধিবাসী। তার প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানা যায় না। প্রসিদ্ধি লাভ করার পরের জীবন সম্পর্কে কিছুটা জানা যায়। এত আগে যুদ্ধকৌশল বিষয়ক এতটা নিখুঁত ও পরিপূর্ণ বই কীভাবে রচনা করলেন, তিনি এই যোগ্যতা কীভাবে অর্জন করেছিলেন—সেটা কারো জানা নেই। বইটি রচনার পর কিছুদিনের মধ্যেই তার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সানজুর বইটা প্রতিবেশী রাষ্ট্র ওয়ে-র রাজা হোলো-র হাতেও পড়ল। রাজা বইটা গভীর মনোযোগে পড়ে ভীষণ মুগ্ধ হলেন। সানজুর কাছে দূত পাঠালেন। সানজু রাজদরবারে হাজির হলেন। রাজা বললেন :

-আমি আপনার বইটা পড়েছি। বইয়ে আপনি সেনাবাহিনীকে সুশৃঙ্খলভাবে গড়ে তোলার পদ্ধতি বাতলেছেন। আমি কি আপনার থিউরিগুলো পরীক্ষা করে দেখতে পারি?

রাজা এ কথা বলার পেছনে কারণ ছিল। সানজু বইয়ে বলেছিলেন, যেকোনো মানুষকে কঠোর শৃঙ্খলা ও নিবিড় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুদক্ষ সেনা বানানো যায়। এমন একাধিক সেনা তৈরি করে তাদের দিয়ে একটি অপরাজেয় সেনাবাহিনী গঠন করা সম্ভব। সানজুর বক্তব্যের সারাংশ হলো, সেনাবাহিনী হলো একটি কঠোর শৃঙ্খলাপূর্ণ দলের নাম। সামরিক শৃঙ্খলার মাধ্যমে

যেকোনো মানবগোষ্ঠীকে দুর্জয় সেনাদলে রূপান্তরিত করা যায়। রাজার কথার জবাবে সানজু তড়িৎ জবাব দিলেন :

-বিলকুল, আপনি এই থিউরিকে যেকোনো মানুষের ওপর, যেকোনো মানব দলের ওপর পরীক্ষা করতে পারেন।

-এই কৌশল কি ঘরে বসে থাকা কোমলমতি নারীদের ক্ষেত্রেও সমান কার্যকর হবে?

-জি, মহারাজ, নারীদের ওপরও এই মূলনীতি সমানভাবে প্রযোজ্য।

সানজুর কথা শুনে রাজা ভীষণ অবাক। নারীদের দিয়েও সেনাবাহিনী গঠন করা সম্ভব? এ যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার। রাজা কিছুটা উত্তেজিত হলে সানজুকে চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে বললেন,

-আমাকে এক্ষুনি এটা প্রমাণ করে দেখাতে হবে।

রাজা তৎক্ষণাৎ অন্দরমহল থেকে ১৮০টি বাঁদি এনে হাজির করলেন। এরা রাজার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। সানজু বাঁদিদেরকে সমান দুইভাবে বিভক্ত করলেন। রাজার সবচেয়ে কাছের দুই বাঁদিকে দুই দলের কমান্ডার নিয়োগ দিলেন। মেয়েদের হাতে অস্ত্র দিয়ে সানজু বললেন, আমি বলার সাথে সাথে তোমরা ডানে ঘুরবে, বামে ঘুরবে, সামনে যাবে, পিছিয়ে আসবে। আমি হুকুম দেওয়ার সাথে সাথে সবাইকে বিনা বাক্য ব্যয়ে হুকুম তামিল করতে হবে। সব মেয়ে একবাক্যে বলে উঠল, আমরা তাই করব। সানজু এবার মেয়েদেরকে দুই কাতারে দাঁড় করিয়ে হুকুম দিলেন, ডানে যাও। মেয়েরা এই হুকুম শুনে খিলখিল করতে হাসতে শুরু করল। একে অপরের দিকে তাকাতে লাগল। অন্য মেয়ে ডানে সরল কি না, সেটা দেখার জন্য ইতিউতি তাকাতে লাগল। তারা হুকুম পালন করতে যেন লজ্জা পাচ্ছিল। কেউ কেউ সংকুচিত ছিল। সানজু বাজখাঁই গলায় বলে উঠলেন, তোমরা বোধহয় আমার হুকুম ভালো করে বুঝতে পারোনি। আবার বলছি, সোজা হাঁটো। সবমেয়ে সোজা সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করল। সানজু আবার হুকুম দিলেন, ডানে ঘুরো। মেয়েরা আবার খিলখিল করে হাসতে শুরু করল। যেন এখানে কোনো খেলা হচ্ছে। সানজু আবার আগের হুকুম জারি করলেন। মেয়েরা সানজুর হুকুমকে সিরিয়াসভাবে নিল না। সানজু বললেন, সৈনিকদের শৃঙ্খলাহীনতার দায় তাদের কমান্ডারের ওপরই বর্তায়। সানজু সাথে সাথে দুই কমান্ডারের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করলেন।

মেয়ে দুটি রাজার সবচেয়ে প্রিয় ছিল। রাজা একটি উঁচু জায়গায় তাঁবু খাটিয়ে পুরো ঘটনা অবলোকন করছিলেন। সবচেয়ে প্রিয় দুই নারীর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা হতেই রাজা চমকে উঠলেন। হায় হায় করে বললেন, এই দুজনকে হত্যা না করা হোক। এদের উপস্থিতি ছাড়া আমার গলা দিয়ে একটা লোকমা খাবারও নামে না। এরা না থাকলে আমার খানাপিনার মজাটাই নষ্ট হয়ে যাবে। জীবনের মানেটাই পানসে হয়ে যাবে। সানজু উত্তর দিলেন, রাজার কিছু হুকুম এমন থাকে, যুদ্ধের ময়দানে থাকা সেনাপ্রধান পরিস্থিতির বিচারে রাজার হুকুম তামিল করতে পারেন না। সেনাপ্রধান রাজার এমন কোনো হুকুম মানতে পারেন না, যে হুকুম মানলে সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যায়।

সানজু রাজার অনুরোধ-হুকুম-সুপারিশের তোয়াক্কা না করে সবার সামনে দুই রাজপ্রিয় তরুণীর গর্দান উড়িয়ে দিলেন। নতুন দুই তরুণীকে দলনেতা নিযুক্ত করা হলো। এই ঘটনা দেখে বাকি মেয়েরা ভীষণ ঘাবড়ে গেল। তীব্র আতঙ্কে নীল হয়ে গেল। ভয়ে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে রোবটের মতো সানজুর হুকুম পালন করতে শুরু করল। হুকুম অমান্য করার কথা ভাবতেও তাদের গা শিউরে উঠছিল। এরপর সানজু হুকুম দেওয়ামাত্রই মেয়েরা মুহূর্তেই অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে শুরু করে দিলো। মেয়েদের সমস্ত মনোযোগ সানজুর হুকুম শোনা ও হুকুম পালন করার মধ্যেই নিবদ্ধ হয়ে গেল। পৃথিবীর আর কোনোকিছুর দিকে তাদের সামান্যতম আগ্রহও ছিল না। যেন তাদের মানসিকতাটাই এমন হয়ে গেল, পৃথিবীতে তাদের জন্মই হয়েছে সানজুর হুকুম তামিল করার জন্য। পৃথিবীতে একমাত্র সানজুর হুকুমই সত্য, বাকি সবকিছু মিছে, অস্তিত্বহীন। পুরো বাহিনী এক দেহের মতো হুকুম পালন করতে শুরু করল। হুকুম পাওয়ামাত্রই সবার দেহ একসাথে নড়ে উঠছিল, একসাথে থামছিল। এভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পর নারীবাহিনী এক মন, এক ধ্যান, এক জ্ঞান, এক দেহ হয়ে ওঠার পর সানজু রাজাকে বললেন, এরা এখন পুরোদস্তুর সেনাবাহিনী হয়ে উঠছে। আপনি চাইলে যাচাই করে দেখতে পারেন। আপনি যদি তাদেরকে আগুনে ঝাঁপ দিতে বলেন, তারা নির্দ্বিধায় ঝাঁপিয়ে পড়বে। আপনি তাদেরকে উত্তাল সমুদ্রে লাফিয়ে পড়তে বললে, তারা বিনা বাক্য ব্যয়ে লাফ দিবে। আপনি তাদেরকে তলহীন গর্তে পড়ে যেতে বললে তারা আগপিছ না ভেবেই পড়ে যাবে। হুকুম না মানার ব্যাপারে তাদের মনে কোনো ধরনের প্রশ্নই দেখা দিবে না।

রাজা তখনো দুই প্রিয় নারীর শোক কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তাদের বিরহে কাতর সময় কাটাচ্ছেন। রাজার কাছে এসব আর ভালো লাগছিল না।

সেনাগঠন কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়ার হুকুম দিলেন। রাজা কিছুদিন সব কাজ থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখলেন। সময়ের সাথে সাথে শোকের তীব্রতা কমে এলো। রাজা স্বাভাবিক হুঁশ-জ্ঞান ফিরে পেলেন। বুঝতে পারলেন, সানজু আসলেই একজন দূরদর্শী সমরবিদ। তার থিউরিও শতভাগ কার্যকর। তার ফর্মুলা অনুসারে এক যুদ্ধজয়ী সেনাদল গঠন সম্ভব। সানজুর স্ট্র্যাটেজি চোখবুজে অনুসরণ করা যেতে পারে। রাজা চিন্তাভাবনা করে সানজুকে সেনাপ্রধানের দায়িত্ব দিয়ে দিলেন। সেনাপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করে সানজু সেনাবাহিনীকে ঢেলে সাজালেন। তাদেরকে নিরলস প্রশিক্ষণ দিয়ে অপরাজেয় বাহিনীতে পরিণত করলেন। সানজুর নেতৃত্বে রাজবাহিনী একের পর এক যুদ্ধ জিততে শুরু করল। প্রথমে চু রাজ্যকে যুদ্ধে পরাজিত করলেন। তারপর রাজধানী প্যাংক দখল করলেন। তারপর চী ও চীন রাজ্যকেও পরাজিত করলেন।

সানজু সম্পর্কে এর বেশি কিছু আর জানা যায় না। এটা নিয়েও বিতর্ক আছে, সানজু বাস্তবিকই নির্দিষ্ট একজন মানুষ, নাকি অনেক পণ্ডিতের বক্তব্য জমা করে বইটা সংকলন করা হয়েছে। এই বইয়ের শ্লোকগুলো বাঁশের কঞ্চির ওপর লেখা হয়েছিল। এভাবেই শত শত বছর ধরে বইটির চর্চা হয়ে আসছিল। চায়নিজ সেনা কমান্ডাররা এই বই পড়ে সামরিক কৌশল ও যুদ্ধবিদ্যা শিখত। চীন থেকে এই বই কোরিয়া ও জাপানে গিয়েছিল। জাপানেই এই বইয়ের সবচেয়ে পুরোনো কপি পাওয়া গেছে। অষ্টম শতাব্দী অর্থাৎ প্রায় বারো শ বছর আগের কপি। জাপানের সামুরাই যোদ্ধারা গভীর অভিনিবেশে এই বই অধ্যয়ন করত। সামুরাইদের জীবনে যুদ্ধই ছিল একমাত্র কাজ। সামুরাইদের কাছে যুদ্ধটা ছিল ধর্মের মতো, সংস্কৃতির মতো। যুদ্ধই সামুরাইদের পূজার প্রধান উপকরণ ছিল। সামুরাইরা জাপানে হাজার বছর ধরে তলোয়ার ও বর্শা চালনা বিদ্যার চর্চা জীবন্ত ও সক্রিয় রেখেছিল। রাইফেল-বন্দুক আসার আগ পর্যন্ত জাপানে সামুরাইদেরই সবচেয়ে বড় যোদ্ধা বিবেচনা করা হতো। সামুরাইরাই ছিল একমাত্র বীর, যোদ্ধা ও প্রকৃত পুরুষ।

আর্ট অব ওয়ার

১. যেকোনো রাজ্যের নাগরিকের জন্যই যুদ্ধবিদ্যা শেখা মৌলিকতম কর্তব্য। যুদ্ধবিদ্যা যেকোনো রাজ্যের জন্য জীবন ও মৃত্যুর সমান। কোনো রাজ্যই এই বিদ্যাকে এড়িয়ে যেতে পারে না। যুদ্ধবিদ্যাকে অবহেলা করে কোনো রাজ্য টিকে থাকতে পারে না।

২. দ্য আর্ট অব ওয়ারে দুটি বিষয়ের ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেনাপতির যুদ্ধপরিচালনা যোগ্যতা ও বুদ্ধিমত্তা (ইন্টেলিজেন্স) খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোনো রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, যুদ্ধতৎপরতা ও সাফল্য যদি কোনো একজন মানুষের ওপর নির্ভরশীল থাকে, সে ব্যক্তি হলো সেনাপ্রধান। সেনাপতি হলো যেকোনো রাজ্যের সুরক্ষাপ্রাচীরের মতো। শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তিতে সেনাপতি যত শক্তিমান হবে, রাজ্যও তত শক্তিশালী হবে। এই সুরক্ষাপ্রাচীরে কোনো ফাটল বা দুর্বলতা থাকলে, সেটা রাজ্যেরই দুর্বলতা।

৩. একজন সেনাপতির সবচেয়ে বড় শক্তি হলো, নিজের রাগের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারা। যুদ্ধপরিস্থিতি যতই সঙ্গিন আর শোচনীয় হোক, সেনাপতির মাথা ও মন সম্পূর্ণ শীতল-ঠান্ডা থাকতে হবে। সেনাপতিকে সর্বাবস্থায় নিরুদ্বেগ থাকা জরুরি। সেনাপতি কঠিন পরিস্থিতিতেও এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, যাতে তার দেশ ও সেনা নিরাপদ থাকে; বেঁচে থাকে। সাফল্যমণ্ডিত থাকে; ভালো থাকে।

৪. যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির কোনো পর্যায়ে আগে অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন না থাকলে শুধু বীরত্ব দেখানোর জন্য অপ্রয়োজনীয় হামলা করা থেকে বিরত থাকাও একজন আদর্শ সেনাপতির কর্তব্য। কোনো যুদ্ধে যদি পরিস্থিতির কারণে পিছু হটা জরুরি হয়, তাহলে গোটা দুনিয়া তাকে ভীরু বললেও পিছু হটতে দ্বিধা করবে না। পিছু হটার কারণে যদি সেনাবাহিনীর স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকে, সেনাপতি পিছু হটে আসবে।

৫. যুদ্ধ শুরুর আগে যে সেনাপতি বেশি চিন্তা-পরিকল্পনা করে, যুদ্ধে তার সাফল্য লাভের সম্ভাবনাও বেড়ে যায়। যে সেনাপতি যুদ্ধের আগে ভালো করে চিন্তাভাবনা করে না, সে বেশিরভাগ সময় পরাজিত হয়।

৬. সেনাবাহিনী শক্তিমান বা দুর্বল হয় না, সেনাপতিই মূলত শক্তিমান বা দুর্বল হয়। সেনাপতিই একটি বাহিনীকে শক্তিমান বা দুর্বল বানায়।

৭. যুদ্ধে জয়লাভ করতে হলে অফিসার ও সাধারণ সৈনিকদের জোশ-হুঁশ, জোর-জযবা একরকম হওয়া জরুরি। উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সবার মধ্যে একই রকমের উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকা দরকার। সবার নৈতিক মনোবল একই রকম উঁচু আর মজবুত হওয়া প্রয়োজন। সবাই যেন লড়া ও মরার জন্য সমান প্রস্তুত থাকে। সৈনিকদের মোরাল বা নৈতিক মনোবল উঁচু রাখা সেনাপতির

অবশ্য কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে। যুদ্ধে সাহস ও মনোবল ধরে রাখার জন্য সৈনিকদেরকে যদি প্রতিপক্ষের সম্পদ লুট করার প্রলোভন দেখাতে হয়, সেনাপতিকে তাই করা উচিত।

৮. সেনাপতির কাছে এ বিষয়টা পরিষ্কার থাকা জরুরি, কখন যুদ্ধ করতে হবে আর কখন যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে। সেনাপতি যখন সবদিক বিবেচনা করে বুঝতে পারবে, যুদ্ধে তাদের জয় সুনিশ্চিত, সেনাপতি কর্তব্য হলো, যথাশীঘ্র হামলা শুরু করে দেওয়া। এমনকি সেনাপতির উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যদি যুদ্ধ শুরু করার অনুমতি নাও দেয়, তবুও ঝুঁকি নিয়ে হামলা করে দেওয়া উচিত।

৯. এর বিপরীতে সার্বিক বিবেচনায় যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে, রাজা হুকুম দেওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধ শুরু না করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে সেনাপতির কাজে রাজার কোনো ধরনের হস্তক্ষেপই করা উচিত নয়। যুদ্ধবিষয়ে সেনাপতিকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিয়ে রাখা উচিত। এটা সেনাপতির মৌলিকতম অধিকার হিসেবে গণ্য করা উচিত।

১০. সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সেনাপতি হলো, যিনি নিজের শক্তিমত্তা দেখিয়েই বা সত্য-মিথ্যা ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রতিপক্ষকে ভীতসন্ত্রস্ত করে পরাজিত করতে পারে, বা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করতে পারে, বা যুদ্ধে না জড়ানোর হিম্মত নষ্ট করে দিতে পারে।

১১. দক্ষ সেনাপতি কখনো অপ্রয়োজনীয় রক্তপাত ঘটায় না। যুদ্ধে তাড়াহুড়া করা যেমন দক্ষ সেনাপতির বৈশিষ্ট্য নয়, তদ্রূপ দীর্ঘ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়াও বিচক্ষণ সেনাপতির কাজ নয়। বিশেষ করে উঁচু প্রাচীরধারী নগর ও দুর্গের মতো সুরক্ষিত শহর অবরোধ করা উচিত নয়। এমন অবরোধে বিপুল সেনাশক্তি, অপরিমেয় যুদ্ধ সরঞ্জাম বা অর্থনীতির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। যুদ্ধ যত তাড়াতাড়ি শেষ করা যায়, ততই উত্তম। দীর্ঘ যুদ্ধ সেনাপতির ব্যর্থতা প্রকাশ করে। দীর্ঘ যুদ্ধে উপকার হয়েছে—এমন দেশ খুব একটা নেই বললেই চলে। দীর্ঘ যুদ্ধের সবচেয়ে ক্ষতিকর দিক হলো, দুশমন নিজেকে গুছিয়ে নেওয়ার বা শক্তি সঞ্চয়ের সুযোগ পেয়ে যায়। অন্যদিকে দীর্ঘ অবরোধের কারণে আক্রমণকারীর শক্তি ক্রমাগত ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে; নৈতিক শক্তিও কমতে থাকে। ফলশ্রুতিতে আক্রমণকারী সেনাবাহিনী ও রাজার মধ্যে মতবিরোধ বাড়তে থাকে। অনেক সময় সেনাবাহিনী বিদ্রোহও করে বসে। এমন পরিস্থিতিতে যাদেরকে অবরোধ করা হয়েছে, তাদেরই

পাল্টা হামলা করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় কোনো সেনাপতি যত জ্ঞানী আর বুদ্ধিমানই হোক, নিজরাজ্যকে ধ্বংস হওয়া থেকে বাঁচাতে পারে না। বুদ্ধিমান সেনাপতি সংক্ষিপ্ত যুদ্ধ করে উদ্দেশ্য হাসিল করে ফিরে আসে। নির্বোধ সেনাপতি মাসের পর মাস লড়তে থাকে, ফলাফল অধরা থেকে যায়। দীর্ঘ লড়াইয়ে অনেক সময় লক্ষ্যটাও পরিষ্কার থাকে না।

১২. দক্ষ সেনাপতি নিজের শক্তি ও দুর্বলতা সম্পর্কে যেমন পরিপূর্ণ ওয়াকিবহাল থাকে, শত্রুর শক্তি ও দুর্বলতা সম্পর্কেও তার সম্যক জানাশোনা থাকে। যে সেনাপতি নিজের ও দুশমনের শক্তি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখে, সে সেনাপতি শত যুদ্ধেও পরাজিত হয় না। কোনো সেনাপতি যদি নিজের শক্তি সম্পর্কে জানে, দুশমনের শক্তি সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখে না, তার বিজয়ের সম্ভাবনা ৫০:৫০। প্রতিটি যুদ্ধেই জয় ও পরাজয় উভয়টার সম্ভাবনা থাকে। যে সেনাপতি নিজের ও দুশমনের শক্তি সম্পর্কে ভালোভাবে জানাশোনা রাখে না, সে প্রতিটি যুদ্ধেই পরাজিত হয়।

১৩. দুশমনকে কখনো কোনো অবস্থাতেই কমজোর মনে করার মতো অপূরণীয় ভুল করা যাবে না। যে সেনাপতি দুশমনের যুদ্ধক্ষমতা নিয়ে হাসিঠাট্টা করে, সে অতি দ্রুতই পরাজিত হয়, না হয় আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। দক্ষ সেনাপতি কোনো ভুল করা ছাড়াই যুদ্ধে জয়লাভ করে। যুদ্ধে জেতাই শেষকথা নয়। যেকোনো মূল্যে যুদ্ধে জেতা জরুরি নয়; বরং অতি সহজে জেতা জরুরি। অপূরণীয় ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়ে যুদ্ধে জেতার কোনো মানে হয় না। যুদ্ধের উত্তম কৌশল হলো, সহজে যুদ্ধে জয়লাভ করা। যাতে সেনাশক্তিতে ঘাটতি না হয়, অর্থনীতিও ঠিকঠাক থাকে।

১৪. দুশমনকে বোঝার জন্য সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো গোয়েন্দা বিভাগ। একজন সেনাপতি যতই সতর্ক, দক্ষ আর বিচক্ষণ হোক, নিজেই দুশমন সম্পর্কে সার্বিক তথ্য হাসিল করা অসম্ভব। দুশমনকে বুঝতে হলে দুশমন সম্পর্কে নানারকমের তথ্য প্রয়োজন হয়। দুশমনের সংখ্যা কত, দুশমনের অবস্থান কোথায় কোথায়, দুশমনের গতিবিধি, দুশমনের মতিগতি, দুশমন অগ্রসর হওয়ার পথ কোনটা, এসব তথ্য ছাড়া লড়াইয়ে জেতা অসম্ভব। এজন্য সেনাপতিকে গোয়েন্দাদের ওপর নির্ভর করতে হয়। গোয়েন্দা বিভাগ যুদ্ধের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। গোয়েন্দারা শাসকের সবচেয়ে শক্তিমান ও কার্যকর ভিত। যে রাজ্য গোয়েন্দাদের পেছনে টাকা খরচ করে না, সে রাজ্য অনেক বড় ভুল করছে, নির্বোধের মতো কাজ করছে। কার্যকর ও সক্রিয়

গোয়েন্দা বিভাগ না থাকলে সেনাপতি নিখুঁত ও কার্যকর কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারবে না। এমন সেনাপতি অন্ধের মতো। এমন সেনাপতি দীর্ঘ অর্থহীন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে। দেশ দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে থাকবে। সানজু গোয়েন্দাদেরকে ৫ শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন :

০১. যুদ্ধক্ষেত্রের আশপাশ থেকে সংগৃহীত গোয়েন্দা। এমন গোয়েন্দা অত্র এলাকার ভৌগলিক অবস্থান, গুরুত্বপূর্ণ সড়ক, গোপন পথ, পানির উৎস সম্পর্কে সম্যক অবগতি রাখে। সেনাপতিকে সহজেই এলাকা সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য সরবরাহ করতে পারে।

০২. দুশমনের সেনা সদস্য থেকে সংগ্রহ করা গোয়েন্দা। বিশেষ করে অফিসার পর্যায়ের সদস্য। এসব অফিসারকে টাকার বিনিময়ে খরিদ করা হয়। তাদের কাছ থেকে দুশমনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

০৩. আগে দুশমনের গোয়েন্দা ছিল, এখন কোনো না কোনোভাবে নিজেদের আয়ত্তে এসে গেছে। এসব লোকের মগজধোলাই করে, লোভ দেখিয়ে নিজেদের দলে শামিল করে নেওয়া যেতে পারে। এমন লোক দুশমন সম্পর্কে বেশি তথ্য প্রদান করতে পারে।

০৪. ডাবল এজেন্ট। এমন লোক বাহ্যিকভাবে দুশমনের গোয়েন্দা হিসেবে কাজ করে। বাস্তবে নিজ দেশের জন্য কাজ করে। এই লোক নিজ দেশের সেনাবাহিনী সম্পর্কে দুশমনকে ভুল তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করে।

৫. নিজ দেশের প্রতি অনুগত থেকে শত্রুবাহিনীতে অনুপ্রবেশ করে তথ্য সংগ্রহ করে। অতি গোপনীয় তথ্য নিজ দলের কাছে পৌঁছাতে থাকে।

১৫. নিজেদের গোয়েন্দা বিভাগ মজবুত হওয়া যতটা জরুরি, ঠিক ততটা জরুরি হলো, দুশমন আমার ওপর গোয়েন্দাগিরি করার যোগ্য না হওয়া। আমার ওপর গোয়েন্দাগিরি করার সুযোগ না পাওয়া। বিশেষ করে সেনাপতির যুদ্ধপরিকল্পনা যেকোনো মূল্যে গোপন থাকা কাম্য। দক্ষ সেনাপতি নিজের পরিকল্পনা শুধু গোপনই রাখে না, প্রতিনিয়ত যুদ্ধপরিকল্পনায় পরিবর্তনও আনতে থাকে। পাশাপাশি দুশমনকে নিজের পরিকল্পনা বিষয়ে অনবরত ধোঁকা দিয়ে যেতেও সক্ষম হন। দুশমনকে ভুল তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করতে থাকেন। সবার আগেই সেনাপতির এই হিসেব থাকা উচিত, কোন যুদ্ধে জয়ের কতটুকু সম্ভাবনা। যে সেনাপতি আগ থেকে জয়ের সুযোগ-সম্ভাবনা মাপতে পারে না, তিনি কখনো ভালো সেনাপতি হতে পারে না।

১৬. যুদ্ধের আগে সেনাবাহিনীর শক্তি যাচাইয়ের জন্য কিছু মূলনীতি আছে, সেগুলো অনুসরণ করলে দুইপক্ষের শক্তির তারতম্য নিরূপণ করা সম্ভব। যথা :

১. দুই সেনাপতির কোনজন বেশি যোগ্য, সেটা দেখতে হবে।

২. ভৌগলিক অবস্থান ও পরিবেশ-পরিস্থিতি কার অনুকূলে।

৩. কোন দলের শৃঙ্খলা বেশি ভালো।

৪. কোন দলের কাছে হাতিয়ারের সংখ্যা বেশি।

৫. কোন দলের অফিসাররা বেশি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। কোন দলের প্রশিক্ষণ বেশি উন্নতমানের।

৬. কোন দলে শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য বেশি সাজা পেতে হয়। কোন দলে ভালো কাজের জন্য বেশি পুরস্কার দেওয়া হয়।

১৭. যে সেনাদল উপরোল্লিখিত বিষয়ে প্রতিপক্ষের তুলনায় বেশি ভালো, তারাই যুদ্ধে জয়লাভ করবে। সেনাপতির কর্তব্য, সাধারণ সেনাদের সাথে খুবই উত্তম ব্যবহার করা। সাধারণ সেনাদেরকে নিজের সন্তানের মতো দেখা। সেনাপতির মধ্যে এমন গুণ থাকলে সাধারণ সেনারা জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণেও সেনাপতির পাশেই থাকবে। সঙ্গিন মুহূর্তে সেনাপতিকে একা রেখে ময়দান ছেড়ে পালাবে না। তার মানে এই নয়, সেনাপতি সাধারণ সেনাদের সাথে এতবেশি নরম-কোমল আচরণ করবে, যার ফলে সেনারা হুকুম পালন করাই ছেড়ে দিবে। সেনাপতির কর্তব্য হলো, সুযোগমতো কঠোরতা করবে, প্রয়োজনে কঠোর শাস্তি দিবে।

১৮. দুশমন সংখ্যায় বেশি হলে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে না নামা উচিত। সম্ভব হলে এমন শত্রু থেকে দূরে কোথাও চলে যাওয়া উচিত। যতক্ষণ পর্যন্ত পরিস্থিতি নিজের অনুকূল না হয়, যুদ্ধে অবতীর্ণ না হওয়া উচিত। প্রতিপক্ষের তুলনায় স্বল্প সংখ্যার বাহিনী যতই বাহাদুরির সাথে লড়ুক, একসময় না একসময় প্রবল প্রতিপক্ষ অল্প সংখ্যকের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেই ফেলে। এজন্য উত্তম হলো, যখন নিজের কাছে সেনা সংখ্যা বেশি থাকে, অস্ত্রশস্ত্র বেশি থাকে, ভৌগলিক অবস্থান ও আবহাওয়া নিজের অনুকূলে থাকে, তখনই হামলা করা যেতে পারে। হামলা করার আগে নিজের সুরক্ষাব্যবস্থা মজবুত করে নেওয়া কর্তব্য। যাতে করে দুশমনের পাল্টা হামলার ধাক্কায় নিজের পরাজয়ের আশঙ্কা না থাকে।

১৯. নিজেকে শক্তিশালী করা নিজের আওতাধীন বিষয়। দুশমনকে পরাজিত করা নিজের এক্তিয়ারে নেই। এজন্য নিজের কর্তব্য হলো অপেক্ষা করা—কখন দুশমন ভুল করে বসে, যার ফলে জেতার সুযোগ সৃষ্টি হবে। যে সেনাপতি আত্মরক্ষায় দক্ষ হয়, সে সেনাপতি ভূগর্ভের গভীরে থাকা গোপন নিরাপদ জায়গা সম্পর্কেও ভালো জানাশোনা রাখেন। প্রয়োজনে এসব জায়গায় গিয়ে আত্মগোপন করেন। সেখান থেকে হামলা পরিচালনা করেন।

২০. দক্ষ সেনাপতি যুদ্ধক্ষেত্রের ভৌগলিক তথ্য-উপাত্ত ভালো করে জানেন। অত্র এলাকার জঙ্গল, পাহাড় চষে সবচেয়ে উপযুক্ত ও নিরাপদ স্থানে ঘাঁটি গাড়েন। দক্ষ সেনাপতি এমন জায়গায় নিজ দল মোতায়েন করেন, সে জায়গা খুঁজে বের করা, সে জায়গা দখল করা শত্রুর জন্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। যারা হামলা করায় দক্ষ হয়, তারা আকাশচুম্বী উচ্চতা থেকেও দুশমনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

২১. দক্ষ সেনাপতি প্রতিটি জায়গাকে হামলার আওতায় নিয়ে আসে। সর্বাত্মক হামলা করে শত্রুকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

২২. যুদ্ধ পুরোটাই আর্ট অব ডিসেপশন। যুদ্ধ হলো ধোঁকাশিল্পের নাম। প্রতিমুহূর্তে দুশমনকে নিজের সম্পর্কে ভুল ধারণার মধ্যে রাখতে হয়। শক্তিমান হলে নিজেকে দুর্বল দেখানো কর্তব্য। তাহলে শত্রু আমার ওপর হামলাকালে ভুল পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হবে। আমাকে দুর্বল মনে করেই হামলা করবে। তাহলে দুশমন আচ্ছামতো ধোলাই খাবে। আমার জালে ফেঁসে যাবে। আমি যদি দুশমন থেকে দূরে অবস্থান করি, তাহলে আমাকে ভান করতে হবে, আমি প্রতিমুহূর্তে দুশমনের আরো কাছাকাছি চলে যাচ্ছি। আমরা যেকোনো মুহূর্তে হামলা করতে পারি—এমন ভাব করা। আমি যদি দুশমনের কাছাকাছি অবস্থান করি, তাহলে আমি ভান করব, আমার মূলশক্তি এখনো বহুদূরে। তারা এখনো এসে সারেনি। তাহলে দুশমন পুরোপুরি সতর্ক হবে না। আমি তখন হামলা করলে, দুশমন সেটা সামাল দিতে পারবে না।

২৩. চেষ্টা করতে হবে, সবসময় দুশমনকে সারপ্রাইজ দিতে; দুশমনকে চমকে দিতে। 'সারপ্রাইজ এটাকে' দুশমন যথাযথভাগে আত্মরক্ষা করে উঠতে পারে না, প্রতিপক্ষের প্রতিরোধ করতে পারে না। যুদ্ধকালে কোনো অবস্থাতেই দুশমনকে আরামে ও স্বস্তিতে থাকতে দেওয়া উচিত নয়। নিঃশ্বাস ফেলার ফুরসতও দুশমনকে দেওয়া যাবে না। অনবরত হামলায় দুশমনের নাভিশ্বাস তুলে ফেলাতে হবে।

২৪. দুশমনের সেনা সারিতে ফাটল ধরানোর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত। অনবরত এমন অগ্রগামী হামলা চালিয়ে যাওয়া উচিত, যাতে প্রতিপক্ষের সেনাপতি তালগোল পাকিয়ে খেই হারিয়ে ফেলে। মুহুর্মুহু হামলার বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পেরে বিপক্ষ সেনাপতি যেন রেগে ওঠে, রাগের মাথায় অবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে—এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। প্রতিপক্ষ সেনাপতি যেন উত্তেজিত হয়ে দ্রুত ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, বিপক্ষ সেনাপতি যেন তাড়াহুড়া করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে—এমন অবস্থা সৃষ্টি করা। দুশমন সেনাপতি যতবেশি ভুল করবে, ততই আমার জেতার সুযোগ-সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

২৫. দুশমন যুদ্ধক্ষেত্রে আসার আগেই নিজে পৌঁছে যাওয়া কর্তব্য। সম্ভাব্য যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে সবচেয়ে উঁচু আর সুবিধাজনক স্থান নিজেদের দখলে নিয়ে নেওয়া কর্তব্য। দুশমনকে কোনো অবস্থাতেই উঁচু জায়গায় অবস্থান গ্রহণ করতে না দেওয়া। উঁচু জায়গায় অবস্থান করলে চারপাশে ভালোভাবে নজর রাখা সহজ হবে। হামলা করা ও হামলা প্রতিহত করাও সহজ হবে।

২৬. সানজু ২৫০০ বছর আগেই বলে গেছেন, যুদ্ধবন্দিদের সাথে উত্তম আচরণ করা জরুরি। এতে করে দুশমনের কিছু লোক আমার অনুকূলে কাজ করতে সম্মত হয়ে যেতে পারে।

২৭. দুশমনের পুরো সেনাবাহিনীকে সম্পূর্ণ নির্মূল করাও উচিত নয়। দুশমনকে জিন্দা পাকড়াও করা হত্যা করার চেয়ে উত্তম। দুশমনের এলাকায় ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর চেয়ে যতটা সম্ভব শত্রু এলাকাকে অক্ষত দখল করা বেশি উত্তম। সামরিক ও অর্থনৈতিক উভয় দিক থেকেই এটা উপকারী।

২৮. তিনটি কারণে যেকোনো সেনাদল ধ্বংস হয়ে যেতে পারে :

০১. বাহিনী এখনো হামলা করা বা নড়াচড়া করার অবস্থায় না থাকার পরও সেনাপতি বাহিনীকে হামলা করা বা আগেপিছে যাওয়ার হুকুম দিলে বাহিনী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

০২. সেনাবাহিনীকে সিভিল প্রশাসনের মতো পরিচালনা করলে সেনাবাহিনী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সমূহ আশঙ্কা থাকে। সেনা প্রশাসন সিভিল প্রশাসনের চেয়ে ভিন্ন হওয়া উচিত।

০৩. মেরিট বা যোগ্যতা, গুণাবলি উপেক্ষা করা। অযোগ্যদেরকে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দানের মাধ্যমে একটি বাহিনী ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

২৯. সানজু ২৫০০ বছর আগে যে যুদ্ধকৌশল বাতলে গেছেন, সেগুলো আজও দুনিয়াতে ব্যবহৃত হয়। সানজুর এই বই শুধু সামরিক অফিসারদের জন্যই নয়, ব্যবসায়ী, প্রতিষ্ঠান পরিচালক, দেশশাসক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দদেরও পড়া উচিত। সানজু মূলত জেতার বাস্তবসম্মত ও অব্যর্থ কৌশল বাতলে গেছেন। তুমুল প্রতিযোগিতায় জেতার জন্য এসব কৌশল একটু এদিক-সেদিক করে প্রয়োগ করা যেতে পারে। যুদ্ধক্ষেত্র ও গোয়েন্দক্ষেত্রের মতো ব্যবসা ও প্রশাসনেও সানজুর কৌশলগুলো প্রয়োগযোগ্য। চায়নিজ নেতা মাও সে-তুং বলত :

> 'আমার সামরিক ও রাজনৈতিক সাফল্যের পেছনে সানজুর বিরাট ভূমিকা আছে।'

সানজুর বইটা শতশত বছর ধরে দুনিয়ার অগোচরে ছিল। শুধু চীন ও তার প্রতিবেশী কিছু দেশই বইটি সম্পর্কে জানত। ইউরোপীয় হানাদাররা যখন এশিয়াতে উপনিবেশ স্থাপন করতে এলো, তখনই তারা সানজু ও তার বই সম্পর্কে জানতে পেরেছিল। ১৭৮২ সালে প্রথমবারের মতো এক ফরাসি পাদরি এই বই সম্পর্কে জানতে পারে। সেই পাদরি চীনে থাকত। পাদরি সানজুর বইটা ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করেছিল। বলা হয়, ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টও উনিশ শতকে এই বই পড়েছিল। নেপোলিয়নই প্রথম ইউরোপিয়ান জেনারেল, যিনি সানজুর কৌশলগুলো ইউরোপ ও আফ্রিকার যুদ্ধে প্রয়োগ করেছিল। তারপর বিশ শতকের শুরুতে বইটির ইংরেজি তরজমা করা হয়। তারপর ধীরে ধীরে সানজুর বইটা গোটা দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে। এই বইকে মিলিটারি স্ট্র্যাটেজির 'বাইবেল' বিবেচনা করা হয়। এই বইয়ের বিক্রি কখনো বন্ধ হয় না। প্রতি বছর এই বইয়ের নিত্যনতুন সংস্করণ বাজারে আসে। সময় সুযোগ করে বইটা একবারের জন্য হলেও নেড়েচেড়ে দেখা উচিত।



চাণক্যনীতি

আজ থেকে প্রায় ২৪০০ বছর আগে ভারতের এক বড় সাম্রাজ্যের নাম ছিল 'মগধ'। এটাকে নন্দ সাম্রাজ্যও বলা হয়ে থাকে। এই সাম্রাজ্য পূর্বে বাংলা, পশ্চিমে পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মগধ সাম্রাজ্য এতবেশি শক্তিশালী ছিল যে, বিশ্ববিজয়ী গ্রিক বীর আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটও হামলা করার সাহস করে উঠতে পারেনি। ৩২৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আলেকজান্ডার রাজা পোরাসকে দীর্ঘ যুদ্ধের পর পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছিল। তখন গ্রিক সেনারা এই নন্দা সাম্রাজ্যের সীমানা পর্যন্ত পৌঁছেছিল। মাঝে ছিল বিয়াস (বিপাশা) নদী। নদীর ওপারেই নন্দা সাম্রাজ্য। নন্দা সাম্রাজ্যের ওপর হামলা করার জন্য আলেকজান্ডার পুরোপুরি প্রস্তুত ছিল। অপ্রত্যাশিতভাবে তার সেনাদলে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। গ্রিক সেনারা রাজা পোরাসের সাথে দীর্ঘ ক্লান্তিকর লড়াইয়ের পর তারচেয়েও শক্তিমান আরেকজন রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়াতে মোটেও রাজি ছিল না। আলেকজান্ডার নিজ সেনাদের মধ্যে বিদ্রোহের আভাস দেখার পর, নদীর এপারে দাঁড়িয়ে দূর থেকেই নন্দা সাম্রাজ্যের দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে তার ইরানি কেন্দ্র পার্সিপোলিসের দিকে যাত্রা শুরু করেছিল। আলেকজান্ডার পর্যন্ত যে সাম্রাজ্যে হামলা করার সাহস করে উঠতে পারেনি, সে সাম্রাজ্যকে ভেতরেরই একজন সাধারণ নাগরিক শুধু বিলুপ্তই করেনি, নন্দা সাম্রাজ্যের স্থানে আরো শক্তিশালী সাম্রাজ্য গঠন করতে সক্ষম হয়েছিল। ভেতরেরই সেই সাধারণ মানুষের নাম চাণক্য আচার্য।

ইতিহাসে চাণক্যকে আরো বহু নামে ডাকা হয়। চাণক্যকে বিশ্বের সর্বপ্রথম পলিটিক্যাল ফিলোসফার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিকের সংক্ষিপ্ত তালিকাতেও চাণক্যের নাম থাকে। কারো কারো মতে, চাণক্য ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বপ্রথম পলিটিক্যাল থিংকার তথা রাজনৈতিক চিন্তক। বলা হয়ে থাকে, চাণক্যই সর্বপ্রথম হিন্দুস্তানের সমস্ত অধিবাসীকে এক জাতি আর গোটা হিন্দুস্তানকে একটি দেশ বানানোর চিন্তা করেছিলেন। রাজনীতি ও অর্থনীতির কালজয়ী গ্রন্থ 'অর্থশাস্ত্র'-ও তার লেখা। বইটির লেখক হিসেবে চাণক্যকে কৌটিল্য নামেও ডাকা হয়। বই বা গ্রন্থ বললে আমাদের মনের পর্দায় যে চিত্র ফুটে ওঠে, সে সময় বইয়ের চিত্র এমন

ছিল না। কাগজ ছিল না, কলম ছিল না, কালি ছিল না। ছাপার বন্দোবস্ত ছিল না। তখন লেখা হতো গাছের পাতায়, পশুর হাড়ে, কাঠের পাতে, বাঁশের পাতলা কঞ্চিতে। এসবকে লেখার উপযোগী বানাতে বহু কায়দা-কসরৎ করতে হতো, কাঠখড় পোড়াতে হতো। সূচ্যাগ্র পাথর, পাখির পালক, কাঠ বা বাঁশের কঞ্চি দিয়ে কলম বানানো হতো। শুরুতে শক্ত কিছুতে খোদাই করে লেখা হতো। এখনকার মতো কলম বোলালাম আর লেখা বেরিয়ে গেল। তরতর করে লেখা এগুতে থাকল—বিষয়টা এত সহজ ছিল না। অনেক কিছু গুলিয়ে-মিলিয়ে কালি বানাতে হতো।

অর্থশাস্ত্র বইটি বিশাল কলেবরের। এক একটি অক্ষর খোদাই করে-করে এত বিরাট গ্রন্থ রচনা করা চাট্টিখানি ব্যাপার ছিল না। চীনে কাঠের পাতলা পাতের ওপর লেখা হতো। সে পাতগুলো পরপর সাজিয়ে সুতো দিয়ে বেঁধে বই বানানো হতো। এখনকার মতো ঘরে ঘরে লেখক-পাঠক মিলত না। শত শত বা হাজার মাইল পর এমন দুয়েকটা ঘর বা এলাকা পাওয়া যেত, যেখানে লেখাপড়ার চর্চা হতো। কাঠ, বাঁশ বা চামড়ায় লিখিত বইগুলোকে স্ক্রোল বলা হয়। এগুলো অতি যত্নে সংরক্ষণ করা হতো। একটা বই নষ্ট হয়ে গেলে আবার নতুন করে বই তৈরি করা যা তা ব্যাপার ছিল না। শিক্ষানুরাগী, বিদ্যোৎসাহী রাজা-মহারাজারা এ ধরনের লেখাপড়ার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। সব রাজারা লেখাপড়া জানতেন না, কদরও করতেন না। কেউ কেউ এসবের ঘোরতর বিরোধীও ছিলেন। শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আজ থেকে তেইশ শ বছর আগে অর্থশাস্ত্রের মতো গ্রন্থ রচনা করা হয়েছিল। অর্থনীতি, রাজনীতি ও রাষ্ট্রপরিচালনার ওপর এত বিশদ-বিস্তারিত বই এর আগে আর কেউ রচনা করতে পারেনি। বইটাকে নিজ বিষয়ে পরিপূর্ণ গ্রন্থ বলা যেতে পারে।

শুধু বইপত্রের কারণেই চাণক্যের নামডাক ছড়ায়নি, মৌর্য (MAURYAN) সাম্রাজ্যও চাণক্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি হিসেবে বিবেচিত। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এই সম্রাট অশোক সাম্রাজ্যেরই রাজা ছিলেন। ৩৭৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দের আশেপাশে কোনো একসময় চাণক্যের জন্ম হয়। কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তার সঠিক হদিস নির্ণয় করা যায় না। কারো মতে, বর্তমান পাকিস্তানের পাঞ্জাব অঞ্চলের তক্ষশীলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কারো মতে, দক্ষিণ ভারতে চাঙ্কা নামক এক গাঁয়ে জন্মেছিলেন। পিতার নাম চেনেন, মায়ের নাম চণ্ডেশ্বরি ছিল। উভয়ে কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন। জৈনধর্মের অনুসারী ছিলেন। জৈনমত ভারতের অতি প্রাচীন এক ধর্মের নাম। হিন্দুদের

মতো জৈনরাও জাতপাত প্রথা মেনে চলে। জৈনমতে, স্বতন্ত্র স্বত্বাধিকারী একক কোনো খোদা নেই। যেকোনো মানবাত্মা পবিত্রতা ও শুদ্ধতা অর্জন করতে করতে একপর্যায়ে খোদার স্তরে উন্নীত হতে পারে। এই ধর্মে প্রাণী হত্যা মহাপাপ বলে বিবেচিত হয়। এই ধর্ম পরম অহিংসার বাণী প্রচার করে। মশা মাছিকেও না মেরে সম্মান দেখানো হয়ে থাকে।

কথিত আছে, চাণক্য জন্মলাভের কয়েকদিন পর জৈনধর্মের পুরোহিতরা এসে দেখল, চাণক্য জন্মগতভাবেই সামনের দুটি দাঁত নিয়ে জন্মেছে। সে সময় জনশ্রুতি ছিল, যে শিশু দাঁত নিয়ে জন্মায় সে বড় হয়ে রাজা হয়। পুরোহিতরাও এই ভবিষ্যদ্বাণী করল। পুরোহিতের কথা শুনে চাণক্যের মা-বাবা ভীষণ ঘাবড়ে গেলেন। এ কী করে সম্ভব? দুজনেই নিতান্ত সাদাসিধা ও ধর্মভীরু ব্রাহ্মণ। তাদের কুঁড়েঘরে রাজা জন্মাবে কীভাবে? মা-বাবার ইচ্ছা, তাদের ছেলে একজন জৈনধর্মের পুরোহিত হবে; নামজাদা ধর্মবেত্তা হবে; সর্বজনমান্য ধর্মগুরু হবে। মা-বাবা দুজনেই পুরোহিতদের কাছে পেরেশানির কথা ব্যক্ত করল। পুরোহিতরা মা-বাবার ভয় কাটানোর জন্য শিশু চাণক্যের দাঁত দুটি উপড়ে ফেলল। এবার পুরোহিতরা বলল, এই বাচ্চা এখন আর রাজা হবে না, তবে রাজার উস্তাদ হবেই হবে। কিং হবে না; কিংমেকার হতে পারে।

যে নিয়তি দাঁতসহ জন্মানোর ফলে লিখিত হয়, দাঁত ফেলে দিলে সেটা খণ্ডে যায় কি না—কে জানে। দাঁতসহ জন্ম তো হয়ে গেছে। আরেকটা জনশ্রুতি আছে, চাণক্যের দাঁত জৈনপুরোহিতরা ভাঙেননি। চাণক্য খোদ নিজের দাঁত ভেঙেছে। শৈশবে সামনের দুটি দাঁত দেখে মা কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, আমার বাছা তো রাজা হবে দেখছি। রাজা হয়ে বাছা মাকে ভুলে যাবে। আগাম দুঃখ-কল্পনায় মায়ের দু চোখ থেকে টপটপ করে আঁসু ঝরতে শুরু করল। মায়ের কান্না দেখে চাণক্যের হৃদয় ভেঙে খানখান হয়ে গিয়েছিল। মায়ের কোল থেকে ছিটকে বেরিয়ে শক্ত পাথর দিয়ে আঘাত করে করে দাঁত দুটি ভেঙে ফেলল। থু করে রক্তাক্ত দুই ভাঙা দাঁত ফেলে মায়ের গলা জড়িয়ে বলল, যাও দাঁত দুটি ফেলে দিয়েছি। এখন আমি রাজাও হবো না, তোমাকেও ভুলব না। ঠিক আছে না?

চাণক্য যতই বড় হতে লাগল, ততই তার মধ্যে বেয়াড়াপনা বাড়তে লাগল। বেজায় ডানপিটে ছেলে হিসেবে আশেপাশে নামডাক ছড়িয়ে পড়ল। একবার তার পায়ে কাঁটা বিধল। রাগে ফুঁসে উঠে আশেপাশের সমস্ত কাঁটাদার গাছগুলা

উপড়ে ফেলল। ভবিষ্যতে যাতে এখানে আর কখনো কাঁটাদার গাছ জন্মাতে না পারে, তার স্থায়ী বন্দোবস্ত করে রাখল। চাণক্যের জন্ম কোথায় হয়েছে, এটা নিয়ে মতবিরোধ থাকলেও, তার যৌবনের লম্বা সময় তক্ষশীলাতেই কেটেছে—এ নিয়ে কারো দ্বিমত নেই। এখানে ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করেছিলেন। ধর্মজ্ঞান, ধর্মানুরাগ ও ধর্মপালনের কারণে পুরোহিত মহলে চাণক্য বেশ সমাদৃত ছিলেন। শিক্ষাদীক্ষা শেষ করার পর তক্ষশীলাতে কিছুদিন শিক্ষকতাও করেছিলেন।

৩২৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। আলেকজান্ডার তখন পারস্য ও আফগানিস্তানের বাকটারিয়া জয় করে পাকিস্তানের পাঞ্জাবে প্রবেশ করেছে। তক্ষশীলাও আলেকজান্ডারের পথেই পড়ে। চাণক্য বিদেশি সেনাদের হাতে আপন লোকদের পরাজিত হতে দেখলেন, লাঞ্ছিত-অপদস্থ হতে দেখলেন। নিজেদের সেনাদের কাতারে কাতারে মরতে দেখেছেন। এসব দেখেই হয়তো চাণক্যের মধ্যে হানাদার বিদেশিদের প্রতি ঘৃণা জন্ম নিয়েছিল, নিজ দেশকে শক্তিশালী বানানোর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা জেগে উঠেছিল। তখন তক্ষশীলা রাজা আম্বি এর শাসনাধীনে ছিল। রাজা আম্বি যুদ্ধ করার বদলে আলেকজান্ডারের সাথে সন্ধি করে নিল। আম্বি বুঝতে পেরেছিল, বিশাল গ্রিক বাহিনীর সাথে তিনি পেরে উঠবে না। এরপরই ছিল ঝিলম রাজ্য। এখানকার রাজা পোরেস আলেকজান্ডারের বিপুল শক্তিমত্তা দেখে টাল খেলো না। অমিত বিক্রমে গ্রিক বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। দীর্ঘদিন ধরে উভয়পক্ষে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হলো। রাজা পোরেসের ছেলেও এই যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছিল। রাজা পোরেসও আহত অবস্থায় গ্রেফতার হলো। এই যুদ্ধই ইতিহাসে ব্যাটেল অব ঝিলম হিসেবে পরিচিত। চাণক্য এসব দেখছিলেন আর ভেতরে ভেতরে ফুঁসছিলেন। এর প্রতিকার খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। তার ভাবনায় এলো, ছোট ছোট রাজ্যগুলো মিলিয়ে যদি একটি বড় সাম্রাজ্য কায়েম করা যায়, তাহলে কোনো বহিঃশক্তি আমাদের ওপর হামলা করার সাহস করতে পারবে না। নিজ দেশের লোকদের বিভাজন ও দুর্বলতা দূর করার জন্য চাণক্যের মনে একটা পরিকল্পনা মাথায় এলো। চাণক্য ভাবলেন, পুরো হিন্দুস্তানকে এক করার পর একজন শক্তপোক্ত রাজা ইনসাফের সাথে দেশ শাসন করলে বিদেশি হানাদাররা এদিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহস করতে পারবে না। এই পরিকল্পনা মাথায় নিয়ে চাণক্য বর্তমান কর্মস্থল তক্ষশীলা থেকে পশ্চিমে মগধ রাজ্যের রাজধানী পাটালিপুত্রায় পৌঁছলেন। যাকে আজ পাটনা বলা হয়।

রাজা পোরেস ও রাজা আম্বির তুলনায় মগধের রাজা অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল। মগধ রাজ্যটাও বড় ছিল। শক্তিমত্তা ও প্রতিপত্তিতে মগধ রাজ্য ও রাজা সবার চেয়ে এগিয়ে ছিল। সবদিক বিবেচনা করে, ভবিষ্যতের কথা ভেবে নিজের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আশাতেই চাণক্য এখানে এসেছিলেন। এখান থেকে উচ্চতর ধর্মীয় ও শাস্ত্রীয়জ্ঞান অর্জন করাও উদ্দেশ্য ছিল। চাণক্য এখানে এসে দেখলেন, নন্দারাজ বড় ও শক্তিশালী ঠিক আছে, কিন্তু প্রজারা তার প্রতি নাখোশ। মাত্রাতিরিক্ত করের বোঝার চাপে প্রজারা হাঁসফাঁস করছিল। কেউ কর দিতে না চাইলে বা কম দিতে চাইলে তার ওপর জুলুমের পাহাড় চাপিয়ে দেওয়া হতো। রাজার এহেন কর্মকৌশল চাণক্যের পছন্দ হলো না। চাণক্যের কল্পনায় আদর্শ রাষ্ট্রের যে রূপকল্প দানা বেঁধেছিল, বাস্তবের কঠিন ধাক্কায় তা হোঁচট খেল।

চাণক্য ব্রাহ্মণ হিসেবে রাজ দরবারে পৌঁছলেন। রাজা তখন ব্রাহ্মণদের মধ্যে ভাতা ও আনাজ-সবজি বিতরণ করছিল। সবাই লাইন ধরে একজন করে এগিয়ে রাজার হাত থেকে দক্ষিণা নিচ্ছিল। চাণক্যও লাইনে দাঁড়ালেন। তার পালা এলো। রাজা চাণক্যের হাতে দক্ষিণা তুলে দিতে গেলে চাণক্য বলে উঠলেন, আপনি কেমন রাজা, যার প্রজারা দুঃখ-কষ্টে দিন কাটাচ্ছে? মুখের ওপর এমন কথা শুনে রাজা ভীষণ অপমান বোধ করল। রাগে থরথর করে কেঁপে উঠল। চাণক্যকে সেই মুহূর্তে দরবার থেকে বেরিয়ে যাওয়ার হুকুম দিলো। চাণক্যও কম যান না। সাহসের সাথে বললেন, রাজামশায়, আপনার রাজত্বের জায়গায় এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করার আগ পর্যন্ত স্থির হবো না। ধর্মগুরু হিসেবে চাণক্যের মাথা মুণ্ডানো ছিল। পেছনে পনিটেইলের মতো টিকি ছিল। চাণক্য করলেন কী, রাজার সামনে পনিটেইলের বাঁধান খুলে ফেলে বললেন, যতদিন পর্যন্ত আপনার সাম্রাজ্য মাটিতে পুঁতে না ফেলছি, ততদিন আর টিকি বাঁধব না। টিকি ছিল ব্রাহ্মণদের সম্মানের প্রতীক। চাণক্য তার ধর্মীয় প্রতীক নিয়েই শপথ করেছিলেন। রাজা ক্রোধে অগ্নিশর্মা হওয়া সত্ত্বেও সরাসরি চাণক্যের কোনো ক্ষতি করার সাহস করে উঠতে পারল না। শত হলেও চাণক্য একজন ব্রাহ্মণ। রাজা ছিল জাতিতে শূদ্র। শূদ্র হয়ে ব্রাহ্মণের গায়ে হাত তোলা মহা অপরাধ। তাছাড়া এক ব্রাহ্মণকে অপমান করলে দেশের ব্রাহ্মণসমাজ ক্ষেপে যেতে পারে। অন্যদেশের ব্রাহ্মণরাও তাতে যোগ দিতে পারে। পরিস্থিতি অনুকূল না থাকায় রাজা বুকে পাথর বেঁধে, রাগক্রোধ হজম করে চাণক্যকে যেতে দিলো।

ইতিহাসে আরেকটি গল্পও প্রসিদ্ধ আছে। রাজার জুলুম দেখে চাণক্য রাজার ওপর ক্ষেপেনি। চাণক্য রাজার দরবারে চাকুরি জুটিয়ে নিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণদেরকে দান-দক্ষিণা দেওয়া চাণক্যের দায়িত্ব ছিল। রাজার অধীনে চাকরি করলেও রাজার সাথে চাণক্যের সরাসরি দেখা হয়নি। একদিন রাজা চাণক্যকে দরবারে দেখল। চাণক্যের গায়ের রং ছিল কুচকুচে কালো। সেকালের বিবেচনায় চাণক্যের ছবি-সুরতেও খুব একটা ছিরিছাঁদ ছিল না। সামনের পাটিতে ভাঙা আর উঁচু দাঁতগুলোও চাণক্যের মুখাবয়বকে এক অদ্ভুত আকৃতি দিয়েছিল। অদ্ভুতদর্শন কিম্ভূতকিমাকার চাণক্যকে দেখে রাজার মেজাজ বিগড়ে গেল। চাণক্যকে তৎক্ষণাৎ রাজদরবার থেকে বের হয়ে যাওয়ার হুকুম দিলো। এদিকে চাণক্যও নন্দরাজের দুঃশাসনের কারণে তিতিবিরক্ত হয়েছিলেন। চাণক্য কালবিলম্ব না করে সদর দরজার দিকে পা বাড়ালেন। যেতে যেতে শূদ্র রাজা সম্পর্কে কঠিন মন্তব্য করে বসলেন। বিড়বিড় করে বললেন, রাজা ধননন্দের রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবে, সে বেঘোরে মারাও পড়বে। চাণক্য মহল থেকে বের হওয়ার আগেই রাজা অনুচর মারফত সব জেনে গেল। চাণক্যকে গ্রেফতার করার জন্য দ্রুত লশকর পাঠাল। অবস্থা বেগতিক দেখে প্রাসাদের এক প্রভাবশালী হিতাকাঙ্ক্ষী চাণক্যকে নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে ফেলল। আশ্রয়দাতা লোকটি রাজবংশের কেউকেটা ব্যক্তি ছিল। কারো কারো মতে, সেই লোক রাজপুত্র পব্বত নন্দ ছিল। রাত নেমে এলে চাণক্য গা ঢাকা দিয়ে প্রাসাদ ত্যাগ করে সোজা পাটলিপুত্র নগরে চলে গিয়েছিলেন।

চাণক্য গোপনে রাজপুত্র পব্বত নন্দকে বহুমুখী প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করলেন। পিতার শাসনকে উৎখাত করে কীভাবে চাণক্যের মতবাদনির্ভর রাজত্ব কায়েম করা যায়, এ নিয়ে দিনরাত শলাপরামর্শ চলতে লাগল। দিনরাত বাবার বিরুদ্ধে রাজপুত্রের কান ভারি করা হতে লাগল। রাজ আইনের মারপ্যাঁচে পব্বতনন্দ রাজপুত্র হলেও পরবর্তী রাজা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল না; তবুও চাণক্য প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখলেন। দূরদর্শী চাণক্য একজনকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকলেন না। সময় থাকতে বিকল্প নিয়েও চিন্তাভাবনা করছিলেন। আরেকটি ছেলে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ছেলেটির মধ্যে রাজা হওয়ার যাবতীয় উপাদান বিদ্যমান ছিল। আসা-যাওয়ার পথে চাণক্য প্রায়ই ছেলেটিকে অন্যদের সাথে খেলাধুলা করতে দেখতেন। ছেলেটি রাজা-রাজা খেলা পছন্দ করত। দরবার সাজিয়ে রাজার ভূমিকায় দারুণ অভিনয় করত।

কল্পরাজা হিসেবে ছদ্মপ্রজাদের উত্থাপন করা অভাব-অভিযোগ যেভাবে নিখুঁতপন্থায় সমাধান করত, চাণক্য ভীষণ মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতেন। সেই বালকের নাম ছিল চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। নন্দরাজ শূদ্র হলেও চন্দ্রগুপ্ত উচ্চবর্ণের ক্ষত্রিয় শাক্য বংশের সন্তান ছিল। সামাজিক দিক থেকে বা ব্রাহ্মণের পরই ক্ষত্রিয় শাক্যদের অবস্থান ছিল। সাধারণত ক্ষত্রিয়রাই রাজা হতো। দেশের যুদ্ধবিগ্রহের নেতৃত্বও ক্ষত্রিয়দের হাতে থাকত। ব্রাহ্মণরা পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করত। চন্দ্রগুপ্তের পিতা ক্ষত্রিয় নেতা ছিল। যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। বাবার মৃত্যুর কয়েক মাস পর চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের জন্ম হয়। চন্দ্রগুপ্ত কোথায় কখন জন্মেছিল, জানা যায় না। কিংবদন্তি আছে, চন্দ্রগুপ্তের মা চেয়েছিল, তার ছেলে দারিদ্র্যের মধ্যে না থাকুক। অনাহারে, অবহেলায়, তিরস্কারের জীবনযাপন না করুক। বুকে পাথর বেঁধে ছেলেকে এক পশুশালায় রেখে এসেছিল। মায়ের আশা, কোনো ধনী ব্যক্তির চোখে পড়লে তাকে তুলে নিয়ে মানুষ করবে। মায়ের প্রচেষ্টা সফল হলো। জনৈক ধনী ব্যক্তি ছিল সেই পশুশালের মালিক। শিশু চন্দ্রগুপ্তকে গোশালায় ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদতে দেখে মালিকের মনে করুণা জেগে উঠল। অনাথ শিশুটিকে বাড়িতে নিয়ে এসে লালনপালন শুরু করল। চন্দ্রগুপ্ত বড় হওয়ার পর তাকে এক শিকারির কাছে বিক্রি করে দেওয়া হলো। শিকারি তাকে রাখালের দায়িত্ব দিলো। পশুপালনের ফাঁকে ফাঁকে চন্দ্রগুপ্ত অন্য রাখাল বালকদের সাথে রাজা-প্রজা খেলত। সে সময় চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের নজর কেড়েছিল।

চাণক্য শিকারির কাছ থেকে চন্দ্রগুপ্তকে চড়ামূল্যে কিনে নিলেন। চন্দ্রগুপ্তকে তক্ষশীলায় নিয়ে যাওয়া হলো। প্রথম শিষ্য পব্বত নন্দও সেখানে ছিল। চাণক্য উভয় শিষ্যকে রাজনীতি, সমরনীতি ও ধর্মনীতির নিবিড় প্রশিক্ষণ দিতে থাকলেন। ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ, অধ্যয়ন ও শাস্ত্রচর্চার মাধ্যমে চাণক্য রাজনীতির যেসব কলাকৌশল শিখেছিলেন, শিষ্যদ্বয়কে সেসব উজাড় করে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে শিখিয়ে দিলেন। চন্দ্রগুপ্ত গুরুর শিক্ষার পাশাপাশি ব্যক্তিগত আগ্রহ ও উৎসাহে আলেকজান্ডার এবং ভারতীয় রাজাদের যুদ্ধবিগ্রহের ঘটনা-ইতিহাস বিশদে অধ্যয়ন করেছিল। প্রতিটি যুদ্ধকাহিনি অধ্যয়নের সময় উভয়পক্ষের শক্তিমত্তা ও দুর্বলতার দিকগুলো গভীর অভিনিবেশে চিহ্নিত করার চেষ্টা করত। এভাবে চর্চা করার কারণে চন্দ্রগুপ্তের সামরিক মেধা দিনদিন তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠছিল; রাজ্য পরিচালনার কাজ তো ছোটবেলা থেকেই চর্চা করে আসছিল। উভয় শিষ্য চাণক্যের মতো গুরু পেয়ে

যৌবনে পদার্পণ করার আগেই হিন্দুস্তানের রাজা হওয়ার জন্য শারীরিক ও মানসিকভাবে পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে গেল।

রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হলে জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল। টাকা ছাড়া সেনা নিয়োগ ও সেনাপালন অসম্ভব। তীক্ষ্ণধী চাণক্য সম্পদ আহরণের একটি মোক্ষম উপায় বের করে ফেললেন। চাণক্য একটি মুদ্রা থেকে ৮টি মুদ্রা বানানোর ধূর্ত কৌশল আবিষ্কার করেছিলেন। এই কৌশলকেই বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কাজে লাগিয়ে মুদ্রাব্যবসা ফেঁদে বসেছিলেন। অর্থলোভী ধনীরা চাণক্যের কাছে মুদ্রা জমা দিত। চাণক্য নানা জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে এক মুদ্রা থেকে আট মুদ্রা বানিয়ে দিতেন। এই ব্যবসা করে চাণক্য বিপুল অর্থকড়ি জমা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এরই মধ্যে দুই শিষ্য পূর্ণ যৌবনে উপনীত হলো। ততদিনে আলেকজান্ডার মারা গেছে। তার বিরাট সাম্রাজ্য সেনাপতিদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। আফগানিস্তান ও পাঞ্জাব অঞ্চল গ্রিক সেনাপতি সেলুকাসের ভাগে পড়েছিল। পাঞ্জাবের কিছু এলাকায় তখনো গ্রিক সেনাবাহিনীর কয়েকটি ইউনিট মোতায়েন ছিল। জীবনব্যাপী প্রস্তুতির পর এটি ছিল চাণক্যের কর্মের মুহূর্ত।

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এসে গিয়েছিল। দুই শিষ্যের কোনো একজনকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। শিষ্যের হাতে একটি সেনাবাহিনী হস্তান্তর করা হবে। অর্থ কেলেঙ্কারি করে উপার্জন করা টাকা দিয়েই বাহিনীর মাসোহারার ব্যবস্থা হয়েছিল। এক রাজ্যে দুই রাজা থাকতে পারে না। কাকে বেছে নিবেন? পরীক্ষার জন্য উভয়ের হাতে মূল্যবান পাথরের নেকলেস দিয়েছিলেন। গুরুর কাছ থেকে পাওয়া হার উভয় শিষ্য গলায় ঝুলিয়ে রাখল। চাণক্য একদিন চুপিচুপি পব্বত নন্দকে ডেকে বললেন, চন্দ্রগুপ্ত ঘুমিয়ে থাকাবস্থায় সন্তর্পণে হারটা খুলে এনে আমাকে দিবে। খবরদার! চন্দ্রগুপ্ত যেন ঘুণাক্ষরেও টের না পায়। পব্বত নন্দ গুরুর কথামতো চেষ্টা করল। চন্দ্রগুপ্তের হার স্পর্শ করতেই সে জেগে উঠল।

কয়েকদিন পর চাণক্য একইভাবে চন্দ্রগুপ্তকে ডেকে পব্বতের হার নিয়ে আসতে বললেন। চন্দ্রগুপ্ত তলোয়ার দিয়ে এক কোপে ঘুমন্ত পব্বতের শিরশ্ছেদ করে মুণ্ডুসহ হারটা গুরুর কাছে হাজির করল। শিষ্যের কর্মপদ্ধতি গুরুর বেজায় পছন্দ হলো। কাকে রাজা বানানো হবে—এ নিয়ে চাণক্যের আর কোনো দ্বিধা রইল না। একজনই তো বাকি ছিল। চন্দ্রগুপ্তকে নন্দরাজ ও গ্রিক বাহিনীর বিরুদ্ধে সেনাপতি করে অভিযানে পাঠালেন।

কিংমেকার চাণক্যের দৃষ্টিতে, একমাত্র চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যই ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা হওয়ার যোগ্য ছিল। জালিয়াতি করে কামানো টাকায় গঠিত সেনাদল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। চন্দ্রগুপ্তের নেতৃত্বে সেই বাহিনী প্রথমে গ্রিক সেনাচৌকি আক্রমণ করল। পাঞ্জাবের গ্রিক সেনাদের পরাজিত করতে খুব এখটা বেগ পেতে হয়নি। চন্দ্রগুপ্ত গ্রিক বাহিনীকে পিটিয়ে দেশছাড়া করল। চন্দ্রগুপ্ত ধীরে ধীরে পাঞ্জাবের আরো অনেক রাজাকে পরাজিত করেছিল। এভাবেই একটি বড় সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্তের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল, মগধের শক্তিশালী সাম্রাজ্য। একদিন এই সাম্রাজ্যকে ধূলোয় মিশিয়ে দেওয়ার শপথ করেছিলেন চাণক্য। পাঞ্জাবে সাফল্য অর্জনের পর গুরু ও শিষ্য মগধের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করল। মগধের রাজা ধননন্দের ছিল ২ লক্ষ পদাতিক, ২০ হাজার অশ্বারোহী, ২ হাজার রথ, ৩ হাজার হাতি। এতবড় সেনাবাহিনীকে পরাজিত করা সত্যিই কঠিন ব্যাপার ছিল। এটা কোনো ছেলেখেলা ছিল না। ধননন্দ প্রথম এক লড়াইয়ে চাণক্য-চন্দ্রগুপ্তকে পরাজিত করেছিল। যুদ্ধে হেরেও গুরুশিষ্য কেউই হাল ছেড়ে দেয়নি। ধননন্দের দুর্বলতা কোথায়, চাণক্য সেটা বিলক্ষণ জানত। চাণক্য ধননন্দের দরবারে কাজ করেছে। তার জানা ছিল, দরবারের কোন কোন অমাত্য রাজার প্রতি নাখোশ। চাণক্যের এও জানা ছিল, কাকে কোন টোপ দিলে ফাঁৎ করে গিলে ফেলবে। নন্দ দরবারের নাড়িনক্ষত্র চাণক্যের নখদর্পণে ছিল। কোন মন্ত্রী এবং সামরিক কর্মকর্তাকে প্রলোভন-প্ররোচনা দিয়ে শিকার করা হবে, চাণক্য তার একটা তালিকা প্রস্তুত করলেন। চাণক্যের ধূর্ত চালে রাজার সব বিরোধীরা সম্পদ ও পদের লোভে প্রলুব্ধ হয়ে বিদ্রোহ করতে সম্মত হয়েছিল। পর্দার আড়ালের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন। এবার আসল লড়াইয়ের সময়।

লড়াই শুরু হলো। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর গুরুশিষ্য এক শানদার বিজয় অর্জন করল। চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্ত যে যার যোগ্যতার সর্বোচ্চটুকু ব্যয় করেছিল এই যুদ্ধে জেতার জন্য। চাণক্য সামলেছেন ময়দানের বাইরের বিষয় আর শিষ্য সামলেছে যুদ্ধের ময়দান। উভয়ের সম্মিলিত প্রয়াসে এক গৌরবজনক বিজয় ধরা দিয়েছিল।

যুদ্ধে রাজা ধননন্দ নিহত হলো। চন্দ্রগুপ্ত পাটালিপুত্র দখল করে মগধ সাম্রাজ্য বিলুপ্ত করে মৌর্য সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেছিল। চাণক্য তার শপথ পুরো করলেন। শহরের প্রাণকেন্দ্রে দাঁড়িয়ে জনসমক্ষে আবার নিজের টিকি বেঁধে নিলেন। অনেক আগে এই শহরে দাঁড়িয়েই চাণক্য শপথ করেছিলেন, সেই

শহরেই শপথ পুরো করলেন। চন্দ্রগুপ্ত পাটালিপুত্রকে মৌর্য সাম্রাজ্যের রাজধানী বানিয়েছিল। চাণক্যের পরামর্শ আর চন্দ্রগুপ্তের সমরকুশলতায় অল্পদিনেই ভারতের বিরাট অংশ মৌর্য সাম্রাজ্যের অধীনে চলে এসেছিল। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের হাতেই সিন্ধুনদের তীরবর্তী অঞ্চলে পরপর কয়েকটি যুদ্ধে আলেকজান্ডারের সেনাপতি সেলুকাস পরাজিত হয়েছিল। সেলুকাস শেষ পর্যন্ত চন্দ্রগুপ্তের সাথে সন্ধিচুক্তি করতে বাধ্য হয়। চুক্তির আওতায় সেলুকাস কান্দাহার পর্যন্ত বিরাট অঞ্চল মৌর্য সাম্রাজ্যের কাছে সোপর্দ করে দেয়। আনুগত্য ও সৌহার্দ্যের প্রমাণস্বরূপ সেলুকাস নিজের একটি মেয়েকে চন্দ্রগুপ্তের কাছে বিয়ে দিয়েছিল। চন্দ্রগুপ্ত শ্বশুরের প্রতি সম্মান দেখিয়ে ৫০০টি হাতিও উপহার দিয়েছিল। সেলুকাস এই হাতিগুলোকে অন্য গ্রিক সেনাপতিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ব্যবহার করেছিল।

চাণক্যের প্রশিক্ষণ ও পরামর্শে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ৩২০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী শাসকে পরিণত হয়েছিল। তার শাসনামলে হিমালয়ের পাদদেশে গড়ে ওঠা সভ্যতার স্বর্ণযুগ শুরু হয়েছিল। মৌর্য সাম্রাজ্য পরবর্তীতে ভারত ও পাকিস্তানের বেশিরভাগ এলাকা শাসন করেছে। ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ভারতের অধিকাংশ অঞ্চল একক সরকারের অধীনে এসেছিল। মৌর্য সাম্রাজ্যের পুরো প্রশাসন ব্যবস্থাকে চাণক্যই ঢেলে সাজিয়েছিল। চাণক্য তার দীর্ঘ চিন্তাভাবনা ও জীবনাভিজ্ঞতার নির্যাস মিশিয়ে জনকল্যাণমূলক শাসনব্যবস্থা ও প্রশাসনিক অবকাঠামো গড়ে তুলেছিল। এই শাসনব্যবস্থায় রাজা সবসময় জনগণের সেবায় নিয়োজিত থাকত। এমনকি ক্লান্তশ্রান্ত রাজা যখন বিশ্রাম করত বা শরীর দলাই-মলাই করাত, তখনো সাধারণ প্রজা নিজ মামলা উপস্থাপন করতে পারত। রাজা শত ব্যস্ততাতেও প্রজাদের অভাব-অভিযোগ মনোযোগ দিয়ে শুনত।

চাণক্যের রূপরেখা অনুসারেই রাজার মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছিল। গোটা প্রশাসনকে ১৫টি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল। প্রদেশের গভর্নর থেকে শুরু করে সুদূর পল্লীগ্রাম পর্যন্ত রাজার শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। গ্রামের শাসনব্যবস্থাকে 'গ্রামসভা' বলা হতো। গ্রামসভা অপরাধীদের শাস্তি দিতে পারত। রাস্তাঘাট নির্মাণ ও মেরামত, সেতুনির্মাণ, পুকুর-দিঘী খনন এবং বিনোদনের ব্যবস্থাও গ্রামসভাকে করতে হতো। তৃণমূল পর্যায়েও শাসনক্ষমতা বণ্টন করে দেওয়া হয়েছিল। এটা ছিল একপ্রকার ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। গ্রামসভারও নিচে আরেকটি প্রশাসন গড়ে তোলা হয়েছিল। সেই গ্রাম প্রশাসককে 'গ্রাসিক' বলা হতো।

এর বাইরে শহরগুলোতে আলাদা পুলিশ বিভাগ ছিল। বলা হয়, চন্দ্রগুপ্তের সেনাবাহিনীর সংখ্যা ৬ লাখে উন্নীত হয়েছিল। জনসংখ্যার বিচারে সেই যুগে এত বিরাট বাহিনী গঠন অসম্ভব। এই সংখ্যাকে অতিরঞ্জিত মনে হয়। এ কথা সত্যি, চন্দ্রগুপ্তের বিশাল সেনাবাহিনী ছিল। চন্দ্রগুপ্তের আগে আর কোনো ভারতীয় শাসকের এতবড় বাহিনী ছিল না।

চন্দ্রগুপ্ত একটি বিষয়ে গুরুর সাথে দ্বিমত পোষণ করত। চন্দ্রগুপ্ত কঠোর শাস্তি দেওয়ার পক্ষপাতি ছিল। ছোটখাটো অপরাধের জন্যও মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখেছিল। এতে জনমনে প্রতিনিয়ত তীব্র আতঙ্ক বিরাজ করত। মানবেতিহাস সাক্ষী, কঠোর শাস্তির ভয় কখনো অপরাধ কমাতে পারেনি। কঠোর সাজা নয়, ন্যায়বিচার ও ভালো অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাই অপরাধের মাত্রা কমিয়ে আসতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

মৌর্য সাম্রাজ্য চাণক্যের পরামর্শে বড় বড় জনকল্যাণমূলক প্রকল্প শুরু করেছিল। চাণক্যের মতে, রাষ্ট্রের উচিত, বড় বড় প্রকল্প হাতে নেওয়া। তাহলে জনগণ এসব প্রকল্প নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। জনজীবনে সুযোগ-সুবিধাও বৃদ্ধি পাবে। জনগণ বুঝতে পারবে, রাজা আমাদের জন্য কাজ করছে। এমন একটি প্রকল্প ছিল, পাটালিপুত্র থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত ১২০০ মাইল (১৯০০ কিমি) সড়ক নির্মাণ। এই সড়কটি ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলকে একে অপরের সাথে যুক্ত করেছে। পেশোয়ার ছিল আফগানিস্তান ও মধ্য এশিয়ার সাথে বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। নবনির্মিত সড়কটি ভারতীয় বাণিজ্যকে একধাক্কায় বহুদূর এগিয়ে দিয়েছিল।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য প্রায় ২২ বছর রাজত্ব করেছিল। তার শাসনকাল ছিল ৩২০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ২৯৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত। তারপর পুত্র বিন্দুসারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে জৈন সাধু হয়ে দক্ষিণ ভারতের মহীশূরে চলে গিয়েছিল। জৈন বিশ্বাস অনুসারে, সাধনা করতে করতে একসময় ক্ষুধার্ত-অনাহারে থাকাবস্থায় মারা গিয়েছিল। চন্দ্রগুপ্তের সময় চাণক্য ছিলেন মৌর্য সাম্রাজ্যের সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ। এমনকি চন্দ্রগুপ্তও হাতজোড় করে চাণক্যের সামনে দাঁড়াত। এত ক্ষমতা ও প্রভাব সত্ত্বেও চাণক্য তার সহজ-সরল জীবন ত্যাগ করেনি, সারা জীবন একটি কুঁড়েঘরে বাস করেছে। এই সময় সে তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'অর্থশাস্ত্র' রচনা করে। বলা হয়ে থাকে, একটি রাষ্ট্রের জন্য পরিপূর্ণ সংবিধান ও মূলনীতি হিসেবে অর্থশাস্ত্র ছিল মানবেতিহাসের প্রথম 'লিখিত' প্রয়াস। অর্থশাস্ত্র মানে 'সম্পদ বিজ্ঞান'।

সংস্কৃতে 'অর্থ' মানে 'সম্পদ', 'শাস্ত্র' মানে ম্যানুয়াল, পদ্ধতি, বিজ্ঞান। সম্পদ জমা করা ও তার সঠিক ব্যবহারের কার্যকর উপায় কী, এটাই ছিল 'অর্থশাস্ত্র'-এর অন্যতম আলোচ্য বিষয়। অর্থশাস্ত্রে ১৫টি বই ও ১৮০টি অধ্যায় আছে। এই গ্রন্থে জনগণ এবং রাষ্ট্রের সম্পর্ককে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। চাণক্য লিখেছেন :

১. প্রজা ছাড়া দেশ হতে পারে না, দেশ ছাড়া কোনো রাজা হতে পারে না। একজন রাজার উচিত, নিজের চেয়ে প্রজাদের প্রতি বেশি যত্নবান হওয়া।

২. রাজার আদেশের চেয়ে বেদ বা ধর্মশাস্ত্রের আদেশ বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে না। রাজার আদেশ আগে, তারপর ধর্মাদেশ।

৩. রাজার কর্তব্য হলো, রাজ্য ও রাজত্বের জন্য হুমকি-ঝুঁকির অস্তিত্ব আগে থেকেই আঁচ করতে পারা। বিপজ্জনক হয়ে ওঠার আগেই কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া এবং আগাম ব্যবস্থা গ্রহণ করে বিপদের উৎসমুখ বন্ধ করে দেওয়া।

৪. রাজার পরিপূর্ণ রাজনৈতিক ও সামরিক প্রশিক্ষণ থাকা জরুরি। রাজাকে ঝানু রাজনীতিবিদ ও দক্ষ যোদ্ধা হতে হয়।

৫. আবেগপ্রবণ মানুষ রাজা হতে পারে না। যে রাগ নিয়ন্ত্রণ করে না, সে ব্যর্থ রাজা। দুর্বল ব্যক্তি রাজা হওয়ারই যোগ্য নয়। যে জ্ঞানী নয়, সেও রাজা নয়। যার মধ্যে প্রেমরোগ আছে, সেও রাজা নয়।

৬. যে রাজা তার প্রজাকে সম্পদশালী করতে অক্ষম, সে কীসের রাজা? রাজার উচিত, নির্দিষ্ট কোনো ধর্মের প্রতি পক্ষপাত না করে, ধর্মীয় বিবেচনার ঊর্ধ্বে উঠে সবার প্রতি ন্যায়বিচার করা।

৭. শাস্তির ব্যাপারে চাণক্য তার শিষ্য চন্দ্রগুপ্তের বিপরীত মত পোষণ করতেন। তিনি কঠোর শাস্তির বিরুদ্ধে আর নমনীয় শাস্তির পক্ষে ছিলেন। তিনি প্রজাদের প্রতি রাজার সদয় আচরণে বিশ্বাসী ছিলেন। প্রজাদের কাছে রাজার দয়ালু প্রতিচ্ছবি থাকা দরকার মনে করতেন।

৮. অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে রাষ্ট্রের প্রতিটি বিভাগ সম্পর্কে বিশদ নির্দেশাবলি আছে। চাণক্য লিখেছেন, রাজাকে সবসময় যোগ্য লোকের সন্ধান করা উচিত। দেশ-বিদেশ থেকে যোগ্য লোক এনে দরবারে জড়ো করা উচিত। যোগ্য লোককে মন্ত্রী বানানো উচিত। প্রতিটি মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ

বিভাগ থাকা উচিত। মন্ত্রী নিজের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে রাজাকে নিয়মিত অবহিত করবে।

৯. প্রতিটি রাজ্যে সাতটি বিভাগ থাকা জরুরি। প্রধানমন্ত্রী, সেনাপ্রধান, গোয়েন্দা প্রধান, অর্থমন্ত্রী, প্রধান বিচারপতি, প্রধান পুরোহিত (ধর্মমন্ত্রী) ও নির্মাণমন্ত্রী (পূর্তমন্ত্রী)।

১০. এই বিভাগগুলি কোন কাজ করবে, কীভাবে করবে—চাণক্যও এই বিষয়েও বিস্তারিত লিখেছেন। উদাহরণস্বরূপ, অর্থবিভাগ সম্পর্কে লিখেছেন, রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ আয় কর্মচারীদের বেতনের জন্য বরাদ্দ হতে হবে।

১১. চাণক্য মন্ত্রী ও কর্মকর্তাদের নিয়মিত রদবদলে বিশ্বাস করতেন। যাতে কেউ তার পদের অযাচিত সুবিধা নিতে না পারে। কেউ একচেটিয়া সুবিধা ভোগ করতে না পারে। কারো হাতে যেন নির্দিষ্ট কোনো ক্ষমতা কুক্ষিগত না হয়।

১২. রাজার একটি দক্ষ গোয়েন্দা বিভাগ থাকা জরুরি। গোয়েন্দারা রাজা-রাজ্যের শত্রু-মিত্র, পরিবার-পরিজন, জোটসঙ্গীর ওপর নজর রাখবে। রাজার কাছে নিয়মিত তথ্য পৌঁছাবে।

১৩. রাজার অধীনে একদল ভাড়াটে ঘাতক থাকবে। শত্রু রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধে না জড়িয়ে শুধু রাজাকে হত্যা করা হবে। নিয়মতান্ত্রিক যুদ্ধ এড়াতে এর বিকল্প নেই।

১৪. গুপ্তচর ও সৈন্যদের প্রশিক্ষণ নিয়ে বিস্তারিত লিখেছেন। হাতিদের সামরিক প্রশিক্ষণের বিষয়েও বিশদ নির্দেশনা দিয়েছিলেন।

১৫. বিদ্রোহীদের উপর নজরদারি করা রাজার অবশ্যকর্তব্য। প্রথমে নরমকোমল ব্যবহার করে, উপহার-উপঢৌকন দিয়ে বিদ্রোহীদের মন জয় করার চেষ্টা করা উচিত। ভেট পেয়ে খুশিমনে বিদ্রোহ ছেড়ে দিলে ঠিক আছে। অন্যথায়, বাছাই করা কিছু লোককে পদমদের প্রলোভন দেখিয়ে নিজ দলে ভিড়িয়ে বাকিদের পিষে মেরে ফেলা উচিত। নির্মূল করার কাজে নতুন যোগ দেওয়া লোকদেরও সাথে নেওয়া উচিত।

১৬. রাজার সামনে দুজন প্রতিপক্ষ। একজন ন্যায়পরায়ণ অথচ দুর্বল রাজা, আরেকজন শক্তিশালী তবে জালেম-নিষ্ঠুর রাজা। রাজাকে যদি দুই

প্রতিপক্ষের কোনো একজনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়, শক্তিমান-নিষ্ঠুর রাজার বিরুদ্ধে লড়াই করা নিরাপদ। একজন ন্যায়পরায়ণ রাজা যতই দুর্বল হোক, দুর্দিনে জনগণ তার সাহায্যে এগিয়ে আসবে। প্রজারা রাজার মৃত্যু পর্যন্ত পাশে থাকবে।

১৭. রাজার জীবদ্দশাতেই নিজের ছেলেকে উত্তরাধিকারী হিসেবে নিয়োগ ও ঘোষণা করা উচিত। যুবরাজকে সরকারি দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করে তোলা উচিত।

১৮. রাজা মারা গেলে তার মৃত্যু সংবাদ গোপন রাখতে হবে। পরবর্তী রাজা পরিস্থিতি ও ক্ষমতা পুরোপুরি নিজের নিয়ন্ত্রণে আনার পর মৃত্যু সংবাদ প্রচার করা যেতে পারে।

১৯. চাণক্য ছিলেন একজন ধর্মগুরু। ধর্মীয় বিধিনিষেধ কঠোর নিষ্ঠার সাথে পালন করতেন। জৈন ধর্মের অনুসারী ছিলেন। হিন্দুধর্মের মতো জৈনধর্মেও ধর্মীয় বর্ণপ্রথা ছিল। চাণক্যও জাতপাত ও বর্ণপ্রথায় বিশ্বাস করতেন। হিন্দুরা চারটি বর্ণে বিশ্বাসী ছিল : ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। চাণক্য বিশ্বাস করতেন, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা বাকি দুই বর্ণের চেয়ে উচ্চতর জাতি। এর বাইরে শূদ্র অন্য জাতিগোষ্ঠীর লোকজন নিচু স্তরের মানুষ। অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে চারটি বর্ণের লোকজনকে পরামর্শ দিয়েছেন, প্রত্যেকে যেন যার যার দায়িত্ব-কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করে।

২০. রাজার কর্তব্য, প্রজাদেরকে ধর্মপালনে বাধ্য করা। এ ব্যাপারে রাজাকে কঠোর ও আপসহীন নীতি অনুসরণ করা উচিত। ধর্মপালন না করলে তাকে রাজা নির্বাচন করার ঘোরবিরোধী ছিল চাণক্য।

২১. শর্তসাপেক্ষে পিতা/স্বামীর সম্পত্তিতে নারীদের নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ দিতে হবে। বিধবাদের পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা করা উচিত। একটি দম্পতি যদি নিজেদের নিয়ে অসন্তুষ্ট থাকে, দুজনের মধ্যে খিটিমিটি লেগে থাকে তবে তাদের আলাদা হয়ে যাওয়া উচিত।

২২. আজ থেকে ২৩০০/২৪০০ বছর আগে একজন বিধবার পুনর্বিবাহ বা বিবাহবিচ্ছেদের নিয়ম ছিল না। চাণক্য তার রাজ্যে এ দুটি বিষয়কে বৈধতা দিয়েছিল।

২৩. পুরুষের বিপরীতে নারী অর্ধেক সাজা ভোগ করবে।

রাজা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মৃত্যুর কয়েক বছর পর খ্রিস্টপূর্ব ২৮২ সালে চাণক্য পাটালিপুত্রে মারা গিয়েছিল। ভারতীয়রা চাণক্যকে তাকে আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার জনক মনে করে। চাণক্যের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে নয়াদিল্লির একটি এলাকার নাম 'চাণক্যপুরী' রাখা হয়েছে। বিদেশি দূতাবাসগুলো চাণক্যপুরীতে অবস্থিত।

চাণক্যের সমালোচনা

১. চাণক্যের রাষ্ট্রদর্শনের বিরুদ্ধে গবেষকগণ অনেক যুক্তিসঙ্গত অভিযোগ-আপত্তি উত্থাপন করেছেন। একটি রাষ্ট্রকে কীভাবে স্থিতিশীল করা যায়? কীভাবে 'কেন্দ্র'-কে শক্তিশালী করা যায়? চাণক্যনীতিতে সমস্ত মনোযোগ এই একটি বিষয়েই কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। এতে সমস্যা নেই। রাষ্ট্রকে স্থিতিশীল রাখা ও কেন্দ্রকে শক্তিশালী করার জন্য চাণক্য নির্মম-নিষ্ঠুর পদ্ধতি অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছিলেন, সেটা আপত্তিকর। আধুনিক চিন্তকগণ মনে করেন, দমন-পীড়ন ও জুলুম করে সাময়িকভাবে দাবিয়ে রাখা যায়, স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় না। নির্মম-নিষ্ঠুর শাস্তি অপরাধ নির্মূল করতে পারে না।

২. চাণক্যের বিরুদ্ধে লিঙ্গ পক্ষপাতদুষ্ট হওয়ার অভিযোগও ওঠানো হয়। অর্থশাস্ত্রে চাণক্য নারীদের ছলনাময়ী, প্রতারক, ধূর্ত ধোঁকাবাজ হিসেবে চিত্রিত করেছেন।

৩. চাণক্যের বিরুদ্ধে এই আপত্তি করা হয়, চাণক্য প্রজার চেয়ে রাজাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। একজন সাধারণ মানুষের প্রতি ন্যায়বিচারের চেয়ে শাসক কীভাবে ক্ষমতা ধরে রাখবে—চাণক্য এই বিষয়টাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। চাণক্যের চিন্তাও বোধ হয় ম্যাকিয়াভেলির মতো ছিল। ম্যাকিয়াভেলির নীতি হচ্ছে, রাষ্ট্র শক্তিশালী হলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়ার সম্ভাবনা ও সুযোগ থাকবে। রাষ্ট্র অস্থিতিশীল হলে, কিছুদিন পরপর সরকার বদল হতে থাকলে সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নতির কোনো সুযোগই থাকবে না। চাণক্যের ১৭০০ বছর পর ম্যাকিয়াভেলি তার '*দ্য প্রিন্স*' বইতেও প্রায় একই রাষ্ট্রদর্শন উপস্থাপন করেছিলেন। দ্য প্রিন্স বইটিও অর্থশাস্ত্রের মতো তুমুল জনপ্রিয়তার পাশাপাশি সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে।

দ্য প্রিন্স

নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি। ইতালির রাজনীতিবিদ, দার্শনিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী। তিনি শাসকদের শিখিয়ে গেছেন, কীভাবে ক্ষমতায় থাকতে হয়; ক্ষমতার মসনদ আঁকড়ে ধরতে হয়। ক্ষমতার নিগূঢ় রহস্য নিপুণভঙ্গিতে শাসকের সামনে তুলে ধরেছেন। ক্ষমতার অলিগলি, অন্ধকার অলিন্দ-ঘুপচির সাথে শাসককে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। সারা পৃথিবীতে শাসকরা দেদারসে ম্যাকিয়াভেলির নীতি অনুসরণ করে থাকে। ম্যাকিয়াভেলি তার রাষ্ট্রনীতির জন্য যতটা না সমাদৃত, তার চেয়ে বহুগুণ বেশি সমালোচিত, অনাদৃত। মীর জাফরের মতো ম্যাকিয়াভেলি নামও অনেকটা গালিতে রূপান্তরিত হয়েছে। রাজনীতি বা কূটনীতির ময়দানে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য ম্যাকিয়াভেলির অনুসারী আখ্যা দেওয়ার বহুল প্রচলন আছে। রাজনৈতিক বিতর্কে প্রায়ই বলতে শোনা যায়, অমুক তো ম্যাকিয়াভেলি নীতির অনুসরণ করছে। তার মানে, সে লোককে ধোঁকাবাজ ও স্বার্থপর আখ্যা দেওয়া হচ্ছে; ধান্ধাবাজ বলা হচ্ছে।

'দ্য প্রিন্স' বইটির কলেবর খুবই ছোট। ২০০ পৃষ্ঠারও কম। ছোট্ট বইটা প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই সারাবিশ্বকে মাতিয়ে রেখেছে। ম্যাকিয়াভেলি ১৪৬৯ সালে ইতালির ফ্লোরেন্সে জন্মগ্রহণ করেন। ইতালি একসময় রোমান সাম্রাজ্যের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। ইতালির রোমে ছিল রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী। রোমসাম্রাজ্য ভেঙে যাওয়ার পর ইতালির শহরগুলো ছত্রভঙ্গ হয়ে ছোট ছোট নগররাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। ক্ষুদে রাজ্যগুলোর মধ্যে পরস্পর হানাহানি লেগেই থাকত। কোন রাজ্য কখন কার শত্রু—সেটা বোঝা মুশকিল হয়ে পড়ত। যুদ্ধ-সংঘাত ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, লুটপাট পুরো অঞ্চলে স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছিল। মারামারি করতে করতে নিজেরা এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছিল, উঠতে বসতে দুই শক্তিশালী প্রতিবেশী স্পেন ও ফ্রান্সের দয়া ভিক্ষা করতে হতো। ইতালীয়রা দুর্বল জাতির প্রতীকে পরিণত হয়েছিল। ইতালীয়দের সম্পর্কে প্রবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল, তুমি কি সেই ইতালিয়ান, যারা যুদ্ধ পর্যন্ত করতে জানে না?

দেশের এমন শোচনীয় পরিণতিতে ম্যাকিয়াভেলির জন্ম। জন্মভূমি ফ্লোরেন্সও অন্য ইতালীয় শহরের চেয়ে আলাদা কিছু ছিল না। শহরের ভেতরে গণতন্ত্র ও রাজতন্ত্র নিয়ে শাসকদের মধ্যে প্রতিনিয়ত ইঁদুর-বেড়াল খেলা চলত। কখনো নাগরিকরা বিদ্রোহ করে গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থা গড়ে তুলত, আবার কখনো শাসক পরিবার শক্তি সঞ্চয় করে রাজতন্ত্র পুনর্বহাল করত। ম্যাকিয়াভেলির প্রথম জীবনে মেডিসি পরিবার ফ্লোরেন্সের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। কিছুদিন পর জনগণ মেডিসি রাজবংশকে উৎখাত করে জনতার শাসন কায়েম করতে সক্ষম হয়েছিল। গণতান্ত্রিক শাসনে ম্যাকিয়াভেলি বেশ উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৫১২ সাল পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করেছিলেন। গণতান্ত্রিক সরকার তাকে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করেছিল। রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালনকালে তিনি বহুদেশ ভ্রমণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। ম্যাকিয়াভেলি ফ্লোরেন্সের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দেশে দেন-দরবার করতে যেতেন। ফ্লোরেন্সের আশেপাশে তখন বেশিরভাগ অঞ্চলেই রাজতন্ত্র কায়েম ছিল। ফ্লোরেন্সের মতো জনতার শাসন খুব কম দেশে ছিল।

রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধানকে 'প্রিন্স' বলা হতো আর প্রিন্সশাসিত দেশগুলোকে প্রিন্সলি স্টেট বলা হতো। তখন বলতে গেলে পুরো বিশ্বই রাজতান্ত্রিক শাসনের অধীন ছিল। আরব-এশিয়া-আফ্রিকার বিরাট অঞ্চল জুড়ে উসমানি সাম্রাজ্য, ইউরোপের বিরাট অংশ জুড়ে ব্রিটেন-ফ্রান্সের রাজ পরিবার শাসন করত। তখনো ইউরোপিয়ান উপনিবেশ ইউরোপের বাইরে ছড়িয়ে পড়েনি। ইতালির ছোট ছোট নগর রাজ্যগুলোর মতো ইউরোপের বড় সাম্রাজ্যগুলোর মধ্যেও হানাহানি চলতেই থাকত। সে সময় ভারতকেও অস্থিতিশীলতা গ্রাস করে নিয়েছিল। কিছুদিন পর বাবর ভারতে হামলা করে মোঘল সাম্রাজ্য কায়েম করেছিলেন। ভারতের অবস্থা ও পরিস্থিতিও ম্যাকিয়াভেলির পর্যবেক্ষণে ছিল। উসমানি সালতানাতের সাথে ইউরোপের অনবরত লড়াই চলছিল। সুলতান সেলিম মিশরের মামলুক সাম্রাজ্যের অবসান ঘটিয়েছিলেন। এর মাধ্যমে আব্বাসি খিলাফাহ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। মামলুকদের অধীনেই নামকাওয়াস্তে আব্বাসি খলিফাগণের অভিষেক হতো। খিলাফাহব্যবস্থা উসমানিদের অধীনে চলে এসে ছিল।

ম্যাকিয়াভেলি যেখানেই যেতেন, গভীর মনোযোগ দিয়ে সেখানকার রাজপরিবার ও শাসনব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করতেন। নতুন দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি নিয়ে নিবিড় পড়াশোনা করতেন। প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধবিগ্রহের

ফলাফল ভালো করে বোঝার চেষ্টা করতেন। দীর্ঘদিনের অনুসন্ধান, পড়াশোনা ও পর্যালোচনার প্রভাবে রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে ম্যাকিয়াভেলির নিজস্ব চিন্তা গড়ে উঠেছিল। তিনি দীর্ঘদিন ধরেই কিছু প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। কোন কাজগুলি একজন রাজা বা রাজপুত্রকে সফল করে তোলে? কোন কাজ করলে শাসক ব্যর্থ হয়? কোন কাজ করলে রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়?

১৫১২ সালে আবার মেডিসি রাজবংশ ফ্লোরেন্স দখল করে নিয়েছিল। ক্ষমতায় বসেই মেডিসি শাসক গণতান্ত্রিক নেতাদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে শুরু করেছিল। ভবিষ্যতে যাতে আর কেউ রাজপরিবারের বিরুদ্ধে মাথাচাড়া দিতে না পারে, শাসক পরিবার তার স্থায়ী বন্দোবস্ত করতে উঠেপড়ে লাগল। ম্যাকিয়াভেলিও মেডিসি রাজবংশের লক্ষ্যবস্তু ছিল। তার বিরুদ্ধে সরকারবিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছিল। ম্যাকিয়াভেলিকে গ্রেফতার করে উল্টো ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। বন্দিদেরকে হাত-পা বেঁধে ছাদের সাথে উল্টো ঝুলিয়ে রাখা হতো। আচানক রশি কেটে নিচে ফেলে দেওয়া হতো। দীর্ঘসময় হাত-পা বাঁধা থাকার কারণে স্নায়ুগুলো অকেজো হয়ে যেত। এ ছাড়া সারাক্ষণ রশি কেটে নিচে পড়ে যাওয়ার ভয় ও দীর্ঘ জাগরণের কারণে অনেকে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ত। বারবার রশি কেটে ছাদ থেকে মেঝেতে ফেলার কারণে অনেকের কোমর-মেরুদণ্ডও ভেঙে যেত। ম্যাকিয়াভেলিও এমন অকথ্য নির্যাতনের মধ্য দিয়ে বন্দিজীবন কাটিয়েছেন।

অবশেষে একদিন মুক্তি মিলল। দুর্বল ভগ্নস্বাস্থ্য, মানসিক বিপর্যয়ের শিকার ম্যাকিয়াভেলি আর কখনো রাজনীতিতে সক্রিয় হতে পারেননি। কয়েক বছর কষ্টকর জীবনযাপন করার পর ১৫২৭ সালে ফ্লোরেন্সে মারা গিয়েছেন। মৃত্যুর বছরকয়েক আগে তিনি একটি বই লিখে গেছেন। বইটাতে তিনি পুরো জীবনাভিজ্ঞতার নির্যাস ঢেলে দিয়েছেন। বইটাতে বলেছেন, একজন শাসক বা প্রিন্স কীভাবে নিজের রাজ্যকে শক্তিশালী করবেন। কোন কাজ করলে রাষ্ট্র শক্তিশালী হবে, কোন কাজ করলে রাষ্ট্র দুর্বল হবে, নানা উদাহরণের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। বারবার জেগে ওঠা বিদ্রোহ শাসক কীভাবে মোকাবেলা করবে, কীভাবে ব্যর্থতা এড়াবে—সেটাও বইয়ে তুলে ধরেছেন। মৃত্যুর ৫ বছর পর ১৫৩২ সালে বইটি ছাপা হয়েছিল।

'দ্য প্রিন্স' পড়ার সময় বই রচনার পটভূমিটা মাথায় রাখা জরুরি। বইটা শুরু হয়েছে এভাবে :

১. পৃথিবী (পৃথিবী মানে তিনি যে স্থান ও কালে বাস করতেন)-তে দুই ধরনের শাসক থাকে :

ক. পূর্বপুরুষের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে রাজক্ষমতা পাওয়া শাসক।

খ. নিজের শক্তি দিয়ে অথবা দেশের ইতিহাসে নতুন বাঁকসৃষ্টির সুযোগে অপ্রত্যাশিতভাবে ক্ষমতার মসনদে আরোহণ করা শাসক।

২. বংশগত রাজপুত্রের জন্য দেশ শাসন করা বেশ সহজ। দেশের জনগণ আগে থেকেই তার পরিবারের আদেশ পালন করতে অভ্যস্ত ছিল। শাসক বংশেরই কেউ নতুন রাজা হবে, এটা জনগণের কাছে নতুন কিছু নয়। আগের রাজার মতো নতুন রাজারও আদেশ পালন করে যায়। রাজপুত্র অত্যাচারী হয়ে না উঠলে, বড় ধরনের কোনো ভুল না করলে, নিজেকে কাপুরুষ প্রমাণ না করলে, উদ্ভট আচরণ করে নিজেকে খেলো করে না তুললে, জনগণ নতুন রাজার প্রতিও অনুগত থাকে।

৩. দ্বিতীয় প্রকারের শাসক বা প্রিন্সের জন্য দেশ শাসন করা তুলনামূলক কঠিন হয়ে থাকে। সে ঘটনাক্রমে ক্ষমতা লাভ করেছে। তাকে অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে ক্ষমতায় টিকে থাকতে হয়। তাকে সারাক্ষণ আশঙ্কায় থাকতে হয়, যেকোনো সময় ক্ষমতাচ্যুত রাজপরিবারের কেউ ক্ষমতার দাবি নিয়ে হাজির হয়ে যেতে পারে। এ ছাড়া যাদের সাহায্যে ক্ষমতায় বসেছে, তারাও বিগড়ে যেতে পারে। যেসব লোক ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য নতুন প্রিন্সের সাথে ছিল, স্বার্থোদ্ধার না হলে তারাও যেকোনো মুহূর্তে চোখ উলটে ফেলতে পারে। তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকানো শুরু করতে পারে।

অন্যদিকে জনগণও প্রথম প্রথম নতুন শাসকের প্রতি আন্তরিক থাকে না। আনুগত্য প্রকাশে দ্বিধান্বিত থাকে। জনগণের আবেগ-উৎসাহ আগের শাসককে জড়িয়ে ছিল। আগের শাসক পরিবারের শাসনেই জনগণ অভ্যস্ত ছিল।

৪. পারিবারিক ঐতিহ্যের সূত্রে মসনদে আরোহণ করা প্রিন্স তুলনামূলক নিরাপদ থাকলেও নবসৃষ্ট ঘটনার জেরে ক্ষমতায় বসা প্রিন্সের ক্ষমতা একমুহূর্তের জন্যও নিরাপদ থাকে না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, সুযোগ পেয়ে ক্ষমতায় বসা প্রিন্স নিত্যনতুন পরিস্থিতির চাপে চিড়েচ্যাপ্টা হয়ে ক্ষমতা থেকে ছিটকে পড়ে।

৫. প্রতিষ্ঠিত রাজবংশকে হটিয়ে কবজির জোরে মসনদে বসা প্রিন্সকে অনেক কঠিন ও তিক্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হয়। সবার আগে তার উচিত, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আগের রাজপরিবারকে সমূলে বিনাশ করে দেওয়া। তারপর সমস্ত বিরোধীদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া উচিত। সাফাই-সুতরোর কাজ মসনদে আরোহণ করার সাথে সাথেই করে ফেলতে হবে। পথের কাঁটা দূর করতে যত দেরি হবে, সমস্যা তত শেকড় গেড়ে বসতে থাকবে। অতি দ্রুত বিরোধীদের নিকেশ করার পর আর নির্বিচারে হত্যা করা উচিত নয়। এমন করলে প্রিন্সকে সবাই জালেম ও রক্তপিপাসু খুনি ভাবতে শুরু করবে।

৬. প্রিন্সকে সবসময় নিজের নিরাপত্তা ও আশেপাশের লোকজন সম্পর্কে সতর্ক-সজাগ থাকতে হবে। চাটুকার, মোসাহেব ও তোষামোদকারীদের দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। সম্ভাব্য ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতি কড়া নজর রাখতে হবে।

৭. প্রিন্সকে খুব বেশি নম্র হওয়া উচিত নয়। খুব বেশি কঠোরও নয়। নিজের সম্পর্কে জনগণের মধ্যে এমন ধারণা প্রতিষ্ঠিত করে দিতে হবে যে, প্রয়োজনে রাজা যেকোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে। রাজা দয়ালু হতে পারেন, উদার-দানশীল হতে পারেন। দরকার হলে বিন্দুমাত্র অনুশোচনা ছাড়া নির্দ্বিধায় গর্দান উড়িয়ে দিতে পারেন।

৮. যুবরাজকে তার নীতিতে অটল থাকতে হবে। তিনি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন, যে আইন জারি করবেন, যা ঘোষণা করবেন, সেটাকে শতভাগ কার্যকর করতে হবে। প্রিন্স যদি বারবার আইনে রদবদল করে, কথা পরিবর্তন করলে, জনগণ তাকে বিশ্বাস করবে না; রাজার প্রতি মানুষ আস্থা হারাবে। রাজার কথার ওজন কমে যাবে। একজন শাসকের জন্য তলোয়ারের শক্তির চেয়েও তার কথার শক্তি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অস্থিরমতি শাসককে জনগণ বিশ্বাস করে না। একবার বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে বসলে শত চেষ্টাতেও সেটা ফিরে পাওয়া যাবে না।

৯. প্রিন্সের উচিত, কখনো কোনো অবস্থাতেই জনগণের সহায়-সম্পদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি না দেওয়া। বিশেষ করে নারীদের প্রতি লালসার দৃষ্টিতে না তাকানো। তাদেরকে ভোগ্যবস্তু বিবেচনা না করা। এমন কিছু করাটা মারাত্মক ভুল হবে। রাজার এমন বদখাসলত থাকলে কোনো গুণী মানুষ তার কাছে ভিড়বে না।

১০. প্রিন্স মানুষের প্রতি সদয় হবেন। তবে এতবেশি সদয়-নরম হবেন না, লোকজন তাকে মেরুদণ্ডহীন কাপুরুষ ভাবতে শুরু করে। প্রয়োজনাতিরিক্ত দয়াদাক্ষিণ্য দেখানোর ফলে শাসকের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়, মানুষের মন থেকে রাজার ভয় কেটে যায়, রাজপ্রাসাদ ও বাইরে নিরাপত্তা সংকট তৈরি হয়। দেশ অস্থিতিশীল হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়, সুযোগসন্ধানীরা লুটপাটে উৎসাহী হয়ে ওঠে। অনেক সময় অযাচিত হত্যাকাণ্ডের ঘটনাও ঘটে।

১১. প্রয়োজনে যুবরাজকে কঠোর ও নিষ্ঠুর হতে হবে। এতে করে দেশে শৃঙ্খলা বজায় থাকবে। ভবিষ্যতে কেউ রাজার সাথে গাদ্দারি করার আগে একশবার চিন্তা করবে।

১২. দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে, দেশে বিরাজমান লুঠমার রোধ করতে অক্ষম দয়ালু শাসকের চেয়ে দেশে শৃঙ্খলা-স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে পারা জালেম শাসক উত্তম।

১৩. রাষ্ট্রের উত্থান-পতনে আরেকটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেটা হলো রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা। প্রিন্সশাসিত রাজ্য দুই ধরনের হয়ে থাকে :

ক. প্রিন্সের ক্ষমতা-কর্তৃত্ব নিরঙ্কুশ থাকে। পুরো দেশ প্রিন্সের নামেই চলে। রাজধানী থেকে শুরু করে গ্রাম পর্যন্ত প্রিন্সের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রবলভাবে বিদ্যমান থাকে। পুরো দেশে প্রিন্সই সর্বেসর্বা হন। রাজধানী থেকে শুরু করে গ্রামসালিশ পর্যন্ত রাজার শাসন চলে। রাজার প্রতিনিধিরাই সরাসরি সবকিছু দেখভাল করে। এসব প্রতিনিধি স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত হয় না। তারা খুব একটা প্রভাবশালী বা ক্ষমতাশালীও হয় না। রাজার নামেই তাদের খুঁটির জোর হয়। নিজস্ব কিছু থাকে না।

খ. রাজাই দেশের মূল শাসক হয়ে থাকেন। তার অধীনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় জমিদার, মাতব্বর থাকে। জমিদার-মাতব্বরগণ স্থানীয়ভাবে জনসমর্থনপুষ্ট হয়ে থাকে। তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য থাকে। তাদের শাসন রাজার ওপর নির্ভরশীল নয়।

প্রথম প্রকারের রাজ্য দখল করা বহিঃশক্তির জন্য মুশকিল হয়। বাইরের কোনো শক্তি প্রিন্সশাসিত রাজ্যে আক্রমণ করলে স্থানীয় জনগণের সাহায্য জোটানো তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ, জনগণ সরাসরি প্রিন্সের সাথে সম্পৃক্ত। তারা প্রিন্সকেই তাদের শাসক হিসেবে জানে ও মানে। প্রিন্সের বিরুদ্ধে কেউ দাঁড়ালে তার সাথে জনগণ থাকবে না, এটাই স্বতঃসিদ্ধ বিষয়।

স্থানীয় রাজপ্রতিনিধিদের যেহেতু নিজস্ব কোনো ক্ষমতা থাকে না, স্থানীয় জনগণের সাথেও তার খুব বেশি সম্পর্কও থাকে না। তাই হানাদার বহিঃশক্তির সাথে যোগশাজশ করে নিজ দেশের প্রিন্সের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর শক্তিও তার থাকে না। অন্যদিকে প্রিন্স যেকোনো মুহূর্তে জনগণকে নিজের পতাকাতলে জমায়েত করে শত্রুর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার ক্ষমতা রাখে। প্রথম প্রকারের প্রিন্স জনশক্তিকে কাজে লাগিয়ে হানাদার ও ভেতরের শত্রুকে সহজেই পরাজিত করতে পারে।

হ্যাঁ, ঘটনাক্রমে হানাদার বাহিনী যদি কোনোভাবে শাসক প্রিন্সকে পরাজিত করে শাসক পরিবারকে সম্পূর্ণ নির্মূল করে দিতে পারে, সেক্ষেত্রে নতুন শাসক অনায়াসে এই রাজ্যে কদম জমিয়ে শাসন করতে পারে। এই ধরনের রাজ্যে শাসন ক্ষমতা লাভ করা কঠিন; কিন্তু কোনোভাবে একবার ক্ষমতা হাতিয়ে নিতে পারলে শাসন টিকিয়ে রাখা সহজ। কারণ, শাসক পরিবার ছাড়া সে রাজ্যে আর কারো প্রতি জনগণের আনুগত্য ছিল না। তাছাড়া আগের শাসকের শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনের কারণে স্থানীয় কোনো শক্তি উঠে দাঁড়ানোর সুযোগ পায়নি। সাবেক রাজার কোনো প্রতিনিধির হাতেও উল্লেখযোগ্য জনসমর্থন-শক্তি থাকে না। হানাদার বিজয়ী শক্তিকে পরাজিত করার মতো জনবলও স্থানীয় রাজপ্রতিনিধির কাছে থাকে না।

ম্যাকিয়াভেলি এর উদাহরণ দিতে গিয়ে উসমানি সালতানাতের কথা বলেছেন। উসমানি সুলতান বিশ্বস্ত লোকের মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চল শাসন করেছেন। যখন দ্য প্রিন্স বইটা লেখা হচ্ছিল, অর্থাৎ ১৫১৩ সালের আশেপাশের কথা। তখন উসমানি সালতানাত অত্যন্ত শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। পরবর্তীতে উসমানি সালতানাতের অবস্থা বদলে গিয়েছিল। ম্যাকিয়াভেলির মতে, প্রথম প্রকারের প্রিন্সের উদাহরণ হলো 'উসমানি সুলতান'। তার হাতে পুরো দেশের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা। সুলতানের নামেই গোটা সাম্রাজ্য চলে। এমন সালতানাত দখল করা খুবই মুশকিল। হ্যাঁ, কোনোভাবে কেউ যদি উসমানি সালতানাত দখল করে নিতে পারে, তবে সহজেই ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে পারবে।

ম্যাকিয়াভেলির মতে, এই জাতীয় রাষ্ট্রের আরেকটি উদাহরণ হলো আলেকজান্ডারের সময়কার পারস্য (একামেনিড) সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্যের সম্রাট দারিয়ুস আলেকজান্ডারের কাছে পরাজিত হয়েছিল। আলেকজান্ডার মারা যাওয়ার পর ইরানের কেউ গ্রিক দখলদারির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেনি।

আলেকজান্ডারের উত্তরসূরিদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গিয়েছিল। নিজেদের মধ্যে সাম্রাজ্য ভাগ-বাটোয়ারা করে নিয়েছিল। স্থানীয় জনগণের পক্ষ থেকে কোনো বিদ্রোহ হয়নি। ইরানি সাম্রাজ্য ছিল উসমানি সাম্রাজ্যের মতো। প্রথম প্রকারের সাম্রাজ্য। সেখানে প্রিন্সই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

দ্বিতীয় প্রকারের রাষ্ট্র দখল করা বহিঃশক্তির জন্য তুলনামূলক সহজ। কারণ এ ধরনের রাজ্যে যেকোনো স্থানীয় নেতা-জমিদার-প্রশাসক, স্থানীয় জনগণ বা বাইরের সাহায্য নিয়ে রাজার সিংহাসন উলটে দেওয়ার শক্তি রাখে। বহিরাগত হানাদার শক্তিও স্থানীয় শক্তির সাহায্য নিয়ে অনায়াসে রাজাকে সহজে উৎখাত করতে পারে। এমন রাজ্য দখল করা সহজ হলেও এখানে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা খুব কঠিন। কারণ, স্থানীয় ভূস্বামীরা আগের যুবরাজের জন্য যেমন হুমকি ছিল, নতুন যুবরাজের জন্যও তাই থাকবে। সাধারণ জনগণ স্থানীয় শাসককেই তাদের সবকিছু মনে করে। স্থানীয় শাসকের ডাক পেলে সাধারণ জনগণ নতুন প্রিন্সের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমে পড়তে দ্বিধা করবে না। জনগণের প্রথম আনুগত্য স্থানীয় শাসকের প্রতি, তারপর রাজধানীর শাসক।

১৪. ম্যাকিয়াভেলি তার বইয়ে বারবার মানুষের মনস্তত্ত্ব নিয়ে কথা বলেছেন। তিনি লিখেছেন, ভূমি জয় করা মানুষের জন্মগত স্বভাব। হাতে ক্ষমতা এলেই মানুষ তার আকাঙ্ক্ষা পূরণে উঠেপড়ে লেগে যায়। এজন্য মানুষকে দায়ী করা যায় না, বরং তার প্রশংসা করা উচিত। সমস্যা হয়, যখন প্রিন্স যোগ্যতা ও যথাযথ প্রস্তুতি ছাড়াই ভূমি জয় করতে নেমে পড়ে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র দখল করার মতো পর্যাপ্ত শক্তি না থাকলে কোনো প্রিন্সকে এই ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়া মোটেও উচিত নয়।

১৫. নিজের ক্ষমতাবলে প্রিন্স কোনো ভূখণ্ড দখল করে নিতে সক্ষম হলে, দখল টিকিয়ে রাখার জন্য প্রিন্সকে তিনটি কাজের কোনো একটি করতে হবে:

১. দখলকৃত এলাকাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিতে হবে।

২. দখলকৃত এলাকায় নিজে সশরীরে থেকে সেখানকার শাসনভার সরাসরি নিজে দেখাশোনা করবে।

৩. দখলকৃত এলাকায় ব্যাপকহারে নিজের লোকজন এনে বসতি স্থাপন করাবে। যাতে জনসংখ্যার আনুপাতিক হার বদলে যায়। যাকে বলে ডেমোগ্রাফিক চেঞ্জ। এমন করতে পারলে সেখানে রাজার অনুগত মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাবে। বিদ্রোহের শঙ্কা দূর হয়ে যাবে।

৪. হ্যাঁ, চতুর্থ এক উপায়ও আছে। দখলকৃত এলাকাকে পছন্দসই স্থানীয় শাসকের হাতে ন্যস্ত করে তার কাছ থেকে কর আদায় করবে। এই পদ্ধতি খুব একটা কার্যকর নয়। প্রিন্স চলে যাওয়ার পর বিদ্রোহের সমূহ আশঙ্কা থেকেই যায়। বিভিন্ন অঞ্চলে এমনটাই ঘটতে দেখা গেছে।

দখলকৃত এলাকা নিজের কবজায় রাখার সেরা উপায় হলো, দখল করার পরপরই পুরো এলাকা পরিপূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়া; যেমনটা রোমানরা করেছিল। কার্থেজিয়ান সাম্রাজ্য দখল করার পর রাজধানীকে সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছিল। যাতে ভবিষ্যতে আর কখনো কার্থেজিয়ানরা রোমানদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে না পারে। বিশেষ করে যেখানকার নাগরিকরা গণতান্ত্রিক শাসনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, এমন শহর দখল করার পর অবশ্যই ধ্বংস করে দেওয়া উচিত। এমন জনগণকে কবজায় রাখা অসম্ভব। গণতন্ত্রপ্রিয় দেশ ও জনগণকে ধ্বংস না করলে, পরবর্তীতে এসব জনগণই প্রিন্সকে ধ্বংস করে দিবে। কারণ, গণতান্ত্রিক শাসনাধীনে বাস করা নাগরিকরা রাজতান্ত্রিক শাসনে আসার পর অতীত স্বাধীনতা নিয়ে নিত্য হা-হুতাশ করবে। 'আহা, আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম' বলে বলে জনগণকে রাজার বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ করে তোলার চেষ্টা করবে। প্রিন্স তাদেরকে যত সুযোগ-সুবিধাই দিক, গণতান্ত্রিক অধিকার না দিলে জনগণ তুষ্ট হবে না। স্বাধীনতার বিনিময়ে কোনো প্রাপ্তিকেই জনগণ গোনায় ধরবে না। পৃথিবীর কোনো কিছুই স্বাধীনতার মতো মূল্যবান হতে পারে না। ইতালির পিসা শহর এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এখানকার জনগণ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রপ্রিয় ছিল। একবার পিসা শহর ফ্লোরেন্সের অধীনে চলে এসেছিল। একশ বছর পর পিসা আবার ফ্লোরেন্সের অধীনতা থেকে স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল। দখল করার সাথে সাথে ধ্বংস না করার পরিণতি এমনই হওয়ার কথা। ধ্বংসপ্রাপ্ত পিসা কখনোই স্বাধীনতা অর্জনের স্বপ্ন দেখতে পারত না।

১৬. আশেপাশের এলাকার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা জরুরি। যেসব রাষ্ট্র দুর্বল, সেগুলোকে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা দেওয়ার ছুতোয় নিজের কবজায় নিয়ে আসা উচিত। এটাই যুৎসই সিদ্ধান্ত। শক্তিশালী প্রতিবেশী দেশকে দুর্বল করার চেষ্টা অব্যাহত রাখা উচিত। প্রিন্সের আশেপাশে শক্তিশালী রাজ্যের উপস্থিতি, প্রিন্সের জন্য 'পটেনশিয়াল থ্রেট' তথা সম্ভাব্য হুমকি।

১৭. আশেপাশের কোনো দুর্বল রাষ্ট্র দখল করলে প্রিন্সকে দুটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে :

ক. বাণিজ্য, মানবিক বা সামরিক সাহায্যের নামে কোনো বিদেশি শক্তিকে দখলকৃত দেশে প্রবেশের অনুমতি না দেওয়া।

খ. সে এলাকায় নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে খুব বেশি শক্তিমান হয়ে ওঠার সুযোগ না দেওয়া।

উপরোল্লিখিত দুটি বিষয়ের কোনো একটি যদি ঘটে যায়, তাহলে প্রিন্সের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আজ বা কাল, ওই এলাকা প্রিন্সের হাতছাড়া হবেই। এর উদাহরণ হলো রোমান সাম্রাজ্য। রোমানরা কখনই স্থানীয় কোনো গ্রিক নেতাকে শক্তিমান হয়ে উঠতে দেয়নি। এমন কেউ থাকলে ক্ষমতা লাভের আগেই তাকে মেরে ফেলা হতো।

১৫ শতকে ইতালির দুটি নগররাষ্ট্র নিজেদের বিবাদ মেটানোর জন্য ফ্রান্সকে ডেকে এনেছিল। খাল দিয়ে কুমির (ফ্রান্স) এসে ইতালির অর্ধেকের বেশি দখল করে নিয়েছিল।

ম্যাকিয়াভেলি দ্য প্রিন্স বইয়ে বারবার ইতালি ও ফ্রান্সের শাসকদের মুখর সমালোচনা করেছেন। দ্য প্রিন্স গভীর মনোযোগে পড়লে বোঝা যায়, সমালোচনা করলেও ম্যাকিয়াভেলি ফ্রান্স দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। ফ্রান্সের প্রতি মুগ্ধ ছিলেন। বইয়ে তিনি ১৬ শতকের ফ্রান্সকে আদর্শ সরকারব্যবস্থার উজ্জ্বলতম নমুনা আখ্যা দিয়েছেন। ফরাসি পার্লামেন্টের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ফরাসি সংসদে সাধারণ মানুষ এবং অভিজাত সম্প্রদায় উভয়েরই প্রতিনিধিত্ব ছিল। সংসদ রাজার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করত। এর ফলে কোনো কঠিন সিদ্ধান্তের জন্য রাজাকে সরাসরি দোষারোপ করা যেত না। সবার ওপর সমান দায় বর্তাত। ম্যাকিয়াভেলির মতে, এটি একটি ভালো ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে প্রিন্সের সরকার সুরক্ষিত থাকে।

দ্য প্রিন্সে ম্যাকিয়াভেলি আরেকটি বিস্ময়কর কথা বলেছেন। প্রতিবেশী দেশগুলোর সংঘাতে প্রিন্সকে নিরপেক্ষ থাকা উচিত নয়। নিরপেক্ষ থাকলে যে প্রতিবেশী দেশ পারস্পরিক লড়াইয়ে জিতবে, সে দেশ প্রিন্সের ওপর হামলা করার আশঙ্কা থাকবে। হেরে যাওয়া দেশের জনগণও প্রিন্সকে সুনজরে দেখবে না। তাদের দুর্দিনে প্রিন্স তাদের পাশে দাঁড়ায়নি। হারের পর নিজেদের ব্যর্থতার গ্লানির পাশাপাশি প্রতিবেশী প্রিন্সের স্বার্থপরতাও তাদেরকে ফুঁসিয়ে তুলবে যে, আমরা যখন পড়ে পড়ে মার খাচ্ছিলাম, তখন প্রতিবেশী প্রিন্স আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। বিজয়ী ও বিজিত উভয় দেশ ও জনগণ



যুদ্ধশেষে প্রিন্সের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠবে। প্রতিবেশীদের মাঝে যুদ্ধ বাঁধলে প্রিন্স ভালো করে দেখবে—কোন দেশ জয়ী হবে। সম্ভাব্য জয়ী দলেই প্রিন্স ভিড়ে পড়বে।

১৮. কোনো রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা পরিবর্তন করার চেয়ে কঠিন কাজ আর নেই। অর্থাৎ ইনকিলাব বা বিপ্লব আনা খুবই কঠিন কাজ। কারণ, আগের শাসনব্যবস্থায় থেকে যারা দুধ-মধু খেতে পাচ্ছিল, তারা নিঃসন্দেহে নতুন সংস্কারে ও সংসারের বিরুদ্ধে অবস্থান নিবে। যারা নতুন সংস্কার কর্মসূচিকে সমর্থন করবে, তারাও জীবন ও মৃত্যুর লড়াইয়ে যুবরাজের পাশে দাঁড়াবে না। এজন্য পুরোনো শাসনব্যবস্থা অব্যাহত রাখা বেশি নিরাপদ ও উত্তম। নতুন ব্যবস্থার প্রবর্তন না করাই বেশি নিরাপদ। হ্যাঁ, একান্তই যদি নতুন নিয়ম জারি করতে হয় তবে সতর্ক পদক্ষেপে অগ্রসর হওয়া উচিত।

১৯. প্রিন্সের চরিত্রে সিংহ ও শিয়াল উভয়ের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকবে। সিংহ খুব শক্তিশালী; তার ব্যক্তিত্ব ভীতিপ্রদ প্রভাববিস্তারকারী আর দেখতে-শুনতে ভয়ংকর। কিন্তু সিংহের বড় দুর্বলতা হলো, সে তার চলার পথে গোপনে পেতে রাখা ফাঁদ দেখতে পায় না। শিয়াল তার সহজাত ধূর্ততায় লুকোনো ফাঁদ শনাক্ত করে ফেলতে পারে; কিন্তু নেকড়ে পালের আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। একজন প্রিন্সকে প্রথমে শেয়ালের মতো নিজের পথ পরিষ্কার রাখতে হবে। তারপর নেকড়ে পালের আক্রমণ ঠেকাতে সিংহের মতো রুখে দাঁড়াতে হবে। আক্রমণটা এমন নির্মমভাবে ঠেকাতে হবে, ভবিষ্যতে আর কখনো যেন নেকড়ে পাল আক্রমণের কথা স্বপ্নেও না ভাবে। যে বীরপুরুষ শুধু বাহাদুরি দেখানোর জন্য সিংহ হওয়ার চেষ্টা করে আর শেয়ালের ধূর্ততা ভুলে যায়, অতি দ্রুত সে বীরপুঙ্গব মাটির নিচে ঠাঁই পায়।

এ ধরনের নানা রাজ কলাকৌশল নিয়ে আলোচনার পর ম্যাকিয়াভেলি 'দ্য প্রিন্স' লেখার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি লিখেছেন, ইতালি চরম বিপর্যয়কর অবস্থায় উপনীত হয়েছিল। পুরো দেশটা ছারখার হয়ে গিয়েছিল। ফেরাউনের দাসত্বে ঠিক যেভাবে ইহুদিরা চরম বিপর্যয়ের শিকার হয়ে ছিন্নভিন্ন ও ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। হযরত মুসা আ. এসে তাদেরকে উদ্ধার করেছিলেন। যেমন ইরানিদের ওপর জুলুমের পাহাড় নেমে এসেছিল। সম্রাট সাইরাস এসে তাদেরকে উদ্ধার করেছিলেন। ইতালির অবস্থাও এমন হয়ে গিয়েছিল। ইতালির জন্যও একজন মুসা বা সাইরাসের দরকার ছিল। ইতালি

অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিল, কেউ একজন এসে তাকে পতিত অবস্থা থেকে মুক্ত করবে, বহিঃশক্তির হামলা থেকে বাঁচাবে এবং অভ্যন্তরীণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা থেকে রক্ষা করবে।

ম্যাকিয়াভেলি দ্য প্রিন্স বইয়ে যা যা বলেছেন, সেটা সেই অনাগত প্রিন্সকে উদ্দেশ্য করেই উপস্থাপন করেছেন, যে প্রিন্স এসে ইতালিকে বাঁচাবে; ইতালিকে গুছিয়ে উন্নতির দিকে নিয়ে যাবে। একজন দেশপ্রেমিক নাগরিকের মতোই ম্যাকিয়াভেলি চাইতেন, তার দেশ ইতালি বর্তমান সংকট কাটিয়ে উঠুক।

দ্য প্রিন্সের ব্যাপারে আপত্তি

প্রথম আপত্তি : ১৫৩২ সালে যখন এই বইটি প্রকাশিত হয়েছিল, ম্যাকিয়াভেলি দারুণ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। প্রশংসিত হলেও বইটি নিয়ে অনেক যৌক্তিক আপত্তিও উত্থাপিত হয়েছিল। বইয়ে বর্ণিত অনেক নীতি-কৌশলের নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। বইয়ে অনেক অন্যায়-অনৈতিক পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বইটি সম্পর্কে এটাও বলা হয়েছে, দ্য প্রিন্সে বর্ণিত মূলনীতিগুলো 'নৈতিকতার কফিনে শেষ পেরেক'। ম্যাকিয়াভেলির দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত সংকীর্ণ। তিনি খুবই সীমিত আর অদূরদর্শী চিন্তা করেছেন। তার চিন্তাগুলো ধূর্ততা ও চাতুর্যপূর্ণ। এসব কূটকৌশল দিয়ে রাজ্যজয় করা গেলেও মানুষের হৃদয়জয় করা যাবে না। ম্যাকিয়াভেলি তার স্বপ্নের প্রিন্সকে এমন পরামর্শ দিয়েছেন, যেগুলো অনুসরণ করলে রাজ্যে সাময়িক স্থিতিশীলতা আসবে; স্থায়ী শান্তি-স্বস্তি কায়েম হবে না।

দ্বিতীয় আপত্তি : ম্যাকিয়াভেলি মানব মনস্তত্ত্বকে ভালো করে বোঝেননি। মানুষ সবকিছু শুধু নিজের বা রাষ্ট্রের উপকারের জন্য করে না, মানুষ দয়ালু হয় এবং বন্ধুত্বের অনুভূতি দ্বারাও আপ্লুত হয়। মানুষের অনেক কাজ নিঃস্বার্থও হয়। মানুষ নিছক মানবকল্যাণেও অনেক কাজ করে। রাষ্ট্রকে মজবুত ভিতের ওপর দাঁড় করানোর জন্য মানুষের এসব মৌলিক গুণাবলি ও আবেগ খুবই জরুরি।

ম্যাকিয়াভেলির সমালোচনার পাশাপাশি তার স্বপক্ষেও অনেকে কথা বলেছেন। ম্যাকিয়াভেলিকে বাঁচাতে বলা হয়, তিনি নিজের সময়কে ভালো করে বুঝে পরামর্শগুলো দিয়েছেন। তিনি যে সময় ও সমাজের মানুষ, তিনি

পরিবেশে বেড়ে উঠেছেন, সেটাকে শোধরানোর জন্য এমন কূটকৌশলই রকার ছিল। ম্যাকিয়াভেলি রিয়েলিজম-বাস্তববাদ ও বাস্তববোধ দ্বারা তাড়িত-প্রাণিত ছিলেন; আইডিয়ালিজম বা কোনো আদর্শবাদকে তিনি প্রশ্রয় দেননি। চরম বিশৃঙ্খলাপূর্ণ একটি রাজ্যে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি বাস্তবসম্মত উপায় বাতলেছেন। তিনি যেসব উপায় বইয়ে বলেছেন, সেগুলোর কার্যকারিতা নিজ চোখে দেখেছেন, ইতিহাসে প্রমাণ পেয়েছেন।

ম্যাকিয়াভেলির 'দ্য প্রিন্স' নৈতিক মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হোক বা অনুত্তীর্ণ—এ কথা অস্বীকার করার জো নেই যে, দ্য প্রিন্স আজও বিশ্বরাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতিতে প্রাসঙ্গিক। বর্তমানে বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন রাজনীতিবিদের কর্মপন্থা ও আচরণে দ্য প্রিন্সের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। ৫০০ বছর পরও এ কথা সত্য, যে কেউ ক্ষমতার লড়াইয়ে নীতি-নৈতিকতা একপাশে সরিয়ে যেকোনো মূল্যে হারজিতের পন্থা অবলম্বন করতে চায়, তার জন্য ম্যাকিয়াভেলির বিকল্প নেই। কেউ এমন করলে বলা হয়, এই লোক ম্যাকিয়াভেলিয়ান নীতি অনুসরণ করছে। সাধারণত জালেম স্বৈরশাসককেই ম্যাকিয়াভেলিয়ান শাসক আখ্যা দেওয়া হয়। বর্তমান পৃথিবীর বহু শাসকই প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে, জেনে না জেনে ম্যাকিয়াভেলির নীতিরই অনুসরণ করে চলছে।

শেষ কথা

যত যাই বলা হোক, অনৈতিক পন্থাবলম্বন করে লাভ করা ক্ষমতাসুখ বয়ে আনে না। আখেরে শাসককে ধিকৃত ও নিন্দিত হতেই হয়। ক'টা বছরের শাসনসুখের জন্য আজীবনের জন্য ঘৃণিত হয়ে কী লাভ?



রিপাবলিক

আজ থেকে প্রায় ২৫০০ বছর আগে (৪৩১-৪০৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) গ্রিসের দুই শক্তিশালী নগররাজ্য এথেন্স ও স্পার্টার মাঝে এক ভয়ানক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এটাকে পেলোপোনেশিয়ান যুদ্ধও বলা হয়। এই যুদ্ধ ২৭ বছর ধরে চলেছিল। এথেন্সের ছিল শক্তিশালী নৌবাহিনী। প্রতিদ্বন্দ্বী স্পার্টার ছিল একটি সাহসী ও শক্তিশালী সেনাবাহিনী। দুই গ্রিক নগররাষ্ট্র আঞ্চলিক আধিপত্য ও তথাকথিত প্রতিরক্ষার জন্য লড়াই করছিল। এথেন্স তার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, নৌবাহিনী, জাহাজ বহর ও বিজ্ঞ সেনাপতিদের নিয়ে খুব গর্বিত ছিল। তারা নিজেদের অপরাজেয় মনে করত। তিন দশকব্যাপী এই যুদ্ধে এথেনীয়রা স্পার্টানদের কাছে শোচনীয়ভাবে হেরে গিয়েছিল। এথেনীয়রা স্পার্টা এবং তার মিত্রজোটের দাসরাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। নিজেদেরকে আঞ্চলিক পরাশক্তি ভাবতে থাকা এথেনিয়ানদের জন্য এই পরিস্থিতি ছিল হৃদয়বিদারক। তাদের হৃদয় ভেঙে খান খান হয়ে গিয়েছিল। শহরের জ্ঞানী ব্যক্তিরা সবাই একজোট হয়ে ভাবতেন, এতবড় নৌশক্তি, অভিজ্ঞ সেনাপতি ও বড় বড় রাজনৈতিক দার্শনিক থাকা সত্ত্বেও আমাদের কেন এমন হার হলো?

এথেনিয়ান বুদ্ধিজীবীরা ভেবে কূলকিনারা করে উঠতে পারছিল না, আমাদের এথেন্সের মতো সভ্য, শিক্ষিত, উন্নত রাষ্ট্র, স্পার্টার মতো বন্য, বর্বর ও স্বৈরতান্ত্রিক রাজ্যের কাছে হেরে গেল? এসব চিন্তাবিদদের মধ্যে বিখ্যাত দার্শনিক প্লেটোও ছিলেন।

এথেন্সের পরাজয়ের কারণ খুঁজতে গিয়ে প্লেটোও ভাবছিলেন, ভবিষ্যতে কীভাবে একটি আদর্শরাষ্ট্র তৈরি করা যায়, যা কখনো শত্রুদের কাছে পরাজিত হবে না? সেই আদর্শ রাষ্ট্রে সাধারণ মানুষের জন্য ন্যায়বিচার ও সমৃদ্ধি থাকবে। লোকজন সে দেশে বাস করে সুখী থাকবে। প্লেটো বের করার চেষ্টা করছিলেন, একটি আদর্শ রাষ্ট্র কেমন হওয়া উচিত, সেখানকার বিচারব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত? কী করলে সেরা ও সর্বোত্তম ব্যক্তিকে এই রাজ্যের রাজা হিসেবে পাওয়া যাবে? কী করলে যোগ্য আর নৈতিক গুণসম্পন্ন শাসকশ্রেণি পাওয়া যাবে? এ ধরনের অগণিত প্রশ্ন নিয়ে প্লেটো দিনরাত এক করে ভেবে যাচ্ছিলেন। চিন্তা করতে করতে প্লেটো এক কাল্পনিক আদর্শ

প্রজাতন্ত্র 'রিপাবলিক'-এর রূপরেখা দাঁড় করাতে সক্ষম হলেন। দীর্ঘ সংলাপের আদলে তার সেই আদর্শ প্রজাতন্ত্রের রূপরেখা সবার সামনে তুলে ধরেছেন। সংলাপে প্লেটো নিজে নয়, তার শিক্ষাগুরু সক্রেটিস বিভিন্ন বিষয়ে জনগণকে প্রশ্ন করেছেন। প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে জনগণ যে উত্তর দিয়েছে, সক্রেটিস সে উত্তরের ওপর আরো প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। প্রতিটি বিষয়ে প্রশ্নোত্তর শেষে সক্রেটিস নিজের মতামতও তুলে ধরেছেন। দর্শননির্ভর কথোপকথনগুলো ছিল আকর্ষণীয় আর কৌতূহলোদ্দীপক। সক্রেটিসের সংলাপগুলোরই বিন্যস্ত রূপের নাম 'রিপাবলিক'।

ন্যায়বিচার, বিচারব্যবস্থা, নৈতিকতা ও রাজনীতির উপর এতটা পরিপূর্ণ বই ইতিহাসে সম্ভবত এর আগে কেউ লিখেনি। বইটা বিশ্বকে এতটাই প্রভাবিত করেছিল, পরবর্তী ১৮০০ বছরে দর্শন, রাষ্ট্র, রাজনীতি, ধর্ম ও নীতিশাস্ত্র নিয়ে যা কিছু লেখা হয়েছে, প্রায় সবগুলোই 'রিপাবলিক' বইয়ের ধারণাগুলো দ্বারা প্রভাবিত ছিল। প্লেটোর রিপাবলিক বই থেকে উদ্বুদ্ধ হয়েই টমাস মুর তার 'ইউটোপিয়া' বইটি রচনা করেছিলেন।

রিপাবলিকের মুখ্য চরিত্র সক্রেটিস। খ্রিস্টপূর্ব ৩৯৯ সালে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি এথেন্সের ঐতিহ্য লঙ্ঘন করছিলেন। বিচারের রায় মতে, সক্রেটিসকে এক কাপ হেমলক বিষ পান করতে হয়েছিল।

সূচনা

গল্পের শুরুতে সক্রেটিসের সাথে তার বন্ধু পলিমাকাস এবং তার বৃদ্ধ পিতা সেফালাসের দেখা হয়। কুশল বিনিময় ও গপশপের এক পর্যায়ে 'ন্যায়বিচার' নিয়ে আলোচনা শুরু হলো। সক্রেটিস জানতে চাইলেন, তোমাদের দৃষ্টিতে ন্যায়বিচার কাকে বলে? উত্তর এলো,

-সত্য কথা বলা এবং নিজের ঋণ শোধ করাই ন্যায়বিচার।

সক্রেটিস এই ধারণা খারিজ করে বললেন, ঋণ সবসময় পরিশোধ করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো বন্ধু তার অস্ত্র আমার কাছে অর্পণ করে, তারপর সে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে আর ওই অবস্থায় আমার কাছ থেকে গচ্ছিত অস্ত্র নেওয়ার জন্য আসে, আমার সেগুলো তার কাছে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত? একজন উন্মাদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়াটা কি ইনসাফ হবে

এমন করলে আমার দোস্ত তো বটেই, অন্য মানুষেরও প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকবে। সক্রেটিসের প্রত্যাখ্যান শুনে আরেকজন বলল, বন্ধুর প্রতি সদাচার করা, শত্রুর সাথে মন্দ করাকে ইনসাফ বলে।

সক্রেটিস এই উত্তর প্রত্যাখ্যান করে বললেন, মানুষ স্বভাবগতভাবে ভালো বা খারাপ হয়। ভালো-মন্দ হওয়ার সাথে বন্ধু বা শত্রুর কী সম্পর্ক? বন্ধু ভালো মানুষ যেমন হতে পারে, খারাপও হতে পারে। শত্রুও তাই। যেকোনো বন্ধুর প্রতি সদাচার করা যদি ইনসাফ হয়, তাহলে বন্ধু খারাপ হলে, তার প্রতি সদাচার করার মানে, মন্দের প্রতি সদাচার করা। শত্রুর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

দ্বিতীয় উত্তরও নাকচ হতে দেখে, তৃতীয় উত্তর এলো, ন্যায়বিচার হলো ক্ষমতাবানের হুকুম, যা দুর্বলকে মানতেই হয়। সক্রেটিস এই উত্তরকেও নাকচ করে দিয়ে বললেন, শুধু বল প্রয়োগের নাম কীভাবে ন্যায়বিচার হতে পারে? ক্ষমতাবানের প্রণীত আইন দুর্বলের মান্য করাই যদি ন্যায়বিচার হয়, ক্ষমতাবানরা নিজেদের স্তরের মধ্যে কীভাবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবে? তাদের জন্য কি ন্যায়বিচারের নতুন সংজ্ঞা ঠিক করতে হবে? ন্যায়বিচার সম্পর্কে সক্রেটিস নিজের অবস্থান তুলে ধরে বললেন, ন্যায়বিচার হলো রাষ্ট্রের প্রত্যেকে নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করা। কোনো নাগরিকের অন্যের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। ন্যায়বিচারের এই সহজ নীতি বাস্তবায়নের জন্য সক্রেটিস একটি রাষ্ট্রের কল্পনা করলেন, যে রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার পাওয়া এবং ইনসাফ প্রদান করা সম্ভব হবে। তিনি এই রাষ্ট্রকে রিপাবলিক-প্রজাতন্ত্র বলে অভিহিত করেছেন। এই কাল্পনিক রাষ্ট্র রিপাবলিকে তিন শ্রেণির নাগরিক থাকে :

১. দার্শনিক রাজাগণ (Philosopher kings) 'জ্ঞানী ও ন্যায়পরায়ণ শাসকগণ'। যারা রাষ্ট্র ও সমাজ শাসন করবেন।
২. অভিভাবকগণ (Guardians), সেনাবাহিনী, নিরাপত্তাবাহিনী, পুলিশ ও শাসকদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নকারী।
৩. শ্রমিকশ্রেণি (Working class), কৃষক, কারিগর, ব্যবসায়ী ইত্যাদি। যারা সমাজের বস্তুগত চাহিদা পূরণ করবে।

রিপাবলিকে 'দার্শনিক রাজা' ও 'অভিভাবকশ্রেণি' নিয়েই বেশি আলোচনা হয়েছে। সক্রেটিসের মতে, প্রতিরক্ষার দায়িত্বে থাকা অভিভাবকশ্রেণিকে

গৃহপালিত কুকুরের মতো হওয়া উচিত। তারা অতি দ্রুত শত্রুকে চিনে নিয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, শত্রুকে পরাভূত করার মতো যথেষ্ট শক্তিধর হবে, সাহসিকতা ও বীরত্বের মনোভাবও থাকবে, শত্রুদের জন্য বিপজ্জনক ও বন্ধুর প্রতি সদয় হবে।

এই তিন শ্রেণির শ্রেষ্ঠ লোকদের কীভাবে রিপাবলিকে জড়ো করা যাবে? কীভাবে তাদের গড়ে তোলা হবে? সক্রেটিস প্রস্তাব করেছেন, ভালো অভিভাবক তৈরি করতে হলে পুরো দেশ থেকে সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী শিশুদের বাছাই করতে হবে। এজন্য প্রথম ধাপে ১০ বছরের বেশি বয়েসি সমস্ত নাগরিককে অস্থায়ীভাবে শহরের বাইরে কোথাও স্থানান্তরিত করা হবে। ১০ বছরের কম বয়েসি শিশু যারা শহরে থেকে যাবে, সরকার তাদেরকে নিজের হেফাজতে নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে স্থানান্তর করবে। এরপর ১০ বছরের বেশি বয়েসি নাগরিকরা শহরে ফিরে এলেও কম বয়েসি শিশুরা তাদের বাবা-মায়ের কাছে ফিরে যাবে না। রাষ্ট্র তাদের বিশেষ লালনপালন ও শিক্ষাদীক্ষার জন্য নিজের যিম্মায় রেখে দিবে। এই শিশুদের সাহিত্য, সঙ্গীত ও শরীরচর্চার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

শিক্ষার সিলেবাস

১. সাহিত্যপাঠ। কারণ, গল্পকাহিনি শিশুদের মধ্যে সাহসিকতা, বীরত্ব ও রাষ্ট্রের জন্য ভালোবাসা এবং দেশের জন্য জীবন দেওয়ার আবেগ জাগিয়ে তুলবে।

২. ঈশ্বরবিশ্বাস। শিশুদেরকে দেবতাদের যেসব গল্প শোনানো হবে, সেগুলো প্রথাগত হবে না। কবিরা মানুষের সামনে দেবতাদের অত্যন্ত ভুল চিত্র তৈরি করে রেখেছেন। বিশেষ করে দুই কবি হোমার ও হেসিয়ড। হোমার ট্রয় যুদ্ধের উপর 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি' রচনা করেছিলেন। কবি হেসিয়ড 'থিওজেনি' নামে একটি বই রচনা করেছিলেন; তাতে দেবতাদের কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে। এই বইগুলিতে দেখানো হয়েছে, দেবতারা মানুষের মতো একে অপরের প্রতি হিংসা-ঈর্ষা অনুভব করে। আকৃতি পরিবর্তন করে মানুষ ও সহদেবতাদের বোকা বানায়। এ ছাড়া দেবতারাই মানুষের মধ্যে ভালোর সাথে মন্দও সৃষ্টি করে। হোমার লিখেছেন, দেবতা জিউসের দরজায় দুটি ড্রাম আছে। একটি ভালোর জন্য এবং অন্যটি মন্দের জন্য। এই ড্রাম দিয়ে দেবতা জিউস যেকোনো মানুষকে ভালো বা মন্দ বানাতে পারত।

সক্রেটিস বলেন, দেবতা-ঈশ্বর সম্পর্কে এসব চিন্ত-মতবাদ সম্পূর্ণ ভুল। কবিরা দেবতাদের যে কাল্পনিক ছবি এঁকেছেন, তা এমন এক চিত্রকরের মতো, যিনি আসল জিনিস না দেখেই ছবি আঁকার চেষ্টা করেছে। স্পষ্টতই এই শিল্পী ভুল ছবি আঁকবে। একইভাবে কবিরা দেবতাদের সম্পর্কে যা বলেছেন, তা মিথ্যা। সত্যি কথা বলতে, ঈশ্বর কারো সাথে শত্রুতা করেন না, অপরাধও করতে পারেন না। ঈশ্বর নিজের আকৃতিও পরিবর্তন করেন না। কারণ, তিনি পরিপূর্ণ আর নিখুঁত। অন্য কোনো রূপ ধারণ করার অর্থ হলো, দেবতা বা খোদা পূর্ণতার স্তর থেকে নিচে নেমে আসা। এজন্য ঈশ্বর-দেবতা এমনটা কখনো করবেন না। ঈশ্বর-দেবতা শুধু ভালোই করতে পারেন, মন্দ নয়। মানুষের সাথে ঘটে যাওয়া কোনো মন্দের জন্য ঈশ্বর দায়ী নন। কারণ, ঈশ্বর কোনো জাতিকে শাস্তি দেন তার কৃতকর্মের কারণে। ঈশ্বর-দেবতা জালেম হতে পারেন না। অভিভাবকদের ঈশ্বরবিশ্বাস সঠিক থাকলে, শিশুদেরকেও সঠিক ঈশ্বরজ্ঞান দিতে পারবেন। সঠিক ঈশ্বরজ্ঞান থাকলে শিশুরা নৈতিকভাবেও শক্তিশালী হবে। বিশুদ্ধ ঈশ্বরজ্ঞান পেলে, কবিদের বানোয়াট গল্পে আঁকা ক্ষমতাপ্রদর্শনকারী দুষ্ট দেবতাদের মতো শিশুরা দুষ্ট-নষ্ট মানুষ হবে না। ভালো ঈশ্বরবিশ্বাসের প্রভাবে তারাও ভালো মানুষ হবে। মৃত্যুর পর আযাবের গল্প বলে ভয় দেখানোর পরিবর্তে পুরস্কারের উৎসাহব্যঞ্জক কথা শিশুদের সুন্দর জীবনের স্বপ্ন দেখাতে হবে। এতে শিশুদের ভেতর ইতিবাচক শক্তি তৈরি হবে। ভবিষ্যতে যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে ও মরতে ভয় পাবে না।

৩. সঙ্গীত। শিশুদের মধ্যে সাহসিকতার চেতনা জাগ্রত করার জন্য শুধুমাত্র সমরসঙ্গীত শেখানো ও শোনানো উচিত। শিশুরা যুদ্ধের গান শিখবে, চর্চা করবে। রিপাবলিকে বাঁশিসহ এমন বাদ্যযন্ত্র নিষিদ্ধ থাকবে, যুদ্ধসঙ্গীতে যেগুলো কোনো কাজে আসে না। প্রাচীন গ্রিসে তৈরি করা হতো না—এমন বাদ্যযন্ত্রও নিষিদ্ধ থাকবে। বীণা ও লেয়ার প্রাচীন গ্রিসে ব্যবহৃত হতো। এ ধরনের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা উচিত।

৪. শরীরচর্চা। শিশুদের শারীরিকভাবে প্রশিক্ষিত করে তোলা হবে। তাদের সব ধরনের অস্ত্রের ব্যবহার শেখানো হবে। পানাহার, ঘুম, জেগে ওঠাসহ সমস্ত স্বাস্থ্যবিধি কঠোরভাবে পালন করা শেখানো হবে। ভবিষ্যৎ গার্ডেনিয়ানদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে মিষ্টি ও মশলাদার খাবার থেকে দূরে রাখতে হবে।

প্লেটো গার্ডিয়ানদেরকে যুদ্ধকৌশলও শিখিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, প্রতিটি শহর দুই ভাগে বিভক্ত :

ক. ধনী।

খ. দরিদ্র।

যদি এমন এক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়, যাদের বিপুল সেনা ও অস্ত্রশস্ত্র আছে, সেখানে শুধু যুদ্ধ করে জেতা যাবে না। গার্ডিয়ানদের কর্তব্য হলো, প্রতিপক্ষ দেশের দরিদ্র নাগরিকদের কাছে প্রতিনিধি পাঠিয়ে প্রস্তাব দেওয়া, তাদের সাথে যোগ দিলে, যুদ্ধজয়সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের একটি অংশ তাদেরও দেওয়া হবে। শত্রু দেশের গরিবদের যুক্ত করতে পারলে শত্রু রাষ্ট্রকে সহজেই পরাজিত করা যাবে। বিজিত শহরের বড় একটি অংশ ইতিমধ্যে রিপাবলিকের সাথে যোগ দেওয়ার কারণে শহর নিয়ন্ত্রণ করাও সহজ হবে। সবচেয়ে ভালো হয়, যুদ্ধ বন্ধ করতে পারলে। যুদ্ধবন্দিদের দাস বানানো বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

প্লেটো তার জীবদ্দশায় দেখেছিলেন, যুদ্ধ ও শত্রুদের দাস বানানো গ্রিকদের জন্য ইচ্ছা ধ্বংস ছাড়া আর কিছু বয়ে আনেনি। প্লেটোর সময় শত্রুদের দাসে পরিণত করা সাধারণ বিষয় ছিল। প্লেটো যে দাসপ্রথার বিরোধিতা করেছিলেন, সেটা গ্রিসের নগররাষ্ট্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। নীতিগতভাবে সক্রেটিস ও প্লেটো উভয়ে দাসপ্রথার বিরুদ্ধে ছিলেন না। রিপাবলিকের রাষ্ট্রকাঠামোতে দাসদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এগুলো ছিল গ্রিকরাজ্যগুলোর বাহির থেকে কেনা দাস।

রিপাবলিকে প্লেটো প্রচলিত প্রথার বাইরে গিয়ে আশ্চর্যজনকভাবে গার্ডিয়ানশ্রেণিতে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদেরও শামিল করেছেন। প্লেটো সক্রেটিসের যবানীতে জানিয়ে দিয়েছিলেন, নারীরা যদিও শারীরিকভাবে পুরুষদের তুলনায় দুর্বল; অন্যসব দিকে নারীরা পুরুষদের চেয়ে মোটেও পিছিয়ে নেই। বুদ্ধিমত্তা, পরিকল্পনা, কঠোর পরিশ্রম ও নেতৃত্বে নারী-পুরুষ সমান। নারীদেরকে পুরুষের মতো প্রশিক্ষণ দিয়ে ভালো অভিভাবক তৈরি করা সম্ভব। তাই গার্ডিয়ানদলে নারীরাও পুরুষদের মতো সঙ্গীত ও যুদ্ধের প্রশিক্ষণ পাবে। প্লেটো আরো এগিয়ে গিয়ে বলেছেন, যুদ্ধ প্রশিক্ষণকালে প্রয়োজন দেখা দিলে নারীরাও পুরুষের মতো পোশাক খুলে অনুশীলন করবে। যে লোক তাদের দেখে হাসবে, তাকে চরম নির্বোধ আখ্যায়িত করা হবে।

গার্ডিয়ানশ্রেণির প্রশিক্ষণের সমস্ত ধাপ শেষ হওয়ার পর যখন প্রাপ্তবয়স্ক হবে, তাদের একসাথে থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। তারা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে থাকবে না। যার যাকে পছন্দ হয়, তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে। যেসব শিশু জন্ম নিবে, অবিলম্বে তাদেরকে জন্মদাতা মা-বাবার কাছ থেকে পৃথক করে আয়ার হাতে তুলে দেওয়া হবে। এই শিশুরা যখন এতবড় হয়ে যাবে যে, তাদের মাতাপিতা তাদের চিনতে পারবে না, তখন তাদেরকে গার্ডিয়ানশ্রেণির কাছে পাঠানো হবে। এই শিশুরাও তাদের প্রকৃত মাতাপিতাকে চিনতে পারবে না। এতে সুবিধা হবে, গার্ডিয়ানরা প্রতিটি শিশুকে সমানভাবে ভালোবাসবে, আদরযত্ন করবে। সবাইকে নিজের সন্তান ভাবতে পারবে। এই ব্যবস্থায় গার্ডিয়ানশ্রেণির রাষ্ট্রই হবে প্রথম ও শেষ ভালোবাসা। রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের সময় তাদের ঘরোয়া সমস্যা মোকাবেলা করতে হবে না।

রাষ্ট্রে শুধু শারীরিকভাবে শক্তিশালী সন্তনেরই জন্ম হওয়া উচিত। ভালো মানের পোষাপ্রাণী পাওয়ার জন্য যেভাবে উন্নত জাতের স্বাস্থ্যকর জোড়ার মিলন ঘটানো হয়, স্বাস্থ্যবান মানুষ পাওয়ার জন্যও এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। একজন পুরুষ ২৫ থেকে ৫৫ বছর পর্যন্ত প্রজননক্ষম থাকে। একজন নারী ২০ থেকে ৪০ বছর পর্যন্ত সন্তান জন্ম দিতে পারে। নারী-পুরুষকে এই বয়েস সীমার মধ্যেই সন্তান প্রজননের কাজে ব্যবহার করা উচিত। দুর্বল দম্পতিদের মাধ্যমে জন্ম নেওয়া দুর্বল ও প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্মের পরপরই গোপনে হত্যা করতে হবে। শুধুমাত্র বলিষ্ঠ শিশুরাই রিপাবলিকে বেঁচে থাকবে।

শ্রমিকশ্রেণি

রিপাবলিকের শ্রমিকশ্রেণি কোত্থেকে আসবে? প্রশিক্ষণরত গার্ডিয়ানশ্রেণির বয়েস ২০ হলে তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের আরো ১০ বছর উচ্চশিক্ষা দেওয়া হবে। পরীক্ষায় অকৃতকার্যদের শ্রমিকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তাদেরকে কৃষক, কারিগর বা ব্যবসায়ী বানানো হবে। রাষ্ট্রের অর্থনীতির চাকা সচল রাখার দায়িত্ব তাদের কাঁধে ন্যস্ত থাকবে। তাদের শ্রমের মাধ্যমে রাজ্যের খাদ্যভাণ্ডার পূর্ণ হয়ে উঠবে। রাজ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে না। রাজ্য থেকে ক্ষুধামন্দা দূর হবে।

[1] প্লেটো নারী-পুরুষের প্রজনন ক্ষমতার যে বয়সসীমা বলেছেন, সেটা ভুল। ২০ বা ২৫ বয়েসের আগেও নারী-পুরুষ সন্তান জন্ম দিতে পারে।

২০ বছর বয়সে পাস করা গার্ডিয়ানদের ৩০ বছর বয়সে আরেকটি পরীক্ষা হবে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের ৫ বছর দর্শন শেখানো হবে। ৩০ বছর বয়েসের পরীক্ষায় অকৃতকার্যদেরকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হবে। ৩৫ বছর বয়েসি তরুণ দার্শনিকদের প্রাথমিকভাবে একটি সরকারি পদ দেওয়া হবে। যাতে তারা সরকারি কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে। এই শ্রেণিকেই প্লেটো দার্শনিক রাজাগণ (Philosopher kings) আখ্যায়িত করেছে। প্লেটো এদের দিয়েই রিপাবলিক গড়ে তোলার পরিকল্পনা পেশ করেছে। তরুণ দার্শনিকরা অন্তত ১৫ বছর নিম্নপদের সরকারি চাকরি করে অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। ৫০ বছর বয়সে তারা একেকজন সরকারি কাজে বিশেষজ্ঞ আর বিজ্ঞ দার্শনিক হয়ে উঠবে। ৫০ বছর বয়েসিদের মধ্যে সেরা কর্মযোগ্যতা প্রদর্শনকারীকে রাজ্যের শীর্ষ কর্মকর্তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এই শীর্ষ কর্মকর্তারাই মূলত Philosopher kings। এরাই সম্মিলিতভাবে রিপাবলিক চালাবে। প্লেটো এ কথা পরিষ্কার করেননি, ফিলোসফার কিংদের থেকে সেরা কেউ একক শাসক হবেন কিনা। প্লেটো সম্ভবত যৌথ শাসকদের শাসনব্যবস্থায় বিশ্বাসী ছিলেন; একক শাসকের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন না। রিপাবলিক বইয়ের এই অস্পষ্টতার কারণে অনেক সমালোচনাও হয়েছে।

অভিভাবক শ্রেণির মতো ফিলোসফার কিংসও ব্যক্তিগত সম্পত্তি গড়তে পারবে না; পারিবার, সন্তান-সন্ততিও না। প্লেটো ফিলোসফার কিংস নিয়ে অনেক উচ্চাশা পোষণ করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, ফিলোসফার কিংস রাষ্ট্রের সকল সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম।

একজন দার্শনিক নেতা-শাসকের ভূমিকায় অন্যদের চেয়ে সেরা কেন, এবং তাকেই কেন সমাজ-রাষ্ট্রের শাসক হওয়া উচিত? নিজের চিন্তাকে জনগণের কাছে সহজবোধ্য আর গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য প্লেটো একটি রূপকের সহায্য নিয়েছেন। এটাকে গুহার রূপক (Allegory of the Cave) বলা হয়। ধরা যাক, একটি গুহায় কিছু লোককে বন্দি করে রাখা হয়েছে। শৈশব থেকেই তারা সেখানে বসবাস করে আসছে। তাদের পা, ঘাড়-গর্দান এমনভাবে বেঁধে রাখা হয়েছে, তারা ঠিকমতো নড়চড়া করতে পারে না; স্বাধীনভাবে ঘাড়ও ফেরাতে পারে না। তারা কেবল সামনের দিকে তাকাতে পারে; ডান বামে পারে না। অর্থাৎ, এই মানুষগুলো বন্দির মতো গুহায় বসবাস করছে। তবে নিজের কারাবাস সম্পর্কে তারা সচেতন নয়। এসব বন্দির পেছনে আগুন জ্বলছে। আগুন ও বন্দিদের মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে ক্রমাগত

কিছু যাওয়া-আসা করছে। বন্দিদের সামনের দেয়ালে বন্দি ও পথচারীদের ছায়া প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। পেছনের পথচারীরা যখন কথা বলে, গুহার দেয়ালে তখন তাদের গমগমে কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হয়। বন্দিরা পিছনের লোকদের দেখতে পায় না, কেবল তাদের প্রতিচ্ছবি দেখে। বন্দিরা মনে করে, চলন্ত ছায়াগুলোই কথা বলছে। গুহাবন্দিরা ছায়া ও প্রতিধ্বনিকে পৃথিবীর চূড়ান্ত বাস্তবতা বলে মনে করে। একজন বন্দি কোনোভাবে নিজেকে বাঁধনমুক্ত করতে সক্ষম হয়। সে বাইরে গিয়ে বিশাল পৃথিবী দেখে ভীষণ অবাক। মুক্তি পাওয়া ব্যক্তি গুহায় ফিরে সবাইকে যদি বলে, দেয়ালে প্রতিবিম্বিত ছায়াগুলো আসল নয়। আগুন, গুহা ও পেছনে হাঁটচলা করা মানুষগুলোই আসল। তাদের ছায়াই দেয়ালে ভেসে ওঠে। দেয়ালে প্রতিবিম্বিত ছায়াগুলো কথা বলে না; পেছনে থাকা রক্তমাংসের মানুষগুলোর কথাই বন্দিদের কানে আসে। পৃথিবীটা কালোছায়া আর লাল শিখা নয়। পৃথিবীটা রঙিন; তাতে আছে বাতাস, পাখি, সুবাস, আকাশ ইত্যাদি। গুহাবন্দি লোকজন মুক্তবন্দির কথা বিশ্বাস করে না। বাইরের আলো দেখে ফেরা ব্যক্তির চোখ গুহার অন্ধকারের সাথে খাপ খাওয়াতে পারছিল না। সে গুহার ভেতরে ভালো করে ঠাহর করতে পারছিল না। তাকে গুহার ভেতরে হাতড়ে হাতড়ে চলতে দেখে শেকলবন্দিরা নিশ্চিত হয়ে যাবে, তাদের সাথি বাইরে গিয়ে পাগল তো হয়েছেই, দৃষ্টিশক্তিও খুইয়েছে। সাথির দুরবস্থা দেখে তারা আফসোস করে বলবে, আমরা আগেই বলেছিলাম, এই গুহা থেকে যে বের হবে, সে পাগল আর অন্ধ হয়ে যাবে।

প্লেটোর মতে, যদি মুক্ত হওয়া সাথি বাকি বন্দিদের উদ্ধার করে মুক্ত পৃথিবীতে আনার চেষ্টা করে, বন্দিরা তাকে শত্রু মনে করে হত্যা করতে উদ্যত হবে। হয়তো তাকে মেরেই ফেলবে।

প্লেটো বলেন, যে ব্যক্তি পৃথিবীর বাস্তবতা দেখতে বেরিয়েছিল, সে ছিল ফিলোসফার কিংস। সে অন্যদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান এবং সাধারণ মানুষের চেয়ে বাস্তবতা বেশি বোঝার যোগ্যতা অর্জন করেছে। একজন দার্শনিক যা দেখেন, সাধারণ মানুষ তা দেখতে পায় না। সাধারণ মানুষ বুদ্ধিজীবী ও দার্শনিকদের শত্রু হয়ে ওঠে। কারণ, তাদের চিন্তাভাবনা সেই বন্দিদের মতই সীমাবদ্ধ; যারা গুহার মিথ্যা ছায়ানৃত্য ছাড়া আর কিছুই দেখেনি। সেগুলোর প্রকৃত উৎস নিয়েও ভাবেনি।



দার্শনিকদেরকে সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান প্রমাণ করার জন্য প্লেটো উপরোল্লিখিত রূপকটি দিয়েছেন। দার্শনিকদেরকে উপযুক্ত শাসক প্রমাণের জন্য প্লেটো আরেকটি উদাহরণ দিয়েছেন। উদাহরণটি হলো, একটি জাহাজ ও নাবিকের। ধরা যাক, এক জাহাজের নাবিক খুবই ভালো মানুষ। সমস্যা হলো, তার জাহাজ পরিচালনার জ্ঞান নেই। জাহাজের ক্রুরা বিদ্রোহ করল। জাহাজের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর বিদ্রোহীরা তাদের পছন্দসই একজন যোগ্য লোককে নাবিকের দায়িত্ব অর্পণ করল। তাদের দৃষ্টিতে সেই লোক অত্যন্ত যোগ্য ও অভিজ্ঞ নাবিক। বাস্তবে দ্বিতীয় নাবিকও জাহাজ পরিচালনায় অযোগ্যই ছিল। জাহাজ যাত্রীদের মধ্যে সত্যিসত্যি একজন অভিজ্ঞ নাবিক ছিল। তার মধ্যে নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতাও ছিল। জাহাজের লোকেরা তাকে চিনত না। চিনলেও তাকে মূল্যায়ন করত না। প্লেটো বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তৃতীয় ব্যক্তি জাহাজের দায়িত্ব না নিবে, জাহাজ গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে না। ফিলোসফার কিংস-ও এমনই হয়ে থাকেন। তারা সমাজে অপ্রিয়-অপরিচিত হলেও একমাত্র তারাই সমাজকে ন্যায়ের দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম।

এই দ্বিতীয় উদাহরণের মাধ্যমে প্লেটো পরোক্ষভাবে এথেন্সে বিরাজমান গণতন্ত্রের সমালোচনা করেছিলেন। প্লেটো তার রিপাবলিক বইয়ে এমন আরও অনেক যুক্তি-উদাহরণ তুলে ধরেছেন। প্লেটো বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, গণতন্ত্র রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য ভালো উপায় নয়। কারণ, সাধারণ মানুষ ভালো ও যোগ্য ব্যক্তিকে চেনে না, এজন্য তারা প্রায়ই বোকাদের নির্বাচন করে। ভুল ব্যক্তি নির্বাচনের কারণে রাজ্য ভুল দিকে পা বাড়ায়।

প্লেটো রিপাবলিকে যে রাষ্ট্রের চিত্র আঁকার চেষ্টা করেছেন, সেটি একটি কাল্পনিক ও ছোট্ট রাজ্য। খুব বেশি মানুষ সে রাজ্যে বাস করে না। সেই রাজ্যের সকল নাগরিকের একটাই কর্তব্য, রাজ্যের উন্নতির জন্য নিরলসভাবে কাজ করা। রিপাবলিকে একটি বিখ্যাত উক্তি আছে, যা আজও জনপ্রিয় :

> When good men decline to govern, their punishment is that bad men become their rulers.
>
> 'ভালো মানুষ যখন শাসন করতে অস্বীকার করে, তখন তাদের শাস্তি হলো, খারাপ লোকেরা তাদের শাসক হয়।'

প্লেটোর মতে, শুধুমাত্র 'গার্ডিয়ানশ্রেণি ও ফিলোসফার কিংস'ই রাষ্ট্রের উন্নতি করতে পারে। পারিবারিক জীবন, সম্পদ আহরণ এবং বিলাসিতা রাষ্ট্রের জন্য

অত্যন্ত বিপজ্জনক বিষয়। রাজ্যে সঙ্গীত ও সাহিত্যেরও কঠোর সেন্সরশিপ হওয়া উচিত। অর্থাৎ, সঙ্গীত ও সাহিত্যের ওপর রাষ্ট্রের পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত। মানুষ কোন সঙ্গীত রচনা করবে, শুনবে আর কোন গল্প লিখবে ও পড়বে—সবই রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত।

এই ছিল প্লেটোর কাঙ্ক্ষিত রিপাবলিকের পরিপূর্ণ নকশা। যে রাষ্ট্র ন্যায়বিচারের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হবে, ন্যায়বিচারের দিকে পরিচালিত করবে।

এখন পর্যন্ত রিপাবলিকের বহু প্রশংসা ও সমালোচনা হয়েছে। প্লেটো যাদের দিয়ে রিপাবলিক প্রতিষ্ঠার কথা ভেবেছেন, তাদেরকে গড়ে তোলার যে অমানবিক প্রক্রিয়া উপস্থাপন করেছেন, সেটা কোনো সুস্থ সমাজে কখনোই গৃহীত হবে না। এছাড়া সমালোচকদের মতে, প্লেটোর রিপাবলিকে শিল্প ও বিজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে বর্জিত হয়েছে। সাহিত্য-সঙ্গীতকে রাষ্ট্রের অধীন করে দেওয়া হয়েছে। এই পদ্ধতিতে উচ্চমানের শিল্প-সাহিত্য রচিত হওয়া অসম্ভব। প্লেটো যে রাজ্যের চিত্র এঁকেছেন, সেটা নিখাদ স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থারই প্রতিচ্ছবি। রিপাবলিকে সাধারণ মানুষের কোনো গুরুত্বই নেই। দুর্বল-অসহায়দের দমন-পীড়নের মাধ্যমে প্লেটোর রিপাবলিক এক জালেম শাহিতে পরিণত হবে। প্লেটো মানুষের আবেগ-অনুভূতিকেই তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছেন। সমাজের ছোট্ট একটি শ্রেণিকে সবার ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন। প্লেটোর গণতন্ত্রবিরোধী অবস্থান নিয়েও অনেক সমালোচনা হয়েছে।



ইউটোপিয়া

ইউটোপিয়া একটি বইয়ের নাম। বইয়ে একটি কল্পরাজ্যকে ইউটোপিয়া আখ্যায়িত করা হয়েছে। পরবর্তীতে 'ইউটোপিয়া'র ধারণা রাজনীতিবিজ্ঞান ও সাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। ইউটোপিয়া মূলত একটি কল্পগল্প। ষোড়শ শতকে বৃটিশ রাজনীতিবিদ ও লেখক টমাস মুর লিখেছিলেন। বইটি লেখা শেষ হয়েছিল তার মৃত্যুর ষোল বছর আগে। এই বইয়ে ইউটোপিয়া বা একটি স্বপ্নরাজ্যের কথা বলা হয়েছে। একটি আদর্শ ও উন্নত শাসনব্যবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। বইটা ছিল টমাস মুরের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও কল্পনার নির্যাস।

ইউটোপিয়া দুটি গ্রিক শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। ইউ (না), টোপাস (জায়গা)। অর্থাৎ, ইউটোপিয়া মানে এমন দেশ, বাস্তবে যার অস্তিত্ব নেই। কল্পনাতেই যে দেশের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব। ইউটোপিয়ার ধারণা পুরো দুনিয়ায় এতটাই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে, বর্তমানে রাজনীতি বিজ্ঞানশাস্ত্রে ইউটোপিয়া একটি স্বতন্ত্র পরিভাষা হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে। নিত্যদিনের কথাবার্তার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। টমাস মুরের দুই হাজার বছর আগে, প্লেটোর রিপাবলিকে আদর্শ[1] শাসনব্যবস্থার যে রূপরেখা পেশ করা হয়েছিল, সেগুলোকেও বর্তমানে ইউটোপিয়াই বলা হয়। গ্রিক দার্শনিক প্লেটো তার রিপাবলিক বইয়ে একটি আদর্শ শাসনব্যবস্থা বা আদর্শ রাষ্ট্রের রূপরেখা তুলে ধরেছিলেন। সেই আদর্শ বা কল্যাণ রাষ্ট্রকেও বর্তমানে ইউটোপিয়া বলা হয়।

ইউটোপিয়া দেশটি কেমন? টমাস মুর বইয়ে তার কল্পরাজ্যের নকশাও এঁকেছেন। দুই শ মাইল জুড়ে বিস্তৃত এক দ্বীপ। দ্বীপটি মাসের প্রথম দিনের চাঁদের মত বাঁকানো। এটি এককালে আমেরিকারই অংশ ছিল। ইউটোপাস নামক এক শাসক ভিনদেশ থেকে এসে এই দ্বীপদেশে পা রেখেছিল। তার হাতেই ইউটোপিয়া রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। রাজার নামেই দেশটির নগরীর নাম ইউটোপিয়া রাখা হয়। ইউটোপাস প্রথমেই একটা কাজ করল। ইউটোপিয়াকে মূল ভূখণ্ড আমেরিকা থেকে আলাদা করার জন্য পনেরো মাইল

---

[1] আদর্শ বলতে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির আদর্শ। আমাদের নয়।

লম্বা একটি খাল খনন করল। ইউটোপিয়া এখন বিশুদ্ধ দ্বীপ। এখানকার লোকজন বেশ ভদ্র ও শান্তশিষ্ট; তবে অনগ্রসর। বারো শ বছর আগে দ্বীপের কাছাকাছি জলভূমিতে একটি রোমান বা মিশরি জাহাজ ডুবে গিয়েছিল। জাহাজের কিছু যাত্রী কোনোরকমে জান বাঁচিয়ে সাঁতরে, কাঠের ভেলায় ভেসে, দ্বীপের মাটিতে পা রাখতে সক্ষম হয়েছিল। ডুবে যাওয়া জাহাজ থেকে বেঁচে আসা মানুষগুলো ছিল যথেষ্ট শান্তশিষ্ট, সভ্য। তারা শিক্ষিত ও উন্নত দেশের অধিবাসী ছিল।

জাহাজডুবিতে সবকিছু হারিয়ে সর্বশান্ত হয়েও মানুষগুলো নতুন দেশে হাত গুটিয়ে বসে থাকল না। ধকল কাটিয়ে উঠার পর চারিদিকে হেঁটে বেড়িয়ে দেখল। ইউটোপিয়ার জনগণের হাল-হাকিকত জানার চেষ্টা করল। এখানকার অধিবাসীরা শিক্ষাদীক্ষায় অনেক পিছিয়ে ছিল। আশ্রিত মানুষগুলো ইউটোপিয়ানদের শিক্ষাদীক্ষার দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নিল। নিজ দেশ ও সাগর ভ্রমণ করে যা শিখেছে, ইউটোপিয়ানদের জন্য উজাড় করে দিলো। ইউটোপিয়ানরা বাকি দুনিয়ার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা ছাড়াই শরণার্থীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে শিক্ষাদীক্ষায় প্রভূত উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছিল। তারা গ্রিসের শিক্ষাপদ্ধতিতে সঙ্গীত, যুক্তিবিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র ও জ্যামিতিশাস্ত্র শিখে নিয়েছিল। ষোড়শ শতকেই ইউটোপিয়ার অধীনে ৫৪টি শহর আবাদ হয়েছিল। প্রতিটি শহর ছিল বিস্তৃত পরিসরের, খোলামেলা আর সুন্দর। প্রতিটি শহরে এক আইন, এক নিয়মের অধীন ছিল। শহরগুলোর রসম-রেওয়াজও প্রায় এক। ইউটোপিয়ার রাজধানীর নাম আমারত। এই শহর ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরে পাহাড়ি অঞ্চলে অবস্থিত। শহরের পাশ দিয়ে এনিড্রাস নামক বড় এক নদী বয়ে গেছে। পাশে ছোট্ট আরেকটি নদীও কুলকুল করে প্রবাহিত হয়েছে। নদীর প্রবাহ ও নাব্যতা ঠিক রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পুরো শহর নিরাপত্তার চাদরে মুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। শত্রুপক্ষ শহর অবরোধ করলে ইউটোপিয়ানরা পানির পিপাসায় মারা যাবে না। ভূগর্ভে পানি সংরক্ষণের সুবন্দোবস্ত রাখা হয়েছে। বৃষ্টির পানি সেখানে গিয়ে জড়ো হয়। শহরের লোকজন কখনো পানিসংকটে ভোগে না। শহরের এক পাশে নদী, তিন দিকে গভীর পরিখা খনন করা হয়েছে। পরিখাটা কাঁটাগুল্ম দিয়ে পূর্ণ করেও রাখা হয়েছে। শহরের চারপাশে চওড়া আর উঁচু নগরপ্রাচীর তুলে দেওয়া হয়েছে। শহরের প্রতিটি সড়ক সুপরিসর। একই সাথে কয়েকটা ঘোড়ার গাড়ি অনায়াসে পাশাপাশি চলতে পারে। শহরের ভবনগুলো এক

সারি, এক নকশায় নির্মাণ করা। গলিমুখে তাকালে শেষ মাথা পর্যন্ত দেখা যায়। শহরের অলিগলিও কমসে কম ২০ ফিট চওড়া। বাড়িঘরের দরজাগুলো এমনভাবে তৈরি, সহজেই খোলা যায়। খোলা দরজা বন্ধ করতে হয় না— স্বয়ংক্রিয়ভাবে আবজে যায়। ইউটোপিয়াতে ব্যক্তি মালিকানার কোনো ব্যাপার নেই। কারো কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নেই। মানুষ ইচ্ছামতো যেকোনো ঘরে উঠতে পারে। ঘরে থাকা ব্যক্তিকে বের করে দিয়ে নয়। শহরের নিয়ম, প্রতি দশ বছর পরপর প্রতিটি বাসিন্দা বাসা বদল করবে। তখন পছন্দসই বাসা খুঁজে নেওয়া যায়। সব ঘর-বাগান একই রকমের, নতুন বাসায় শুধু প্রতিবেশী নতুন হয়, বাকি সব একই থাকে। সবার সাজ-পোশাকের ডিজাইন আর রং এক। পোশাক দিয়ে যেন মানুষের বিচার না করা হয়, সেজন্য এই ব্যবস্থা।

ইউটোপিয়ায় সামাজিক, রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনেকটা এমন, এখানকার জনসংখ্যাকে বিভিন্ন পরিবারে বিভক্ত করে দেওয়া হয়েছে। প্রতি পরিবার ৪০ জন নারী-পুরুষ, দুজন দাস নিয়ে গঠিত। ত্রিশ পরিবার মিলে একজন ম্যাজিস্ট্রেট নির্বাচন করে। দশ ম্যাজিস্ট্রেটের ওপর একজন ঊর্ধ্বতন ম্যাজিস্ট্রেট থাকেন, তাকে 'আর্চ ফ্লেয়ার্চ' বলা হয়। দুইশ ম্যাজিস্ট্রেট মিলে নিজ শহরের শাসক নির্বাচন করেন। গোপন ভোটের মাধ্যমে প্রিন্স বা নগরশাসক নির্বাচন করা হয়। শহরের চারজন সৎ মানুষকে প্রাথমিক মনোনয়ন দেওয়া হয়। এদের একজনকে নগররাজ বানানো হয়। প্রতি বছর শহর থেকে তিনজন প্রতিনিধিকে ইউটোপিয়ার রাজধানীতে পাঠানো হয়। তারা ইউটোপিয়ার কেন্দ্রীয় পরিষদে যোগ দিয়ে গণতান্ত্রিকভাবে শাসনবিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে একটা বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়, সরকারি কোনো কর্মকর্তা প্রজাদের উপর যেন কোনোকিছু চাপিয়ে না দেয়, তাদেরকে যেন গোলাম বানানোর চেষ্টা না করে। কোনো নগররাজের ব্যাপারে যদি জানা যায়, তিনি জনস্বার্থবিরোধী কাজ করছেন, তাকে অপসারণ করা হয়। সাধারণত একজন প্রিন্সকে আজীবনের জন্য নির্বাচন করা হয়। গণবিরোধী কাজ করলেই শুধু নগররাজকে বরখাস্ত করা হয়। কিছু কিছু বিষয়ে সাধারণ জনগণকেও গণপরিষদে ডাকা হয়। গণপরিষদে কমপক্ষে তিন দিন পর্যন্ত আলোচনা-পর্যালোচনা করা ছাড়া কোনো রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় না। দৈনন্দিন জীবনে, পথেঘাটে, দোকানপাটে, জনপরিসরে রাজনৈতিক আলাপ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এটাকে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ বিবেচনা করা হয়।

ইউটোপিয়ার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা। এই আদর্শ রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে কিছু নেই। রাষ্ট্রই সবকিছুর মালিক। প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট স্থান থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করতে পারে। গ্রামের অধিবাসীরা ক্ষেত-খামারে কাজ করে, পশুপালন করে। শহুরে লোকজন নানা শিল্পপণ্য উৎপাদন করেন। শহুরে নাগরিকদের প্রয়োজনীয় খাবার গ্রামীণ চাষীরা বিনামূল্যে পাঠিয়ে দেয়। গ্রামের লোকেরা শহর থেকে দরকারি পণ্যদ্রব্য বিনামূল্যে নিয়ে যায়। শহুরেদের গ্রামীণ পরিবেশে থাকা, গ্রামীণ লোকদের শহুরে পরিবেশে থাকার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বছরের নির্দিষ্ট সময়ে শহুরে লোকজন গ্রামে গিয়ে ফসল ফলায়, পশুপালন করে আর গ্রামের লোকেরাও শহরে এসে নানা শিল্পপণ্য বানায়। ইউটোপিয়ায় কেউ বেকার থাকার সুযোগ নেই। পদস্থ কর্মকর্তা ও ম্যাজিস্ট্রেটকেও কায়িকশ্রম করতে হয়। শৈশব থেকেই ইউটোপিয়ানকে ফসল ফলানো ও পশুপালন শেখানো হয়। প্রত্যেক ইউটোপিয়ানকে চাষাবাদের বাইরে অন্তত একটি শিল্প দক্ষতা অর্জন করা আবশ্যক। কেউ চাইলে কামার হতে পারে, চাইলে কুমার হতে পারে। চাইলে পছন্দসই অন্য কোনো কারিগরি দক্ষতাও অর্জন করতে পারে। দক্ষতাটা যেন হস্তশিল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়, এটা খেয়াল রাখতে হবে। ইউটোপিয়ান দিনে ছয় ঘণ্টা কাজ করে, আট ঘণ্টা ঘুমায়। শরীরের যত্ন নেয়; বাকি সময় তারা বইপত্র পড়ে, হস্তশিল্প শেখে, ভালো-শিক্ষিত নাগরিক হওয়ার জন্য সাগ্রহে জ্ঞানীদের বক্তব্য শোনে। দিনে ছয় কর্মঘণ্টা কম মনে হলেও ইউটোপিয়ানরা স্বল্পসময়েই বহুকিছু উৎপন্ন করতে পারে। কারণ, ইউরোপিয়ান সমাজে সবাই কাজ করে না। বিপরীতে প্রতিটি ইউটোপিয়ান কাজ করে।

ইউরোপীয় সমাজে শাসক, মন্ত্রী ও বিত্তশালী ব্যবসায়ীদের বেশিরভাগই কোনো কাজ করে না; পায়ের ওপর পা তুলে খায়। সমাজের নিম্নবিত্ত অর্থাৎ দিনমজুর, কৃষকশ্রেণি সারাদিন খেটে মরে। ইউরোপের অর্ধেক জনগোষ্ঠী অর্থাৎ নারীরা পুরোপুরি কর্মমুক্ত। জাতীয় অর্থনীতিতে তাদের কোনো ভূমিকাই নেই। ইউটোপিয়ায় নারীপুরুষ সবাই কাজ করে। কায়িকশ্রম কম, এমন কাজই নারীদের দেওয়া হয়। যেমন তুলা থেকে সুতা বের করা ইত্যাদি। সবার অংশগ্রহণের কারণে ছয় ঘণ্টা কাজ করেই ইউটোপিয়ানরা ইউরোপের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি পণ্য উৎপাদন করতে পারে। নিজেদের প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী রেখে উদ্বৃত্ত পণ্য-ফসল আশপাশের রাজ্যে রপ্তানি করা

হয়। পণ্য রপ্তানির সময় বলে দেওয়া হয়, ইউটোপিয়া থেকে আমদানিকৃত পণ্যের সাত ভাগের এক ভাগ গরিবদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করতে হবে। বাকি ছয় ভাগের বিনিময়ে স্বর্ণ, রুপা, হীরা-জহরত, লোহাসহ প্রয়োজনীয় জিনিস ইউটোপিয়াতে আমদানি করা হয়। পণ্যের বিনিময়ে মুদ্রা নয়, পণ্য আনা হয়।

ইউটোপিয়ানদের সোনা-রুপা, মণি-মুক্তার প্রতি কোনো লোভই নেই। কারণ, সেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তিরই অস্তিত্ব নেই। তাহলে সোনা-রুপা দিয়ে তারা কী করবে? দুটি কারণে রপ্তানিকৃত পণ্যের বিনিময়ে সোনা-রুপা গ্রহণ করা হয় :

ক. ইউটোপিয়ান শাসকরা জানেন, বাহির দুনিয়াতে এসব সোনা-রুপার অনেক দাম। সোনা-রুপার জন্য সেখানকার মানুষ একজন আরেকজনকে হত্যা করতেও দ্বিধা করে না। ইউটোপিয়ান শাসকের কাছে মূল্যবান স্বর্ণরৌপ্য সঞ্চিত থাকলে কখনো প্রয়োজন দেখা দিলে বাহির দুনিয়াকে সাহায্য করা যাবে।

খ. সোনা-রুপা, মণি-মুক্তা দিয়ে টয়লেট নির্মাণ করা হয়। এর পেছনে দর্শন হলো, ইউটোপিয়ানদের মনোজগতে এই চিন্তা বদ্ধমূল করে দেওয়া, এসব পাথরের বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই। এসব ব্যবহার করে কেউ দামি হয়ে যায় না। ইউটোপিয়ানরা শৈশব থেকে বুঝতে শেখে, সোনারুপা টয়লেট নির্মাণে ব্যবহৃত পাথরবিশেষ; বেশি কিছু নয়। ইউটোপিয়ায় গোলামদেরকে সোনা-রুপার শেকল পরানো হতো। ইউটোপিয়ার উপকূলে কুড়িয়ে পাওয়া মণি-মুক্তা বাচ্চাদের খেলার জন্য দিয়ে দেওয়া হতো। বড় হতে হতে জনমনে মূল্যবান পাথরের প্রতি বিতৃষ্ণা আর ঘেন্না তৈরি হয়। ধুর, এসব তো টয়লেট নির্মাণের জিনিস, গোলামদের ব্যবহৃত দ্রব্য, বাচ্চাদের খেলনা।

ইউটোপিয়ানদের বিশ্বাস, প্রকৃতিতে বাতাস, আগুন, মাটি, পানিসহ অন্যান্য বস্তুর অবাধ প্রাচুর্য। কারণ, এগুলোর প্রয়োজন বেশি। সোনা-রুপা, মণি-মুক্তা কম। কারণ, এগুলোর প্রয়োজন কম। জীবনকে এগিয়ে নিতে এসবের কোনো প্রয়োজন নেই। বহির্বিশ্বের মানুষকে এসব পাথরের জন্য বুভুক্ষ লালায়িত হয়ে থাকতে দেখলে ইউটোপিয়ানরা হতবাক হয়ে যায়। সোনারুপা, মণিমুক্তার জন্য কাউকে সম্মান করাটা তাদের কাছে নিতান্ত বোকামো মনে হয়। স্বর্ণ-রৌপ্যলোভী মানুষকে তারা হাসি-তামাশার পাত্র মনে করে।

একবারের ঘটনা। দূরদেশ থেকে তিনজন রাষ্ট্রদূত ইউটোপিয়াতে এলো। নব আগন্তুকরা ইউটোপিয়ানদের সংস্কৃতি সম্পর্কে তেমন কিছু জানত না। মেহমানরা ইউটোপিয়ানদেরকে ছোট ছোট দ্বীপে বাস করা হতদরিদ্র জাতি ভেবেছিল। তারা মনে করেছিল, স্থানীয়দেরকে সম্পদ দেখিয়ে মুগ্ধ করা যাবে। তারা এক শ চাকর-গোলাম নিয়ে এলো। চাকর-গোলামদেরকে দামি পোশাক পরানো হয়েছিল। তিন কর্তাব্যক্তি সবচেয়ে দামি পোশাক পরেছিল। স্বর্ণের সুতোয় বোনা কাপড় পরেছিল কর্তারা। তাদের কানে ছিল স্বর্ণের দুল, হাতে মণি-মুক্তার আংটি। তাদের টুপিতেও মুক্তা বসানো ছিল। ইউটোপিয়ানরা অভ্যর্থনা জানাতে এসে দেখল, তিনজনের শরীরে সবচেয়ে বেশি স্বর্ণ। স্থানীয় রীতিমাফিক তারা ওই তিনজনকেই গোলাম ঠাওরাল। স্থানীয়রা দামি কুর্তা-আচকান পরিহিত কর্তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপই করল না। তুলনামূলক কমদামি পোশাক পরিহিতরা বেশি তোয়াজ-তাজিম পেল। বাচ্চারা অপার কৌতূহলে মায়েদের কাছে জানতে চাইল, এরা বাচ্চাদের খেলনার জিনিস টুপিতে পরেছে কেন? মায়েরা উত্তর দিলো, এরা হয়তো ভাঁড়; মানুষকে হাসানোর কাজ করে বেড়ায়। তিন ধনী ব্যক্তি ইউটোপিয়ানদের উপেক্ষামূলক আচরণে ভীষণ অপমান বোধ করল। অসম্মানিত বোধ করল। কিছুদিন থাকার পর আগন্তুকরা যখন প্রকৃত অবস্থা জানতে পারল, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। আরো কিছুদিন বেড়িয়ে বিদায় নিল।

ইউটোপিয়ানরা সোনা-রুপা ছাড়াও অন্যান্য মূল্যবান বস্তুকেও খুব একটা গুরুত্ব দিত না। রেশমি পোশাকের কদরও তাদের কাছে ছিল না। অতি উন্নতমানের পশমি পোশাক দেখেও তারা নাক সিঁটকে বলত, বানাচ্ছে তো ভেড়ার পশম দিয়েই, তাই না? এটা নিয়ে এতো ডগমগ হওয়ার কী আছে! ইউটোপিয়ানদের খাবার, পোশাক, জীবনযাত্রা একই রকম। গ্রামে পুরো খানদান এক টেবিলে বসে তিন বেলা খাবার খায়। শহরে কমিউনিটি সেন্টারে সবাই মিলেমিশে খাবার খায়। এ কারণে তাদের মধ্যে সামাজিক ঐক্যবোধ জাগ্রত থাকে। একই রকম পোশাক, একসাথে বসে খাওয়া-দাওয়ার কারণে তাদের মধ্যে বদ্ধমূল বিশ্বাস জন্মে—কোনো মানুষ ছোট বা বড় নয়; সবাই সমান।

ইউটোপিয়ানরা যুদ্ধবিগ্রহকে ঘৃণা করে। তারা সযত্নে যুদ্ধ এড়িয়ে চলে। তারা যুদ্ধবাজ কোনো দেশের সাথে যুদ্ধমৈত্রী জোট করে না। কোনো দেশ দখলেরও দুরভিসন্ধি করে না। কোনো দেশ তাদের ওপর চড়াও হলে

জোরদার প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তারা মনে করে, শত্রুরাজ্যের সবাই আমাদের শত্রু নয়। যুদ্ধপ্রিয় শাসক আর তার আশেপাশের মুষ্টিমেয় লোকেরাই ইউটোপিয়ার শত্রু। এজন্য ইউটোপিয়ানরা শত্রুরাজ্যের উপর নির্বিচারে চড়াও না হয়ে শত্রুরাজাকে বধ করার চেষ্টা করে। পালের গোদা শেষ হলেই ঝামেলা চুকে যাবে; যুদ্ধ থেমে যাবে। তারা যেকোনো মূল্যে দ্রুত যুদ্ধটা শেষ করতে চায়। এজন্য তারা ধাপে ধাপে কয়েকটা কাজ করে :

১. প্রথমে অতি গোপনে শত্রুরাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় পোস্টার লাগিয়ে আসে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, যে বা যারা শাসক ও তার কাছের লোকদের জীবিত বা মৃত ধরে আনতে পারবে, তাকে বিশাল পুরস্কার দেওয়া হবে। এভাবে জমাকৃত সোনা-রুপা, মণি-মুক্তার একটা সদগতি হয়। পুরস্কারের লোভে শত্রুরাজের বিরোধীরা অনেক সময় রাজাকে হত্যা করে ফেলত। না লড়েই হাজারো মানুষের জান বাঁচানো যেত আর যুদ্ধসংকটের আশু সমাধান হয়ে যেত।

২. গুপ্তহত্যার মাধ্যমে শত্রুরাজকে পৃথিবী থেকে সরাতে না পারলে প্ল্যান-বি সামনে আনে। নিজেদের লোককে বিপদের মুখে ঠেলে না দিয়ে সঞ্চিত সোনা-রুপার বিনিময়ে অভিজ্ঞ পোড়খাওয়া লড়াকু ভাড়াটে সেনা সংগ্রহ করা হয়। বেছে বেছে তুখোড় যোদ্ধাদেরকে নেওয়া হয়। যাদেরকে দলে ভেড়ালে যুদ্ধেজেতা নিশ্চিত, তাদেরকেই যাচাই-বাছাই করে নেওয়া হয়। যুদ্ধংদেহী লোকগুলো শত্রুসেনাদেরকে পর্যুদস্ত করে নিরঙ্কুশ বিজয় নিয়ে ইউটোপিয়াতে ফিরে।

৩. দ্বিতীয় পরিকল্পনাও নস্যাৎ হয়ে গেলে আর শত্রুরা ইউটোপিয়াতে ঢুকে পড়লে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ইউটোপিয়ানরা তাদের সবচেয়ে অভিজ্ঞ পোড়খাওয়া জেনারেলকে সেনাপ্রধান নিয়োগ করে। বিকল্প হিসেবে দুজন কমান্ডারকে ব্যাকআপ হিসেবে প্রস্তুত রাখা হয়। এরপর ইউটোপিয়ানরা জীবনবাজি রেখে মরণপণ লড়াইয়ে তুফানগতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বেদম আক্রমণের প্রচণ্ড তোড় সামলাতে না পেরে শত্রুরা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ময়দান ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। শত্রুদের পরাজিত করার জন্য প্রতিটি শহরকে সুউচ্চ মজবুত দুর্ভেদ্য প্রাচীরের বেষ্টনী দিয়ে ঘিরে ফেলে। মুখোমুখি লড়াইয়ের প্রস্তুতিস্বরূপ প্রতিদিন পুরুষ-মহিলা সবাইকে নিবিড় অনুশীলন-মহড়ায় বাধ্যতামূলকভাবে অংশগ্রহণ করতে হয়।

এভাবেই ইউটোপিয়ানরা দেশরক্ষায় সর্বোচ্চ ও সফল প্রতিরোধ গড়ে তোলে। জীবনমরণ লড়াই চলাকালেও ইউটোপিয়ানরা সযত্নে লক্ষ্য রাখে, যুদ্ধের কারণে সাধারণ মানুষের যেন ভোগান্তি না হয়। ধর্মীয় পণ্ডিতগণ যুদ্ধক্ষেত্রের কাছাকাছি অবস্থান করে অনবরত প্রার্থনা করতে থাকে, যুদ্ধে যেন দুই পক্ষেরই জানমালের কম ক্ষয়ক্ষতি হয়। ইউটোপিয়ানরা এতটাই শান্তিপ্রিয় যে, নিজেদের খাওয়ার জন্য কোনো প্রাণী হত্যা করে না, অন্যদেরও করতে দেয় না। তাদের দৃষ্টিসীমাতেও এমনটা ঘটতে দেয় না। তারা মনে করে, এমন করলে মানুষের সহজাত সহনশীলতা ও মমতার অনুভূতিগুলো মরে যায়। এজন্য তারা পরিবারের শিশু বা অন্য সদস্যদের ছেড়ে গোলামদের দিয়ে পশু জবাই করায়। তাও শহর থেকে অনেক দূরে, লোকচক্ষুর অন্তরালে। অহেতুক শিকার করাকেও তারা জুলুম মনে করত। পশু শিকারের ব্যাপারে বেশ কড়া নজরদারির ব্যবস্থা থাকে।

শারীরিক দোষ-খুঁতের কারণে কাউকে ঠাট্টা-বিদ্রুপকে জঘন্য কাজ মনে করা হতো ইউটোপিয়াতে। রোগীদের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখা হতো। হাসপাতালগুলো শহরের বাইরে নির্মাণ করা হতো। মুমূর্ষু, দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি বাঁচার আর কোনো আশা না থাকলে, জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে ভীষণ কষ্টে ধুঁকতে থাকলে তাকে সুযোগ দেওয়া হয়, সে নিজেই যন্ত্রণাহীন কোনো পদ্ধতিতে নিজেকে শেষ করে দিবে বা অন্যদেরকে তা করার অনুমতি দিয়ে দিবে। যন্ত্রণাকর জীবনের ঘানি টানার চেয়ে স্বস্তিকর মৃত্যুই শ্রেয় মনে করা হতো ইউটোপিয়াতে। ইউটোপিয়ানদের সামাজিক রীতি এমন, ছোটরা বড়দের, স্ত্রীরা নিজ স্বামীদের খেদমত করত। ঘরের কর্তা বা স্বামী তার সন্তান ও স্ত্রীকে নিয়মানুবর্তী জীবনে অভ্যস্ত করতে শক্ত আচরণ করতে পারত। মেয়েদের জন্য অতিরিক্ত সাজসজ্জা, মেকআপ, রঙচঙ মাখা মন্দ কাজ বলে বিবেচিত হতো। বিবাহ বিচ্ছেদকেও ইউটোপিয়ানরা চরম ঘৃণা করত। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কেউ বাড়াবাড়ি করলে সরকারিভাবেই বিচ্ছেদের ব্যবস্থা থাকত। দুজনের যে বাড়াবাড়ি করেছিল, বাকি জীবন সে আর বিয়ের অনুমতি পেত না। যেসব দাম্পত্যে দুজনে বনিবনা হতো না, তাদেরকে তালাক গ্রহণ করে পুনর্বিবাহের অনুমতি দেওয়া হতো। তবে হ্যাঁ, বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক, যৌন সম্পর্ককে খারাপ চোখে দেখা হতো। বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের অনুমোদন দেওয়া হলে মানুষ বিয়ের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে, এজন্য বিবাহপূর্ব গভীর প্রণয়কে পুরো বংশের জন্য চরম অপমানজনক ঘটনা হিসেবে বিবেচনা

করা হতো। কারো পরকিয়া ধরা পড়লে শাস্তিস্বরূপ তাকে গোলাম বানিয়ে দেওয়া হতো।

ইউটোপিয়ানরা নিজ শহরে স্বাধীনভাবে অবাধে ঘোরাফেরা করতে পারে। দেশের অন্য কোনো শহরে যাওয়ার প্রয়োজন হলে সরকারের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হতো। সরকার তার জন্য পাসপোর্টের ব্যবস্থা করে। পাশাপাশি সরকার তার জন্য একটি ঘোড়ার গাড়ি ও গোলামের বন্দোবস্তও করে দেয়। সে যেখানেই যাবে, যেখানেই থাকবে, তার থাকা-খাওয়ার সুন্দর বন্দোবস্ত করা হয়।

ইউটোপিয়ানরা ধর্ম পালন করত। তাদের মধ্যে নানা ধর্মাবলম্বী ছিল। কারো ধর্ম তাকে অন্য ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে, ভিন্নধর্ম ও ভিন্নধর্মীকে ঘৃণা করা শেখাত না। অধিকাংশই এক খোদা, পরকাল, জান্নাত-জাহান্নামে বিশ্বাস রাখত। তারা খোদাকে 'মিথরাস' বলত। তাদের ধর্মীয় উপসনালয়ও ছিল। চন্দ্র-সূর্য কেন্দ্রিক উৎসব পালন করত। নারীদেরও ধর্মীয় পণ্ডিত হওয়ার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। বিশেষ করে বিধবাদেরকে ধর্মপণ্ডিত বানানোর ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া হতো। ইউটোপিয়ানদের বিশ্বাস মতে, মিথরাস খোদা চান যে, মানুষ প্রকৃতি থেকে বেশি বেশি আনন্দ-বিনোদন উপভোগ করুক। তারা বিশ্বাস করত, আশেপাশে থাকা বস্তু থেকে হাসি-আনন্দের উপাদান খুঁজে নেওয়া উচিত। ছোটখাটো সাময়িক আনন্দের জন্য বড় ও স্থায়ী আনন্দকে নষ্ট করা উচিত নয়। তারা এমন কোনো আনন্দ উদযাপন করত না, যা পরে আফসোস, অনুশোচনা বা কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তারা বলে, যুক্তিবোধ ও বিচারবুদ্ধিই আমাদেরকে খোদার ভালোবাসার দিকে টেনে নেয়। নিরপেক্ষ যুক্তিচর্চাই আমাদেরকে নিরাবেগ সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে। যুক্তির চর্চা করে আমরা অন্যদেরও আনন্দের উৎস হতে পারি। কোনো অবস্থাতেই অন্যের খুশিতে বাধা হয়ে দাঁড়ানো উচিত নয়। তাদের দৃষ্টিতে মানুষের শারীরিক আনন্দ মানে, খাওয়াদাওয়া, বংশবৃদ্ধি ও সুর। তারা সুস্বাস্থ্যকেও শারীরিক আনন্দের অন্যতম উৎস বলে মনে করে। সুস্থতাই সমস্ত আনন্দ ও সুখভোগের কেন্দ্রবিন্দু।

ইউটোপিয়াতে কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় না। অপরাধীদের শাস্তিস্বরূপ গোলাম বানিয়ে দেওয়া হয়। অন্য দেশে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীদেরকে কিনে এনে গোলাম বানিয়ে রাখা হতো। বিদেশ থেকে আমদানিকৃত গোলামদের চেয়ে শাস্তিস্বরূপ গোলামে পরিণত হওয়া স্থানীয়দের প্রতি তুলনামূলক বেশি কঠোরতা আরোপ করা হতো। তারা সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষাদীক্ষা,

বেড়ে ওঠার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়ার পরও নিজেদের শোধরাতে পারেনি, গড়ে তুলতে পারেনি, ভালো মানুষ হতে পারেনি। সুনাগরিক হওয়ার সমস্ত বন্দোবস্ত থাকার পরও তারা অপরাধ করেছে। এজন্য ইউটোপিয়ান আদালত তাদের কোন অজুহাত, ওজর-আপত্তিই আমলে নেয় না। ভিনদেশি গোলামরা শিক্ষিত নয়, বেড়ে ওঠার সুযোগ ও স্বাধীনতাও পায়নি। তাদের অপরাধী হওয়াটা স্বাভাবিক। তারা কিছুটা ছাড় পেতে পারে।

ইউটোপিয়ানদের সহায়-সম্পত্তি, প্রাচুর্য, সমৃদ্ধি দেখে প্রতিবেশী দেশের গরিব-মিসকিনরা অভিভূত হয়ে স্বেচ্ছায় এসে গোলামি গ্রহণ করত। এখানে অন্তত খানাপিনা, পোশাক ও বাসস্থান জুটবে। জুলুম-বৈষম্যের শিকার হতে হবে না। এমন গোলামদেরকে সবচেয়ে ভালো আচরণের যোগ্য ভাবা হয়।

এই কল্পরাজ্যে অপরাধের সাজাশাস্তিও খুব বেশি নয়। হাতেগোনা কয়েকটা বিচারধারা নথিভুক্ত আছে। পুরো দেশে একজন উকিলও নেই। নাগরিকরা নিজেই মামলা লড়তে পারে। উকিলদের চড়াদরের ফি সুবিচার প্রাপ্তির পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। আদালতের কেতাদুরস্ত কঠিন কেতাবি জটিল ভাষার পরিবর্তে সহজ-সরল ভাষায় মামলা উত্থাপন করতে পারে। বিচারকগণ এ নিয়ে কোনো আপত্তি করেন না।

বইয়ের শুরুতে টমাস লিখেছেন, তার সাথে রাফেল হেথোল্ড নামক এক পর্তুগিজ পর্যটকের সাক্ষাৎ হয়েছিল। রাফেইল একাধিকবার উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণ করেছে। আমেরিগো ভেসপুচির সাথেই রাফেইল সফরগুলো করেছিল। আমেরিগোর নামেই বর্তমান আমেরিকার নামকরণ করা হয়েছে। রাফেইল হেথোল্ড ইউটোপিয়াতে ৫ বছর কাটিয়েছিল। রাফেইল সেখানকার অভিজ্ঞতা খাবার টেবিলে বসে টমাস মুরকে শুনিয়েছিল। টমাস লিখেছেন, আমি রাফেইলের অনেক কথার সাথে একমত হতে পারিনি। তবে, মনে হয়েছে ইউটোপিয়ান কিছু আইনকানুন ও সংস্কৃতি যদি ইউরোপে চালু করা যেত, দারুণ ব্যাপার হতো।

ব্রিটেনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ নিয়েও দুজনের বিস্তারিত আলাপ হয়েছিল। বইয়ের বড় অংশজুড়ে তাদের আলাপচারিতার বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। রাফেইল বলেছিল, ব্রিটেন সফরকালে এক উকিল বলছিল, চোরদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত। তাহলে কেউ চুরি করার কথা ভাবতেও ভয় পাবে। রাফেইল মৃত্যুদণ্ডবিরোধী ছিল। তার মতে, চোরকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া কোনো অবস্থাতেই ন্যায়বিচার হতে পারে না। রাফেইলের মতে, ব্রিটেনে চোর বৃদ্ধি পাওয়ার

পেছনে দায়ী মূলত ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব। যুদ্ধ বাঁধলে ব্রিটেন অনেক লোককে আর্মিতে ভর্তি করে। যুদ্ধশেষে তাদেরকে গণহারে ছাঁটাই করে। বিপুল সংখ্যক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যোদ্ধা এক ধাক্কায় বেকার হয়ে যাচ্ছে, শাসক তাদের খাবারের বন্দোবস্ত করছে না, অন্য কোনো কর্মসংস্থানও করছে না। এরাই চুরিসহ নানা অপরাধে লিপ্ত হয়ে হচ্ছে। জমিদাররা তাদের জমিগুলোতে ভেড়ার খামার বানাচ্ছে। ভেড়ার পশম বেশি দামে বিক্রি হয়। এতে বহু কৃষক বেকার হয়ে যাচ্ছে। বেকারত্বই অনেককে অপরাধপ্রবণ করে তুলছে। ভেড়ার খামার কর্মসূচী বন্ধ করে ফসল উৎপাদনের দিকে বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত। বরখাস্তকৃত সেনাদের অন্য কোনো অর্থকরি কারিগরি দক্ষতা শিখিয়ে দেওয়া উচিত। তারা যেন কর্ম করে খেতে পারে; দু-চার পয়সা উপার্জন করতে পারে। তাহলে লোকজন চুরি-ডাকাতির দিকে ঝুঁকবে না।

এই ছিল, ইউটোপিয়া বইয়ের সংক্ষিপ্ত নির্যাস। ইউটোপিয়ার মতো রাষ্ট্র কি বাস্তবে সম্ভব? মোটেও না। সেখানকার অনেক আইনই উদ্ভট। এমন কোনো রাজ্যের অস্তিত্ব শুধু কল্পনাতেই সম্ভব। টমাস মুরের শেষ পরিণতি খুবই করুণ হয়েছিল। তাকে ব্রিটেনে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। না, ইউটোপিয়া লেখার জন্য এই গুরুদণ্ড দেওয়া হয়নি। টমাস মুর ছিলেন ক্যাথলিক। ইংল্যান্ড তখন ক্যাথলিক ধর্ম ছেড়ে প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টমত গ্রহণ করেছে। টমাস মুর এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। টমাস মুর ছিলেন ইংল্যান্ডের রাজা অষ্টম হেনরির উপদেষ্টা। টমাস চাইলে নিজের ধর্মবিশ্বাস লুকিয়ে রাখতে পারতেন। তা না করে প্রকাশ্যে ধর্ম পরিবর্তনের বিরোধিতা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, বাদশাহকে প্রটেস্ট্যান্ট চার্চের প্রধান হিসেবে মানতেও অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। টমাসের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা রুজু করা হলো। টমাসকে গাদ্দার আখ্যায়িত করে ফাঁসি ও লাশকে চার টুকরা করার রায় দেওয়া হলো। রাজা হেনরি পুরোনো সম্পর্কের দিকে তাকিয়ে শাস্তিতে কিছুটা পরিবর্তন আনল। টমাসের শিরোশ্ছেদ করে কর্তিত মুণ্ডু লন্ডন ব্রিজে লটকে রাখা হলো। আগামীতে কেউ যেন এমন গাদ্দারির কথা চিন্তাও না করে। ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দে টমাস মুরকে হত্যা করা হয়েছিল। হত্যাকাণ্ডের চার শ বছর পর ১৯৩৫ সালে ক্যাথলিক চার্চ টমাসকে শহীদ আখ্যা দিয়ে সেইন্টের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে।

দি ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশন

ধরা যাক, কোনো কারণে আমেরিকা বিশ্বের একক শক্তির অবস্থান থেকে ছিটকে পড়ল বা নিজের সামরিক শক্তি খুইয়ে বসল, তাহলে আমেরিকার মোড়লগিরিহীন নতুন পৃথিবী কেমন হবে? নতুন বিশ্বব্যবস্থা কে পরিচালনা করবে এবং কিভাবে? সেটা আদৌ কার্যকর হবে? চীন, রাশিয়া বা ইউরোপীয় ইউনিয়ন কি এর নেতৃত্ব দেবে নাকি অন্য কোনো কাঠামোতে হবে?

এটি একটি অনুমানমূলক পরিস্থিতি (Hypothetical situation)। ১৯৮০ এর দশকের শেষদিকে এবং ১৯৯০ এর দশকের শুরুতে সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙে যাওয়ার পর একই অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল। কয়েক দশক ধরে বিশ্ব তিনটি ব্লকে বিভক্ত হয়েছিল। তিনটি ব্লক মূলত দুটি মতাদর্শের ভিত্তিতে বিভক্ত হয়েছিল :

ক. পুঁজিবাদী ব্লক। আমেরিকা যাকে 'ফ্রি-ওয়ার্ল্ড' বা মুক্তবিশ্ব বলে আখ্যায়িত করেছিল। এখানে রাজনীতি, অর্থনীতি ও গণমাধ্যমের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল।

খ. কমিউনিস্ট ব্লক। এখানে একদলীয় সরকার ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা চালু ছিল। কল্যাণরাষ্ট্রের ধারণা প্রচলিত ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন এর নেতৃত্বে ছিল। এই জোটে পোল্যান্ড, পূর্ব জার্মানি ও অন্যান্য মিত্র ছিল।

গ. জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। যারা উপরোল্লিখিত দুটি ব্লকের কোনোটার সাথেই ছিল না। ভারত, মিশর ইত্যাদি দেশ এই ব্লকের সদস্য ছিল। এই ব্লকের নেতৃত্বে কেউ ছিল না। তৃতীয় ব্লকের দেশগুলো প্রথম দুই ব্লকের সাথেই সুসম্পর্ক বজায় রাখার পক্ষপাতি ছিল।

এই তিনটি ব্লকই মূলত নিজ নিজ স্বার্থের অনুকূলে বিশ্বের রাজনীতি, ক্ষমতা, অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক গ্রেট গেইমের কলকাঠি নাড়ত। এমন এক বিশ্বব্যবস্থা তৈরি হয়েছিল, যাতে তিনটি ব্লকই একসাথে থাকছিল ও লড়ছিল। ১৯৯০ এর দশকের শুরুতে কমিউনিস্ট ব্লকের নেতা সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার জেরে পুরো ব্লকটি বিলুপ্তির শিকার হয়েছিল। মিত্ররা ছত্রভঙ্গ হয়ে

গিয়েছিল। সোভিয়েত ব্লক ভেঙে যাওয়ার সাথে সাথে তৃতীয় 'জোটনিরপেক্ষ' ব্লকেরও বিলুপ্তি ঘটেছিল। কারণ, এখন আর দুই ব্লকের কোনো একটার সাথে যোগ দেওয়ার বিষয় ছিল না; একটা ব্লকই অবশিষ্ট ছিল। সেটা হলো, আমেরিকা ও পশ্চিমা মিত্রদের নেতৃত্বে ধর্মনিরপেক্ষ-গণতান্ত্রিক ব্লক। একটি শক্তিশালী ব্লকের অধীনে পৃথিবী কেমন থাকবে? নতুন আর কোনো ব্লক তৈরি হবে? নতুন ব্লক হলে সেটা কীসের ভিত্তিতে হবে? মার্কিন ব্লককে টিকে থাকতে হলে কী করতে হবে? ১৯৯৬ সালে স্যামুয়েল পি হান্টিংটন এই প্রশ্নগুলোর জবাব খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন তার বিখ্যাত 'দি ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশন এন্ড রিমেকিং অব ওয়ার্ল্ড অর্ডার' বইতে। লেখক বইতে মূলত বলতে চেয়েছেন, মতাদর্শের ভিত্তিতে পৃথিবী এতদিন যেভাবে কয়েকটি ব্লকে বিভক্ত হয়েছিল, সে যুগের অবসান ঘটেছে। পৃথিবী আর কখনো এভাবে মতাদর্শের ভিত্তিতে বিভক্ত হবে না। ভবিষ্যৎ দুনিয়া সভ্যতা-সংস্কৃতির পার্থক্যের ভিত্তিতে বিভক্ত হবে। এক সভ্যতা ও সংস্কৃতি তার সাথে মিল বা সাদৃশ্য আছে, এমন সভ্যতা-সংস্কৃতির সাথে জোটবদ্ধ হবে। এই ব্লকগুলোই একটা আরেকটার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে। নতুন বিশ্বব্যবস্থায় সভ্যতাগুলোর মাঝে ক্ল্যাশ হবে, তবে মতাদর্শের নয়।

এ বইটা লেখার জন্য হান্টিংটনই উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন। একজন বুদ্ধিজীবী হওয়ার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক গ্রেট গেইমের ব্যাপারেও তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছিল। ৩৯তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার (১৯৭৭-১৯৮১)-এর শাসনামলে তিনি নিরাপত্তা পরিকল্পনা পরিষদের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার বিষয়ক পরিচালক ছিলেন। ফরেন পলিসি ম্যাগাজিনও তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

যে কজন মানুষ বিশ্বে চলমান শক্তির খেলা বুঝতেন, হান্টিংটন তার অন্যতম ছিলেন। বইয়ের শুরুতেই তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, সিভিলাইজেশন মানে কী? সিভিলাইজেশন মানে,

> শিক্ষিত, সংস্কৃতমনা সমাজব্যবস্থা, যা (যাযাবরি না হয়ে) একটি জায়গা স্থায়ী আবাস গড়ে তুলেছে। এই সমাজব্যবস্থায় লোকজন শহুরে ও শিক্ষিত।

বিশ্বের বহু স্থানে এমন সভ্যতা বিকশিত হয়েছে। এসব সিভিলাইজেশন একটি আরেকটির চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রতিটি সিভিলাইজেশনই বিভিন্ন অবস্থা ও

পরিস্থিতি অতিক্রম করে বর্তমান পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। প্রতিটি সিভিলাইজেশনের ইতিহাস-ঐতিহ্যও ভিন্ন। ভবিষ্যতে ৫টি সভ্যতার সংঘর্ষ হবে। সেগুলো যথাক্রমে :

১. ইসলামিক সভ্যতা।
২. চায়নিজ ও জাপানিজ সভ্যতা।
৩. রাশিয়ান সভ্যতা।
৪. ভারতীয় সভ্যতা।
৫. পাশ্চাত্য সভ্যতা।

হান্টিংটনের মতে, বর্তমানে মানুষ মতাদর্শের ভিত্তিতে নয়, সমসংস্কৃতির ভিত্তিতে সম্পর্ক গড়তে পছন্দ করে। মানুষ কাছাকাছি সভ্যতা-সংস্কৃতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সম্পর্ক নিয়ে গর্ববোধ করে। মানুষ সম্পর্ক ও মৈত্রী গড়ার ক্ষেত্রে মতাদর্শ, অর্থনীতি ও সমরনীতির বদলে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যগত মিল-অমিলের বিবেচনা প্রাধান্য পাবে। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে কোনো ব্লক-জোটে যোগ দেওয়া বা সমর্থন যোগানোর ক্ষেত্রেও মতাদর্শিক, অর্থনৈতিক ও স্ট্র্যাটেজিক কারণের চেয়ে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যগত মিলের বিবেচনা প্রাধান্য পাবে। এমনকি নিজ ব্লক বা জোটের কাউকে সমর্থন-সহযোগিতা করার ক্ষেত্রেও মতাদর্শগত মিলের চেয়ে ঐতিহ্যগত মিল মূল অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে। সর্বশক্তি দিয়ে নিজ জোটের পেছনে দাঁড়ানোর কারণ হলো, সে জোটকে নিজের অংশ মনে করে, নিজের মানস ও বোধবুদ্ধির সতীর্থ মনে করে। ইসরায়েল ও পশ্চিমাবিশ্ব এর জাজ্বল্যমান প্রমাণ। আমেরিকা-পশ্চিমাবিশ্ব সমস্ত নীতি-আদর্শ একদিকে ছুড়ে ফেলে যেকোনো মূল্যে ইসরায়েলের পাশে দাঁড়ায়। কারণ, ওয়েস্ট-আমেরিকা মনে করে, ইসরায়েল তাদের সংস্কৃতি-সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অংশ। পশ্চিমারা আরবকে শত্রু মনে করে। আরবকে তাদের বিপরীত সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারকবাহক মনে করে। আরব ও মুসলিমবিশ্ব ফিলিস্তিনের পাশে দাঁড়ায়। ইসরায়েলের ক্ষতিতে আরব ও মুসলিমরা বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না; বরং আনন্দিত হয়।

ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশন বইয়ে হান্টিংটন পশ্চিমা সভ্যতার দুটি ভুল ধারণা দূর করার প্রয়াস চালিয়েছেন :

১. পশ্চিমারা যদি মনে করে, মুসলিম সভ্যতার ধর্মনিরপেক্ষ নেতারা তাদের ধর্মনিরপেক্ষ ও উদারনৈতিক মূল্যবোধকে সমর্থন করবে, আমাদের পাশে দাঁড়াবে, কাজেকর্মে কখনো ধর্মকে টেনে আনবে না, তাহলে সেটা হবে

পাশ্চিমাদের মারাত্মক ভুল। মুসলিম বিশ্বের উদার ও ধর্মনিরপেক্ষ নেতা, প্রকৃতপক্ষে ইসলামি সভ্যতারই ধারকবাহক হয়ে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ একজন আত্মস্বীকৃত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি ছিলেন। এই জিন্নাহই পূর্ণ উৎসাহ-উদ্দীপনায় ইসলামের নাম নিয়েই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইসলামকেই নবগঠিত পাকিস্তানের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছিলেন।

২. পশ্চিমা সভ্যতার দ্বিতীয় ভুল ধারণা হলো, পশ্চিমারা নিজেদের সভ্যতাকে বিশ্বজনীন, বিশ্বজয়ী, সর্বজনমান্য, সর্বজনগ্রাহ্য মনে করে। বিশ্বের সবাই পশ্চিমা সভ্যতাকে নিরঙ্কুশচিত্তে মেনে নিয়েছে, গ্রহণ করেছে। এটা চরম ভুল ও অযৌক্তিক (ননসেন্স) চিন্তা।

কিছু প্রশ্ন

১. নীল জিন্স, ফ্যাটি বার্গার, কোকাকোলা, পেপসিতে ঠিক কোন জিনিসটা আছে, যা বিশ্বকে আমাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানান দেয়? ইউরেমিরিকার বাইরে বসবাসকারী জিন্স পরা, কোক-বার্গার খাওয়া যুবকরা কি পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে কখনো অস্ত্র তুলে নেয় না?

২. আন্তর্জাতিক মিডিয়ার ওপর পশ্চিমাদের একক নিয়ন্ত্রণের কারণে বিশ্ব পশ্চিমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে সবকিছু চিন্তা করে—এমনটা ভাবাও মারাত্মক ভুল। ইরাক বা কোনো মুসলিম দেশে মার্কিন-ব্রিটিশ বোমা হামলার সংবাদে পশ্চিমা ও মুসলিম সভ্যতা একই রকম প্রতিক্রিয়া দেখায়? ব্যাপারটা মোটেই এমন নয়। ইরাক বা লিবিয়া আক্রমণকে পশ্চিমা সভ্যতার লোকজন তাদের সাফল্য ও বিজয় হিসেবে দেখে; অন্যদিকে মুসলিমবিশ্ব একে নিপীড়ন হিসেবে দেখছে। ইউরেমিরিকান চলচ্চিত্রের জনপ্রিয়তা, নিউজ চ্যানেলের দর্শকপ্রিয়তা, মিডিয়ার একচেটিয়া আধিপত্য কোনো সংস্কৃতিকে বিশ্বজনীন করছে না।

৩. একটি চমকপ্রদ প্রশ্ন, ৭০ এবং ৮০-এর দশকে ইউরেমিরিকানরা যখন দেদারসে জাপানি গাড়ি, ক্যামেরা, ইলেকট্রনিক গ্যাজেট আমদানি করেছিল, তারা সাথে কি জাপানি সংস্কৃতিও কিনে এনেছিল? উত্তর হলো, না। পশ্চিমা পণ্য ক্রয়কারী মুসলিম ও এশিয়ানরাও পণ্যের সাথে তথাকথিত পশ্চিমা সংস্কৃতি গ্রহণ করে না।

তৃতীয় ভুলধারণা

এখানকার লোকজন মনে করে, তাদের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ অন্যান্য সংস্কৃতি-সভ্যতার চেয়ে উন্নত। পশ্চিমা সভ্যতা মুসলিম, চীনা, রাশিয়ান ও ভারতীয় সভ্যতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ; অথচ বাস্তবতা হলো, প্রাচ্যসংস্কৃতি বিশেষ করে মুসলমানরাও নিজেদের সংস্কৃতিকে ঠিক তেমনি শ্রেষ্ঠ আর উন্নত মনে করে, যেমনটা আমরা পশ্চিমারা নিজেদের সংস্কৃতিকে শ্রেষ্ঠ আর উন্নত মনে করি। প্রাচ্যের সমাজগুলো পশ্চিমকে নিজেদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করার বদলে, পশ্চিমা সংস্কৃতি ও পশ্চিমাদেরকে ভণ্ড, মুনাফিক আর দ্বিমুখী চরিত্রের মনে করে।

উদাহরণস্বরূপ, পশ্চিম গণতন্ত্রকে সমর্থন করে। গণতান্ত্রিক পন্থায় ইসলামপন্থী দল ক্ষমতায় এলে পশ্চিমারা সেটা মেনে নিতে পারে না। একইভাবে, পশ্চিমা শক্তিগুলো ইরাক এবং ইরানকে পারমাণবিক বোমা বানাতে বাধা দেয়। আণবিক অস্ত্র বানানো বা আণবিক অস্ত্র রাখা বেআইনি। এটা মানবিক মূল্যবোধ পরিপন্থী কাজ। পশ্চিমারা একই নিষেধাজ্ঞা ইসরায়েলের উপর আরোপ করে না। উল্টো ইসরায়েলকে আণবিক বোমা বানাতে সহযোগিতা করে। কারণ, তারা মনে করে ইসরায়েল তাদের সভ্যতার একটি অংশ।

অতএব, আমাদের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ বাকি বিশ্বের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও সার্বজনীন—পশ্চিমাদের এহেন চিন্তা নিতান্ত অযৌক্তিক (Absolutely absurd)। পশ্চিমা সভ্যতাকে তার ভ্রম থেকে বেরিয়ে আসা উচিত।

হান্টিংটন তার বইয়ে জনসংখ্যার সমস্যা নিয়েও আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, সভ্যতাগুলোর জনসংখ্যাগত পার্থক্য (Demographical differences) ভবিষ্যতে সংঘর্ষ ও মারামারির কারণ হবে। মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা নিয়ে শুধু পশ্চিমারাই নয়, বাকি বিশ্বও চরম উদ্বিগ্ন। ইসরায়েলও ফিলিস্তিনিদের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা নিয়ে উদ্বিগ্ন। স্পেনও উত্তর আফ্রিকার মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধিতে উদ্বিগ্ন। বসনিয়া, চেচনিয়া, মধ্য এশিয়া ও কাশ্মীরে চলমান সংঘাত-লড়াইয়ের একটি কারণ, ক্রমবর্ধমান মুসলিম জনসংখ্যা। ভারতে মুসলিম ও হিন্দু চরমপন্থীদের মধ্যকার দাঙ্গা-হাঙ্গামার পেছনেও তাদের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা অন্যতম কারণ হিসেবে সক্রিয় আছে। ইউরোপে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধিও পশ্চিমাদের উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১৯৯০ সালে ৭৬% ফরাসি বলেছিল, তাদের দেশে আরবদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। ১৯৯১ সালে ৫১% ফরাসি বলেছিল, তারা দক্ষিণ থেকে অর্থাৎ উত্তর আফ্রিকার মুসলমানদের কাছ থেকে হুমকি পেয়েছে। মাত্র ৮% বলেছে, তারা পূর্বদিক থেকে অর্থাৎ রাশিয়ার দিক থেকে হুমকিতে রয়েছে। রাশিয়া ঐতিহাসিকভাবেই ফ্রান্সের শত্রু। ১৯৯৪ সালে ৪৭% জার্মান বলেছিল, তারা আরবদের সাথে বসবাস করা পছন্দ করে না। ৩৬% জার্মান বলেছিল, তারা তুর্কিদের অপছন্দ করে। ২২% ইহুদিদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেছিল। ইউরোপে ইহুদিবিরোধী এন্টিসেমিটিজম বর্তমানে আরব বিদ্বেষের রূপ পরিগ্রহ করেছে। এর অর্থ হলো, উভয় সভ্যতার মধ্যে বৈরিতা দিন দিন বেড়ে চলছে।

পশ্চিমা সভ্যতাকে মোকাবেলা করার জন্য শীঘ্রই আরেকটি সভ্যতাও ইসলামি সভ্যতার সাথে যোগ দেবে; তা হলো চায়নিজ সিভিলাইজেশন। আন্তর্জাতিক শক্তির দ্বৈরথে চীন সবচেয়ে বড় খেলোয়াড়। বিপুল জনসংখ্যা আর সুদীর্ঘ সমৃদ্ধ অতীত চীনের অপরিসয় শক্তির প্রধান উৎস। ১৯৮০ সাল থেকে চীন তার সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে চলছে। ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৩ পর্যন্ত পাঁচ বছরে চীন তার প্রতিরক্ষা ব্যয় দ্বিগুণে উন্নীত করেছে। চীন আগে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত ছিল। সোভিয়েত পতনের পর চীন প্রতিরক্ষার পাশাপাশি ক্ষমতা দেখানো (Power projection) শুরু করেছে। দেশটি সাউথ চায়না সির দ্বীপপুঞ্জে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করা শুরু করেছে। সেখানে কদম জমাতে শুরু করেছে।

হান্টিংটন এ কথা লিখেছিলেন ২৮/২৯ বছর আগে যখন চীন রাশিয়ার ঘনিষ্ঠ মিত্র ছিল না। আজ দুটি দেশ বলতে গেলে হরিহর আত্মা। হান্টিংটনের কথা সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। চীন আজ পশ্চিমা সভ্যতার প্রধানতম প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত হয়েছে। পশ্চিমাবিরোধী সবচেয়ে বড় খেলোয়াড়ও চীন। চীন বর্তমানে সেকালের সোভিয়েত ইউনিয়নের চেয়েও বেশি শক্তিশালী।

হান্টিংটনের আরেকটি ভবিষ্যদ্বাণীও আংশিক সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। হান্টিংটন বলেছিলেন, চীন অচিরেই পশ্চিমকে চ্যালেঞ্জ করতে মুসলিম সভ্যতার পাশে দাঁড়াবে। কিছুদিন আগে দেখেছি, চীন দুই শক্তিশালী ও প্রভাবশালী মুসলিম রাষ্ট্র সৌদি ও ইরানের মাঝে দূরত্ব কমিয়ে আনতে সাহায্য করেছে। দুটি দেশের ছিন্ন হয়ে যাওয়া কূটনৈতিক সম্পর্কে জোড়া লাগানোর

পেছনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। এ কাজে আন্তর্জাতিক শক্তি হিসাবে দুইপক্ষের জামিন (Gurantor) হয়েছে। পাকিস্তানের সাথেও চীনের ভালো বোঝাপড়া আছে। সিপ্যাক (CPAC), দ্বি-পাক্ষিক প্রতিরক্ষা সহযোগিতাসহ দুই দেশের বিভিন্ন চুক্তিও ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশনেরই প্রতিক্রিয়া।

পশ্চিমাবিরোধী চীন ও মুসলিম মৈত্রীবন্ধনকে হান্টিংটন কনফুসিয়াস ইসলামিক কানেকশন আখ্যায়িত করেছেন। কনফুসিয়াস চীনা দার্শনিকের নাম। আগে বা পরে এই জোটে রাশিয়ান সভ্যতাও যোগ দিবে। এই তিনটি সভ্যতা যদি কোনোক্রমে জোটবদ্ধ হয়, সেটা হবে পশ্চিমা সভ্যতার অস্তিত্বের জন্য বিরাট হুমকি। এই জোট ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেশনের জন্য মারাত্মক বিপদ ডেকে আনবে।

এই বইটি পশ্চিমা সভ্যতাকে বাঁচানোর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা হয়েছে। তাই লেখক জায়গায় জায়গায় পশ্চিমা সভ্যতাকে নানা পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি আমেরিকাকে পরামর্শ দিয়েছেন, চীনের মোকাবেলায় পূর্ব এশীয় দেশ জাপান, তাইওয়ান, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম ইত্যাদি দেশের সাথে জোট গঠন করতে।

আজ পূর্ব এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ দেশ ফিলিফাইনের জন্য আমেরিকান পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে যে বিবৃতি প্রকাশিত হয়, আগে ইসরায়েলের জন্য এমন বিবৃতি প্রকাশিত হতো। ফিলিফাইনের জন্য আমেরিকা সিসাঢালা প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে গেছে। চীনের বিরুদ্ধে আমেরিকা-জাপান নিরাপত্তা জোটের নতুন যুগে প্রবেশ করছে। এই ঘটনাও ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশন বইয়ের আরেকটি ভবিষদ্বাণীকে সত্য প্রমাণ করেছে। হান্টিংটনের এই পরামর্শও আমেরিকা গ্রহণ করেছে। লেখক রাশিয়াকে চীনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছেন। লেখক মনে করেন, আমেরিকা রাশিয়ার সাথে একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে পারে। কারণ, রাশিয়ার পূর্বাংশ ঐতিহাসিকভাবে পশ্চিমা সভ্যতারই অংশ ছিল। এটাই রাশিয়ার সবচেয়ে জনবহুল এলাকা। রাশিয়ার মূল অংশও বটে। দেওয়া-নেওয়ার মূলনীতির ভিত্তিতে রাশিয়াকে পশ্চিমা সভ্যতার বন্ধু বানানো যেতে পারে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ন্যাটোকে যদি মধ্য ইউরোপ ও পূর্ব ইউরোপে ইউক্রেনের পিছন পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা যায় এবং রাশিয়াকে গ্যারান্টি দেওয়া

যায় যে, ন্যাটোকে তার সীমানা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হবে না, তাহলে খুব সহজেই রাশিয়াকে বন্ধু বানানো যাবে। রাশিয়া যদি ইউক্রেনের ওপর হামলা করে বা ইউক্রেন দখল করে নেয়, শুধু তখনই ন্যাটোকে সম্প্রসারিত করা উচিত; তার আগে নয়। অনেক বুদ্ধিজীবীর মতো, হান্টিংটনের এই ভবিষ্যদ্বাণীও সত্য প্রমাণিত হয়েছে। কারণ, অনেক স্ট্র্যাটেজিক এক্সপার্ট বলেছিলেন, ইউরোপ যদি ন্যাটোকে ইউক্রেন পর্যন্ত বা কোনোভাবে রাশিয়া সীমান্ত পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায়, তাহলে রাশিয়া কখনই শান্তিতে থাকবে না। তেমন পরিস্থিতিতে রাশিয়া হামলা করবেই। দুই বছর আগে বাস্তবে এমনটাই ঘটেছে।

ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশন বইয়ে আলোচিত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, পশ্চিমা সভ্যতার শক্তি ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের পর পশ্চিমা সভ্যতা এখনো অনেক বড় শক্তি। প্রযুক্তি, মিলিটারি ও অর্থনীতিতে পশ্চিম এখনো অপরাজেয়। এসব বিষয়ে এখন পর্যন্ত পশ্চিমের মোকাবেলা করার মতো বিকল্প শক্তি গড়ে ওঠেনি। তারপরও বলতে হয়, পশ্চিমা ক্ষমতার যাত্রা নিম্নমুখী। কারণ, অনেক শক্তিশালী দেশ বা অঞ্চল অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে উন্নতি করে চলছে; করছে। পশ্চিমাদের উচিত, উদার গণতন্ত্র ও নিজস্ব মতামতগুলো সার্বজনীন মনে করে অন্যদের উপর চাপিয়ে না দেওয়া। এই চেষ্টায় নিজেদের শক্তি ও অর্থ ব্যয় করা থেকেও বিরত থাকা উচিত। নিজেদের শক্তিকে যতবেশি সম্ভব নিজেদের উদ্ভাবনী শক্তি ও আত্মরক্ষার পেছনেই ব্যয় করা উচিত।

লেখক মনে করেন, আগামী কয়েক দশকের মধ্যে পশ্চিম বড়সড় অভিবাসনের মুখোমুখি হবে। পশ্চিমাদের এজন্য প্রস্তুত থাকা জরুরি। কারণ, মুসলিম দেশগুলোতে যুবকদের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। যুবকরা পশ্চিমা দেশগুলোতে অভিবাসী হওয়ার চেষ্টা করবে। ফলে, পশ্চিমে সামরিক সংঘাত ও জঙ্গিবাদ বৃদ্ধি পাবে। পশ্চিমা দেশগুলোতে নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি হবে।

হান্টিংটনের এই ভবিষ্যদ্বাণীও একপ্রকার সত্য প্রমাণিত হয়েছে। মুসলিম যুবকরা তুরস্ক ও আফ্রিকা হয়ে পশ্চিমে অনুপ্রবেশ করার চেষ্টা করছে। তবে এই প্রসঙ্গে হান্টিংটনের দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়নি। তিনি লিখেছিলেন, ২০২০-২০৩০ সালের দিকে মুসলিম বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমতে শুরু করবে। তখন

পশ্চিম ও মুসলিম বিশ্বের সম্পর্ক অনেক ভালো হয়ে যাবে। এটাকে লেখক 'কোল্ড পিস'-শীতলশান্তি বলে অভিহিত করেছেন। এর অর্থ হলো, উভয়পক্ষের সম্পর্কে উত্তেজনা থাকবে, তবে বড় ধরনের সংঘাত সৃষ্টি হবে না।

হান্টিংটন সাহেব এই পয়েন্টে এসে সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত হয়েছেন। এখন অর্থাৎ, ২০২৪ সালে মুসলিমবিশ্ব ও পশ্চিমের সম্পর্ক চরম খারাপ অবস্থায় আছে। বিশেষ করে গাযা-ইসরায়েল সংঘাতের পর সম্পর্কের মারাত্মক অবনতি ঘটেছে।

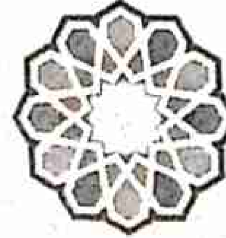
বইয়ের সমালোচনা

১. দি ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশন নব্বই দশকের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ বইগুলোর অন্যতম। এই বই যতটা প্রশংসিত হয়েছে, ততটা নিন্দিতও হয়েছে। বইয়ের সবচেয়ে বড় ও ধ্বংসাত্মক ভুল ছিল, হান্টিংটন মনে করতেন, সভ্যতাগুলোর পার্থক্য নিশ্চিতরূপে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের জন্ম দিবেই; বাস্তবে দেখা গেছে, এ কথা সত্য নয়। সবসময় এমনটা ঘটেও না। জাতিগোষ্ঠী ও মতাদর্শভিত্তিক বলয়গুলোতে আরো অনেক কারণেও সংঘর্ষ হয়ে থাকে। শুধু সভ্যতার পার্থক্যের কারণেই যুদ্ধ বাঁধে না। রাশিয়াও পশ্চিমা সভ্যতারই অংশ। রাশিয়ানদের সাথে পশ্চিমের সেই কবে থেকে সংঘাত লেগে আছে!

২. হান্টিংটন যেভাবে মুসলিম ও পশ্চিমা সভ্যতার বলয় বানিয়েছেন, এটা খুবই অবিবেচনাপ্রসূত আর শিশুসুলভ হয়ে গেছে। সভ্যতাগুলোকে বাহির থেকে যতই মিলমিশপূর্ণ লাগুক, ভেতরে ভেতরে নানা অমিলও বিদ্যমান থাকে। ভৌগলিক অবস্থান ও ভাষাগত অমিলের কারণে একই সভ্যতার মধ্যেও নানা মতপার্থক্য দেখা দেয়। আরবিভাষী মুসলিম আর ফারসিভাষী মুসলিম পরস্পর শত্রুও হতে পারে। এদেরকে যেকোনো মূল্যে একই বলয়ভুক্ত মনে করা নিতান্তই বোকামো।

৩. অভিবাসনের কারণে পশ্চিমা সভ্যতা শুধুই ক্ষতিগ্রস্ত হবে—হান্টিংটনের এই চিন্তাও সঠিক নয়। মুসলিম অভিবাসনের কারণে পশ্চিম অনেক উপকৃতও হয়েছে। পশ্চিমে অনেক মেধাবী মানুষ গেছে। পশ্চিম এসব মেধাকে ভরপুর কাজে লাগিয়েছে। অভিবাসনের কারণে পূর্ব ও পশ্চিমের মানসিক দূরত্বও কমেছে। অনেক ভুল বোঝাবুঝি দূর হয়েছে। সংঘাত এড়িয়ে দুই সভ্যতার মাঝে

ভালো সম্পর্কও কিছু কিছু ক্ষেত্রে গড়ে উঠেছে। অভিবাসনের ফলে পরস্পরের বোঝাপড়া ভালো হওয়ারও সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। হান্টিংটনের এই জগদ্বিখ্যাত বই আজও প্রাসঙ্গিক। প্রতিনিয়ত এ বই কোনো না কোনোভাবে আলোচনায় উঠে আসে। কখনো প্রশংসা, কখনো নিন্দার মুখোমুখি হয় বইটি।



নাইট টেম্পলার ও ফ্রিম্যাসনারি

১৩০৭ সালের ১৩ অক্টোবর শুক্রবার, ফরাসি সম্রাট চতুর্থ ফিলিপ ৭০০ বছর আগের ধর্মযোদ্ধা নাইট টেম্পলারদের বিলুপ্ত করেছিল। চার্চের ইতিহাসে এই দিনটি ব্ল্যাক ফ্রাইডে নামে পরিচিত। বর্তমানে প্রচলিত ব্ল্যাক ফ্রাইডের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। তখন থেকে ১৩ তারিখকে ইউরোপে অশুভ মনে করা হয়ে থাকে।

বর্তমান ব্ল্যাক ফ্রাইডের ইতিহাস দেখা যাক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশেষ দিন হচ্ছে ব্ল্যাক ফ্রাইডে। এটি পালিত হয় প্রতি বছর নভেম্বর মাসের শেষ শুক্রবার। দিনটি উপলক্ষে ধুম পড়ে কেনাকাটায়। কারণ, এই দিনে বিশেষ অফারে পণ্যের উপর ছাড় দেয় মার্কিন ব্যবসায়ীরা। আগে ব্ল্যাক ফ্রাইডে তেমন পরিচিত ছিল না। শুধু আমেরিকাতেই দিনটি পালিত হতো। পরে ইউরোপ ও অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল। নভেম্বর মানে বাংলাদেশে শীতের সময়। এই সময় বিয়ে বা সামাজিক অনুষ্ঠান বেড়ে যায়। কেনাকাটায়ও ধুম পড়ে। ব্ল্যাক ফ্রাইডের অফারকে কাজে লাগিয়ে অনেকেই এই দিনে কেনাকাটা সেরে ফেলে। ব্যবসায়ীরা দোকানে কিংবা অনলাইনেও বিভিন্ন অফারে পণ্য কেনার সুযোগ দেয়। শোরুম বা ওয়েবসাইট থেকে শুরু করে অনলাইনের পেজগুলোতে দেওয়া হয় 'ব্ল্যাক ফ্রাইডে' সেল।

১৮৬৯ সালে 'ব্ল্যাক ফ্রাইডে' সেল প্রথম শুরু হয় আমেরিকায়। 'থ্যাঙ্কস গিভিং'-এর পরেই শুরু হয় ব্ল্যাক ফ্রাইডে। 'থ্যাঙ্কস গিভিং' হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নবান্ন উৎসব। নভেম্বরের শেষ বৃহস্পতিবার 'থ্যাঙ্কস গিভিং' পালন করার পরদিনই অর্থাৎ নভেম্বরের শেষ শুক্রবার পালিত হয় ব্ল্যাক ফ্রাইডে।

১৮৬৯ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর আমেরিকায় ভয়াবহ অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছিল। মার্কিন স্বর্ণের বাজারে মারাত্মক বিপর্যয় নেমে এসেছিল। ব্যবসায়ীরা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়েছিল। ওই সময় তারা এমন একটি দিনের কথা ভাবল, যেদিন সব পণ্যের উপর বিশেষ ছাড় দেওয়া হবে, ফলে ক্রেতারা আকৃষ্ট হবে। ব্যবসায়ীদের সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী ঠিক হয়, বিশেষ



অফারের দিনটি হবে নভেম্বরের শেষ শুক্রবার। এরপরই দিনটির প্রচলন শুরু হয়।

দিনটি শুরুর সাথে সাথে ব্যবসা খাতে সুদিন ফিরতে থাকে। ওই দিন যে পরিমাণ পণ্য বিক্রি হয়, এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক সূচক বেড়ে যায়। ব্যবসায়ীরা ওই সময় হিসাবের খাতায় লোকসানের হিসাব লিখত লাল কালিতে। আর লাভের হিসাব লেখা হতো কালো কালিতে। তখন থেকেই ব্ল্যাক ফ্রাইডে নাম রাখা হয়। কালো বা ব্ল্যাক শব্দটি ব্যবসায়ীদের জন্য ইতিবাচক হয়ে দাঁড়ায়। ব্ল্যাক ফ্রাইডে-তে ভোর চারটা থেকে দোকান খোলেন ব্যবসায়ীরা। এমনকি অনেক ব্যবসায়ী মধ্যরাত থেকেই দোকান খুলে বসেন। ইতিহাসের আরো পেছনে তাকালে জানা যায়, ১৮০০ শতকেও ব্ল্যাক ফ্রাইডের প্রচলন ছিল। ওই সময় এই দিনটিতে বিশেষ ছাড়ে বিক্রি হতো ক্রীতদাস।

নাইট টেম্পলারদের কেন নিষিদ্ধ করা হয়েছিল? ফ্রি-ম্যাসনদের সাথে নাইটদের কীসের সম্পর্ক? এর পেছনে আছে ৩ হাজার বছরের পুরোনো এক চাঞ্চল্যকর গল্প। বর্তমানে যেখানে বাইতুল মুকাদ্দাস অবস্থিত, ইহুদি-খ্রিস্ট মতবাদ অনুযায়ী এখানেই ছিল টেম্পল অব সলোমন বা হাইকালে সুলাইমানি। বাইবেল বর্ণিত এই মহাসৌধ বাস্তবে ছিল কি না, আল্লাহ মালুম। এটা নিয়ে নানা উপকথার ইতি নেই। বাইবেলে 'রাজাবলি'-র দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশদভাবে এই টেম্পলের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। বাইবেলে অন্য কোনো বিষয়ে এতটা বিস্তারিত বর্ণনা খুব কমই আছে। বাইবেলের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, ইহুদিদের কাছে এই টেম্পলের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এই টেম্পল ছিল বাইবেল বর্ণিত কিং সলোমনের ইবাদতগাহ ও বাসভবন। কুরআনে যাকে সুলাইমান নামে উল্লেখ করা করা হয়েছে। আলাইহিমুস সালাম। হাইকালে সুলাইমানি সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে, এটাকে জিনেরা নির্মাণ করেছে। এমন হতে পারে, এর বিরাট আকার দেখে সাধারণ মানুষের মনে এই চিন্তা এসে থাকতে পারে যে, এত বড় স্থাপনা কোনো মানুষের পক্ষে বানানো সম্ভব নয়। এই ভবন নির্ঘাত জিনেরা নির্মাণ করেছে। এমনো হতে পারে, এই ভবনকে পবিত্র বানানোর জন্য ইহুদিরাই জিনদের কথা রটিয়ে দিয়েছে।

একই সময়ে বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে কিছু দূরে মিশরে আরো বিশাল পিরামিড বানানো হয়েছিল। সেগুলো জিন নির্মিত—এমন দাবি মিশরীরা

কখনো করেনি। কুদস শহরে জিনদের দিয়ে নির্মাণকাজ পরিচালনার কথা কুরআনে আছে। সেটা কোন স্থাপনা—এ বিষয়ে পরিষ্কার করে বলা হয়নি। কুদসের পূর্বদিকে ব্যাবিলনেও বিশাল সাম্রাজ্য ছিল। সেখানেও বিরাট এক টাওয়ার ছিল; সেটাকেও জিননির্মিত বলা হয়নি। প্রাচীন কালের সাতটি বিস্ময়কর স্থাপনা রয়েছে, সেগুলোর একটি ছিল ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যান। তার পাশেই ব্যাবিলন টাওয়ার অবস্থিত ছিল। এই টাওয়ারটি ব্যাবিলন সভ্যতার বহু আগে সুমেরীয়রা বানিয়েছিল। তাদের সবচেয়ে বড় খোদা মারদুকের উপাসনার জন্য।

এ কথা প্রসিদ্ধ আছে, সুমেরি বাদশাহ এই টাওয়ার বানিয়েছিল, এটাতে চড়ে উপরে উঠে খোদাকে দেখা ও তার সাথে কথা বলার জন্য। কোনো কোনো সিকিউরিটি এক্সপার্টের মতে, দূরদূরান্ত থেকে আগত শত্রুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য এই টাওয়ার নির্মাণ করা হয়েছিল। ব্যাবিলন সম্রাট বখতেনসর তার সভ্যতা নিয়ে গর্ব করত। সেই সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ এখনো ইরাকে বিদ্যমান আছে। ৫৮৬ খ্রিস্টপূর্ব সালে বখতেনসর জেরুজালেমের ওপর হামলা করেছিল। হাইকালে সুলাইমানি বিধ্বস্ত করেছিল। ইহুদিদের ওপর গণহত্যা চালিয়ে বিপুলসংখ্যক ইহুদিকে দাস হিসেবে ইরাকে নিয়ে গিয়েছিল। বখতেনসর হাইকালে সুলাইমানিকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। বনি ইসরাইল ইরাকে ৭০ বছরের মতো দাসজীবন কাটিয়েছে। ইরাকের প্রবাস জীবনে বনি ইসরাইল মৌখিকভাবে ধর্মগ্রন্থ চর্চা অব্যাহত রেখেছিল। বড়দের থেকে ছোটরা শুনে শুনে ধর্মগাথা সংরক্ষণ করত। লিখিতভাবেও কিছু কিছু সংরক্ষণ করা হতো। ধর্মগ্রন্থের পাশাপাশি বিগত সাধু-সন্তদের জীবনীচর্চাও চলত। এসব ঘটনাই পরবর্তীতে বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে সংযুক্ত হয়েছে। এ থেকেই বোঝা যায়, ওল্ড টেস্টামেন্ট সম্পূর্ণ মানবরচিত।

আচেমেনিড সম্রাট সাইরাস (৬০০-৫৩০ খ্রিস্টপূর্ব) ব্যাবিলন আক্রমণ করেছিলেন ৫৩৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। তিনি ইহুদিদের দাসত্ব থেকে মুক্তি দান করেন। সাইরাস ইহুদি না হওয়া সত্ত্বেও বাইবেলে তার ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। কারো কারো মতে, এই সাইরাসই হলেন কুরআনে বর্ণিত যুলকারনাইন। ৭০ বছরেরও অধিককাল পর ইহুদিরা নির্বাসন থেকে জেরুজালেমে ফিরে এসে দেখল, তাদের সাধের হাইকালে সুলাইমানির চিহ্নও অবশিষ্ট নেই। হাইকালে সুলাইমানি ইহুদিদের স্বপ্ন-জাগরণে বিদ্যমান ছিল।

তারপর ইহুদিরা দ্বিতীয় হাইকালে সুলাইমানি নির্মাণ করল। দ্বিতীয় টেম্পলও ৭০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রোমানরা ধ্বংস করে দিয়েছিল। দ্বিতীয় টেম্পলের জায়গায় রোমানরা অন্য স্থাপনা নির্মাণ করেছিল। প্রাচীনকালে এটাই স্বাভাবিক ঘটনা ছিল যে, বিজয়ী শক্তি আগের বড় বড় স্থাপনা গুঁড়িয়ে নতুন স্থাপনা নির্মাণ করে নিজেদের আধিপত্যের জানান দিত। এই নির্মাণকাজে আগের ইট-পাথরকেই কাজে লাগানো হতো। ডিজাইন ও নকশা বদলে যেত। দ্বিতীয় টেম্পলও বিধ্বস্ত হলো। ইহুদিদের জন্য এটা ভীষণ কষ্টের ছিল। এরপর থেকে ইহুদিরা তৃতীয় হাইকালে সুলাইমানি নির্মাণের স্বপ্ন দেখে আসছে। বারবার দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়ার কারণে তারা তৃতীয় হাইকালে সুলাইমানি নির্মাণ করার অনুকূল পরিবেশ পায়নি। প্রথমে বখতেনসরের হাতে, দ্বিতীয়বার রোমানদের হাতে দাসত্ববরণ করতে হয়েছিল। এরপর এলো মুসলমানগণ। কুদস চলে এসেছিল ইসলামি খিলাফাহর অধীনে। ইহুদিদের তৃতীয় টেম্পল নির্মাণের স্বপ্ন অধরা থেকে গেল।

হযরত উমর রা. বাইতুল মুকাদ্দাস দখলের পর এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। ১০৯৯ সাল পর্যন্ত এখানে মুসলমানদের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। এতদিন পর্যন্ত এখানে কোনো টেম্পল বা গির্জা নির্মাণ করার কথা কেউ বলেনি। ১০৯৯ সালে ক্রুসেডাররা ফাতেমি শাসকদের পরাজিত করে প্রথম ক্রুসেড জিতে গিয়েছিল। তারা মসজিদে আকসা দখল করে নিয়েছিল। ক্রুসেডাররা কুদস দখল করার পর মাটির উপরে তো বটেই, মাটির নিচে থাকা ভূগর্ভস্থ গোপন কক্ষগুলোতেও ডেরা বানিয়ে জমিয়ে বসেছিল। জনশ্রুতি ছড়িয়ে পড়েছিল, যেখানে মসজিদে আকসা আছে, সেটার ঠিক নিচেই হাইকালে সুলাইমানির ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। এই জনশ্রুতি ইহুদি ও খ্রিস্টানরা পরম সত্য বলে বিশ্বাস করে।

জেরুজালেম তিন ধর্মের অনুসারীদের কাছে পবিত্র স্থান। ক্রুসেডাররা জেরুজালেম দখল করার পর খ্রিস্টানরা তাদের তীর্থস্থান দর্শনের জন্য ইউরোপের নানাপ্রান্ত থেকে দলে দলে আসতে লাগল। তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য চার্চ কর্তৃপক্ষ একটি শক্তিশালী বাহিনী গঠন করল। এই বাহিনীকে নাইট টেম্পলার বলা হয়। ইউরোপের সেরা যোদ্ধাদের নাইট বলা হতো। নাইটরা ইউরোপের সবচেয়ে অভিজাত যোদ্ধা ছিল। তাদের অতুলনীয় সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। ইউরোপিয়ান নাইটদের চেয়েও নাইট টেম্পলারদেরকে বেশি সম্মান ও ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। আগের নাইটদের

থেকেই নবগঠিত নাইট টেম্পলার নির্বাচন করা হতো। নাইট টেম্পলাররা ক্রুসের সামনে শপথ গ্রহণ করত যে, তারা জীবনে সবধরনের আরাম-আয়েশ থেকে দূরে থাকবে; সবসময় দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনযাপন করবে; নারীদের থেকে দূরে থাকবে এবং জীবনকে একান্তভাবে চার্চের সেবায় নিয়োজিত করবে।

প্রতিটি শক্তিমান দলের মতো কালের বিবর্তনে নাইট টেম্পলাররাও একটা সংঘবদ্ধ ডাকাত দলে পরিণত হয়েছিল। তারা নিজেদেরকে সমস্ত জবাবদিহিতার ঊর্ধ্বে মনে করত। তাদের কাজকর্ম ও গতিবিধি—সবকিছুই গোপনীয় ছিল। ব্যভিচার, অর্থ আত্মসাৎ-সহ এমনসব কাজ করতে শুরু করে দিয়েছিল, যেসব কাজ না করার শপথ তারা নিত। যেহেতু তাদের মধ্যে কঠোর শৃঙ্খলা ও অমিত শক্তি ছিল, এজন্য কেউ তাদের টিকিটির নাগালও পেত না। তারা ছিল সমস্ত আইনের ঊর্ধ্বে। কালক্রমে তারা রাষ্ট্রের ভেতরে আরেকটি রাষ্ট্র হয়ে পড়েছিল। অন্যকথায় বলতে গেলে, তারা দেশহীন সরকারে পরিণত হয়েছিল। তারা কোনো নির্দিষ্ট দেশের সেনা ছিল না। তাদের নিজস্ব কোনো দেশ ছিল না। সব খ্রিস্টান দেশেই তাদের অবাধ গতিবিধি ছিল।

নাইট টেম্পলাররা তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে গির্জা-চৌকি-সরাইখানা বানিয়েছিল। এসব গির্জা-চৌকির কার্যক্রম ধীরে ধীরে ব্যাংকের রূপ ধারণ করেছিল। তীর্থযাত্রীরা পথখরচা ও নজর-মানতের উদ্দেশ্যে অনেক টাকাপয়সা ও মূল্যবান সামগ্রী বা অলংকার সাথে নিত। অনেক সময় এসব দ্রব্য চুরি-ডাকাতি হয়ে যেত, হারিয়ে যেত। এই সমস্যার সমাধানে নাইট টেম্পলাররা এগিয়ে এলো। তারা একটা ব্যবস্থা দাঁড় করালো। তীর্থযাত্রীরা সফরের শুরুতে সাথে নেওয়া মূল্যবান সামগ্রী নাইট টেম্পলারদের স্থানীয় গির্জা বা প্রতিনিধির কাছে জমা করত। তীর্থযাত্রীদেরকে একটা জমা রসিদ দেওয়া হতো। নাইট টেম্পলাররা সে সম্পদ তাদের জেরুজালেম অফিসে পৌঁছে দিত। তীর্থযাত্রী জেরুজালেম গিয়ে রসিদ দেখিয়ে নিজের সম্পদ বুঝে নিত। এমনিভাবে ফেরার সময়ও একই পদ্ধতি অবলম্বন করা হতো। জেরুজালেম থেকে মূল্যবান কিছু বাড়ি নিয়ে আসতে চাইলে নাইট টেম্পলারদের কাছে জমা করত। বাড়ি এসে স্থানীয় প্রতিনিধির কাছ থেকে নিজের সম্পদ বুঝে নিত। বর্তমানে কুরিয়ার সার্ভিসের মতোই অনেকটা।

নাইট টেম্পলারদের এই সুরক্ষাব্যবস্থা একসময় ব্যাংকের মতোই কাজ করতে শুরু করেছিল। নাইট টেম্পলাররা আমদানি-রপ্তানির কাছে লেগে যায়।

তাদের মধ্যে নিজস্ব এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। এর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ টেম্পলারদের হাতেই ছিল। ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে নানাবিধ পণ্য তৈরি করিয়ে দেশে-বিদেশে বিক্রির কাজও করতে শুরু করে দিয়েছিল। নাইট টেম্পলাররা একই সাথে :

ক. রেগুলেটর বা বাজার নিয়ন্ত্রক।
খ. প্রডিউসার বা উৎপাদক।
গ. সেলার বা বিক্রেতা ছিল।

তীর্থযাত্রীদের জেরুজালেমে নিরাপদে পৌঁছে দেওয়ার জন্য নাইট টেম্পলারদের উদ্ভব হয়েছিল। ১১৮৭ সালে জেরুজালেম টেম্পলারদের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল, কুদস আবারো মুসলমানদের কবজায় এসে গিয়েছিল। ৮৮ বছর পর হিত্তিনের যুদ্ধে খ্রিস্টশক্তি পরাজিত হয়েছিল। নাইট টেম্পলারদের বৈধতার প্রধানতম উপযোগিতা একশ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই ফুরিয়ে গিয়েছিল। তারপরও নাইট টেম্পলারদের কাজ-কারবার খতম হয়নি। পরবর্তী আরো ১০০ বছর গোটা ইউরোপে নাইট টেম্পলাররা রাজত্ব করেছিল, দাপিয়ে বেড়িয়েছিল। এই সময় তারা এতটাই প্রভাবশালী হয়ে গিয়েছিল যে, কেউ তাদের হুকুম দিতে পারত না, বরং তারাই সবাইকে হুকুম দিত। রাজা-বাদশাহরাও তাদের সন্তুষ্টি কামনা করত। তাদের ব্যাংকিং ব্যবস্থা এতটাই মজবুত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যে, তারা ধনীকে মুহূর্তে গরিব আর গরিবকে ধনী বানিয়ে দিতে পারত। শুধু ব্যক্তি নয়, রাষ্ট্রের ভাগ্যও নাইট টেম্পলাররা বদলে দিতে পারত।

নাইটরা হাইকালে সুলাইমানির স্থান জেরুজালেম থেকে বের হয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল; তবে তারা হাইকালে সুলাইমানি পুনর্নির্মাণের স্লোগান ছাড়েনি। তারা আবারো হাইকালে সুলাইমানি নির্মাণ করবে, আবার জেরুজালেম দখল করবে—এই ধুয়ো তুলে নিজেদের অস্তিত্বের বৈধতা ধরে রেখেছিল। থার্ড টেম্পল নির্মাণ ছিল নাইট টেম্পলারদের ড্রিম প্রজেক্ট। থার্ড টেম্পল থেকেই তাদের নাম নাইট টেম্পলার। বাইবেলে বর্ণিত টেম্পলের আদলেই তারা ইউরোপে নিজেদের চার্চগুলো নির্মাণ করত। ওল্ড টেস্টামেন্টে বর্ণিত নকশা অনুসরণ করে উঁচু পিলারের ওপর চার্চগুলো নির্মিত হতো। মূল প্রবেশপথে বড় দুটি পিলার, ভেতরে বিরাট হলোঘর আর বাইরে প্রশস্ত আঙিনা থাকত। মন্দিরের ভেতর দেয়ালে বিভিন্ন চিত্র-নকশা আঁকা থাকত। এসব নকশাগুলো হতো সাংকেতিক। এসবের গূঢ় রহস্য একমাত্র নাইটরাই জানত। নিজেদের

মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্যই নাইট টেম্পলাররা একটি গোপন সাংকেতিক ভাষার প্রচলন ঘটিয়েছিল। হাজারো মানুষের সমাগমেও একজন নাইট আরেকজনকে চিনে ফেলত। নিজেদের ভাষায় ভাব বিনিময় করতে পারত। তারা অনেকটা ক্যাডারভিত্তিক সংগঠনের মতো ছিল। কঠোর অনুশাসন ও অনুশীলনের পরে একজন নিচ থেকে উপরের পদে যেতে পারত। প্রথমে নাইট টেম্পলার, তারপর নোবল টেম্পলার, তারপর চ্যাপেল। তাদের সর্বোচ্চ নেতাকে গ্র্যান্ড মাস্টার বলা হতো।

নাইট টেম্পলাররা শুধু বাহুশক্তিতেই সাধারণের চেয়ে এগিয়ে ছিল না, পড়াশোনাতেও তারা অনেক অগ্রসর থাকত। এই পড়াশোনাকে কাজে লাগিয়ে তারা পুরো ইউরোপের ওপর ছড়ি ঘোরাতো এবং শক্তিশালী ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। ইউরোপের বড় বড় চার্চ পরিচালনা ও নিজস্ব অর্থব্যবস্থার কারণে নাইট টেম্পলাররা রীতিমতো অপরাজেয় শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। যেখানে নিয়ন্ত্রণহীন শক্তি, সেখানে শক্তির অপব্যবহার থাকবেই। সাংগঠনিকভাবে তারা ইউরোপের সবচেয়ে বড় ও সম্পদশালী গোষ্ঠী ছিল। জনশ্রুতি আছে, আজকের কুদসে নাইট টেম্পলাররা প্রাচীন হাইকালে সুলাইমানির অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছিল। বর্তমান আকসা কমপ্লেক্সের নিচে অসংখ্য গোপন কুঠরি নির্মাণ করেছিল। বিপুল সম্পদের বড় একটি অংশ তারা সেই কথিত কুঠরিতে লুকিয়ে রেখেছিল। কথিত আছে, হলি গ্রেইলও নাইট টেম্পলারদের কাছে ছিল। লাস্ট সাপারে ব্যবহৃত বাটি-পেয়ালাকে হলি গ্রেইল বলা হয়। খ্রিস্টবিশ্বাস মতে, ঈসা আ. ক্রুশবিদ্ধ (নাউযুবিল্লাহ) হওয়ার আগে শিষ্যদের নিয়ে শেষবারের মতো রাতের খাবার খেতে বসেছিলেন।

থার্ড টেম্পল ও হলি গ্রেইল জনশ্রুতি হলেও নাইট টেম্পলারদের অস্তিত্বের জন্য এসব বড় পুঁজি ছিল। পাশাপাশি তাদের দুর্বলতাও ছিল। তাদের বিপুল ধনসম্পদের ওপর ইউরোপের রাজা-বাদশাহদের শ্যেন দৃষ্টি ছিল। ফ্রান্সের রাজা চতুর্থ ফিলিপ দ্যা পেয়ার নাইট টেম্পলারদের ওপর নানা কারণে ক্ষেপে গিয়েছিল। মধ্য যুগে রাজা ও চার্চের মধ্যে টানাপোড়েন চলতেই থাকত। চৌদ্দ শতকে ফরাসিরাজ চতুর্থ ফিলিপ নাইট টেম্পলারদের ওপর চড়াও হয়েছিল। নাইটদের বিরুদ্ধে ধর্ম অবমাননা, অস্বাভাবিক যৌন সম্পর্ক, শয়তান পূজার মতো ২৯টি অভিযোগ আনা হয়েছিল। এই অভিযোগের ভিত্তিতে ফরাসিরাজ নাইটদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। নাইটদের চারিত্রিক অধঃপতনের বিচার করেই রাজা ক্ষান্ত

হতে চায়নি; সাথে সাথে তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য ধ্বংস ও তাদের অপরিমেয় ধনরাশিও হস্তগত করতে চাচ্ছিল। ১৩০৭ খ্রিস্টাব্দের ১৩ অক্টোবরে নাইট টেম্পলারদের সদর দপ্তরে ফরাসিরাজের নাইটরা চড়াও হয়। নাইট টেম্পলারদের গ্রেফতার করা হয়। বহু নাইটকে সেখানেই হত্যা করা হয়। গ্র্যান্ড মাস্টার জ্যাকস মুলায়ে-কে খুঁটির সাথে বেঁধে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। জনসাধারণের সামনে নাইট টেম্পলারদেরকে এতবেশি নির্দয়ভাবে পিটানো হয় যে, জনমনে নাইটদের প্রতি যে ভাবমূর্তি ছিল, তা ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। ইউরোপে যে নাইট টেম্পলারদের অপরাজেয় মনে করা হতো, তাদের বিলুপ্তি ঘটল।

নাইট টেম্পলারদের অগাধ ধনরাশি কাদের ভাগ্যে জুটেছিল? কারো ভাগ্যেই জোটেনি। এমনো হতে পারে, তাদের সম্পর্কে অসংখ্য জনশ্রুতির মতো তাদের ধনসম্পদ নিয়েও অতিরঞ্জন করা হয়েছিল। আরেকটা প্রশ্নও উঠতে পারে, নাইট টেম্পলারদের গোপন সংঘও ১৩০৭ সালে ভেঙে গিয়েছিল? এর উত্তর একই সাথে হ্যাঁ ও না। হ্যাঁ এজন্য যে, তাদের গোপন সংগঠন ও শক্তি সত্যি সত্যি বিলুপ্ত হয়েছিল। না এজন্য যে, নাইট টেম্পলারদের ব্যবহৃত সংকেত ও টেম্পল আর্ট আজও চর্চিত হয়ে আসছে। সমস্ত নাইট টেম্পলারও খতম হয়নি। ফ্রান্সে আজও বহু রাস্তার নাম 'টেম্পলার স্ট্রিট'। স্কটল্যান্ডে টেম্পলারদের কবরও বিদ্যমান আছে। সেসব কবরের ওপর টেম্পলারদের সংকেত উৎকীর্ণ আছে। ফ্রান্সে যখন নাইট টেম্পলাদের ওপর ধ্বংসযজ্ঞ চলছিল, স্কটল্যান্ডের কবরগুলো সে সময়কার। তার মানে বহু নাইট টেম্পলার জান বাঁচিয়ে স্কটল্যান্ডসহ অন্যান্য দেশে সরে আসতে পেরেছিল। তারা নিশ্চয়ই একা আসেনি। সাথে তাদের গোপন জ্ঞান ও সঞ্চিত সম্পদও নিয়ে এসেছিল। পরবর্তী তিন শতক নাইট টেম্পলারদের কোনো চিহ্ন ইউরোপে দেখা যায়নি। তারপর স্কটল্যান্ডে একটি ঘটনা ঘটল। তারপর থেকে নতুন আরেকটি ভ্রাতৃত্ব জন্ম নিয়েছিল। আবার গ্র্যান্ডমাস্টার ও গোপন সাংকেতিক বিষয়াদির চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছিল।

ঘটনা অনেকটা এমন ছিল, বারো শতকে স্কটল্যান্ডে শক্তিমান স্টুয়ার্ট রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই রাজবংশের রাজা প্রথম ডেভিড নিজের গুরুত্ব ও সম্মান বৃদ্ধির জন্য একটা ঘটনা চাউর করালো। চার্চের চেয়ে নিজেকে শক্তিমান প্রমাণের জন্যই রাজা এই ছাতুরির আশ্রয় নিয়েছিল। রাজা

বলেছিল, এবারডিনের ঘন জঙ্গলে শিকার করতে গিয়ে সঙ্গীদের থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। পথ হারিয়ে ঘোড়সওয়ার হয়ে চলতে লাগল। কিছুদূর যাওয়ার পর সামনে বিরাট এক প্রাণীর দেখা মিলল। বিশাল ছাগলসদৃশ প্রাণীটি ঢুস মেরে রাজাকে ঘোড়ার পিঠ থেকে ফেলে দিলো। বিরাটাকায় শিংবিশিষ্ট ছাগলটি রাজাকে গুঁতো মারার জন্য এগিয়ে এলো। রাজা শিং ধরে ফেলল এবং যিশুর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল। তখন অলৌকিকভাবে রাজা ও ছাগলের শিংয়ের মাঝামাঝিতে একটি ক্রুশ আবির্ভূত হলো। ক্রুশটা রাজার হাতে ধরা দিলো। ক্রুশ আবির্ভাবের পর রামছাগলটি পালিয়ে যেতে বাধ্য হলো।

রাজা দরবারে ফিরে এই বানোয়াট গল্পটি শোনালো। দরবার তো বটেই, পুরো দেশ এই গল্পে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। প্রমাণস্বরূপ সেই কাঠের ক্রুশও রাজা প্রদর্শন করল। রাজা এবার নিজের খাহেশ জাহির করল। ঘটনাস্থলে পবিত্র চার্চ (এ্যাবে অব হলিরোল) নির্মাণ করতে হবে। স্কটিশ ভাষায় হলিরোল মানে হলি ক্রস। পরিকল্পনা মতো শানদার গির্জা নির্মিত হলো। চার্চের বাইরে ছাগলের শিংয়ের ওপর ক্রুশযুক্ত চিত্র এঁকে দেওয়া হলো। এই কল্পিত ঘটনার মাধ্যমে কিং ডেভিড প্রজাদের মধ্যে একটা বিশ্বাস ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিল যে, স্টুয়ার্ট রাজবংশের ওপর খোদার মদদ ও যিশুর সমর্থন আছে। এই নতুন চার্চের মাধ্যমে রাজার অভাবনীয় উপকার হলো। প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত ক্যাথলিক চার্চের বিপরীতে রাজানির্মিত চার্চ বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। রাজার চার্চে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীদের আশ্রয় দেওয়া হলো। প্রাচীন ক্যাথলিক চার্চের নানা ফতোয়া-ফরমানের মোকাবেলায় রাজাপালিত সন্ন্যাসীরাও পাল্টা ফতোয়া-ফরমান জারি করত। রাজা সফলভাবে ধর্মকে ধর্মের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পেরেছিল। তার রাজত্ব ও ব্যক্তিত্ব ধর্মবিরোধিতার অপবাদ থেকে কৌশলে বেঁচে যেত।

স্কটল্যান্ডের প্রাচীন চার্চের যাজকরা রাজার এহেন চতুর ব্যবস্থায় খুশি হতে পারেনি। নতুন বিকল্প ব্যবস্থায় পুরোনো চার্চের কায়েমি স্বার্থ ভঙ্গুর হয়ে পড়ল। আগে তারা রাজার চেয়েও শক্তিমান ছিল, এখন তারা রাজার চেয়ে দুর্বল হয়ে পড়ল। ক্যাথলিক চার্চের যাজকরা আরেক দিক থেকেও পিছিয়ে পড়েছিল যে, তাদের পুরোনো চার্চ রাজার বানানো হলি রোল এ্যাবের মতো শানদার ও জাঁকজমকপূর্ণ ছিল না। রাজকীয় চার্চের ঠাঁটবাট দেখে সাধারণ লোকজন এমনিতেই কাত। চার্চে এসে যে কেউ মুগ্ধবিস্মিত হয়ে পড়ত। ক্যাথলিক চার্চ

ছেড়ে প্রজারা দলে দলে রাজার চার্চে ধরনা দিতে আরম্ভ করে। পুরোনো চার্চের যাজকরা বসে বসে মাছি মারা ছাড়া আর কোনো কাজ থাকল না।

পুরোনো চার্চের যাজকরা বসে বসে বেশিদিন আঙুল চুষল না। তারা ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। গোপনে রাজার সিংহাসন উল্টে দেওয়ার পাঁয়তারা কষতে শুরু করল। এই দলের নেতা ছিল সেইন্ট উইলিয়াম ক্লিয়ার। গোপন ষড়যন্ত্রে সেইন্টের সাথে ইংল্যান্ডের রাজা এডওয়ার্ডও শরিক ছিল। পরিকল্পনা ছিল, স্কটল্যান্ডকে দুই টুকরা করে একাংশ ইংল্যান্ডের সাথে জুড়ে দেওয়া হবে এবং অপরাংশ সেইন্ট উইলিয়াম শাসন করবে। রাজার তখতেতাজ ওল্টানোর ষড়যন্ত্রের সাথে সাথে এবারডিনের অদূরে সাগরতীরে একটি বিকল্প চার্চ নির্মাণের পরিকল্পনাও ছিল। সেই চার্চের নামও নির্ধারণ করা হয়েছিল, রোজলিন চ্যাপেল। এই চ্যাপেল হুবহু হাইকালে সুলাইমানির নকশায় নির্মাণ করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

রোজনিল চ্যাপেল নির্মাণের মাধ্যমে সেইন্ট উইলিয়াম জনসাধারণের কাছে রাজার চেয়েও বেশি গ্রহণযোগ্যতা লাভের খাহেশ পুষেছিল। ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে দলপাকানোর কাজ শুরু হলো। এই কাজে দক্ষ ও শিক্ষিত লোকজনের প্রয়োজন ছিল। চ্যাপেল নির্মাণের জন্য ইতিহাস, রাজনীতি ও গোপন সংকেত সম্পর্কে গভীর জ্ঞানধারী ব্যক্তির দরকার ছিল। বিশেষ করে পাথর খোদাই করে প্রাসাদ নির্মাণের অভিজ্ঞতা থাকা অপরিহার্য ছিল। যে কাউকে দলে নেওয়ার সুযোগ ছিল না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর উপযুক্ত লোক পাওয়া গেল। এই লোকের চার্চ ও ধর্মীয় ভবননির্মাণে সীমাহীন দক্ষতা ছিল। লোকটা ছিল লেখাপড়া জানা। নির্মাণ প্রকৌশল ও প্রাচীন গোপন সংকেতজ্ঞান সম্পর্কেও তার ব্যাপক জানাশোনা ছিল। তার নাম ছিল স্যার গিলবার্ট হে। গিলবার্ট দায়িত্ব পেয়েই দূরদূরান্ত ও বিভিন্ন দ্বীপ থেকে পাথুরে শিল্পীদের বড় একটি দলকে একাট্টা করতে সক্ষম হলো। জমায়েত লোকদের প্রশিক্ষণ শুরু হলো। নাইট টেম্পলারদের উত্থানের সময় প্রাচীন ফরাসি ভাষায় পাথর খোদাইকারীদের স্টোনম্যাসন বা শুধু ম্যাসন বলা হতো। গিলবার্ট হের জমা করা লোকজনকেও ম্যাসন নামে ডাকা শুরু হলো। এই লোকেরা যেহেতু সবাই মুক্ত স্বাধীন ছিল; দাস ছিল না, এজন্য তাদেরকে ফ্রি-ম্যাসন বলা হতো। এদের ভ্রাতৃত্ব ও আদর্শকে ফ্রি-ম্যাসনারি বলা হতো। তারা থাকার জন্য ছোট ছোট কুঠরি (লজ) বানাতো। তাদের গোপন বৈঠক-

সভাও এসব লজে আয়োজিত হতো। নাইট টেম্পলারদের মতো ম্যাসনদের প্রধানকেও গ্র্যান্ডমাস্টার বলার প্রচলন শুরু হলো। পনেরো শতকের মাঝামাঝিতে রোজলিন চ্যাপেলের নির্মাণ শুরু হয়। নির্মাণকাজ চালানোর পাশাপাশি গিলবার্ট অধীনস্থ ম্যাসনদের নানামুখী প্রশিক্ষণও জারি রাখল। গিলবার্ট বলল, দুনিয়াতে দুই ধরনের জিনিস রয়েছে :

১. বস্তু।

২. প্রক্রিয়া বা প্রসেস।

বস্তু যেমন পাথর; যা কখনো বদলায় না। হ্যাঁ, প্রসেস বা প্রক্রিয়া সময়ের সাথে সাথে বদলাতে থাকে। পাথর যুগকাল পেরিয়েও সেই পাথরই থাকে। তবে পাথর ভাঙার প্রক্রিয়া বদলায়। যদি বস্তুর ওপর সঠিক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা যায়, তাহলে বস্তুও বদলে যায়। নিজের বক্তব্যকে বোঝানোর জন্য গ্র্যান্ডমাস্টাররা টেম্পল অব সলোমনকে ব্যবহার করত। নাইট টেম্পলাররাও তাই করত। টেম্পলে ব্যবহৃত পাথরগুলোর কীই-বা মূল্য ছিল? সেগুলোকে দিনের পর দিন সঠিক পদ্ধতিতে কেটে নিখুঁত কৌশলে গেঁথে চোখ ধাঁধানো উপাসনালয় বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষ বা একজন ম্যাসনও পাথরের মতো। তাকেও যদি ধারাবাহিকভাবে প্রসেস করা যায়, তাহলে সেও টেম্পল অব সলোমনের মতো এক শক্তিমান প্রভাবশালী ধর্মালয়ে পরিণত হতে পারে। প্রশিক্ষণ ও পরিশীলনের মাধ্যমে ম্যাসনরা সাধারণ মানুষের চেয়ে বহুগুণ বেশি যোগ্যতাসম্পন্ন হয়ে উঠবে। গিলবার্ট হে প্রতিটি ম্যাসনকে সবার আগে এই দর্শন শেখাত। ম্যাসনদের প্রশিক্ষণের সময় বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করা হতো :

ক. আমাকে বললে আমি ভুলে যাব।

খ. আমাকে দেখালে আমি মনে রাখব।

গ. আমাকে জড়িত করো, তাহলে আমি বুঝতে পারব।

ম্যাসনদেরকে কাজে জড়িত করে হাতে-কলমে শেখানো হতো। শেখানোর সময় এমন সংকেত, মাধ্যম ও উপকরণ ব্যবহৃত হতো, হাইকালে সুলাইমানির সাথে যার সরাসরি সম্পর্ক আছে; নির্মাণকাজের সাথে যার যোগসূত্র আছে। যেমন হাতুড়ি ও কম্পাস ছিল ম্যাসনদের প্রথমদিককার সিম্বল-প্রতীক।

তারা বলত, আমরা পাথর ও ফল দেখিয়ে বোঝাতে পারি, পাথর কেমন আর

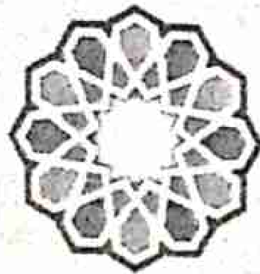
সত্য কেমন। যদি কাউকে বোঝাতে হয়, রাজা কেমন? সত্য কেমন? তখন তাকে গল্প শোনাতে হয়; কোনো বস্তু দেখিয়ে এটা বলা বা বোঝানো সম্ভবপর নয় যে, রাজা বা সত্য কেমন। এসব গল্প ম্যাসনরা বিশেষ কিছু সংকেত-প্রতীকের মাধ্যমে বোঝাত। সাধারণ মানুষের পক্ষে যা বোঝা সম্ভব ছিল না। ম্যাসনরা এসব আলামত বা সংকেত হাইকালে সুলাইমানি থেকে সংগ্রহ করেছিল। ফ্রি-ম্যাসনদের গোপন বৈঠকে গল্পের জন্য নির্বাচিত সিম্বল বা প্রতীকগুলো একটা কলামে এঁকে সবার সামনে বিছিয়ে রাখা হতো। এসব সিম্বলকে ম্যাসনরা সবসময় চোখের সামনে রাখত, চর্চায় রাখত। এই সিম্বলগুলো ম্যাসনদের কাছে ধর্মীয় প্রতীকের মতো পবিত্র বিবেচিত হতো। এগুলোর প্রতি তাদের অন্ধবিশ্বাস ছিল। ম্যাসনদের মতে, কোনো কিছু শেখানোর জন্য এটাই সবচেয়ে সেরা পদ্ধতি। শেখার বিষয়টাকে এমন জায়গায় রেখে দেওয়া, যাতে চলতে ফিরতে তা চোখে পড়ে।

সেইন্ট উইলিয়ামের বিদ্রোহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। স্টুয়ার্ট রাজবংশ পরবর্তী ২০০ বছর ধরে স্কটল্যান্ড শাসন করেছিল। রোজলিন চ্যাপেলের কাজ ৩০ বছর ধরে চলেছিল। বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার পর চ্যাপেল নির্মাণকাজ বন্ধ করে ফ্রি-ম্যাসনদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। ফ্রি-ম্যাসনরা স্কটল্যান্ড ত্যাগ না করে ত্রিশ বছরে অর্জিত যোগ্যতার আলোকে কাজকর্ম করে জীবিকা চালিয়ে যেতে থাকল। ভবন নির্মাণ কাজে ম্যাসনরাই সবচেয়ে যোগ্য ও দক্ষ জনগোষ্ঠী ছিল সেই অঞ্চলে। কিছুদিন পর ফ্রি-ম্যাসনরা তাদের গ্র্যান্ডমাস্টার ডেভিড মেঞ্জেস ও ম্যাথিউ রবার্টের নেতৃত্বে এবারডিনে একটি নতুন ফ্রি-ম্যাসন লজ নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিল। এটা ছিল ১৪৪০ বা ১৪৬০ সালের মাঝামাঝি সময়ের ঘটনা। ফ্রি-ম্যাসনদের শুরুর দিককার তথ্য-উপাত্ত 'ব্যুরো কাউন্সিল অব এবারডিন'-এ সংরক্ষিত আছে। প্রথম দিকে যারা পাথর খোদাই করে কাজ করতে পারত, তারাই শুধু ফ্রি-ম্যাসনে যোগ দিতে পারত। পরবর্তীতে সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিদেরকেও ফ্রি-ম্যাসনে যোগ দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হতে লাগল। ভবন নির্মাণের সাথে সম্পর্ক না থাকলেও সমস্যা ছিল না। ফ্রি-ম্যাসন হওয়ার জন্য দরখাস্ত লিখতে হতো। গৃহীত হলে অন্য পেশার লোকজন ফ্রি-ম্যাসন দলে সবচেয়ে নিচের স্তরের সদস্য হতে পারত। পরে যোগ্যতাবলে ধীরে ধীরে উপরের দিকে পদোন্নতি হতো। ভর্তি হওয়ার আলামত হিসেবে নতুন সদস্যদেরকে কম্পাস ও হাতুড়ি দেওয়া হতো।

এই ছিল ফ্রি-ম্যাসন সম্পর্কিত প্রাথমিক আলোচনা। একটা বিষয়কে অকাট্যভাবে প্রমাণের যেমন ঐতিহাসিক তথ্য-উপাত্ত দরকার, নাইট টেম্পলারদের অস্তিত্ব অকাট্যভাবে প্রমাণের জন্য এমন তথ্য-উপাত্ত নেই। তবে ফ্রি-ম্যাসন সম্পর্কিত নানা কাহিনি বেশ জনপ্রিয়। তাদের সম্পর্কে যেসব তথ্য পাওয়া যায়, তাতে অসংখ্য 'যদি-কিন্তু' আছে। রোজলিন চ্যাপেলের অস্তিত্ব আজও বিদ্যমান আছে। এটি বর্তমানে ব্যক্তিগত সম্পত্তি। সম্পত্তির মালিক এই চ্যাপেল সম্পর্কিত যাবতীয় ঘটনাকে বানোয়াট আখ্যা দিয়েছে। ফ্রি-ম্যাসনরা টেম্পলারদের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক আছে বলে স্বীকার করে না। নাইট টেম্পলার ও ফ্রি-ম্যাসনদের অনেক কাজকর্মে মিল থাকলেও দুটি দলের যোগসূত্র থাকার বাস্তবসম্মত কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। দুটি দলের মধ্যে শত-শত বছরের ব্যবধানও আছে। বলা হয়ে থাকে, নাইট টেম্পলাররা নিষিদ্ধ হওয়ার পরও গোপনে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে ফ্রি-ম্যাসনরা কখনো গোপন সংগঠন ছিল না। লন্ডনে তাদের গ্র্যান্ড ইউনাইটেড লজ আজও বিদ্যমান আছে। সেই ভবনে ১৭১৭ সালে প্রতিষ্ঠার তারিখও উৎকীর্ণ আছে। ১৭১৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত তাদের কার্যক্রমের বিবরণীও সংরক্ষিত আছে। শুধু লন্ডনেই ফ্রি-ম্যাসনদের ছোট-বড় সব মিলিয়ে এক হাজারেরও বেশি লজ আছে। পৃথিবীর বড় বড় শহরেও এ ধরনের লজ পাওয়া যায়। উপমহাদেশের লাহোরে ফ্রি-ম্যাসন লজ ছিল। বিশ বছর আগেও লজটির অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। বিখ্যাত লেখক রুডইয়ার্ড কিপলিং এই লজ প্রতিষ্ঠা করেছিল। লাহোরে আরো কয়েকটি ম্যাসনিক লজ ছিল। পাকিস্তান ভেঙে যাওয়ার এক বছর পর ১৯৭২ সালে আমেরিকা-ইউরোপ থেকে সাহায্য না আসার কারণে পাকিস্তান জুড়ে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল। সমস্ত বিদেশি এনজিও, সংগঠনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল। তখন ফ্রি-ম্যাসন লজও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ঢাকাতেও পুরানা পল্টনে ম্যাসনিক লজ ছিল। বর্তমানে সেই ভবনটি ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রধান হিসাব রক্ষকের কার্যালয় হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ফ্রি-ম্যাসন গোপন সংগঠন নয়, তবে তাদের কাজকর্মে কিছু গোপনীয়তা আছে। বলা হয়, 'Free-masonry is not a secret organization, but an organization with secrets.' তাদের গোপনীয়তার প্রথম দিক হলো, তাদের সিম্বলের অর্থ কী, সেটা বাইরের কারো জানা নেই। দ্বিতীয় দিক,

তাদের রুদ্ধদ্বার বৈঠকে কী হয়, সেটা বাইরের কারো জানা নেই। তাদের বৈঠকে বাইরের কেউ অংশ নিতে পারে না। উপস্থিত সভ্যদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নেওয়া হয়, বৈঠকে কী হচ্ছে না হচ্ছে—এ বিষয়ে কাউকে বলা যাবে না। লন্ডনের গ্র্যান্ড ইউনাইটেড লজে বহিরাগতরা পরিদর্শনে যেতে পারে। দর্শনার্থীদের ঘুরিয়ে দেখানোর জন্য ম্যাসনরা উপস্থিত থাকে। ম্যাসনরা সবকিছু বলবে; কিন্তু তাদের রিচুয়াল বা ধর্মীয়কৃত্য কী—সেটা ভুলেও উচ্চারণ করবে না।



রথচাইল্ড পরিবার

ষোলো শতকে ইউরোপের ইহুদিদের গলায় ও বুকে বিশেষ ব্যাজ লাগাতে হতো। ইহুদিদের ঘরের বাইরেও বিশেষ চিহ্ন দেওয়া থাকত, যাতে ইহুদিদের ঘর সহজেই চেনা যায়। এহেন অপমানজনক প্রথা চালুর কারণ, ইউরোপের লোকেরা ইহুদিদেরকে নিজেদের চেয়ে নিম্নস্তরের মানুষ মনে করত। শহরে ইহুদিদের নাগরিক অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা তুলনামূলক কম হতো। ইহুদিরা যেখানে-সেখানে বাস করতে পারত না, তাদের জন্য এলাকা নির্দিষ্ট ছিল। সে এলাকাকে জিউশ ল্যান, ঘেটো বা ফাউন্ড্রি বলা হতো। জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট জাদুঘরে আজও ইহুদিবস্তির হুবহু নমুনা বানিয়ে প্রদর্শনীতে রাখা হয়েছে। ইহুদি বস্তির চারপাশে দেয়াল তুলে রাখা হতো। রাতের বেলা ইহুদিরা নিজেদের এলাকা থেকে বের হতে পারত না। রোববারসহ খ্রিস্টানদের অন্যান্য ধর্মীয় উৎসবের দিনগুলোতে ইহুদিরা শহরে বেরোতে পারত না। এভাবে একঘরে করে রাখার পাশাপাশি ইহুদিদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত শহরজুড়ে বিদ্বেষপূর্ণ ও বিদ্রুপাত্মক কথাবার্তা প্রচার করা হতো। ফ্রাঙ্কফুর্টের দেয়ালে দেয়ালে ইহুদিদের বিরুদ্ধে চিকা মারা হতো, পোস্টার সাঁটা হতো। ইহুদিদের সম্পর্কে প্রপাগান্ডা চালানো হতো : ইহুদিরা শূকরের পূজা করে, ধর্মীয় কৃত্যের জন্য শিশুদের রক্ত ব্যবহার করে। বাস্তবে এমনকিছু ইহুদিরা করত না। তারপরও প্রচারণা থেমে থাকত না। শহরে কোনো সমস্যা বা সংকট সৃষ্টি হলে, তার দায় ইহুদিদের ওপর চাপানো হতো। ইহুদিবস্তির ওপর হামলা করা, বস্তিতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল।

ষোলো শতকের মাঝামাঝি ১৫৬০ সালের আশেপাশে, ফ্রাঙ্কফুর্টের এমনই এক বস্তিতে একটি ইহুদি পরিবার বাস করত। রীতি অনুযায়ী এই পরিবারের ঘরবাড়ির বাইরে লাল রঙের একটি ঢাল (শিল্ড) ঝোলানো থাকত। একই ধরনের ঢালব্যাজ গলায়ও ঝোলাতে হতো। এই ব্যাজকে স্থানীয় ভাষায় 'রটশিল্ড' ইংরেজিতে রেডশিল্ড (RED SHIELD) বলা হতো। এই শব্দই কালক্রমে রথচাইল্ড (ROTH CHILD) হয়ে গেছে। বলা হয়ে থাকে,

রথচাইল্ড পরিবার নিজেরাই এই নাম বেছে নিয়েছিল। অন্যদের থেকে নিজেদের আলাদা করার জন্য। ইউরোপে আরো কিছু ইহুদি পরিবারের ঘরের বাইরেও লাল ঢাল ঝোলানো হতো। তাদেরকেও রথচাইল্ড বলা হতো। তবে ফ্রাঙ্কফুর্টের রথচাইল্ড পরিবারই ইতিহাসে বেশি সুখ্যাতি বা কুখ্যাতির অধিকারী হয়েছে। এই পরিবারের সাথেই নানা গুজবকাহিনি যুক্ত করা হয়েছে। বিশ্বের নানা অঘটন-দুর্ঘটনের নেপথ্য কারিগর ও কুশীলব হিসেবেও এই পরিবারকে দায়ী করা হয়ে থাকে।

ফ্রাঙ্কফুর্টের রথচাইল্ড পরিবারের নামে বহু রসালো ও চাঞ্চল্যকর কাহিনি প্রসিদ্ধ আছে। এসবের কিছু সত্য কিছু নিছক কল্পনা। কয়েকটি কাহিনি আলোচনা করা যেতে পারে :

১. রথচাইল্ড পরিবারের কাছে বিপুল সম্পদ এসেছে কোথা থেকে? এই সম্পদের জোর ও জেরেই তারা পুরো দুনিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে আসছে বা করার চেষ্টা করে আসছে।

২. ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সত্যিই কি রথচাইল্ড পরিবারের হাত ছিল?

৩. পৃথিবীতে হঠাৎ হঠাৎ যে তুফান, ঘুর্ণিঝড়, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ভূমিকম্প হয়, এসবের পেছনে রথচাইল্ড পরিবার জড়িত থাকার কথা কেন বলা হয়?

৪. বর্তমানে দুনিয়ার অর্থনীতিতে রথচাইল্ড পরিবারের অবস্থান কোথায়? আজও কি তারা দুনিয়াকে আড়াল থেকে নিয়ন্ত্রণ করছে?

পাঁচ শ বছর আগে ফ্রাঙ্কফুর্টে বাস করা রথচাইল্ড পরিবারের আর্থিক অবস্থা ছিল শোচনীয়। অবর্ণনীয় দারিদ্র্যের মধ্য দিয়েই তারা কোনোরকমে বেঁচেবর্তে ছিল। মুরগির খোঁয়াড়ের মতো অতি ক্ষুদ্রাকার বাসাবাড়িতে তারা গাদাগাদি করে থাকত। একেকটি ঝুপড়িতে, একেকটি সংকীর্ণ ফ্ল্যাটে ৩০ জনেরও বেশি মানুষ বাস করতে বাধ্য হতো। নতুন ঘর বানানোর অনুমতিও ছিল না, টাকাপয়সাও থাকত না। রথচাইল্ড পরিবারকে এমন মানবেতর জীবন এক-দুই বছর নয়; ২০০ বছর থাকতে হয়েছিল।

১৭১২ সালে বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কার হলো। টেক্সটাইল মিল নির্মিত হলে বস্ত্রনির্মাণশিল্পে রাতারাতি বৈপ্লবিক পরিবর্তন এলো। স্টিম ইঞ্জিন ও টেক্সটাইল মিল গোটা পৃথিবীকে শিল্পবিপ্লব (ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল রেভুলেশন) উপহার দিলো। যেসব পণ্য নির্মাণ করতে আগে মাসের পর মাস লেগে যেত, সেগুলো

গন্তব্যে পৌঁছাতে সপ্তাহের পর সপ্তাহ লেগে যেত, এখন দিনেই হাজার হাজার পোশাক তৈরি হয়ে অতি দ্রুত জায়গামতো সরবরাহ হয়ে যেতে শুরু করল। আমেরিকা থেকে ইউরোপে, ইউরোপ থেকে বিশ্বের নানাপ্রান্তে ইঞ্জিনচালিত পণ্যবাহী জাহাজ অনবরত আসা-যাওয়া করতে শুরু করল। ইউরোপের বাজারগুলো টেক্সটাইল প্রডাক্টস, সিল্ক, কার্পেট, যন্ত্রপাতি, কয়লা ও চায়ের মতো বহুল ব্যবহৃত পণ্যসামগ্রীতে জমজমাট হয়ে উঠল। দেশে দেশে আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে রীতিমতো বিস্ফোরণ ঘটল।

ইহুদিরা অনেক আগে থেকেই মুদ্রাবিনিময় ব্যবসার সাথে জড়িত ছিল। আমদানি-রপ্তানি বেড়ে যাওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনও পাল্লা দিয়ে সমানতালে বেড়ে গিয়েছিল। গোটা দুনিয়া থেকে ইউরোপে আগত ব্যবসায়ীদের স্থানীয় মুদ্রার প্রয়োজন পড়ত। ফ্রাঙ্কফুর্টে থাকা রথচাইল্ড পরিবার ক্ষুদ্র পরিসরে মানি এক্সচেঞ্জের ব্যবসা করত। ১৭৬০ সালের মাঝামাঝিতে রথচাইল্ড পরিবারের এক চৌকস তরুণ পারিবারিক ব্যবসার খোলনলচেই বদলে দিলো। তার নাম 'মায়ের আমশেল রথচাইল্ড'। আমশেলের বাবা মোজেস রথচাইল্ডও মুদ্রা ব্যবসায়ী ছিল। পাশাপাশি রেশমি কাপড়ের ব্যবসাও করত। মানি এক্সচেঞ্জার পিতার ইচ্ছা ছিল ছেলেকে ইহুদি রাব্বি বানাবে। আমশেল ১২ বছরে পা দিতেই বাবা মোজেস মারা গেল। মোজেসের মৃত্যু আমশেল ও তার খান্দানের জন্য বাঁক সৃষ্টি করল। পরিবারের এখন ইহুদি রাব্বি নয়, একজন উপার্জনকারী ব্যক্তির তীব্র প্রয়োজন ছিল। পরিবারের বড়রা পরামর্শ করে আমশেলকে জার্মানির আরেক শহর হ্যানোভারে পাঠিয়ে দিলো। আমশেল সেখানে গিয়ে সাইমন উলফ ওপেনহাইমারের ব্যাংকিং ফার্মে শিক্ষানবিশ হিসেবে যোগ দিলো। ওপেনহাইমার পরিবারের সাথে রথচাইল্ড পরিবারের দীর্ঘদিন থেকে ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল। সে সূত্রেই আমশেল সহজে কাজ শেখার সুযোগ পেয়েছে। পরবর্তী আট বছর আমশেল এখানে চাকরি করেছে। আনুমানিক ১৭৬৩ সালের দিকে আমশেল ফ্রাঙ্কফুর্টে ফিরে এলো।

আমশেল মানি এক্সচেঞ্জ ও এন্টিক দ্রব্য বেচাকেনা শুরু করল। ১৮০০ শতকের দিকে জার্মানি আজকের মতো একক দেশ ছিল না। কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। বর্তমানের নুরেমবার্গ, হামবুর্গ, বারলিন, ফ্রাঙ্কফুর্ট আলাদা আলাদা রাজ্য ছিল। ফ্রাঙ্কফুর্ট সবচেয়ে বড় রাজ্য ছিল। এখানকার শাসক সম্রাটের মতো দাপটে রাজ্যশাসন করত। সবকিছু রাজার মর্জিতেই

চলত। রাজা সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকতেন। সুযোগসন্ধানীরা রাজার নেকনজর লাভের জন্য দিনরাত উপায় খুঁজে বেড়াত। একবার রাজার প্রিয়পাত্র হতে পারলে আর পেছন ফিরে তাকাতে হতো না। ব্যবসা-বাণিজ্য, সরকারি দয়া-দাক্ষিণ্য পেয়ে দিব্যি খোশহালে জীবন কাটিয়ে দেওয়া যেত। রাজার সাথে সম্পর্ক থাকলে আশেপাশের লোকজনও সমঝে চলত। ফ্রাঙ্কফুর্টের রাজা প্রথম উইলিয়ামের সাথে সম্পর্ক করার জন্য আমশেল দৌড়ঝাঁপ শুরু করে দিলো। রাজার ছিল দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য বস্তু সংগ্রহের নেশা। আমশেল কিছু বহুমূল্য প্রাচীন মুদ্রা ও এন্টিক উপহার দিলো। রাজা বেজায় খোশ হলো। এরপর থেকে আমশেলের মাধ্যমেই রাজা দুষ্প্রাপ্য বস্তু সংগ্রহ করতে শুরু করল। রাজার সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরি হলো। আমশেলের কারবার ফুলেফেঁপে উঠতে শুরু করল। বিপুল মুনাফা ঘরে আসতে লাগল। আমশেলের দিন ঘুরে গেল।

আমশেলের ব্যবসায়িক কৌশল, আমানতদারিতা দ্বারা রাজা ভীষণ প্রভাবিত হলো। ১৭৬৯ সালে রাজার পক্ষ থেকে আমশেলকে দরবারি ইহুদি (কোর্টজিউ)-এর মর্যাদা দেওয়া হলো। সেকালে রাজা যেসব ইহুদি থেকে ঋণ নিত, তাদেরকে কোর্টজিউ বা জিউফ্যাক্টর বলা হতো। আমশেলও এই দলভুক্ত হয়ে গেল। রাজা তার কাছ থেকে সুদের ওপর করজ নিত। আমশেলের জন্য ব্যবসায়িক সুযোগ-সুবিধাও বাড়িয়ে দেওয়া হলো। ১৭৯০ সাল নাগাদ মাত্র ৩০ বছরে রথচাইল্ড পরিবার সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলতে সক্ষম হলো। ক্ষমতার পালাবদলে ফ্রাঙ্কফুর্টের রাজা প্রথম উইলিয়াম ভাগ্য বিড়ম্বনার শিকার হলো। ১৮০৬ সালে ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টের বাহিনী ফ্রাঙ্কফুর্টের ওপর হামলা করল। কারণ ফ্রাঙ্কফুর্ট ছিল ফ্রান্সের দুশমন ব্রিটেনের মিত্র। কথিত আছে, ফরাসি বাহিনী ফ্রাঙ্কফুর্ট কবজা করার আগেই রাজা উইলিয়াম রাজকোষের সমস্ত সম্পদ রথচাইল্ড পরিবারের হেফাজতে পাঠিয়ে দিয়েছিল। ফরাসি ফৌজের মোকাবেলা করা স্থানীয় রাজার পক্ষে অসম্ভব ছিল। রাজা নিরাপদ জায়গায় সরে পড়ল।

১৮১৩ সালের অক্টোবর মাস, ব্যাটল অফ হানাউ-র পর ফ্রাঙ্কফুর্ট ফ্রান্সের দখলে চলে গেল। ফরাসি সেনারা প্রায় বিনা বাধায় শহরে প্রবেশ করল। রাজা উইলিয়ামের ধনভান্ডারের খ্যাতি দেশের সীমানা ছাড়িয়ে ফ্রান্সেও পৌঁছে গিয়েছিল। ফরাসিরা শহরে ঢুকে প্রথমেই রাজকোষ হাতানোর দিকে মনোযোগ দিলো। রাজপ্রাসাদ তন্নতন্ন করে খুঁজেও কানাকড়ি সম্পদের দেখা

মিলল না। মিলবে কীভাবে, রাজার ধনভান্ডার তো রথচাইল্ড পরিবারের বাগানে মাটির নিচে পুঁতে রাখা আছে। সময় অনেক দূর গড়িয়ে গেল। দেখতে দেখতে ১৮১৫ সাল এসে গেল। ওয়াটার লু যুদ্ধে নেপোলিয়ন পরাজিত হলো। ব্রিটেনের নেতৃত্বাধীন মিত্রবাহিনী নেপোলিয়নকে গ্রেফতার করে সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত করল। ফ্রাঙ্কফুর্ট ফরাসি দখলমুক্ত হলো। রাজা প্রথম উইলিয়াম আবার সিংহাসনে বসল। ততদিনে আমশেল মারা গিয়েছিল। তার সন্তানেরা বাগান খুঁড়ে সমস্ত ধনরত্ন রাজাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। রাজা ভীষণ খুশি হলো। রাজা প্রস্তাব দিলো, তোমরা আমার সম্পদ আরো ২০ বছর নিজেদের কাছে রেখে ব্যবসা করো। আমাকে শুধু ২% সুদ দিলেই হবে। এত কম সুদে এত বেশি সম্পদ হাতে পেয়ে রথচাইল্ড পরিবার বর্তে গেল। রথচাইল্ড পরিবার রাজার সম্পদ ব্যবসায় খাটিয়ে মুনাফার পাহাড় জমিয়ে তুলল।

এ কথা প্রসিদ্ধ আছে, ফ্রাঙ্কফুর্টের রাজা ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ব্রিটেনকে ভাড়াটে সেনা সরবরাহ করত। এজন্যই মূলত নেপোলিয়ন ফ্রাঙ্কফুর্ট আক্রমণ করেছিল। ভাড়াটে সেনা সরবরাহের বিনিময়ে ফ্রাঙ্কফুর্ট ব্রিটেনের কাছ থেকে বিপুল অর্থকড়ি পেত। এই লেনদেনও রথচাইল্ড পরিবারের মাধ্যমে সম্পন্ন হতো। এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ব্রিটেনের সাথেও রথচাইল্ড পরিবারের সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আমশেল ১৮১২ সালে মৃত্যুবরণ করেছিল। তার জন্ম হয়েছিল ১৭৪৪ সালে। আমশেল মৃত্যুর আগে নিজের পাঁচ সন্তানকে ইউরোপের বড় পাঁচটি বাণিজ্যিক শহরে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে গিয়েছিল। শহরগুলো যথাক্রমে ফ্রাঙ্কফুর্ট, লন্ডন, প্যারিস, অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা ও ইতালির রাজধানী নেপলস। প্রত্যেকেই নিজ নিজ শহরে পারিবারিক ব্যাংকব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল। স্থানীয় সরকারকে মোটা অঙ্কের ঋণ দিয়েছে। সব ভাই সুদি কারবার করে বিপুল অর্থকড়ি কামাতে সক্ষম হয়েছিল। লন্ডনে থাকা ভাই রাজার পক্ষ থেকে লর্ড উপাধি পেয়েছিল।

রথচাইল্ড পরিবার অর্থবিত্তের পাশাপাশি ইউরোপে প্রচুর শত্রুও কামিয়েছিল। ইহুদিবিরোধী মহল রথচাইল্ড পরিবার সম্পর্কে নানা গুজব, চমকপ্রদ গল্প ও ষড়যন্ত্রতত্ত্ব ছড়াতে শুরু করেছিল। কট্টর ইহুদিবিরোধী ফরাসি সাংবাদিক ম্যাথু জর্জ ডেইরনভেইল ১৮৪৬ সালে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিল। ম্যাথু জর্জ পত্রিকায় 'শয়তান' ছদ্মনামে লিখত। পুস্তিকাটি ছিল রথচাইল্ড পরিবার সম্পর্কে। সেটাতে লিখেছিল, লন্ডনে বাস করা নাথান রথচাইল্ড ওয়াটার লু

যুদ্ধে সশরীরে উপস্থিত ছিল। ব্রিটিশ কমান্ডার ডিউক অব ওয়েলিংটনের সাথে ছিল। নাথান নিজ চোখে নেপোলিয়নের হার দেখে দ্রুত ফরাসি উপকূলে চলে গেল। সমুদ্র তখন উত্তাল ছিল। ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে ব্রিটেনে যাওয়ার মতো কিছু জলযান সেখানে ছিল। সাগরের উন্মত্ত অবস্থা দেখে কোনো নাবিক যেতে রাজি হলো না। নাথান এক নাবিককে অকল্পনীয় টাকা দিয়ে রাজি করিয়ে ফেলল। জীবন-মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়তে লড়তে ব্রিটেনে পৌছতে সক্ষম হলো। জাহাজ থেকে নেমেই ডানবামে না তাকিয়ে সোজা স্টক মার্কেটে চলে গেল। ব্রিটেনের জয়ের খবর কাউকে না জানিয়ে যতবেশি সম্ভব শেয়ার কিনে নিল। ব্রিটেন যুদ্ধাবস্থায় ছিল।

ব্রিটিশবাহিনী নেপোলিয়নের মতো দিগ্বিজয়ী বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে গিয়েছিল। দেশে অর্থনৈতিক মন্দা চলছিল। শেয়ারবাজারে চরম দুরবস্থা চলছিল। কিছুকাল পরে নেপোলিয়নের পরাজয় সংবাদ লন্ডনে পৌছল। শেয়ার মূল্য লাফিয়ে বাড়তে বাড়তে আকাশ ছোঁয়ার উপক্রম হলো। নাথান ২০ মিলিয়ন পাউন্ড লাভে শেয়ার বিক্রি করে দিলো। এক ধাক্কায় নাথানের সম্পদ বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেল। এই অর্থ রথচাইল্ড পরিবারকে ব্রিটেনের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করেছিল। রথচাইল্ড পরিবার তাদের মুনাফা দিয়ে যতবেশি সম্ভব ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের শেয়ার কিনে রাখল। ব্রিটেনের অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ রথচাইল্ড পরিবারের হাতে এসে গেল। রথচাইল্ড পরিবার সম্পর্কিত এই ঘটনাকে অনেকে গুজব বলে উড়িয়ে দিয়েছে।

আধুনিক ইতিহাসবিদদের মতে, নাথান কখনো ওয়াটার লু-তে যায়নি। হ্যাঁ, এটুকু সত্য যে, ব্রিটিশ কমান্ডার ডিউক অব ওয়েলিংটকনের জেতার সংবাদ কোনো এক মাধ্যমে নাথান অন্যদের আগেই পেয়ে গিয়েছিল। নাথান গোপন না করে ব্রিটিশ সরকারকে দ্রুত জয়ের সংবাদ পৌছে দিয়েছিল। এই সংবাদ লুকিয়ে টাকা কামানোর ধান্ধা করেনি। বানোয়াট কাহিনিটা এতবেশি আকর্ষণীয় ছিল যে, এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকাতেও স্থান পেয়েছিল। ১৯১০ সালে ১১তম সংস্করণে। পরে ক্ষমা প্রার্থনা করে ঘটনাটি বিশ্বকোষ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ ধরনের আরো অসংখ্য মুখরোচক গল্প রথচাইল্ড পরিবার ঘিরে প্রচলিত ছিল।

এই পরিবার সম্পর্কিত সব ঘটনা মুখরোচক নয়; কিছু গল্প অক্ষরে অক্ষরে সত্য। বলা হয়ে থাকে, ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পেছনে রথচাইল্ড পরিবারের

হাত আছে। এটা শতভাগ সত্যি। রথচাইল্ড পরিবার ১৮৫০ সালের পর থেকে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে প্রকাশ্য সমর্থন ও সহযোগিতা করতে শুরু করে দিয়েছিল। জায়োনিস্টদের আন্দোলনে আগাগোড়া ব্রিটেনের পরিপূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা ছিল। তখন ব্রিটেনই ছিল বিশ্বের প্রধান পরাশক্তি। রথচাইল্ড পরিবারের প্যারিস শাখার প্রধান জেমস রথচাইল্ড ১৮৬৮ সালে মৃত্যুবরণ করেছিল। বাবার পরে ছেলে আলফন্স জেমস পারিবারিক ব্যবসার হাল ধরেছিল। পাশাপাশি ইসরায়েল প্রতিষ্ঠা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। দুনিয়াজুড়ে ইহুদি সংগঠনগুলোকে মুক্তহস্তে আর্থিক সহযোগিতা করে গিয়েছিল। ফিলিস্তিনে ইহুদি বসতি স্থাপনে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা ছিল আলফন্সের ছোট ভাই এডমন্ড রথচাইল্ডের। ১৮৮২ সালে ফিলিস্তিনে রিশন লিজিয়ন নামে ইহুদি বসতি স্থাপনের পুরো খরচ এডমন্ড রথচাইল্ড দিয়েছিল। এই বসতি ছিল জাফা শহরের দক্ষিণ প্রান্তে। এডমন্ড প্রথমে ২৫ হাজার ফ্র্যাংক বরাদ্দ দিয়েছিল। এই টাকায় বসতির জন্য প্রয়োজনীয় গভীর নলকূপের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। ফিলিস্তিনে সমস্ত ইহুদি বসতির পানি সরবরাহের ব্যয় এডমন্ডের অর্থায়নে নির্বাহ করা হয়েছিল। ১৯০৯ সালে রিশন লিজিয়নের সন্নিকটে তেলআবিব শহর প্রতিষ্ঠাতেও এডমন্ড অবদান রেখেছিল। রিশিয়ন ও তেলআবিব কাছাকাছি হওয়াতে অনেকে দুটোকে একই শহর মনে করে। তেলআবিব এখন ইসরায়েলের ছায়া রাজধানী, আগে মূল রাজধানী ছিল। এখন জেরুজালেম ইসরায়েলের রাজধানী। যেসব রাষ্ট্র এখনো জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী মানে না, তাদের দূতাবাস তেলআবিবেই আছে। যেমন ব্রাজিল, তুরস্ক ইত্যাদি।

এডমন্ড রথচাইল্ড কয়েক দশক ধরে ইহুদি বসতি স্থাপনে অর্থায়ন করা জারি রেখেছিল। তেলআবিবের পূর্বে অবস্থিত পেটাহ টিকভাহ বসতি স্থাপনেও এডমন্ড প্রধান অর্থ যোগানদাতা ছিল। এটি স্থাপিত হয়েছিল ১৮৭৮ সালের নভেম্বরে। ১৯০৩ সাল নাগাদ ফিলিস্তিনে ২৮টি বসতি স্থাপনের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার এডমন্ড বহন করেছিল। এসব বস্তিতে ৫৬ লাখ পাউন্ড খরচ হয়েছিল। এজন্য ইহুদিরা এডমন্ডকে 'মহা অনুগ্রহকারী' (The Benefactor) মনে করে থাকে। তেলআবিবের একটি প্রধান সড়কসহ আরো কয়েকটি শাখাপথের নামও রথচাইল্ড পরিবারের নামে রাখা হয়েছে। তেলআবিবের বাইরে পুরো ইসরায়েল জুড়ে রথচাইল্ড পরিবারের নামবাহী স্থাপনা-সড়ক আছে। যিখরন ইয়াকুব নামক বস্তির নামকরণ করা হয়েছে এডমন্ডের পিতা

জেমস জ্যাকব রথচাইল্ডের নামে। এডমন্ডের ছেলে জেমস রথচাইল্ড (১৮৭৮-১৯৫৭)-এর অর্থায়নে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর গোটা ফিলিস্তিনে অতিরিক্ত ১ লক্ষ ২৫ হাজার একর জমি কেনা হয়েছিল। এসব জমি কেনা হয়েছিল বাণিজ্যিক ও কৃষিকাজে ব্যবহারের জন্য।

১৯০১ সালে জায়োনিস্ট আন্দোলনের নেতারা উসমানি খলিফা দ্বিতীয় আবদুল হামিদ রহ.-এর কাছে ফিলিস্তিন কেনার প্রস্তাব দিয়েছিল। বলা হয়ে থাকে, খলিফা প্রস্তাবে সম্মত হলে অর্থের যোগান রথচাইল্ড পরিবারই দিত। খলিফাকে প্রস্তাব দিতে গিয়ে ইহুদি নেতা থিয়োডর হার্জেল বলেছিল, প্রস্তাবে সম্মত হলে ঋণে জর্জরিত উসমানি খিলাফাহর সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে দিবে। শুধু তাই নয়, ইউরোপে উসমানি খলিফা ও খিলাফাহর স্বপক্ষে প্রচার-প্রপাগান্ডাও চালাবে। বিনিময়ে ইহুদিদেরকে ফিলিস্তিনে বসতি স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হোক, ফিলিস্তিনের শাসনভার তাদেরকে দিয়ে দেওয়া হোক। খলিফার কাছে দুইবার এই প্রস্তাব পেশ করা হয়েছিল। দুইবারই খলিফা ঘৃণাভরে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন, আমি এই পবিত্র ভূমির এক ইঞ্চিও বিক্রি করব না। এই ভূমির মালিক আমি নই, গোটা মুসলিম উম্মাহ এই ভূমির মালিক। আমাদের পূর্বপুরুষগণ রক্ত দিয়ে যে ভূমির মালিক হয়েছে, আমি কীভাবে কয়টা টাকার বিনিময়ে সে ভূমি বিকিয়ে দিতে পারি? আমাদের থেকে এই ভূমি নিতে হলে শক্তির জোরে নিতে হবে।

খলিফা দ্বিতীয় আবদুল হামিদ দায়িত্ব গ্রহণের আগ থেকেই উসমানি খিলাফাহ ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। দেশের ভেতরেই একদল তুর্কি তরুণ সেনা অফিসার বিদেশি মদদে খিলাফাহর বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। ১৯০৯ সালে এই বিভ্রান্ত তরুণ তুর্কিরাই খলিফাকে অপসারণ করেছিল। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ইহুদিরা ফিলিস্তিন দখলের কার্যক্রম আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল। রথচাইল্ড পরিবারের বহু সদস্য ব্রিটিশফৌজে ভর্তি হয়ে উসমানি খিলাফাহর বিরুদ্ধে লড়েছিল। ব্রিটিশ আর্মিতে ইহুদি রেজাকারদের নিয়ে গঠিত ৫টি ব্যাটালিয়ন ছিল। এদেরকে জিউশ লিজিয়ন নাম দেওয়া হয়েছিল। এই বাহিনীকে ফিলিস্তিনে মোতায়েন করা হয়েছিল। এডমন্ডের ছেলে জেমস রথচাইল্ড এই জিউশ লিজিয়নে মেজর পদে আসীন ছিল। রথচাইল্ড পরিবারের আরেক সদস্য এন্থনি গুস্তাভ ব্রিটিশ বাহিনীতে থেকে তুরস্কের বিরুদ্ধে গ্যালিপল্লির যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিল। মারাত্মকভাবে আহতও হয়েছিল। ১৯১৭ সালের ১৭ নভেম্বর ব্রিটিশ রথচাইল্ড

শাখার এভেলিন রথচাইল্ড দক্ষিণ ফিলিস্তিনে উসমানি খিলাফাহর বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে মারা যায়। সেই যুদ্ধকে ব্যাটেল অব মাগার রিজ বলা হয়।

রথচাইল্ড পরিবার একদিকে যেমন ময়দানে উসমানি খিলাফাহর বিরুদ্ধে লড়ছিল, অন্যদিকে ব্রিটিশ রথচাইল্ড পরিবারের সদস্য ওয়াল্টার রথচাইল্ড ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিকভাবে চেষ্টা চালাচ্ছিল। ওয়াল্টার অত্যন্ত কট্টর জায়োনিস্ট ছিল। এই লোক বোর্ড অব ডেপুটিস অব ব্রিটিশ জিউশ সংগঠনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিল। এটা ছিল ব্রিটিশ ইহুদিদের সবচেয়ে পুরোনো ও শক্তিশালী সংগঠন। এই সংগঠনের সাহায্যে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে জোরদার প্রচারণা চালিয়ে গিয়েছিল। এই সংগঠন ব্রিটিশ সরকারেও জোরালো লবিং করে গিয়েছিল। এসব চেষ্টার ফলে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মোক্ষম ভূমিকা পালনকারী বেলফোর ঘোষণা অস্তিত্ব লাভ করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ১৯১৭ সালের নভেম্বরে যখন ব্রিটিশফৌজ বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন বেলফোর ঘোষণার ঘটনা সংগঠিত হয়েছিল। তখন তুর্কিবাহিনী নানা ফ্রন্টে ক্রমাগত পরাজিত হচ্ছিল।

১৯১৭ সালের ২ নভেম্বর ওয়াল্টার রথচাইল্ডের লন্ডনস্থ পিকাডিলির বাসভবনে একটি চিঠি এলো। চিঠির প্রেরক ছিল তৎকালীন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর্থার বেলফোর। চিঠিতে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, ফিলিস্তিনে ইহুদিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ব্রিটিশ সরকার পুরোপুরি সাহায্য করবে। এই চিঠি মূলত একটি গোপন সমঝোতা চুক্তির অংশ। এই চিঠিকেই বেলফোর ঘোষণা বলা হয়। এই সাহায্যের বিনিময়ে ব্রিটিশ সরকার ইহুদিদের কাছ থেকে কী গ্রহণ করেছিল? এর উত্তর চিঠিতে ছিল না। তবে মনে করা হয়, ব্রিটিশ সরকার বিশ্বযুদ্ধের খরচ ইউরোপিয়ান ইহুদিদের কাছ থেকে আদায় করার জন্য এসব করেছিল। ব্রিটিশবাহিনী বিশ্বযুদ্ধে জয়ী হয়েছিল। বাইতুল মুকাদ্দাস তাদের দখলে চলে গিয়েছিল। উসমানি খিলাফাহর সমাপ্তি ঘটে। পুরো ফিলিস্তিন ব্রিটিশরা কবজা করে নিয়েছিল। ততদিনে গোটা দুনিয়া থেকে বহু ইহুদি ফিলিস্তিনে এসে বসতি স্থাপন করে। স্থানীয় আরব ও সেটেলার ইহুদিদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বেধে গিয়েছিল। বেলফোর ঘোষণামতো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশরা পুরো ফিলিস্তিন খালি করে চলে এসেছিল। ১৯৪৮ সালের ১৪ মে ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েল প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বাহ্যিক সমস্ত কাজ মূলত ব্রিটিশদের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়েছিল। জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ভোটাভুটিও ব্রিটিশ সরকারের উদ্যোগে হয়েছিল।

ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরও রথচাইল্ড পরিবার আর্থিক সাহায্য পুরোদমে জারি রেখেছিল। ইসরায়েলি পার্লামেন্ট ভবন নির্মাণে জেমস রথচাইল্ড ১২ লক্ষ ২৫ হাজার পাউন্ড সাহায্য দিয়েছিল। তার স্ত্রী ডরোথি রথচাইল্ড ইসরায়েল রাষ্ট্রকে বিরাট একটি ভবন উপহার দিয়েছিল। সে ভবনে বর্তমানে ইসরায়েলের সুপ্রিম কোর্ট বসে। ফিলিস্তিনে ইহুদিবসতি স্থাপন থেকে শুরু করে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ও নবসৃষ্ট ইসরায়েল গঠনের প্রতিটি ধাপে রথচাইল্ড পরিবার ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। ইসরায়েলের জন্য রথচাইল্ড পরিবার খোলাখুলিভাবে সর্বাত্মক আর্থিক ও রাজনৈতিক সাহায্য দিয়ে গিয়েছিল। জীবন ও রক্তও ঝরিয়েছিল।

২০১৮ সালের ১৬ মার্চ, আমেরিকার ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সদস্য ট্রেয়ন ওয়াইট নিজের গাড়িতে চড়ে কোথাও যাচ্ছিল। সেদিন প্রচণ্ড তুষারপাত হচ্ছিল। ট্রেয়ন চলতে চলতে তুষারপাতের ভিডিও দৃশ্য ধারণ করল। ভিডিওতে ধারাভাষ্যও যোগ করা হয়েছিল। ট্রেয়ন বলেছিল, আজ শহরে আচানক তুষারপাত শুরু হয়ে গিয়েছে। সবার উচিত, এদিকে মনোযোগ দেওয়া। তুষারপাতের ঘটনার জন্য রথচাইল্ড পরিবার দায়ী। রথচাইল্ড পরিবারই 'আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ' করছে। আবহাওয়া নিয়ে দুরভিসন্ধি করছে। রথচাইল্ড পরিবারই এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য দায়ী। এসব করে মানুষকে বিপদে ফেলে তারা শহরের মালিক বনতে চায়। সবার সতর্ক হওয়া উচিত।

ট্রেয়ন ভিডিওটা নিজের ফেসবুক আইডিতে পোস্ট করল। মুহূর্তেই ভিডিওটা ভাইরাল হয়ে গেল। ডেমোক্র্যাটিক পার্টির বিরুদ্ধে অভিযোগ আসতে শুরু করল। এই পার্টির সদস্য ইহুদিবিরোধী বক্তব্য দিয়ে ইহুদিবিরোধী কন্সপিরেসি থিওরি ছড়াচ্ছে। তীব্র সমালোচনার মুখে ট্রায়ান ভিডিওটা ডিলিট করে ইহুদি সম্প্রদায়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল। ট্রায়ান বলেছিল, 'আমি বুঝতে পারিনি, আমার বক্তব্যকে এন্টিসেমিটিক মনে করা হবে'। বিষয়টা যাতে বেশিদূর না গড়ায়, সেজন্য স্থানীয় ইহুদি নেতাদের সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ করেছিল। একটি ইহুদি স্মৃতি জাদুঘরও পরিদর্শনে গিয়েছিল। ট্রায়ান পরিস্থিতির চাপে ক্ষমা চাইলেও তার ভেতরে রথচাইল্ড সম্পর্কিত আগের বিশ্বাস থেকে গিয়েছিল। ২০১৮ সালে ট্রায়ান আবার ইহুদিবিরোধী ষড়যন্ত্রতত্ত্বের ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছিল। ঘটনা ছিল এই, রিপাবলিকান পার্টির সদস্য মারজরি ট্রেইলার গ্রিন ২০১৮ ফেসবুকে দীর্ঘ এক পোস্টে বলেছিল,

রথচাইল্ড মহাকাশ থেকে বিপজ্জনক এক লেজারবিম ছুড়েছে। এর ফলে ক্যালিফোর্নিয়ার জঙ্গলে আগুন লেগে গেছে। আকাশ থেকে লেজারবিম পড়ার দৃশ্য অনেকেই দেখেছে। রথচাইল্ড জঙ্গলের বিশেষ অংশে আগুন ছুড়েছে। জঙ্গলের এই অংশে রথচাইল্ড ৭৭ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে একটি হাইস্পিড রেললাইন বসানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। আগুন লাগার কারণে এখানকার ভূমির মূল্য কমে যাবে। রথচাইল্ড স্বল্পমূল্যে জমি ক্রয় করে তাদের প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করতে পারবে।'

মারজরি তার পোস্টকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল দাবি করেছিল। ট্রেয়ন ওয়াইট মারজরির পোস্ট লাইক-শেয়ার দিয়েছিল। মারজরির পোস্টটা মার্কিন যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক হাস্যরসের সৃষ্টি করেছিল। সবাই বলাবলি করছিল, জমি অধিগ্রহণের জন্য বিপুল ব্যয় করে মহাকাশ থেকে লেজার ছোড়ার কী দরকার? আরো অনেক সস্তায় এ কাজ করার হাজারো পদ্ধতি ছিল। ইহুদিমিডিয়া এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বই লেখা হয়েছে, পত্রপত্রিকায় ব্যাপক লেখালেখি হয়েছে। কার্টুন বানানো হয়েছে। মারজরিকে পচানোর যাবতীয় আয়োজন ইহুদি নিয়ন্ত্রিত মার্কিন মিডিয়া করে রেখেছিল।

এ ধরনের ষড়যন্ত্রতত্ত্ব শুধু আমেরিকাতেই নয়, বিশ্বের প্রায় সবদেশেই বিদ্যমান আছে। ২০০৫ সালে কাশ্মীর, পাকিস্তানের গিলগিটে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছিল। তখন এ কথা চাউর হয়ে গিয়েছিল, আমেরিকা গোপনে মাটির নিচে আণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটানোর কারণেই এই ভূমিকম্প সৃষ্টি হয়েছে। বাস্তবে এমন কোনো ঘটনা আমেরিকা ঘটায়নি। এ ধরনের গুজব ছড়িয়ে পড়ার পেছনে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার আধবোঝা, আধশোনা কাহিনি ও থিউরি ক্রিয়াশীল থাকে। ভালোভাবে না বুঝেই সাধারণ মানুষ মনগড়া গল্প ছড়ায়। গুজব ছড়ানোর পেছনে মানুষের হিংসাত্মক মনোভাব কাজ করে, শত্রুকে ঘায়েল করা উদ্দেশ্য থাকে। মানুষ মনের বিষ উগরে দেওয়ার জন্য উপযুক্ত পাত্রের সন্ধানে থাকে। প্রতিপক্ষ সম্পর্কে গুজব ছড়িয়ে তাকে ঘায়েল করাটা পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন কূটকৌশল।

বর্তমানে আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কন্সফিরেসি থিউরি জন্ম দেওয়ার পেছনে একটি সংস্থার ভূমিকাও কম নয়। সংস্থাটির নাম ওয়েদার সেন্ট্রাল (Weather Central)। বেসরকারি সংস্থাটির সদর দপ্তর আমেরিকার উইসকনসিন অঙ্গরাজ্যে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়াই এই সংস্থার প্রধান কাজ। এখানে ৭০ জন আবহাওয়া বিশারদের অধীনে ২৫০ জন গবেষক নিরলসভাবে কাজ

করে। এই সংস্থা বিশ্বের ২১টি দেশে ৪০০টির মতো টিভি চ্যানেলকে আবহাওয়া বিষয়ক তথ্য বিক্রি করে। আগামীকাল বা আগামী সপ্তাহে মওসুম কেমন হবে, কোথাও ঝড়-তুফান হবে কিনা, জলোচ্ছ্বাস আসবে কিনা—এসব নিয়েই সংস্থাটি গবেষণা করে। এ ছাড়া আইফোন ও এন্ড্রয়েড ফোনের আবহাওয়া বিষয়ক এ্যাপস ডেভেলপ করা নিয়েও এই সংস্থা কাজ করে। ২০১১ সালে রথচাইল্ড পরিবার এই সংস্থার ৭০% শেয়ার কিনে নিয়েছে। ষড়যন্ত্রতাত্ত্বিকদের জন্য পথ আরো সুগম আর সহজ হয়ে গেল। তারা এখন নিশ্চিন্তে আবহাওয়া বিষয়ক যেকোনো বিপর্যয় বা দুর্ঘটনাকে রথচাইল্ডের সাথে সংযুক্ত করতে পারে।

২০১৭ সালে হারিকেন 'হার্ভে' আমেরিকার লুইজিয়ানা এবং টেক্সাস রাজ্যের উপকূলে আঘাত হেনেছিল। হারিকেন আসার আগেই উপকূলীয় এলাকা থেকে বেশিরভাগ মানুষকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তাই হতাহতের সংখ্যা খুবই কম ছিল। ৬৮ জনের মতো মানুষ নিহত হয়েছিল। হারিকেন থেমে যাওয়ার পরে একজন আমেরিকান মহিলা ইউটিউবার দাবি করেছিল, রথচাইল্ড পরিবার এই ঝড়ের জন্য দায়ী। মহিলা দাবি করেছিল, আলাস্কায় মার্কিন সরকারের একটি বড়সড় গোপন প্রকল্প আছে। এই সংস্থা সাগরে বিদ্যুৎ ছেড়ে দেয়। এ কারণে বহু তিমি মারা যায়। প্রায়ই দেখা যায়, অসংখ্য তিমি সৈকতে মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। তার দাবির স্বপক্ষে প্রমাণ দাখিল করতে গিয়ে মহিলা বলেছিল, আমার চাচা বিমানবাহিনীতে চাকরি করেছিলেন। তিনি আমাকে সব বলেছেন। আমি সব জানি। মহিলাটি তার বক্তব্যে ওয়েদার সেন্ট্রাল কোম্পানির কথাও উল্লেখ করেছিল। মার্কিন সরকার ও রথচাইল্ড মিলে কেন সাগরকে বিদ্যুতায়িত করে, সে ব্যাখ্যা মহিলা করেনি। এটা করে সরকার ও রথচাইল্ডের লাভ কী? কেন শুধু তিমিরা সৈকতে এসে মারা যায়? অন্যান্য যাত্রীবাহী জাহাজ এবং সামুদ্রিক জীব কেন ক্ষতিগ্রস্ত হয় না? এসব প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। স্পষ্টতই, এসব সেই মহিলার স্বল্পজ্ঞান ও গুজবপ্রীতি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তবে মহিলার গুজব বাজারে ভালোই বিকেছে। উক্ত গুজববাজ মহিলা আলাস্কায় যে প্রজেক্টটির কথা বলেছে, সেটি হচ্ছে 'হাই-ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাক্টিভ অরোরাল রিসার্চ প্রোগ্রাম'। মহাকাশে প্রদক্ষিণরত হাজারো মার্কিন 'স্পেস স্যাটেলাইট' থেকে পাঠানো মেসেজ ও সিগনালগুলো কীভাবে সুরক্ষিত রাখা যায়, আলাস্কান প্রজেক্টে মূলত এই বিষয়টাই দেখা হয়। আলাস্কার গাকোনাতে অবস্থিত এই গবেষণা কেন্দ্রটি

সূর্যালোকের কণা নিয়ে গবেষণা করে। বিশেষজ্ঞরা যাচাই করে দেখার চেষ্টা করছে, সূর্যের আলোকণা 'মেসেজ-সিগনাল'-কে কতটা প্রভাবিত করতে পারে। প্রভাবিত করলে, কীভাবে সেটা এড়ানো যায়? এই গবেষণা মার্কিন নিরাপত্তার স্বার্থেই করা হয়। মহাকাশ উপগ্রহ কেন্দ্রগুলির মাধ্যমেই পরাশক্তিগুলো তাদের অতি গোপনীয় বার্তা আদান-প্রদান করে। আমাদের মোবাইলও এসব স্যাটেলাইটের মাধ্যমে তথ্য লেনদেন করে। চীন, আমেরিকা এবং রাশিয়ার স্যাটেলাইটগুলো একে অন্যের তথ্য চুরির চেষ্টাতে লেগে আছে। পরাশক্তিগুলোর কাছে নিজেদের মেসেজ ও সিগনাল গোপন রাখা বড় এক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাক, এই গবেষণাগারের সাথে সমুদ্রে বিদ্যুৎ ছেড়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্রতত্ত্বকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

আমরা জানি, নতুন কিছু নিয়ে গবেষণা করা বেজায় কঠিন কাজ। এসব গবেষণার বিষয় সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা মুশকিল। অস্পষ্ট বিষয় নিয়ে জনমনে রহস্য তৈরি করা সহজ। অর্ধবোঝা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সাথে যখন জনপ্রিয় কন্সপিরেসি থিউরিকে মিশিয়ে পরিবেশন করা হয়, জনগণ গোগ্রাসে সেই ষড়যন্ত্রতত্ত্ব গেলে। তারপর সেই ষড়যন্ত্রতত্ত্বকে টেনেটুনে ঐতিহাসিক কোনো ঘটনার সাথে মিলিয়ে দিতে পারলে তো কেল্লা ফতে। তত্ত্বটা নিখুঁত আর অকাট্য সত্যের মতো দাঁড়িয়ে যায়। মানুষ ভাবতে শুরু করে, এটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এর ঐতিহাসিক ভিত্তিও আছে। ষড়যন্ত্রতত্ত্ব এভাবেই কাজ করে, ডালপালা মেলে। গুজবের প্রতি মানুষের আগ্রহ জন্মগত। একদল সুযোগসন্ধানী এটাকে কাজে লাগিয়ে ষড়যন্ত্রতত্ত্বের পালে হাওয়া দিয়ে যেতে থাকে। তাদের পত্রিকা-বইয়ের কাটতি হু হু করে বাড়তে থাকে। এসব গুজবকে ঘিরে আরো বহু ব্যবসা দাঁড়িয়ে যায়।

রথচাইল্ড পরিবার কি এখনো আগের মতোই শক্তিশালী আর বিত্তশালী আছে? তারা কি পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো শক্তি রাখে? দুনিয়ার গতিপথ বদলে দেওয়ার শক্তি তাদের আছে? যেভাবে তারা ইসরায়েলের মতো একটি জারজ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় অন্যতম কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছিল, আজও কি তেমনটা পারে? আমাদের জানতে হবে, বর্তমানে তাদের শক্তি কেমন?

রথচাইল্ড পরিবার উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিশ্বের সবচেয়ে ধনী পরিবারগুলির অন্যতম ছিল, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তখন সত্যিই তাদের এত সম্পদ ছিল। তারা ব্রিটেন, ফ্রান্সসহ অনেক দেশকে বিপুল অঙ্কের ঋণ দিয়ে

রেখেছিল। রথচাইল্ডই ব্রিটেনকে সুয়েজ ক্যানেল কোম্পানির বৃহত্তম স্টেকহোল্ডার বানিয়ে দিয়েছিল। তারা ব্রিটেনকে তখন চার মিলিয়ন পাউন্ড ঋণ দিয়েছিল।

ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা আমাদের মনে রাখা উচিত। পৃথিবীতে একটি পরিবার, একটি শ্রেণি বা একটি দেশ চিরকাল ক্ষমতার শীর্ষে অবস্থান করতে পারে না। আল্লামা ইকবালের মতে :

سکوں محال ہے قدرت کے کارخانے میں
ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں

'শুধুমাত্র পরিবর্তনই ধ্রুবসত্য, আর কিছুই স্থায়ী নয়।'

রথচাইল্ডের ক্ষেত্রেও এমন কিছুই ঘটেছে। রথচাইল্ডরা দক্ষ ব্যাংকার ছিল। তবে তাদের ব্যাংকব্যবস্থাটা আজকের মতো ছিল না। তাদের ব্যবসায়িক মডেল ছিল বিশেষ গ্রাহকদের জন্য 'প্রাইভেট ব্যাংকিং'। এ ধরনের প্রাইভেট ব্যাংক ১৯ শতকে ধনী ব্যক্তিরা প্রতিষ্ঠা করত। তাদের লেনদেন হতো শুধু সরকার বা অত্যন্ত ধনী রাজপরিবারের সাথে। তাদেরকে ঋণ দিত। এসব ব্যাংকে যে কেউ একাউন্ট খুলতে পারত না। এসব ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যাংকের কর্মপরিধিও বিশেষ ব্যক্তিপর্যায়েই সীমাবদ্ধ থাকত। ব্যাংকের মালিকপক্ষ ধনীদের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করে তাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে লাভজনক ও লোভনীয় ব্যবসার প্রস্তাব দিত। চুক্তি হওয়ার পর শুধু ব্যবসাই নয়, গ্রাহককে আরো নানা সেবা প্রদান করা হতো। অন্য ব্যবসার পরামর্শ দেওয়া হতো। অর্থপাচারে সাহায্য করা হতো। বড় বিনিয়োগকারীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হতো। রথচাইল্ড ব্যাংকগুলো গ্রাহকের যাবতীয় তথ্য গোপন রেখেই কাজ করত। গ্রাহক কত টাকা বিনিয়োগ করেছে, লাভের হার, কোন খাতে টাকা খাটানো হয়েছে—সবই গোপন রাখা হতো। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে যখন অর্থনীতি উন্মুক্ত ছিল না, রথচাইল্ড এই ব্যবসায়িক কৌশলে প্রচুর সম্পদ উপার্জন করেছে। দুই শতাব্দী ধরে তারা ব্যাংকিং খাত শাসন করেছে। হাজার হাজার কোটি টাকার ব্যবসা করেছে। এমনকি পৃথিবীর মানচিত্র পরিবর্তনে ঘৃণিত ভূমিকা রেখেছে।

২০ শতকে অর্থনীতিগুলি উন্মুক্ত হতে শুরু করেছিল। সাধারণ মানুষের জন্যও ব্যাংক খোলা শুরু হয়ে গেল। ২০ শতকের গোড়ার দিকে নতুন ব্যবসায়িক

মডেল রথচাইল্ডসের প্রাইভেট মডেলকে হারিয়ে দিয়েছে। নতুন মডেলের নাম 'জয়েন্ট স্টক ব্যাংকিং'। এই মডেলে একজন ব্যক্তি বা একটি পরিবারই একটি ব্যাংকের মালিক হতে হবে—এমন ধরাবাঁধা কোনো নিয়ম ছিল না। ওপেন মার্কেটে ব্যাংকের শেয়ার বিক্রি হতো। যার কাছে যতটুকু শেয়ার, সে ততটুকু ব্যাংকের মালিক, সে তত ধনী। একটি পরিচালনা পর্ষদ ব্যাংক পরিচালনা করে এবং বোর্ডের সদস্য পরিবর্তন হতে থাকে। নতুন ব্যাংকিং ব্যবস্থায় একজন সাধারণ মানুষও যেকোনো পরিমাণ অর্থ দিয়ে ব্যক্তিগত একাউন্ট খুলতে ও ঋণ নিতে পারে। এই ব্যাংকের দরজা রাজা ও প্রজা সবার জন্য উন্মুক্ত। লাভের হারও সবার সামনে উন্মুক্ত থাকে। সবাই শেয়ারের পরিমাণ অনুযায়ী মুনাফার হিসসা লাভ করে। কোনো লুকোছাপা নেই। পত্রিকায় নিত্যদিন ছাপা হয়, অমুক ব্যাংকের এত শেয়ার এত দামে বিক্রি হয়েছে, অমুক ব্যাংক এই হারে সুদ দিচ্ছে। নতুন ব্যাংকিংব্যবস্থা দেখতে না দেখতেই বিশ্ব অর্থনীতিকে কবজা করে নিল। রথচাইল্ডের ব্যাংক ছিল চার থেকে ছয়টি শহরে। নতুন মডেলের ব্যাংকগুলো বিশ্বের প্রতিটি বড় শহরে খোলা শুরু হয়েছিল। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে প্রতিটি দেশে শতাধিক ব্যাংক খোলা হয়ে গিয়েছিল। রথচাইল্ড নতুন ব্যাংকিং মডেলের নেতৃত্ব দিতে পারেনি। ফলে তাদের ক্লায়েন্টরা যতই ধনী হোক না কেন, পুরো বিশ্বের খোলা বাজারের চেয়ে ধনী ছিল না। রথচাইল্ড নিজেরা ধনী থেকে গেল, কিন্তু তাদের চেয়ে বহুগুণ ধনী নতুন কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান ও পরিবার বাজারে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

উদাহরণস্বরূপ, আমেরিকায় জেপি মরগান পরিবারের হাতে ব্যাংকিং ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ চলে গিয়েছিল। তারা আমেরিকার ব্যবসা-বাণিজ্যকেও নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে দিয়েছিল। ফলে মর্গানদের সামনে রথচাইল্ড পরিবার রীতিমতো নস্যিতে পরিণত হয়েছিল। রথচাইল্ডস ব্যবসার মডেল পরিবর্তন করতে পারেনি। ধীরে ধীরে প্রতিযোগিতার দৌড়ে পিছিয়ে পড়তে শুরু করেছিল। আরেকটি কারণেও রথচাইল্ড বাজার রাজার অবস্থান থেকে হটে গিয়েছিল, সেটা হচ্ছে ব্রিটেন-ফ্রান্সের পতন ও আমেরিকার উত্থান। ১৮ শতকে রথচাইল্ডরা যখন ব্যবসা শুরু করেছিল, তখন আমেরিকা পরাশক্তি ছিল না; ব্রিটেন ও ফ্রান্স ছিল পরাশক্তি। রথচাইল্ডরা এই দুই দেশের সরকারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছে। তারা ভালো মুনাফাও করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ নাগাদ ব্রিটেন-ফ্রান্স বিশ্ব মঞ্চে তাদের আধিপত্য খুইয়ে বসেছিল।

তাদের বিশাল সাম্রাজ্যও খতম হয়ে গিয়েছিল। রথচাইল্ডের প্রভাব-প্রতিপত্তিও এসব দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে গেছে। বলা ভালো, এসব দেশেও নতুন ব্যাংকিং ব্যবস্থার কারণে রথচাইল্ডরা পিছিয়ে পড়তে শুরু করেছিল। ইউরোপের জার্মান এবং অস্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যেরও পতন ঘটেছিল। রথচাইল্ড উভয় সাম্রাজ্যে প্রধান অর্থ লগ্নিকারী ছিল। সাম্রাজ্যের পতনের সাথে সাথে রথচাইল্ডের ব্যবসায়িক সাম্রাজ্যও বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

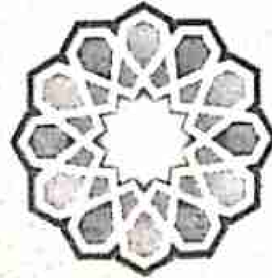
রথচাইল্ড পরিবার পতনের তৃতীয় কারণ হচ্ছে, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকার উদীয়মান বৈশ্বিক অবস্থা সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ বেখবর ছিল। এখানে তাদের বেনিয়াবুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। তারা ইউরোপে বসে আমেরিকায় ব্যবসা করেছে। লন্ডন বা ভিয়েনার মতো নিউইয়র্ক-ওয়াশিংটনে পারিবারিক শাখা স্থাপন করেনি। তাদের অনুপস্থিতিতে, জন রকফেলার, অ্যান্ড্রু কার্নেগি, জেপি মরগান ও হেনরি ফোর্ডের মতো বিজনেস টাইকুনরা পুরো মার্কিন বাজার দখল করে নিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এত বড় বাজারে পরিণত হয়েছিল যে, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেন রথচাইল্ডের চেয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে বেশি ঋণ পেয়েছিল। চারপাশে বিপুল পরিবর্তন দেখতে পেয়েও রথচাইল্ড তাদের মডেল পরিবর্তন করতে পারেনি। আজ রথচাইল্ডের পাঁচটি ইউরোপীয় শাখার মধ্যে তিনটি তথা ভিয়েনা, ফ্রাঙ্কফুর্ট এবং নেপলস বন্ধ হয়ে গেছে। ইউরোপে একের পর এক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। নেপলস ও ফ্রাঙ্কফুর্ট স্বাধীন নগর রাষ্ট্রের অবস্থান হারিয়ে সাধারণ শহরে পরিণত হয়েছে। নেপলস হয়ে গেছে ইতালির অংশ আর ফ্রাঙ্কফুর্ট জার্মানির। এসব দেশের শাসকদের পক্ষে কোনো পারিবারের সাথে গোপন ব্যবসায়িক চুক্তি করা সম্ভব নয়। সরকারকে তাদের ব্যাংকের সাথে খোলা চুক্তি করতে হবে। রথচাইল্ড আজও খোলামেলা চুক্তি করে না। ১৮৬৩ সালে নেপলস শাখা বন্ধ হয়েছিল, ১৯০১ সালে ফ্রাঙ্কফুর্ট শাখা। অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের শেষদিকে ভিয়েনা শাখা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। হিটলার ফ্রান্স দখলের পর প্যারিস শাখা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

ফ্রান্স নাজিদের হাত থেকে স্বাধীনতা লাভের পর ফ্রান্সে আবার রথচাইল্ড ব্যাংক চালু হয়েছিল। বর্তমানে 'রথচাইল্ড অ্যান্ড কোং'-এর লন্ডন অফিসকে নিউ কোর্ট বলা হয়। অফিসটি লন্ডনের সেন্ট সুইডেন লেনের একটি সরু রাস্তায় অবস্থিত। এটি ব্রিটিশ রাজপরিবারসহ বেশ কয়েকটি অভিজাত পরিবারকে আর্থিক পরিষেবা প্রদান করে। এছাড়া বিশ্বজুড়ে বড় কোম্পানি ও

ব্যক্তিদের অনুরূপ পরিষেবা সরবরাহ করে। দালাল হিসেবে কাজ করে। জাপানি কোম্পানি মিতসুবিশি কর্পোরেশন ২০১৭ সাথে দালাল হিসাবে রথচাইল্ডকে নিয়োগ করেছিল অস্ট্রেলিয়ার একটি কয়লা খনির শেয়ার বিক্রি করার জন্য। Rothschild & Co-এর ওয়েবসাইট অনুসারে, তাদের কাছে ৪২০০ ফাইনান্সিয়াল এক্সপার্ট (অর্থ বিশেষজ্ঞ) রয়েছে। এরা বিশ্বের চল্লিশটি দেশে সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। রথচাইল্ডরা আজও অনেক ধনী। তবে তারা আগের মতো একক ধনী নয়। বিশ্বের হাজার হাজার পুঁজিপতির একজন। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাদের পরিবার ব্যাংকিং ও সুদ থেকে যে সম্পদ উপার্জন করেছিল, পরিমাণে তা অবিশ্বাস্য হলেও সেটা অনেক উত্তরাধিকারীর মাঝে বণ্টিত হয়ে গেছে। তাছাড়া পরিবারটি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আগের মতো একার হাতে ব্যবসা পরিচালিত হয় না। কয়েক প্রজন্ম ধরে সম্পদ বণ্টনের পর পারিবারিক সম্পদ এখন অনেক কম। কত কম? এটা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। রথচাইল্ড সবসময় নিজের ও গ্রাহকদের যাবতীয় ব্যবসায়িক তথ্য গোপন রাখে। এটাই তাদের ব্যবসায়িক পলিসি। বর্তমানে রথচাইল্ডদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী সদস্য ডেভিড মায়ার ডি রথচাইল্ড। তার সম্পদের পরিমাণ দশ বিলিয়ন ডলার। তার এই সম্পদ বিশ্বের ১০০তম ধনী নারী 'ভিকি সাফরা' ও তার পরিবারের চেয়েও কম। গ্রিক বংশোদ্ভূত ভিকি সাফরার ষোল বিলিয়ন সত্তর মিলিয়ন ডলারের সম্পদ আছে। অর্থাৎ, রথচাইল্ডদের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিও বিশ্বের শততম ধনীর ব্যক্তির চেয়ে পিছিয়ে। ডেভিড রথচাইল্ড আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে থাকে। প্লাস্টিকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে পরিবেশ রক্ষার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। ডেভিড বারো হাজার পাঁচশ প্লাস্টিকের বোতল দিয়ে একটি নৌযান বানিয়েছিল। সেটার নাম দিয়েছিল 'প্লাস্টিকি'। ২০০০ সালে ডেভিড রথচাইল্ড প্লাস্টিকের নৌযানে চড়ে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়েছিলেন। ক্যালিফোর্নিয়ার সান ফ্রান্সিসকো শহর থেকে ১৫,০০০ কিলোমিটার দূরে অস্ট্রেলিয়ার সিডনি বন্দরে গিয়েছিল।

মোদ্দাকথা, রথচাইল্ডরা এখনো গরিব নয়; আবার এ কথাও সত্য, আজ তারা কোনো ধনী-নেতৃস্থানীয় দেশকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো অবস্থায় নেই। বিশ্বব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষমতা তাদের আর নেই। এখন তারা কোনো ব্যক্তি বা দেশকে ব্ল্যাকমেইল করে ব্যবসা বাগাতে পারে না।

যারা রথচাইল্ড সম্পর্কে আজগুবি গালগল্প তৈরি করে, তারা আসলে কন্সফিরেসি ওয়েবসাইটের পোকা। তাদের জানাশোনাতেও কোনো আপডেট নেই। বিশ্বে আজ কার একচেটিয়া আধিপত্য? কে আজ পৃথিবী চালাচ্ছে? আমাদের গ্রেট গেইম লেখায় এর উত্তর মিলবে।



ইউরোপ কেন উন্নত?

ইউরোপ কীভাবে চার্চকে পরাজিত করেছিল?

আমরা রোমান ক্যাথলিক চার্চ সম্পর্কে জানি। খ্রিস্টানরা নানা দল-উপদলে বিভক্ত। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় দলের নাম ক্যাথলিক। ইতালির রাজধানী রোমে ক্যাথলিকদের প্রধান চার্চ অবস্থিত। এখানেই ক্যাথলিকদের প্রধান ধর্মযাজক থাকে। তাকে পোপ বলা হয়। রোমের যে অংশে ক্যাথলিকদের প্রধান চার্চ আছে, সেটাকে ভ্যাটিকান সিটি বলে। ১৯২৯ সালে ভ্যাটিকান স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। ভ্যাটিকান বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষুদ্র রাষ্ট্র। আয়তন মাত্র ১২১ একর। পোপ এখানকার শাসক। কয়েক শ বছর আগে অবস্থা এমন ছিল না। পোপের রাজ্য ও ক্ষমতার পরিসর এতটা ক্ষুদ্র ছিল না। তখন বলতে গেলে পুরো ইউরোপ পোপের হুকুমে ওঠবস করত। ইউরোপের রাজনীতি ও ধর্ম—উভয়টার ওপর পোপের পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল। ধীরে ধীরে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। ৯০০ বছরের মধ্যে পোপের ক্ষমতা সংকুচিত হতে হতে ছোট্ট ভ্যাটিকান সিটিতে এসে ঠেকেছে। পোপের এই ক্ষমতাহানি কীভাবে ঘটল?

আজ থেকে নয় শ বছর আগে রোমান ক্যাথলিক চার্চ স্রেফ উপাসনালয়ই ছিল না, অবিশ্বাস্য ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুও ছিল। চার্চগুলোও পোপের প্রতিনিধিত্ব করত। চার্চগুলো ছিল ক্ষমতার ভেতর আরেক ক্ষমতা। দেশে রাজা ও চার্চের শাসন সমান্তরালে চলত। কখনো উভয়ের দ্বন্দ্ব দেখা দিলে রাজাকে পিছিয়ে এসে আপস করতে হতো। রাজার খুঁটা চার্চের বেদিতে প্রোথিত থাকত। রাজাদেরই এমন হাল হলে পোপ ও চার্চের কাছে সাধারণ প্রজারা কতটা যিম্মি ছিল! দেশের মানুষ পোপ-চার্চের গণ্ডির বাইরে গিয়ে চিন্তাও করতে পারত না। পোপ-চার্চের বিপরীত কিছু করার পরিণতি ভয়ংকর ছিল। এসব কারণে রাজা-প্রজা সবাই পোপ-চার্চের মতো করেই ভাবতে শিখেছিল। গায়ে পড়ে অযথা আগ বাড়িয়ে কেউ ঝামেলায় জড়াতে চাইত না।

আমরা যে সময়কার কথা বলছি, তখন রোমান সাম্রাজ্যের উত্থানের একটা পর্ব শেষ হয়ে গিয়েছে। রোমান সাম্রাজ্য দুটি অংশে বিভক্ত ছিল, পূর্ব ও পশ্চিম।

পশ্চিমাংশ বিলুপ্ত হয়েছিল। পূর্ব রোম সাম্রাজ্য তখনো বহাল তবিয়তে টিকে ছিল। এই সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল কনস্টান্টিনোপলে। আজ যেটা ইস্তাম্বুল নামে পরিচিত। পূর্ব রোম সাম্রাজ্যকে বাইজেন্টাইন এম্পায়ার বলা হতো। ইউরোপ শাসন করা পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যেই মূলত পোপের নিরঙ্কুশ প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। এতদাঞ্চলে পোপের ক্ষমতা ৭৫৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে কায়েম ছিল। পোপের অধীনে থাকা রাজ্যগুলোকে পেপাল স্টেট বলা হতো। পোপের সরাসরি কর্তৃত্বাধীন এলাকা মূলত বর্তমানের ইতালি ও ফ্রান্সের কিছু অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত ছিল। এর বাইরে পুরো ইউরোপের উপরও পোপের অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণ বহাল ছিল। ইউরোপের এই অংশে চার্চ মুকুটহীন সম্রাট ছিল। একাদশ শতক অর্থাৎ ১০০১ থেকে ১০৯৯ সালের মাঝে পোপের ক্ষমতা ধীরে ধীরে হ্রাস পেয়েছিল। এই পতনের পেছনে প্রধানত দুটি কারণ ক্রিয়াশীল ছিল :

এক. ক্রুসেড।
দুই. জান্নাতের টিকিট।

ক্রুসেড কীভাবে পোপ ও চার্চের শক্তিকে খর্ব করেছে? ১০৯৫ সালে পোপ দ্বিতীয় আরবান ক্রুসেডের ডাক দিয়েছিল। ক্রুসেডের প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল, মুসলমানদের করায়ত্ত থেকে পবিত্রভূমি তথা বাইতুল মুকাদ্দাসের নিয়ন্ত্রণ পোপ-চার্চের অধীনে নিয়ে আসা। পোপের খাহেশ ছিল, পুরো ফিলিস্তিনকে করায়ত্ত করার। বাইতুল মুকাদ্দাস ছিল খ্রিস্টানদের কাছে হলি ল্যান্ড বা পবিত্র ভূমি। কারণ, এখানেই ঈসা আ.-এর জন্ম এবং (তাদের মতে) মৃত্যু (নাঊযুবিল্লাহ)। খ্রিস্টধর্মের জন্ম, উত্থান বাইতুল মুকাদ্দাসেই হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই চার্চ চাইত, হলিল্যান্ডের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অনুসারীদের কাছে নিজের ক্ষমতা জানান দিতে। ক্রুসেডের পেছনে চার্চের আরেকটি উদ্দেশ্যও ছিল—নিজের রাজনৈতিক শক্তি ও প্রভাব বৃদ্ধি করা। মুসলমানদের হাত থেকে জেরুজালেম ছিনিয়ে নিতে পারলে খ্রিস্টানদের কাছে চার্চের গ্রহণযোগ্যতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে—এই ছিল পোপ-চার্চের পরিকল্পনা।

১০৯৯ সালে সংগঠিত প্রথম ক্রুসেডে খ্রিস্টানরা অভূতপূর্ব বিজয় লাভ করেছিল। তারা বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করতে সক্ষম হয়েছিল। এটা ছিল চার্চের অনেক বড় বিজয়। এই বিজয়ের মাধ্যমে চার্চের দীর্ঘদিনের সুপ্ত

ধারেশ অনেকটা পূরণ হয়েছিল। গোটা ইউরোপে চার্চের প্রভাব-প্রতিপত্তি অবিসংবাদিত হয়ে গিয়েছিল। ক্রুসেডের আগে তো ছিলই, এবার চার্চ ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেল। চার্চের এই বিজয়সুখ বেশিদিন টেকেনি। বিজয়ের কিছুদিন পর থেকেই একের পর এক পরাজয়ের সংবাদ আসতে লাগল। মুসলিম সেনাবাহিনী ঘুরে দাঁড়াতে খুব বেশি সময় নিল না। ইমাদুদ্দিন যিনকী, নুরুদ্দিন যিনকী ও সালাহুদ্দিন আইয়ুবী রহ.-এর মতো জাঁদরেল মুসলিম জেনারেল একের পর এক যুদ্ধে হানাদার খ্রিস্টানদের রাতের ঘুম হারাম করে দিলো। দীর্ঘ চেষ্টার পর ১১৮৭ সালে সালাহুদ্দিন আইয়ুবী মসজিদে আকসা ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হলেন।

এই পরাজয়ে গোটা ইউরোপ বলতে গেলে ওলটপালট হয়ে গেল। পোপ ও চার্চ যেন আকাশ থেকে ধপাস করে মাটিতে পড়ল। ১১৮৭ সালের পর থেকে সেই যে পরাজয় শুরু হলো, পরবর্তী ১০০ বছর ধরে পরাজয়ের ধারা অব্যাহত থাকল। মুসলমানরা ধীরে ধীরে ক্রুসেডারদেরকে অধিকৃত ফিলিস্তিন থেকে তাড়িয়ে দিতে থাকল। ক্রুসেডারদের সর্বশেষ দুর্গ আক্কা শহরও শেষমেষ মুসলমানরা দখল করে নিতে সক্ষম হলো। এই শহরটি তিন দিক থেকে মুসলিম ভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। আরেকদিকে ছিল সাগর। এজন্য দীর্ঘদিন এই শহরটি অজেয় থেকে গিয়েছিল। বর্তমানে এই শহরটি অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলের অংশ। ১২৯১ সালে মিশরের মামলুকরা এই শহর অবরোধ করে। দীর্ঘ অবরোধের পর ক্রুসেডাররা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। এর মাধ্যমে ক্রুসেডাররা তাদের সর্বশেষ ঘাঁটি হারিয়ে বসে। ক্রুসেডাররা খালি হাতে ইউরোপে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এই পরাজয় চার্চের কর্তৃত্বকে মারাত্মকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছিল।

ইউরোপের সাধারণ জনগণ মনে করত, পোপ ও চার্চ খোদার প্রতিনিধি। খোদার সাথে পোপ-চার্চের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। পোপ-চার্চ পরাজিত হতে পারে না। পোপ-চার্চ সবসময় জিতেই যাবে। ক্রুসেডে জেতার পর তাদের বিশ্বাস ইস্পাতের চেয়েও সুদৃঢ় হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীতে ক্রুসেডে হারার পর খ্রিস্টানদের আজন্মলালিত বিশ্বাস ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। ঘটনা এখানেই শেষ হয়নি; ১৪৫৩ সালে উসমানি সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মাদ রোমান সাম্রাজ্যের সর্বশেষ অজেয় দুর্গ কনস্টান্টিনোপলও দখল করে নিয়েছিলেন। এই পরাজয়ের বদলা নেওয়ার জন্য পোপ দ্বিতীয় পায়াস আবারো ক্রুসেডের ডাক দিয়েছিল। ততদিনে দুনিয়া ও ইউরোপ বদলে গিয়েছে। পোপ ও চার্চের

প্রতি সর্বসাধারণ ও রাজাদের ভরসা এতটাই কমে গিয়েছিল যে, কোনো শক্তিমান ইউরোপীয় রাষ্ট্র পোপের ডাকে সাড়া দিলো না। ক্রুসেডের মৃ... আর কাজে এলো না। এই ভয়াবহ পরাজয়ে চার্চগুলো শুধু শোক পালন করে ক্ষান্ত হতে বাধ্য হলো। এভাবেই পোপ-চার্চ রাজনৈতিকভাবে সর্বস্বান্ত ও দেউলিয়া হয়ে গেল।

ধর্মীয়ভাবে ইউরোপের কিছু কিছু এলাকায় পোপ-চার্চের কিছু প্রভাব-প্রতিপত্তি তখনো অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছিল। এর কারণ হলো, খ্রিস্টবাদের ভিত্তিই ছিল সালভেশন বা মুক্তির ধারণার ওপর। খ্রিস্টানদের বড় অংশের বিশ্বাস ছিল, মানুষের গুনাহের ভার নিজের কাঁধে তুলে নেওয়ার জন্যই যিশু ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুকে বেছে নিয়েছিলেন (নাউযুবিল্লাহ)। চার্চ এ কথা প্রচার করে দিয়েছিল, পোপ চাইলে মানুষের গুনাহ মাফ করে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারে। মানুষের এই বিশ্বাসকে চার্চ ষোলোআনা কাজে লাগানোর ধান্ধায় নেমে পড়ল। এটাই চার্চের জন্য একসময় কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মানুষের বিশ্বাস নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে গিয়ে চার্চ নিজের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দিয়েছিল।

ক্যাথলিকদের বিশ্বাস, যে পাপী মানুষ মৃত্যুর আগে গুনাহ থেকে তাওবা করে নেয়, তার আত্মা জাহান্নামে যায় না। তার আত্মা পুরগেটরি নামক জায়গায় চলে যায়। এখানে জাহান্নামের মতো ভয়ংকর আযাব নেই। এখানে ছোটখাটো শাস্তি দিয়ে মানুষের আত্মাকে পরিপূর্ণ পাপমুক্ত ও বিশুদ্ধ করার পর জান্নাতে স্থানান্তরিত করা হয়। ইতালির বিখ্যাত কবি দান্তে তার মহাকাব্য *দ্য ডিভাইন কমেডিতে* এসব ঘটনার দৃশ্য কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছিল।

ক্যাথলিক বিশ্বাস মতে, পোপ চাইলে পুরগেটরিতে আটকে থাকা আত্মার গুনাহ মাফ করে তাকে জান্নাতে দাখিল করতে পারেন। ইউরোপে এমন হতো, সারাজীবন ধরে পাপ-পঙ্কিলতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত থেকে শেষজীবনে বিত্তশালীরা চার্চের কাছে ধরনা দিত। চার্চ তখন নিদান দিত, তুমি অমুক অমুক সৎকর্ম করো, এই পরিমাণ টাকা দাও, তাহলে তুমি পুরগেটরি থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। চার্চ লিখিতভাবে মুক্তির সনদও দিয়ে দিত। এটাকে ইনডালজেন্স বলা হতো। ক্রুসেড যুদ্ধের আগেও ইউরোপে জান্নাতের টিকিটবিক্রির রেওয়াজ ছিল। ক্রুসেডের পর পোপ দ্বিতীয় আরবান জান্নাতের টিকিট বিক্রিকে আইনি রূপ দিয়েছিল। ক্রুসেডের সময় পোপ এই জান্নাতি টিকিটের 'অস্ত্র' ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছিল। এই টিকিটের লোভ দেখিয়ে মানুষকে ক্রুসেডে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করা হতো। তাদেরকে বলা হয়েছিল,

যারাই ক্রুসেডে অংশ নিবে তাদের যাবতীয় গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। পাপমোচনের লোভে হাজারো খ্রিস্টান পঙ্গপালের মতো ক্রুসেডে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

ক্রুসেড শেষ হওয়ার পর লড়াইয়ের বদলে গুনাহ মাফ করার ব্যবস্থা ছিল না। এখন কী হবে? খ্রিস্টানবাহিনী তো গো হারা হেরে এসেছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে চার্চ নতুন কৌশলের আশ্রয় নিল। চার্চের দায়িত্বশীলরা মানুষের কাছ থেকে টাকা নিয়ে জান্নাতের টিকিট বিক্রি শুরু করে দিলো। সাধারণ জনগণ দলে দলে টিকিট কেনার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ধূর্ত চার্চ কর্তৃপক্ষ এটাও ঠিক করে দিয়েছিল, কোন পাপের জন্য কতদিন পুরগেটরিতে থাকতে হবে। কেউ চার্চের কাছে এলে তার জীবনবৃত্তান্ত শুনে চার্চ বলে দিত, তুমি এতদিন বা এত বছর পুরগেটরিতে থাকবে। পুরগেটরির মেয়াদ কখনো শতক, কখনো হাজার, কখনো লাখো বছরে গিয়ে ঠেকত। পুরগেটরির মেয়াদের আলোকেই ইনডালজেন্সের দরদাম ওঠানামা করত। চার্চ জানতে চাইত, তুমি পুরগেটরি থেকে কতদিন কমাতে চাও? সে হিসেবে টাকা নির্ধারণ করা হতো। যতবেশি টাকা তত বেশিদিন পুরগেটরি থেকে মুক্তি।

তখন এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল, পোপ চাইলে নিজের মর্জিতেই পুরগেটরির মেয়াদ ১৯ লাখ বছরেরও বেশি মেয়াদ কমিয়ে দিতে পারেন। এটা পোপের এক্তিয়ারাধীন ছিল। চার্চ শুধু জীবিত লোকদের জন্যই ইনডালজেন্স বিতরণ করত না, মৃতদের জন্যও জান্নাতি টিকিট বিক্রি করতে শুরু করেছিল। নতুন অফার আসার পর জান্নাতি টিকিট বিক্রির পরিমাণ কয়েক শ গুণ বেড়ে গিয়েছিল। জীবিত মানুষগুলো তাদের মৃত প্রিয়জনের জন্যও ইনডালজেন্স কিনতে শুরু করে দিয়েছিল।

জান্নাতি টিকিট বিক্রির অফুরন্ত টাকায় চার্চগুলোর ধনভান্ডার ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগল। এসব টাকা দিয়ে চার্চ চারিদিকে নতুন নতুন চার্চ নির্মাণ করতে শুরু করল। চার্চে কর্মরত যাজক ও কর্মকর্তাদের বসবাসের জন্য আলিশান প্রাসাদ নির্মাণ হতে লাগল। ইউরোপজুড়ে তখন রেনেসাঁ বা পুনর্জাগরণ ছিল তুঙ্গে। ইউরোপের দিকে দিকে গ্রিক পদ্ধতিতে জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদ নির্মিত হচ্ছিল। অগাধ টাকার বিনিময়ে মূর্তি তৈরি হতে লাগল। বিপুল অর্থ ব্যয়ে চার্চের দেয়ালে চিত্রকলা অঙ্কিত হচ্ছিল। চার্চের দেয়াল অলংকৃত করার জন্য বিশ্বের সেরা সেরা চিত্রকরদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।

চিত্রকররা দিনের পর দিন ব্যয় করে চার্চের দেয়ালে, ছাদে বাইবেলের গ... কাহিনি ফুটিয়ে তুলেছিল। এত বিপুল অর্থের যোগান আসত ইনডালজেন্স বিক্রির টাকা থেকে।

চার্চ যখন ইনডালজেন্স বিক্রির মতো চরম অনৈতিক কাজে আপাদমস্তক নিমজ্জিত ছিল, তখন চার্চেরই কিছু লোক এই গর্হিত কাজের প্রচণ্ড বিরোধী ছিল। তারা আক্ষেপ করে মরত, পবিত্র ধর্মালয়কে টাকা বানানোর মেশিনে পরিণত করা হয়েছে। তাদের মর্মযাতনা আরো বেড়ে যেত যখন দেখত, ধনীরা সহজেই ইনডালজেন্স কিনে পরকালীন মুক্তি (?) নিশ্চিত করে ফেলছে আর গরিবদের পুরগেটরিতে রেখে দেওয়া হচ্ছে। পয়সার অভাবে তারা টিকিট কিনতে পারছে না। এহেন দুষ্কর্ম খ্রিস্টের রেখে যাওয়ার আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ ছিল। খ্রিস্টবিশ্বাস মতে, একটা উট সুইয়ের ছিদ্র দিয়ে পার হওয়া যত কঠিন, একজন ধনী জান্নাতে যাওয়া তার চেয়ে বেশি কঠিন। জান্নাতের টিকিট বিক্রিতে এই খ্রিস্টীয় মূলনীতি সম্পূর্ণ উল্টে দেওয়া হয়েছিল যে, ধনীরা জান্নাতে যাচ্ছে আর গরিবরা জাহান্নামে। টিকিট বিক্রির টাকায় চার্চের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের পকেট দিনদিন ভারী হয়ে উঠছিল। স্থানীয় চার্চের লোকজন নিজেরা ভাগ-বাটোয়ারা করার পর যা বাঁচত, সেটা পোপের কাছে পাঠিয়ে দিত।

চার্চের অভ্যন্তরে যারা ইনডালজেন্স বিক্রিকে অনৈতিক মনে করত, তারা প্রথমে মৃদু আওয়াজে বিরোধিতা করতে শুরু করল। সে সময় চার্চ অত্যন্ত শক্তিধর ছিল। সাধারণ মানুষকে জ্ঞানবিজ্ঞান ও বিদ্যা-বুদ্ধিতে পিছিয়ে রাখার জন্য সবরকমের বন্দোবস্ত করে রেখেছিল। বাইবেল ছাড়া অন্য কিছু পড়া নিষিদ্ধ ছিল। আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শন পড়াও নিষিদ্ধ ছিল। শুধু পাদরিরাই পড়াশোনা করার অধিকার রাখত। জনগণকে নিরক্ষর রাখার সর্বাত্মক প্রয়াস চালানো হতো। যারা আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান ও দর্শন চর্চা করত, তাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হতো। তাদের ঘরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হতো। নিরপরাধ নারীকে ডাইনি অপবাদ দিয়ে পুড়িয়ে মারা হতো। চার্চের কর্তৃত্ব, চার্চের দেওয়া নির্দেশনার ওপর যারা প্রশ্ন ওঠাত, তাদেরকে শেষ করে দেওয়া হতো। চার্চের আইনে যারা অপরাধী সাব্যস্ত হতো, তাদেরকে খুঁটির সাথে বেঁধে পায়ের নিচে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হতো। এসবের মাধ্যমে চার্চ শতকের পর শতক সমাজে নিজের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। এভাবেই চার্চ মানুষের মুখ বন্ধ রাখতে পেরেছিল।

চার্চের তীব্র নিষ্পেষণে সাধারণ মানুষ তার স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধিই হারিয়ে বসেছিল। মানুষ স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারত না। বলা ভালো, চিন্তা করার সাহস পেত না। চার্চ এ কথা প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিল : চার্চ যা বলে, এর বাইরে সত্য-সুন্দর কিছু হতেই পারে না। যারা চার্চের প্রতি নিরঙ্কুশ আনুগত্য করে চলে, তারাই ভালো মানুষ। তারাই মুক্তিপ্রাপ্ত। চার্চের বিরোধিতা করা ভালো মানুষের কাজ নয়। দীর্ঘদিনের নির্যাতন-নিষ্পেষণে সাধারণ লোকজন প্রতিবাদের সাহস ও শক্তি হারিয়ে বসেছিল।

পাদরিরাই যেহেতু সর্বশক্তিমান ছিল, তাই ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু থেকে কায়েমি স্বার্থের বিরুদ্ধে প্রশ্ন ওঠানো হলে, তাহলে কাজ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। ভেতরের কেউ কণ্ঠস্বর উঁচু করলে চার্চের জন্য সেটা শক্ত চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াত। ১৫১৫ সালে এমন কিছুই ঘটল। জার্মানির এক ব্যক্তি চলমান বৈষম্য, অনৈতিক কর্মকাণ্ডের শুধু বিরোধিতাই নয়, চার্চের বিরুদ্ধে খোলামেলা বিদ্রোহও করেছিল। তার সেই বিদ্রোহ এমন এক আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিল, যার প্রভাব আজও খ্রিস্ট দুনিয়াতে প্রবলভাবে বিদ্যমান। খ্রিস্টবিশ্বের সম্ভবত সবচেয়ে বড় বিদ্রোহী বিপ্লবীর নাম ছিল মার্টিন লুথার। মার্টিন লুথার শুধু ক্যাথলিক চার্চের ক্ষমতাকেই চ্যালেঞ্জ করেনি, তার আন্দোলন গোটা ইউরোপে এমন অভূতপূর্ব পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছিল যে, মানুষ চিন্তাভাবনার শক্তি আর সাহস ফিরে পেয়েছিল। ইউরোপে জাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল। ইউরোপ ভাবনা-চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছিল। এই ভাবনা-চিন্তার অভ্যেস আর সাহসই ইউরোপকে এশিয়া থেকে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আর এটিই ইউরোপকে বস্তুগত দিক থেকে অগ্রসর করে দিয়েছে।

মার্টিন লুথার ১৪৮৩ সালে জার্মানির এলেবেন শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বাবার ইচ্ছা ছিল, মার্টিন একজন আইনজীবী হোক। মার্টিনের ঝোঁক ছিল ধর্মের প্রতি। ওকালতি পড়া মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে মঙ্ক (পাদরি) হওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল মার্টিন লুথার। ক্যাথলিক ধর্মে মঙ্করা বিয়ে করত না। ধর্মের কাজেই জীবন উৎসর্গ করার শপথ নিত। মঙ্কদের থাকার জায়গাকে মনাস্ট্রি বলা হয়। মার্টিন লুথারও মনাস্ট্রিতে থাকতে শুরু করল।

কথিত আছে, ১৫০৫ সালে মার্টিন যখন যুবক ছিল, সাগরপথে কোথাও যাচ্ছিলেন। জাহাজ ঝড়ের কবলে পড়ে। উত্তাল সমুদ্রে জাহাজ ডুবি ডুবি অবস্থা। বিকট আওয়াজে বাজ পড়ছে। আগুনের মতো বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

মার্টিন ভয় পেয়ে ঈশ্বরের কাছে মানত করলেন, এবারের মতো বেঁচে গেলে বাকি জীবন মঙ্ক হয়ে কাটিয়ে দিবেন। অবশেষে জাহাজ নিরাপদে নোঙর করল। মার্টিন বাড়ি ফিরে মনাস্ট্রিতে যোগ দিলেন। কিছুদিন পর ধর্মীয় উচ্চশিক্ষার জন্য ভ্যাটিকানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। মুসলমানদের যেমন মক্কা, ক্যাথলিকদের কাছে তেমন ভ্যাটিকান। ধর্মীয় রাজধানী, আধ্যাত্মিকতার কেন্দ্রবিন্দু।

মার্টিন লুথার অনেক ভক্তিশ্রদ্ধা ও মহব্বত-ভালোবাসা নিয়েই রোমে গিয়েছিলেন। ভ্যাটিকানে গিয়ে মার্টিন যা দেখলেন, তাতে চোখ ছানাবড়া। ভক্তি-শ্রদ্ধা সব উবে গেল। রোমের পাদরিরা ধর্মকে স্রেফ ব্যবসা বানিয়ে রেখেছে। ধর্মীয় কাজকর্মের বিনিময়ে সাধারণের কাছ থেকে দেদার টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। ধর্মালয়গুলোতে টাকপয়সার ছড়াছড়ি। চার্চ-গির্জাগুলোর বাহ্যিক চাকচিক্য আর জাঁকজমক বাড়ানোর দিকেই ছিল পাদরিদের যাবতীয় মনোযোগ। গরিবের সম্পদ দুই হাতে লুটে পাদরিরা নিজেদের বিলাসব্যসনে দেদারসে খরচ করছে। রোমের অধিকাংশ পাদরি ধর্মের প্রতি কোনো বিশ্বাসই রাখত না। ধর্মের বিধানগুলোর দিকেও তারা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখত। মার্টিন লুথার রোম সফরের বৃত্তান্ত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, রোমের পাদরিরা আমাদের মতো সহজ-সরল পাদরিদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত। আমাদেরকে তারা নির্বোধ ঠাওরাতো। আমাদের একটা পূজা করতে যতক্ষণ সময় ব্যয় হতো, ততক্ষণে রোমের পাদরিরা ৭-৮ টা পূজাপাট সেরে ফেলত। কারণ, যত বেশি পূজা ততবেশি টাকা। অথচ আমরা মানুষের জন্য পূজা দিয়ে তাদের কাছ থেকে কোনো টাকা নিতাম না। সম্পূর্ণ ফ্রি ধর্মীয়কৃত্য সেরে দিতাম।

রোমের ক্যাথলিক চার্চ সম্পর্কে এমনটাই ছিল মার্টিন লুথারের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ। মার্টিন লুথার জার্মানি ফিরে এলো। কিছুদিন পর এক ঘটনায় চার্চ আর মার্টিন লুথার মুখোমুখি অবস্থানে চলে গেল। ১৫১৫ সালে পোপ দশম লিয়ো সিদ্ধান্ত নিল, রোমে 'সেন্ট পিটারস ব্যাসিলিকা' নির্মাণ করবে। খ্রিস্টবিশ্বাস মতে, এখানে রোমান ক্যাথলিক চার্চের প্রতিষ্ঠাতা, যিশুর ঘনিষ্ঠ সহচর সেন্ট পিটারকে দাফন করা হয়েছে। তার সমাধির ওপর একটা স্মৃতিসৌধ বানানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলো। এজন্য বিপুল পরিমাণ অর্থের দরকার। পোপ ইউরোপের চার্চগুলোতে চিঠি লিখে জানাল, সৌধ নির্মাণের জন্য মোটা অঙ্কের টাকা-পয়সা দরকার। জান্নাতের টিকিট বিক্রি

তেজোদীপ্ত করতে হবে। বিক্রির টাকা জরুরি ভিত্তিতে রোমে পাঠিয়ে দিতে হবে। পোপের কথামতো জার্মানিতেও ইনডালজেন্স বিক্রি শুরু হয়ে গেল। সাধারণ মানুষকে টিকিট কিনতে বাধ্য করার জন্য চার্চের লোকজন নানা ধূর্তকৌশলের আশ্রয় নিতে শুরু করল। এক পাদরি টাকা তুলতে গিয়ে এমনটাও বলেছিল, চার্চের ভান্ডারে যখন কেউ একটা পয়সা ছুড়ে মারে, পয়সা যেভাবে ঝনঝন শব্দে ছিটকে ওপরের দিকে ওঠে, পুরগেটরি থেকেও রুহ সেভাবে লাফিয়ে বের হয়ে জান্নাতে চলে যায়। নাজাতের রাস্তা খুবই আসান। চার্চে দান করো, লাফিয়ে জান্নাতে চলে যাও। এমন প্রচারণায় প্রভাবিত হয়ে সাধারণ লোকজন দেদারসে ইনডালজেন্স কিনতে শুরু করে দিলো।

মার্টিন লুথার চুপচাপ এসব দেখে যাচ্ছিলেন। তার বুঝতে বাকি থাকল না, জান্নাতের টিকিটের নাম করে মূলত সমাধিসৌধ নির্মাণের তহবিল সংগ্রহ করা হচ্ছে। মার্টিন আগে থেকেই চার্চের গলা পরিমাণ দুর্নীতি নিয়ে সীমাহীন পেরেশান ছিলেন। এবার জান্নাতের টিকিট বিক্রির নোংরা ধান্ধা দেখে মার্টিন আর চুপ থাকতে পারলেন না। চার্চের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কথা বলতে শুরু করে দিলেন। প্রচলিত বিপ্লবীদের মতো চার্চের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের বদলে যুক্তিতর্ক দিয়ে চার্চের মোকাবেলা করতে শুরু করলেন। মার্টিন লুথার একটা সুদীর্ঘ দলিল প্রস্তুত করলেন। তাতে ধর্মগ্রন্থ থেকে অসংখ্য দলিল দিয়ে জান্নাতের টিকিট বিক্রিকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। ওই দলিলকে নাইনটি ফাইভ থিসিস বলা হয়। ওই দলিলনামায় ৯৫টি দলিল দেওয়া হয়েছিল। সেন্ট পিটারস ব্যাসিলিকা নির্মাণকে ভুল প্রমাণ করা হয়েছিল। পোপের ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল।

মার্টিন লুথার লিখেছিলেন, জার্মানিদের এই স্মৃতিসৌধের কোনো প্রয়োজনই নেই। স্মৃতিসৌধের পেছনে অযথা অর্থ অপচয় না করে দেশে যেসব চার্চের ভগ্নদশা, সেগুলোকে মেরামত করা বেশি জরুরি। মার্টিন লুথার বলেছিলেন, আজ স্মৃতিসৌধ নির্মাণের দোহাই দিয়ে টাকা তোলা হচ্ছে, কাল অন্য কিছুর জন্য টাকা তোলা হবে। এভাবে আমাদের টাকা দিয়ে রোমে প্রাসাদের পর প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে। পোপ ও ধনী পাদরিরা নিজেদের টাকায় কেন এই স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করছে না? পোপের কর্তব্য হলো, ইতিমধ্যে স্মৃতিসৌধ যতটুকু নির্মিত হয়েছে, সেটা ভেঙে বিক্রি করে গরিবদের মাঝে সে টাকা বিলিয়ে দেওয়া। যেসব গরিবের কাছ থেকে জান্নাতের টিকিটের নাম করে পয়সা লুটে নেওয়া হয়েছে, তাদের পয়সা ফেরত দেওয়া হোক।

অন্যের পাপ ক্ষমা করার অধিকার কোনো মানুষের আছে কি না—এ নিয়েও মার্টিন প্রশ্ন তুললেন। মার্টিন দলিল দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন, পুরগেটরিতে সাজা ভোগ করা আত্মাকে মাফ করার ক্ষমতা পোপের নেই। এই সাজা খোদার পক্ষ থেকে ধার্য করা হয়েছে; পোপের পক্ষ থেকে নয়। মার্টিন লুথার তার এই দলিলপত্রকে জার্মানির ভ্যাটিকানবার্গের প্রধান চার্চ 'অল সেন্টস চার্চ'-এর প্রধান ফটকে লটকে দিলেন। জান্নাতের টিকিট বিক্রির বিষয়ে চার্চের লোকজনকে ধর্মীয় বিতর্কের আহ্বান জানানো হলো।

রোমান ক্যাথলিক চার্চ মার্টিনের এহেন ধৃষ্টতা বরদাশত করতে পারল না। চার্চের পক্ষ থেকে মার্টিনকে বিদ্রোহী আখ্যা দেওয়া হলো। চার্চের আদালতে মার্টিনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হলো। সে সময় চার্চের বিরোধিতাকারীদের জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে মারা হতো। এ ছাড়া অমানুষিক নির্যাতন আর দীর্ঘদিন বন্দি করে রাখার ঘটনার কোনো শেষ নেই। মার্টিন লুথার জন্মের ৫০ বছর আগে ফ্রান্সের স্বাধীনতাকামী নারী জোয়ান অব আর্ককে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। মার্টিন লুথারেরও এমন পরিণতি হওয়ার সমূহ আশঙ্কা ছিল। মার্টিন লুথারের ভাগ্য ভালো, তার উপস্থাপন করা ৯৫ দলিলবিশিষ্ট নথি জার্মান জনগণের মধ্যে বিপুল সাড়া ফেলে দিয়েছিল। লোকজন মার্টিনের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছিল। জার্মান ক্যাথলিকরা বুঝতে পেরেছিল, জান্নাতের টিকিটের নাম করে এতদিন ধরে তাদের সম্পদ লুঠ করা হয়েছে। তাদের টাকায় রোমের স্বার্থান্বেষী পোপ-পাদরিদেরই পকেট ভারী হয়েছে। তাদের রক্ত পানি করা টাকায় রোমের গির্জা-চার্চের শোভা বৃদ্ধি করা হয়েছে। দিনশেষে পোপ-পাদরিদের শক্তি বাড়িয়েছে। টিকিট ক্রয়কারী গরিব মানুষটার কোনো উপকারই হয়নি।

জার্মানিতে মার্টিনের জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা দিনদিন বৃদ্ধি পেতে লাগল। এমতাবস্থায় মার্টিনের বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনা করা চার্চের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়াল। ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও মার্টিনের বিরুদ্ধে চার্চ একটি কঠিন মামলা রুজু করল। মামলাটা ছিল খুবই জটিল ধরনের। কয়েক বছর ধরে এই মামলা ধুঁকে ধুঁকে চলে। মার্টিন লুথার বারবার মামলার শুনানিতে হাজির হলেন। নানা হয়রানি সত্ত্বেও মার্টিন নিজের অবস্থানে অটল থাকলেন। চার্চের বিরুদ্ধে অকুতোভয়ে রুখে দাঁড়ানোর কারণে মার্টিনের জনপ্রিয়তা এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে, জার্মানির লোকজন তাকে নিজেদের মাসিহা-মুক্তিদূত মনে করতে শুরু করেছিল। মার্টিন যেখানেই যেতেন, তাকে অভ্যর্থনা জানানোর

জন্য বিপুল জনসমাগম ঘটত। চার্চ সাজা ঘোষণা করতে ভয় পাচ্ছিল। চার্চের প্রতি অনুগত স্থানীয় রাজারাও রাজনৈতিক কারণে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছিল না। জনরোষের মুখে পড়ার ভয় ছিল। চার্চ ভিন্ন কৌশলে আগানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। চার্চ চাইছিল, মার্টিন লুথার চার্চের বিরোধিতা করার পাপ (?) থেকে তওবা করুক, ৯৫ দলিল থেকে সরে এসে নিজের ভুল স্বীকার করুক। আগের মতো চার্চের প্রতি অনুগত হোক। এজন্য চার্চ রোমান সম্রাটের সাহায্য গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিল। সম্রাটের কাছে পোপ আবেদন জানাল, তিনি যেন মার্টিন লুথারকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে রাজি করান।

পোপের পক্ষ থেকে এই আবেদনের কারণ ছিল, রোমান সম্রাট পোপের আনুগত্য করত। সম্রাটের অভিষেক পোপের হাত দিয়েই হতো। তখন সম্রাট ছিল পঞ্চম চার্লস। পোপের কথামতো মার্টিন লুথারের সাথে সম্রাট কথা বলল। কাজ হলো না। মার্টিন লুথারকে মানানো গেল না। মার্টিন লুথার সম্রাটকে জবাব দিয়েছিলেন, আমি কোনো অবস্থাতেই ইনডালজেন্সের পক্ষে অবস্থান নিতে পারব না। আমার বিবেক কোনো অবস্থাতেই এটা মেনে নিতে পারবে না। অগত্যা পোপ ১৫২০ সালে ফরমান জারি করল, মার্টিন লুথার পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। মার্টিন লুথারকে হুকুম দেওয়া হলো, ১২০ দিন অর্থাৎ চার মাসের মধ্যে রোমে এসে যাবতীয় কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুক। মার্টিন লুথার পোপের হুকুম মানতে সাফ অস্বীকার করলেন। এর মাধ্যমে মার্টিন লুথার চার্চ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেলেন।

মার্টিন এরপর থেকে ধর্মীয় শিক্ষার সংস্কার করতে শুরু করে দিলেন। ১২০ দিন পর মার্টিন লুথারকে ক্যাথলিক ধর্ম থেকে বহিষ্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। পোপ এই ঘোষণা দিয়ে মনে শান্তি পেল না। এত অল্প শাস্তিতে পোপের মন ভরল না। পোপ চাচ্ছিল, মার্টিনকে চার্চ অবমাননার স্বাদ চাখাতে। পোপ এবার রোম সম্রাটকে বলল, মার্টিনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। সম্রাট হুকুম দিলো, মার্টিনের লিখিত সমস্ত বইপত্র পুড়িয়ে দেওয়া হোক। তখন ইউরোপ জুড়ে গ্রিক দার্শনিক প্লেটো, এরিস্টটল ও অন্যান্য দার্শনিকের বইপত্র পোড়ানো হতো। এসব বই পড়ার জন্য মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেওয়া হতো। এমন হুকুম মার্টিন লুথারের বইপত্রের ব্যাপারেও জারি করা হলো। হুকুম জারির পর রাজার সেনারা দেশজুড়ে মার্টিনের বইপত্র তল্লাশি শুরু করে দিলো।

ব্যক্তি মার্টিনের বিরুদ্ধে রাজা সরাসরি কোনো ব্যবস্থা নিতে পারল না। কারণ, মার্টিনকে কিছু শুভানুধ্যায়ী নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিল। আত্মগোপনে থাকাবস্থায় মার্টিন লুথার বাইবেলকে ল্যাটিন থেকে জার্মান ভাষায় অনুবাদ করলেন। এতদিন ধর্মীয় বইপুস্তক শুধু ল্যাটিন ভাষাতেই লেখার রেওয়াজ ছিল। মার্টিন এই প্রথা ভেঙে দিলেন। বাইবেলের অনুবাদ মার্টিনের অন্যতম সেরা কর্ম হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

এক বছর লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকার পর মার্টিনের হিতাকাঙ্ক্ষীরা যখন বুঝতে পারল, এখন আর মার্টিনের প্রাণনাশের আশঙ্কা নেই, তখন মার্টিন জনসমক্ষে আবির্ভূত হলেন। প্রকাশ্যে নিজের আন্দোলন শুরু রাখলেন। খ্রিস্টান সমাজে নতুন আরেকটি দলের জন্ম হলো। তাদেরকে প্রটেস্ট্যান্ট বলা হয়। এই নামকরণের পেছনে ঘটনা আছে। রোমান সম্রাট অধীনস্থ প্রশাসককে হুকুম দিয়েছিল, মার্টিন লুথারের বইপত্র জ্বালিয়ে দিতে। তখন অনেক স্থানীয় সামন্তরাজা এই হুকুমের বিরুদ্ধে প্রটেস্ট অর্থাৎ প্রতিবাদ জানিয়েছিল। এখান থেকেই মার্টিন লুথারের অনুসারীদেরকে প্রটেস্ট্যান্ট বলা হয়।

প্রটেস্ট্যান্টরা তাদের বিশ্বাস থেকে পুরগেটরির ধারণাকে বিলুপ্ত করে দিয়েছিল; জান্নাতের টিকিট বিক্রির তো প্রশ্নই আসে না। কারণ, পুরগেটরি থেকেই ইনডালজেন্স বিক্রির প্রাসঙ্গিকতা আসে। ধর্মীয় ক্ষেত্রে পোপের কর্তৃত্ব মানতেও অস্বীকার করল। প্রটেস্ট্যান্টরা শেখাতে শুরু করল, তাদের মুক্তি স্রেফ বাইবেলে আছে। পোপ নিজের খাহেশ বা হুকুম দিয়ে কাউকে নাজাত দিতে পারে না। একজন মানুষ যত গরিবই হোক, সৎকর্ম করে স্বর্গে যেতে পারবে। জান্নাতে যাওয়ার জন্য কোনো মানুষের কাছ থেকে টিকিট বা অনুমোদন নিতে হবে না। মার্টিন লুথারের জীবদ্দশাতেই তার শিক্ষা বিদ্যুতের মতো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল। লুথারের সংস্কার আন্দোলন সাফল্যের মুখ দেখল। ১৫৪৬ সালে লুথার মারা গিয়েছিলেন। ততদিনে সংস্কার আন্দোলন ইউরোপের কয়েকটি দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রটেস্ট্যান্ট আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে ক্যাথলিক চার্চ তার প্রভাব প্রতিপত্তি হারাতে শুরু করেছিল। খুব দ্রুত চার্চের শক্তি ও ক্ষমতা দুর্বল হয়ে আসছিল।

প্রটেস্ট্যান্ট আন্দোলনের মূল সুরই ছিল, অন্ধ অনুকরণের বিরোধিতা করা। প্রটেস্ট্যান্টরা পুরোনো বস্তাপচা ধর্মীয় কুসংস্কার ও অচলায়তনের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল। এর মাধ্যমে ইউরোপিয়ানরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে অভ্যস্ত

হয়ে উঠেছিল। ইউরোপিয়ানরা চার্চের চোখ রাঙানির বাইরে এসে মুক্তচিত্তে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার পথে অগ্রসর হতে শিখল। যেসব বইপত্র নিষিদ্ধ ছিল, যেসব বই চার্চ জ্বালিয়ে দিত, সেগুলো বাধাহীনভাবে পড়া হচ্ছিল। চিন্তা জাগানিয়া বই, আধুনিক বিজ্ঞানের বই, দর্শনচিন্তার বই উন্মুক্তভাবে পড়াপড়ি শুরু হলো। এসব বই পড়ার প্রভাবে আরো নতুন চিন্তার জন্ম হচ্ছিল। একজনের চিন্তার সাথে আরেকজনের চিন্তার লেনদেন হচ্ছিল। এভাবে জন্ম নিচ্ছিল আরো নতুন চিন্তা। চিন্তা বিনিময়ের ফলে ভুলত্রুটি ধরা পড়ছিল; সংশোধন হচ্ছিল। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ইত্যাদি মতবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। মানুষ যখন নির্ভয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারে, তখন সেখানে একচিন্তা থেকে আরো চিন্তার জন্ম হয়। ক্যাথলিক আধিপত্যের যুগে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র মুক্তভাবে বিকশিত হতে পারেনি। পোপ-চার্চ দ্বারা মুক্তচিন্তা বারবার বাধাগ্রস্ত হয়েছিল। গণতন্ত্র, জাতি-রাষ্ট্র মূলত গ্রিকচিন্তার ফসল। ক্যাথলিক যুগে গ্রিকচিন্তার চর্চা নিষিদ্ধ ছিল। জাতীয়তাবাদী চিন্তার প্রসারে প্রটেস্ট্যান্ট মতবাদ প্রধান সহায়ক ছিল। ইউরোপের লোকেরা ধর্মের তুলনায় নিজ নিজ এলাকা নিয়ে গর্ব করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠল। ধর্মের চেয়ে অঞ্চল বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। এখন 'সন অব দ্যা সয়েল'-ভূমিপুত্র বলাই বেশি গর্বের ছিল। ধর্মীয় পরিচয় গৌণ হয়ে গিয়েছিল।

প্রটেস্ট্যান্ট আন্দোলনের প্রভাবে ইউরোপের বহু দেশ ক্যাথলিক থেকে প্রটেস্ট্যান্ট হয়ে গেল। নিজেদের চার্চ বদলে ফেলল। যারা আমূল বদলাতে পারল না, তারা নামে ক্যাথলিক হলেও চিন্তায় প্রটেস্ট্যান্ট হয়ে গেল। চার্চ অব ইংল্যান্ড এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই চার্চ পোপের অধীনে চলে না। ইউরোপের রাজা ও জনগণের ওপর পোপের কর্তৃত্ব খতম হয়ে গিয়েছিল। রাজনৈতিক প্রভাব তো আরো আগেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। একপর্যায়ে গোটা ইউরোপ থেকেই পোপের প্রভাব খর্ব হয়ে গেল। পোপ একদিকে আর রাষ্ট্র চলে গেল আরেক দিকে। এখান থেকেই সেকুলার রাষ্ট্রচিন্তার উদ্ভব। নতুন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের ওপর চার্চের কোনো হুকুম চলত না, চার্চের ওপরও রাষ্ট্রের হুকুম চলত না। ধীরে ধীরে ধর্ম যার যার ব্যক্তিগত বিষয়ে পরিণত হয়ে গেল। এই মতবাদ একসময় ইউরোপীয় জনজীবনে পোক্ত হয়ে উঠল—ধর্ম প্রত্যেকের ব্যক্তিগত বিষয়।

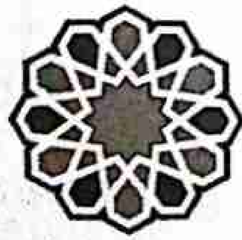
ইউরোপ জুড়ে সেকুলারিজম ও ডেমোক্রেসির প্রসার সত্ত্বেও পোপের তূণীরে একটা তির তখনো মজুদ ছিল। সে তিরের নাম ছিল 'পাপাল স্টেট'।

রোমশহরসহ ইতালির কিছু কিছু এলাকার ওপর তখনো পোপের নিয়ন্ত্রণ বজায় ছিল। এসব এলাকায় পোপের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষমতা বহাল ছিল। ইউরোপে জাতীয়তাবাদের যে জোয়ার বইছিল, পাপাল স্টেটও তার বাইরে ছিল না। ১৮৭০ সালে ইতালির সরকার পোপের অধীনে থাকা সর্বশেষ সুরক্ষিত অঞ্চলে হামলা করল। ইতালি তখন যুক্তরাজ্য হওয়ার চেষ্টায় ছিল। পাপাল স্টেট ছাড়া বাকি পুরো ইতালি এক শাসকের অধীনে এসে গিয়েছিল। রোম আর পাপাল স্টেট বাকি ছিল। জাতীয়তাবাদের তোড়ে রোম ও পাপাল স্টেটের জনগণও পোপের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করছিল। চারিদিকে পোপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মতো পরিবেশ বিরাজমান ছিল। জনগণের চাহিদা ছিল, পাপাল স্টেটগুলোও বৃহত্তর ইতালির অংশ হয়ে যাক। রোম ইতালির রাজধানী হোক। ইতালির মোকাবেলা করার মতো সেনা পোপের কাছে ছিল না। ইতালি অনায়াসে পোপবাহিনীকে হারিয়ে দিলো। এর মাধ্যমে পোপের সর্বশেষ রাজনৈতিক ক্ষমতা শেষ হয়ে গেল। পোপ ও চার্চের দীর্ঘ কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব শেষ হয়ে গেল। পোপ এরপর থেকে শুধু চার্চের অভ্যন্তরীণ বিষয় দেখাশোনা করত। সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা পোপের ছিল না। যে মানুষ গোটা ইউরোপের ওপর ছড়ি ঘোরাত, তার অধীনে এক ইঞ্চি জমিনও থাকল না।

৫০ বছর পর পোপকে প্রতীকীভাবে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া হলো। সরাসরি শাসনের জন্য পোপকে ছোট্ট একটা এলাকা দেওয়া হলো। ১৯২৯ সালে ইতালির স্বৈরশাসক বেনিতো মুসোলিনি পোপের সাথে একটা চুক্তি করল। এই চুক্তিকে ল্যাটারান ট্রিটি বলা হয়। এই চুক্তির অধীনে ক্যাথলিক চার্চ রোম ও পাপাল স্টেটের ওপর থেকে নিজেদের দাবি ছেড়ে দিয়েছিল। রোমের অধীনে গঠিত ইতালি রাষ্ট্রকেও পোপ মেনে নিয়েছিল। বিনিময়ে ইতালি সরকার পোপকে ভ্যাটিকান সিটির শাসনক্ষমতা অর্পণ করেছিল। রঙচঙা পোশাক পরা সুইস গার্ডরা এই শহরের নিরাপত্তার দিকটা দেখে।

এই ছিল পোপের উত্থান-পতন ও ইউরোপ উত্থানের সংক্ষিপ্ত গল্প। একজন ব্যক্তির প্রভাবে পুরো ইউরোপের গতিপথই বদলে গিয়েছিল। ইউরোপের উত্থান ঘটার আরো বহু কারণ ছিল। তবে ক্রুসেড ও মার্টিন লুথার ছিল অন্যতম প্রধান কারণ। আবার এ কথা মনে করা মোটেও ঠিক হবে না যে, দুনিয়া থেকে ক্যাথলিক চার্চের ক্ষমতা একেবারে শেষ হয়ে গেছে। মনে রাখতে হবে, এখনো দুনিয়ার সবচেয়ে বড়, শক্তিশালী ও বিত্তশালী সংগঠনের

নাম ক্যাথলিক চার্চ। ক্যাথলিক চার্চের আধ্যাত্মিক প্রভাব এখনো দুনিয়ার বিরাট একটি অংশে বিদ্যমান আছে। দুনিয়ার নানাপ্রান্তে ছড়িয়ে থাকা ক্যাথলিকরা এখনো ধর্মের ব্যাপারে পোপকেই চূড়ান্ত ব্যক্তি মনে করে থাকে। পৃথিবীতে ক্যাথলিকদের সংখ্যা প্রায় ১.৩ বিলিয়ন তথা একশ ত্রিশ কোটি। প্রটেস্ট্যান্টদের জনসংখ্যা এক বিলিয়নের চেয়ে কিছু কম। সংখ্যায় কম হলেও তাদের হাত দিয়েই মূলত ইউরোপের বর্তমান উত্থানের সূচনা হয়েছে। চার্চ ও রাষ্ট্র আলাদা হওয়ার ঘটনায় মুগ্ধ হয়ে একদল লোক মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতেও একই ধারণা-মতবাদ প্রচার করে। এই পাশ্চাত্যপূজারিরা বিকৃত খ্রিস্টবাদ ও বিশুদ্ধ ইসলামকে এক মনে করে গুলিয়ে ফেলে। বিকৃত খ্রিস্টবাদ জাগতিক উন্নতির ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইসলাম কখনো জাগতিক উন্নতির ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। মুসলিমরা যতবেশি ইসলামকে আঁকড়ে ধরবে, ততবেশি তাদের জাগতিক ও পারলৌকিক উন্নতি হবে।



উপমহাদেশে সামরিক অভ্যুত্থান

১৮ শতকের শেষদিকে এক দীর্ঘ যুদ্ধের পর ব্রিটেনের কাছ থেকে আমেরিকা স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছিল। জর্জ ওয়াশিংটন ছিলেন স্বাধীনতা যুদ্ধের নায়ক। ৭ জনকে আমেরিকার ফাউন্ডার ফাদার বিবেচনা করা হয়। জর্জ ওয়াশিংটন, বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন, জন অ্যাডামস, টমাস জেফারসন, জেমস ম্যাডিসন, জন জে ও আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন। এরা সবাই জর্জের সহযোদ্ধা ছিল। এরা আমেরিকার ফাউন্ডার ফাদার হিসেবে পরিচিত। ১৭৭৬ সালের ৪ জুলাই মার্কিন স্বাধীনতার দলিল স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এই দিনকেই আমেরিকা স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করে থাকে। জর্জ ওয়াশিংটন সেদিন স্বাক্ষর প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল না। জর্জ ওয়াশিংটন আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিল। আমেরিকান দুই ডলারের নোটে স্বাধীনতার দলিলে স্বাক্ষরপ্রদান অনুষ্ঠানের ছবি উৎকীর্ণ আছে।

স্বাধীনতার ঘোষণায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ পড়েছিল। সেই ঘোষণায় আমেরিকার লাখো কৃষ্ণাঙ্গদের দাসমুক্তির বিষয়ে কোনো কথা ছিল না। সেটি ছিল শ্বেতাঙ্গ জাতির স্বাধীনতার দলিল। পাঁচ ডলারের নোটে আব্রাহাম লিঙ্কনের ছবি আছে। তিনিই মার্কিন স্বাধীনতার ৮৮ বছর পর ক্রীতদাস মুক্ত করার জন্য নিজ দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ৪ বছরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করেছিল। এজন্য তাকে জীবন বিসর্জন দিতে হয়েছে। দাসপ্রথা বিলুপ্ত করে এই মানুষটা আমেরিকাকে বদলে দিয়েছিল। আব্রাহাম লিংকন যা করেছিল, সেটা ছিল আমেরিকান প্রতিষ্ঠাপুরুষদের আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। জর্জ ওয়াশিংটন মারা যাওয়ার সময় তার ১২৩ জন ক্রীতদাস ছিল। জর্জ ওয়াশিংটনের মৃত্যুর পর তার স্ত্রী সেই দাসদের উত্তরাধিকারী হয়েছিল। অন্য মার্কিন নেতারাও দাসপ্রথার পক্ষে ছিল। মার্কিন প্রতিষ্ঠাপুরুষরা স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। পূর্বপুরুষের ভুল সংশোধন করে লিঙ্কন পতিত হয়ে যায়নি। জাতির চোখে খাটো হয়ে পড়েনি। সবাই আপন মহিমায় ভাস্বর। বেঁচে থাকা ও এগিয়ে যাওয়ার জন্য অতীত নেতাদের ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া অপরিহার্য। নেতাদের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেই তাদের ভুল সংশোধন করা যায়। গান্ধীকে সারাবিশ্ব শ্রদ্ধা করে। তাকে অহিংসতার পরম প্রতীক বিবেচনা

করা হয়। দেশভাগের আগে ও পরে গান্ধী বেশ কয়েকবার অনশন ধর্মঘট করেছেন। মানবাধিকারের জন্য তিনি কয়েকবার নিজের জীবনকেও ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছিলেন। হিন্দুদের জীবনরক্ষায় তিনি চরম ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে গিয়েছিলেন। এত বড় মানবতাবাদী হয়েও গান্ধীজি কখনো ভারতে প্রচলিত চরম বর্বর বর্ণপ্রথার বিরুদ্ধে কিছুই বলেননি। আজ অনেক মানুষ গান্ধীকে শ্রদ্ধা করে। তার মানে এই নয়, গান্ধীর বর্ণপ্রথার বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গিকে সবাই সমর্থন করে। বর্ণপ্রথার ব্যাপারে অবস্থান নিয়ে গান্ধীর সমালোচনা করেই সবাই গান্ধীকে সম্মান করে।

সম্মান ও সমালোচনা একসাথে চলতে পারে, কোনো সমস্যা নেই। পাথরের মূর্তির মতো অতীতকে পূজা করার কোনো মানে হয় না। আমাদের অতীত থেকে শিক্ষা নেওয়া জরুরি। নিঃসন্দেহে আজ পাকিস্তানবাসী এই দেশের প্রতিষ্ঠাতাদের সংগ্রামের ফল ভোগ করছে। জনগণ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাতাদের ত্যাগের সুফল যেমন ভোগ করছে, তাদের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করাও তাদের কর্তব্যের সীমার মধ্যে পড়ে। নতুন যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কিছু পুরোনো ঐতিহ্য বদলানো জরুরি হয়ে পড়ে। যেসব ক্ষতিকর ধারা-ঐতিহ্য বদলানো যাচ্ছে না, সেগুলোর শেকড় খুঁজে বের করা দরকার। কেন বদলানো যাচ্ছে না—তার কারণ নির্ণয় করা দরকার। এখন দেখা যাক, পাকিস্তানের গোড়াতেই কোন গলদ রয়ে গিয়েছে, যার কারণে পুরো জাতি সঠিক দিকে পা-ই বাড়াতে পারছে না। বিশ্ব-পাসপোর্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে পাকিস্তানের অবস্থান একেবারে তলানির দিকে। পাকিস্তানের নিচে মাত্র তিনটি দেশ আছে, ইরাক, সিরিয়া ও আফগানিস্তান। এই র‍্যাঙ্কিংয়ের নির্ভুলতা নিয়ে আপত্তি উঠতে পারে, তথাপি নিখুঁত র‍্যাঙ্কিং হলেও পাকিস্তানের অবস্থানে খুব বেশি হেরফের হবে বলে মনে হয় না। পাকিস্তানের অবস্থান তলানিতে কেন? এই প্রশ্নের উত্তরের মাঝেই পাকিস্তানের উত্তরণের পথ নিহিত আছে। বর্তমান পাকিস্তানের কিছু সমস্যার জড় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময়ে নেওয়া কিছু প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের সাথে জড়িত।

প্রথম ভুল

পাকিস্তান কার হুকুমে চলবে—এই বিষয়টা প্রথমদিন থেকেই বিতর্কিত হয়ে উঠেছিল। রাষ্ট্রপ্রধান কে হবেন আর রাষ্ট্রকে কার্যকরভাবে নেতৃত্ব কে দিবেন—এটা নিয়েই মূলত বিরোধের সূচনা। দুটি বিষয়কে এক মনে হলেও বাস্তবে দুই বিষয়। উদাহরণ দিলে পরিষ্কার হবে।

বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত ও ব্রিটেনে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রধানমন্ত্রী প্রধান নির্বাহী। তিনিই সরকার পরিচালনা করেন। রাষ্ট্রপতি বা রাজা কেবল প্রতীকী প্রধান। বাংলাদেশে কাগজে-কলমে রাষ্ট্রপ্রধান কে? রাষ্ট্রপতি। দেশ চালায় কে? প্রধানমন্ত্রী। প্রেসিডেন্টের সর্বোচ্চ সম্মান ও প্রটোকল আছে; কিন্তু তিনি দেশ চালান না, কখনো দেশ পরিচালনার চেষ্টাও করেন না। প্রধান নির্বাহী দেশ চালান। প্রধান নির্বাহী একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হয়ে থাকেন। পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও ভিন্ন কিছু ছিল না। পাকিস্তান সৃষ্টির আগে ও পরে জিন্নাহ ছিলেন সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা; কিন্তু তিনি কাগজেকলমে প্রধান নির্বাহী হননি। তিনি লর্ড মাউন্টব্যাটেনের পদ গ্রহণ করে গভর্নর-জেনারেল হিসেবে নিজেকে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। লিয়াকত আলী খানকে প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছিলেন। জিন্নাহর এই সিদ্ধান্তের কুফল ছিল, পাকিস্তানে ক্ষমতার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, যেখান থেকে কার্যকরভাবে দেশ পরিচালিত হওয়ার কথা, সেটা কার্যত একটি প্রতীকী পদে পরিণত হয়েছিল। গভর্নর-জেনারেলের প্রতীকী পদটি হয়েছিল আসল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। এমনকি গভর্নর জেনারেল জিন্নাহ মন্ত্রিসভার বৈঠকেও সভাপতিত্বও করতেন। মাঝেমধ্যে পুরো মন্ত্রীসভাকেই তার বাসভবনে ডেকে নিতেন। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানও সেই ঘরোয়া মন্ত্রীসভায় উপস্থিত থাকতেন। পাকিস্তানের শুরুতেই প্রাদেশিক বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতাও গভর্নর জেনারেল ব্যবহার করেছেন। খাইবার পাখতুনখোয়া (কেপি) তখন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ (NWFP) নামে পরিচিত ছিল। সংক্ষেপে 'সরহদ-সীমান্ত' বলা হতো। স্বাধীনতার মাত্র এক সপ্তাহ পর ১৯৪৭ সালের ২২ আগস্ট এই প্রদেশের নির্বাচিত বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। সিএম আবদুল জব্বার খানকে রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে গ্রেফতার করে জেলে পোরা হয়েছিল। সিন্ধুর সিএম আইয়ুব খুরোও প্রায় একই পরিণতি ভোগ করেছিলেন।

করাচিকে পাকিস্তানের রাজধানী বানানো ও উদ্বাস্তুদের বসতি স্থাপনকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মতপার্থক্যের সূচনা হয়েছিল। গভর্নর জেনারেল জিন্নাহ ও প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান চাচ্ছিলেন করাচিকে দেশের রাজধানী বানিয়ে সিন্ধ সরকারকে হায়দারাবাদে স্থানান্তরিত করতে। ভারত থেকে বানের পানির মতো আসা উদ্বাস্তুদেরও করাচিতে আবাদ করতে চাচ্ছিলেন দুজনে। সিন্ধের সিএম আইয়ুব খুরো করাচিকে সিন্ধ থেকে আলাদা

করার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, করাচি জাতীয় ও প্রাদেশিক উভয় রাজধানী হয়ে উঠুক। তিনি সিন্ধ থেকে করাচিকে বিচ্ছিন্ন করার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন। সিন্ধের জাতীয়তাবাদীরা করাচিকে সিন্ধু থেকে বিচ্ছিন্ন করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করল। কেন্দ্রের কলকাঠিতে আইয়ুব খুরোর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হলো। সিন্ধ বিধানসভার বেশিরভাগ সদস্য আইয়ুব খুড়োর সাথে ছিল। অনাস্থা প্রস্তাবের চেষ্টায় কাজ হলো না। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এবং কয়েকজন মন্ত্রী গভর্নর জেনারেলকে বলল, আপনি আইয়ুব খুড়োকে অনুরোধ করুন, আইয়ুব যেন ৬ মাসের জন্য রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ায়। আমরা এই ফাঁকে সিন্ধের যাবতীয় সমস্যা সমাধান করে ফেলব। আইয়ুব খুরো কেন্দ্রের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। পরে আইয়ুব যখন জানতে পারলেন, এই প্রস্তাবের পেছনে কায়দে আজমও আছেন। তিনি কায়দে আজমের কাছে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিলেন। পদত্যাগপত্র জিন্নাহর কাছে পৌঁছার আগেই কেন্দ্র সরকার তাকে বরখাস্ত করে দিলো। এটা ঘটেছিল ২৬ এপ্রিল ১৯৪৮ সালে।

পাকিস্তানের বয়েস তখন মাত্র ৮ মাস ৯ দিন। এরই মধ্যে ২ জন মুখ্যমন্ত্রীকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। একজন জেলে ছিলেন এবং অন্যজন জেলে যাওয়ার পথে ছিলেন। আইয়ুবের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অসংখ্য অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করা হলো। মামলার বিচার নিয়ে আদালতের দরজায় দরজায় ঘুরিয়ে মারার ব্যবস্থা করা হলো। অনেক চেষ্টা করেও আইয়ুবের বিরুদ্ধে সাজা দেওয়ার মতো কোনো মামলা দাঁড় করাতে না পেরে একটি টাইপরাইটার চুরির দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হলো। পাকিস্তানে যোগ দেওয়ার পক্ষে প্রথম ভোটদানকারী সিন্ধ প্রদেশের প্রধানমন্ত্রীকে টাইপরাইটার চুরির দায়ে সাজা দিয়ে জেলে পাঠানো হলো। আইয়ুব আড়াই বছর জেলে ছিলেন। এসব কিছু কায়েদে আজম ও প্রধানমন্ত্রীর সম্মতিতেই হচ্ছিল।

যোগ্য ব্যক্তি সরে গেলে অযোগ্যরা স্থান দখল করে। আইয়ুব খুরোর মতো রাজনীতিবিদের শূন্যস্থান পূরণ করতে এগিয়ে এলো চাটুকারের দল। সিন্ধের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হলো পীর ইলাহি বখশ। দায়িত্ব নিয়েই পীর সাহেব প্রস্তাব তুললেন, জুমার খুতবায় কায়েদে আজমের নাম নেওয়া হোক। যেভাবে ইসলামি খিলাফাহ ব্যবস্থায় খলিফার নাম নেওয়া হয়। এই প্রস্তাবে কেন্দ্র সরকার বা কায়েদে আজম কেউই সম্মত হননি। নির্বাচিত যোগ্য গণ-প্রতিনিধির ওপর জোর-জবরদস্তি করে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিলে, যোগ্যদেরকে

দাবিয়ে রাখার চেষ্টা হলে অযোগ্যরাই তার স্থান দখল করে নেয়। পাকিস্তানে শুরু থেকেই এমনটা হয়ে আসছে। পাকিস্তানে প্রথম থেকেই রাজনৈতিক অস্থিরতা কতটা ভয়াবহ—সেটা বোঝার জন্য এই দুটি ঘটনাই যথেষ্ট। পাকিস্তানের শুরু থেকেই নির্বাচিত প্রতিনিধির চেয়ে অনির্বাচিত কোনো পদই বেশি শক্তিশালী ছিল। অনির্বাচিত পদ, নির্বাচিত পদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারত। এটাই পাকিস্তানের জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। জিন্নাহকে দিয়ে এই ধারা শুরু হয়েছে আর আজও একই ধারা অব্যাহত আছে।

স্বাধীনতার পর পাকিস্তানে যখন এমন ঘটছিল, ভারতের অবস্থা কেমন ছিল? নেহেরু প্রধান নির্বাহীর পদ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি গভর্নর জেনারেল হননি। পরিবর্তে তিনি প্রধানমন্ত্রী হন। মাউন্টব্যাটেনকে গভর্নর জেনারেল পদে বহাল রাখেন। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতীয় সংবিধান কার্যকর হয়েছিল। সংবিধানে প্রেসিডেন্ট পদ সৃষ্টি করে গভর্নর জেনারেলের পদ বিলুপ্ত করা হয়েছিল। ভারতে কোনো নির্বাচিত প্রাদেশিক সরকার ভেঙে দেওয়া হয়নি। কোনো প্রদেশের প্রধান নির্বাহীকে বরখাস্ত বা কারারুদ্ধ করা হয়নি। ভারতীয় গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতাও পাকিস্তানি গভর্নর জেনারেলের মতোই ছিল। সংবিধান কার্যকর করার পর রাজেন্দ্র প্রসাদ ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। তিনি প্রায় ১২ বছর রাষ্ট্রপতি ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন প্রতীকী রাষ্ট্রপ্রধান। তার হাতে কোনো ক্ষমতা ছিল না। নেহেরু প্রধান নির্বাহী ছিলেন। তিনি পরপর তিন নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। এভাবে ভারতে প্রথম দিন থেকেই শক্তিশালী রাজনৈতিক ঐতিহ্যের ভিত্তি স্থাপনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। অন্যদিকে পাকিস্তান প্রথম দিন থেকেই রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার দিকে অভিযাত্রা শুরু করেছিল। পাকিস্তানে যতদিন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে যাবতীয় সিদ্ধান্ত সংসদে (মজলিসে শুরায়) গৃহীত না হবে, অনির্বাচিত কর্তৃপক্ষের হাতে সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থাকবে, ততদিন পাকিস্তানের সমস্যা সমাধান হবে না। পাকিস্তানকে সংবিধান থেকে এমন ধারাগুলো বিলুপ্ত করতে হবে, যেসব ধারা দিয়ে অরাজনৈতিক ও অনির্বাচিত কর্তৃপক্ষ ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পেয়ে যায়।

দ্বিতীয় ভুল

পাকিস্তান কেন একটি সঠিক শাসনব্যবস্থা বা সংবিধান প্রণয়ন করতে পারেনি? ভারতীয় সংবিধান ও আইন কেমন হবে—এ বিষয়ে ১৯৪৭ সালের

জানুয়ারিতে ভারতীয় কংগ্রেস একটি খসড়া পরিকল্পনার প্রস্তাব পাস করেছিল। প্রস্তাবিত পরিকল্পনা অনুসারেই পরবর্তীতে ভারতীয় সংবিধান রচিত হয়েছিল।

নেহেরুর কয়েক ডজন বক্তব্য ও আর্টিকেলে পরিষ্কার বলে গেছেন, তিনি একজন ধর্মনিরপেক্ষ; তিনি একটি ধর্মনিরপেক্ষ ভারত চান। ভারতের শাসনব্যবস্থা কেমন হবে, শুরু থেকেই এ নিয়ে কোনো বিভ্রান্তি ছিল না। পাকিস্তানের সংবিধান ও আইন কেমন হবে—এ বিষয়ে মুসলিম লীগের কাছে লিখিত কোনো সংবিধান তো দূরে থাক, খসড়াও ছিল না। হ্যাঁ, এটুকু পরিষ্কার ছিল, ইসলামই হবে পাকিস্তানের মূল ভিত। তার মানে এই নয়, মুসলিম লীগ নেতাগণ লিখিত সংবিধানের গুরুত্ব বুঝতেন না। তারা ভালো করেই এটা জানতেন। ১৯২৮ সালে যখন সিন্ধকে বোম্বে থেকে আলাদা করার কথা বলা হয়েছিল, তখন মুসলিম লীগ লিখিতভাবে ১৪ দফা পেশ করেছিল। পাকিস্তানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এখনো কায়েদ-ই-আজমের ১৪ দফা পড়ানো হয়। এমনিভাবে ভারতে যখন আযাদি আন্দোলন হয়েছিল, মুসলিম লীগও ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চে লাহোরের মিন্টো পার্কে একটি স্বাধীন পাকিস্তানের দাবি পেশ করেছিল। সেটাই লাহোর প্রস্তাব নামে পরিচিত। প্রস্তাবে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছিল, মুসলিম লীগ কোন কোন এলাকায় স্বাধীন মুসলিম রাজ্য চায়। তাছাড়া কায়েদে আজমসহ মুসলিম লীগের বহু নেতা সংসদ সদস্য ছিলেন, বিভিন্ন আইনের খসড়া তৈরিতেও অভিজ্ঞ ছিলেন। তা সত্ত্বেও মুসলিম লীগ একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের দাবি তুললেও সেই রাষ্ট্র কীভাবে চালানো হবে, (অজ্ঞাত কারণে) তার কোনো খসড়াই প্রস্তুত করেনি। স্বাধীন পাকিস্তানের কাছে এমন কোনো সংবিধান বা খসড়া ছিল না—যেটাকে সামনে রেখে বলা যায়, এই খসড়া বা রূপরেখা পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতাগণ ঐকমত্যের ভিত্তিতে রেখে গেছেন। কোনো বিরোধ দেখা দিলে সেই খসড়া দেখে কর্তব্য নির্ধারণ করা যেত।

সে সময় সারাবিশ্বের নানা দিকে বিভিন্ন দেশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীন হচ্ছিল। প্রতিটি দেশই স্বাধীন হওয়ার পাশাপাশি এই বিষয়টাও ঠিক করে নিচ্ছিল, স্বাধীনতা-পরবর্তী শাসনব্যবস্থা কেমন হবে? কমিউনিস্ট শাসন হবে নাকি ধর্মনির্ভর শাসন হবে? পুঁজিবাদী শাসন হবে নাকি প্রজাতান্ত্রিক শাসন হবে? স্বৈরতান্ত্রিক হবে নাকি রাজতন্ত্র হবে? সবদেশে এসব প্রশ্নের সমাধান শুরুতেই নিষ্পত্তি হয়ে যেত। ইংরেজ থেকে স্বাধীন হতে যাওয়া পাকিস্তানের জন্য এ বিষয়টা আরো বেশি জরুরি ছিল। কারণ, তাকে ২০০

বছরের ঔপনিবেশিক শাসনের জঞ্জাল দূর করতে হবে। সমাজ-রাষ্ট্র থেকে ব্রিটিশ গোলামির যাবতীয় নাপাকি সাফ করা দরকার ছিল। কংগ্রেসের পরিকল্পনা তারা পেশ করেছিল। মুসলিম লীগ করতে পারেনি বা করেনি। প্রায় ২০০ বছর ধরে গোলামির জিঞ্জিরে আবদ্ধ থাকা একটি দেশ কীভাবে দাসত্বমুক্ত হবে, সেটা পরিষ্কার থাকা ভীষণ জরুরি ছিল। মুসলিম লীগ নেতাদের কাছে সাংবাদিকগণ এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে নেতাগণ এটাসেটা বলে পাশ কাটিয়ে যেত। কখনো বলা হতো, ইসলামই আমাদের সংবিধান। কখনো বলা হতো, গণতন্ত্রই হবে আমাদের মূল ভিত। কখনো বলা হতো, নবগঠিত পাকিস্তানে হিন্দু-মুসলিম-শিখ সবাই সমানাধিকার ভোগ করবে; সবাই বরাবর হবে; সবাই পাকিস্তানি হবে। সবাই যে যার ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করতে পারবে। নেতাদের কথায় কখনো মনে হতো, পাকিস্তান একটি ইসলামি শাসনব্যবস্থানির্ভর দেশ হবে। কখনো মনে হতো, পাকিস্তান একটি সেকুলার ডেমোক্র্যাটিক দল হবে। মোদ্দাকথা, মুসলিম লীগের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর পরিষ্কারভাবে ছিল না। পরবর্তীতে দেখা গেছে, পাকিস্তান ইসলামি শাসনব্যবস্থা নির্ভর দেশ হবে নাকি সেকুলার হবে—এ নিয়ে বিতর্ক দেখা দিলে কেউ জিন্নাহর কোনো বক্তব্যাংশ পেশ করে প্রমাণ করার চেষ্টা করে, পাকিস্তান ইসলামি রাষ্ট্র হবে; আরেকজন জিন্নাহর অন্য কোনো বক্তব্য পেশ করে বলে, এই যে এখানে কায়েদে আজম সেকুলার পাকিস্তানের কথা বলেছেন। এসব বিতর্কের মধ্যেই পাকিস্তান গঠিত হয়ে গেছে। পাকিস্তান গঠনের পরও এই মহাগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি কারো ভ্রূক্ষেপ ছিল বলে মনে হয় না। পাকিস্তানের প্রথম সংসদ লিয়াকত আলী খানকে প্রধানমন্ত্রী বানাতে পেরেছিল কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক কোনো সংবিধান রচনা করতে পারেনি। কাশ্মীর নিয়ে ভারতের সাথে যুদ্ধ করা, প্রধানমন্ত্রীকে উৎখাত করা, প্রাদেশিক পরিষদ ভেঙে দেওয়া, মুখ্যমন্ত্রীদের গ্রেপ্তার করার মতো কঠিন কাজে তাড়াহুড়া করতে পেরেছে; তার চেয়ে সহজ কাজ, সংবিধান রচনা করার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করতে পারেননি পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতাগণ।

সর্বসম্মত ও নিয়মতান্ত্রিক সংবিধান রচনা করতে পাকিস্তানের ২৬ বছর লেগে গিয়েছিল। ততদিনে পাকিস্তান ভেঙে দুই টুকরা হয়ে গিয়েছে। ১৯৫৪ সালে একটি খসড়া সংবিধান প্রণীত হলেও সেটা কার্যকর করা হয়নি। বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর সরকার এই খসড়া সংবিধান রচনা করেছিল। গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ ২৪ অক্টোবর মোহাম্মাদ আলীর সরকারকেই

ভেঙে দিয়েছিল। ২ বছর পর ১৯৫৬ সালে আবার সংবিধান প্রস্তুত করা হলো। কিছুটা কার্যকরও করা হলো। ১৯৫৮ সালে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা ও সেনাপ্রধান আইয়ুব খান আরেকবার সংবিধান ছুড়ে ফেলেছিল। তারা পুরো সংসদকেই বিলুপ্ত করে দিয়েছিল। ২ অক্টোবর সামরিক শাসন জারি করা হয়। আইয়ুব খান ২৭ অক্টোবরে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জাকে হটিয়ে নিজেই দেশের সর্বেসর্বা হয়ে বসেছিল। গত ১১ বছর ধরে পাক সংবিধান রচনার যে মেহনত চলছিল, চোখের পলকে সব ব্যর্থ হয়ে গেল। বার্মা ফ্রন্টে মাত্র আড়াই দিনের যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা নিয়ে একজন জেনারেল পুরো একটি দেশের মাথায় চড়ে বসেছিল। আইয়ুব খান নিজের মতো করে পাক সংবিধান রচনা শুরু করল। আইয়ুব খান এই দায়িত্ব দিয়েছিল বিচারপতি শাহাবুদ্দিনকে। জনাব শাহাবুদ্দিনকে বলা হলো, সংসদীয় শাসনব্যবস্থা পরিবর্তন করে এমনভাবে সংবিধান সাজাতে হবে, যাতে প্রেসিডেন্টের হাতেই সমস্ত ক্ষমতা থাকে। শাহাবুদ্দিন ফরমায়েশ অনুযায়ী কাজ দেখালেন। ১৯৬২ সালের জুন মাসে আইয়ুব খান নতুন আইন বাস্তবায়ন করল। এই আইনও চলল না। পাক জনগণ এই আইনকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। কোনো সংসদই আইয়ুব প্রণীত আইন অনুমোদন করেনি। ১০৬৯ সালের ২৫ মার্চে জেনারেল ইয়াহিয়া যখন জেনারেল আইয়ুবকে বিদায় করল, সাথে সাথে আইয়ুবের আইনকেও বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিল।

পাকিস্তান সৃষ্টির ২২ বছর পরও পাক নেতারা একমত হতে পারেনি—পাকিস্তান কীভাবে চলবে। জেনারেল ইয়াহিয়া নতুন করে সংবিধান রচনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। সেই উদ্যোগের অধীনেই ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। প্রথমবারের মতো ওয়ান-ম্যান-ওয়ান-ভোট নিয়ম চালু করা হয়েছিল। নির্বাচন হলো। আইয়ুবের ১০ বছরের শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তানিদের প্রতি বৈষম্য ও নির্বাচনে ভুট্টোর চেয়ে দ্বিগুণ আসন লাভকারী শেখ মুজিবের দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার কারণে পাকিস্তান ভেঙে দুই টুকরা হয়ে গিয়েছিল। অবশিষ্ট পাকিস্তানের সংসদে সংবিধান প্রণয়নের জন্য দৌড়ঝাঁপ শুরু হলো। ১৯৭৩ সালে সর্বসম্মত সংবিধান প্রণীত হলো। ১৪ আগস্ট এই সংবিধান জারি করা হয়েছিল। নতুন আইন শেকড় গেড়ে বসার আগেই আরো দুইবার ছুড়ে ফেলা হলো। নতুন আইন জারির ৪ বছর পর জেনারেল জিয়াউল হক এবং তারপর আবার জেনারেল মোশাররফ পাক সংবিধান ছুড়ে ফেলে মার্শাল ল জারি করেছিল। এটা ছিল পাকিস্তানের জাতীয়

ব্যর্থতা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সামনে আসে, পাকিস্তানে সামরিক অভ্যুত্থান হয়: বাংলাদেশে হয়, ভারতে হয় না কেন? প্রশ্নটা বহুত পুরোনো। বাংলাদেশে সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছে, বার্মাতে তো হয়েই আছে। পাকিস্তানে এই পর্যন্ত চার বার মার্শাল ল জারি হয়েছে। নানা আঙ্গিকে এখনো হয়েই চলছে: কিন্তু পাশাপাশি দেশ হওয়ার পরও ভারতে এখন পর্যন্ত একবারও সামরিক অভ্যুত্থান তো দূরের কথা, দৃশ্যমান প্রচেষ্টা পর্যন্ত হয়নি। এমনকি শ্রীলঙ্কাতেও ১৯৬৬ সালে একবার সামরিক অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা হয়েছিল। সেটাকে ব্যর্থ করে দেওয়া হয়। অভ্যুত্থানের প্রধান কুশীলব জেনারেল রিচার্ড ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের গ্রেফতার করে সাজা দেওয়া হয়েছে।

কেন?

ইন্ডিয়ান লেফটেন্যান্ট জেনারেল এসটি ভার্মা লিখেছেন, '১৯৬০ সালে যখন আমার বন্ধু আর্মি চিফ জেনারেল থিমায়ার সাথে মন খুলে গপশপ করার ইচ্ছা হতো, তখন আমরা নাগিন ঝিলে চলে যেতাম। সেখানে একটা বোট নিয়ে ঝিলের মাঝামাঝি গিয়ে মনের কথা খুলে বলতাম। এ ছাড়া ঘরে-বাইরে আর কোথাও মনের কথা বলাটা নিরাপদ বোধ করতাম না।'

এই ঘটনাটি আইসবার্গের মাথা। ভারতে সামরিক বাহিনী কেমন নজরদারিতে থাকে, তার ছোট্ট এক নমুনা। ভারতে কেন সামরিক অভ্যুত্থান হয় না—এর কারণ খুঁজতে একটু পেছনে যেতে হবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটি রাজকীয় সেনাবাহিনী (Imperial Army) দরকার ছিল। জনগণের সুরক্ষার জন্য নয়, সাম্রাজ্য ও সম্রাটকে রক্ষা করার জন্য বাহিনী প্রয়োজন ছিল। ব্রিটিশরা এমন সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে চেয়েছিল, যার শতভাগ আনুগত্য থাকবে রাজার প্রতি, উপনিবেশ স্থাপনকারী মনিবের প্রতি এবং ব্রিটিশ এম্পায়ারের প্রতি। এজন্য ইংরেজরা নতুন সেনা ও অফিসার রিক্রুট করার সময় অত্যন্ত সতর্কতার সাথে একটি নীতিমালা মেনে চলত। তারা ব্রিটিশ-ইন্ডিয়ান আর্মির জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু এলাকা থেকেই নতুন সদস্য সংগ্রহ করত। ইংরেজরা হিন্দুস্তানের এলাকাগুলোকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে নিয়েছিল :

১. মার্শাল রেস তথা যোদ্ধা জাতি। এই দলে ছিল শিখ, মুসলিম পাঞ্জাবি, হিন্দু জাট, ডোগরা, গোর্খা, ঘরওয়াল, পাঠান, আফ্রিদি। ব্রিটিশরা এই জাতিগোষ্ঠীর লোকজনকেই সেনা বিভাগে ভর্তি করত। এজন্য আমরা দেখি,

ব্রিটিশ আর্মির বিপুল সংখ্যক সদস্য পাঞ্জাবের পোটোহার বা উত্তরাঞ্চল থেকে রিক্রুট করা হয়েছে অথবা নেপালের গোর্খাদের থেকে রিক্রুট করা হয়েছে। এর বাইরে হিন্দুস্তানের অন্য এলাকা থেকে নামমাত্র সেনা রিক্রুট করা হয়েছে। ইংরেজরা এই কাজ জেনেবুঝে পরিকল্পিতভাবে করত।

২. নন মার্শাল রেস। অযোদ্ধা জাতি। এদের থেকে সেনা রিক্রুট করা হতো না।

নির্দিষ্ট এলাকা থেকে ভর্তি হওয়ার কারণে, নিজ রেজিমেন্টের সবাই শুধু নিজ এলাকার খবরাখবর পেত। দেশের বাকি অঞ্চল সম্পর্কে বেখবর থাকত। অন্য এলাকার প্রতি তাদের এতটা মায়া বা দুর্বলতাও থাকত না। এখানেও ইংরেজদের বহুল ব্যবহৃত ডিভাইড এন্ড রুল পলিসির কথা প্রযোজ্য। সেনারা ঘুরেফিরে নির্দিষ্ট কিছু এলাকার মানুষ দেখতে দেখতে তারা একটা পরিবারের মতো হয়ে যেত। নিজেদেরকে বিশেষ কিছু ভাবতে শুরু করত। নিজেদেরকে অন্যদের তুলনায় সেরা মনে হতো। কখনো গুলি চালানোর হুকুম হলে তারা গুলি চালাতে দ্বিধায় ভুগত না। তারা পুরো দেশের প্রতিনিধিত্ব করত না। দেশের প্রতি তাদের কোনো দায়বদ্ধতাই ছিল না। তাদের সমস্ত আনুগত্য ও আন্তরিকতা ছিল সম্রাটের জন্য; ব্রিটিশরাজের জন্য। তাদের অভিধানে নিজের জন্মাঞ্চল ছাড়া পাক-ভারত-বাংলার সমস্ত অঞ্চলই বিদেশ; ভিনদেশ।

হিন্দুস্তানের মতো আফ্রিকার টোগো, ঘানা ও নাইজেরিয়াতেও বেশিরভাগ সেনা সদস্য সেসব দেশের উত্তরাঞ্চল থেকে ভর্তি করাতো। ইরাকে শিয়া জনসংখ্যা বিপুল হলেও সেনাবাহিনীতে বেশিরভাগ সেনা সুন্নি মুসলিম গোত্র থেকে রিক্রুট করা হতো। ফরাসিরা সিরিয়াতেও এমনটা করেছিল। সিরিয়ান সেনা অফিসার বেশিরভাগই সংখ্যালঘু আলাবি শিয়া সম্প্রদায় থেকে রিক্রুট করা হতো।

ব্রিটিশ ইন্ডিয়াতে পরিবর্তন এসেছিল ১৯৪৬ সালে নির্বাচনের পর। জওহরলাল নেহেরু সরকার প্রধান হয়েছিলেন। তাকে ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের ভাইস প্রেসিডেন্ট বানানো হয়েছিল। এই পদ ক্ষমতার দিক থেকে প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদার ছিল। এই হিসেবে নেহেরুকে অখণ্ড হিন্দুস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী বলা যেতে পারে। দায়িত্ব গ্রহণের পর ১২ সেপ্টেম্বরে আর্মির কমান্ডার ইন চিফ ও প্রতিরক্ষা সচিবের কাছে একটি চিঠি লিখেন। এই চিঠিতে ইন্ডিয়ান আর্মিকে আমূল বদলে ফেলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল।

চিঠির জবাবে পণ্ডিত নেহেরুকে বলা হলো, আপনার প্রস্তাব মানা হলে ব্রিটিশ আর্মির খোলনলচেই বদলে যাবে। নেহেরু তো সেটাই চাচ্ছিলেন। তিনি বারবার প্রস্তাবিত বিষয়গুলো বাস্তবায়নের তাকিদ দিয়েই যাচ্ছিলেন। তার কথা ছিল, হিন্দুস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষার জন্য সেনাবাহিনীর এই সংস্কার করতেই হবে। ব্রিটিশরাজকে নিজের প্রস্তাব মানাতে না পারলেও ভারত স্বাধীন হওয়ার পর সেনাবাহিনীর সংস্কার করেই ছেড়েছেন। পণ্ডিত মশাইয়ের সংস্কারগুলোর দিকে লক্ষ্য করলেই প্রশ্নের উত্তর মিলে যাবে, কেন ভারতে আর্মি ক্যু হয় না আর পাক-বাংলা-বার্মায় অনবরত ক্যু লেগেই থাকে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সংস্কার হলো :

০১.

সেনাপ্রধানকে মন্ত্রীসভা থেকে বাদ দিয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়ে আসা হয়েছিল। ব্রিটিশ ভারতে সেনাপ্রধান দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান ছিলেন। তিনি এক্সিকিউটিভ (কার্যকরী) কাউন্সিলের সদস্য থাকতেন। নীতি-নির্ধারণী সভা-অধিবেশনে সেনাপ্রধানের অপরিহার্য উপস্থিতি থাকত।

০২.

১৯৪৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারি নেহেরু আরেকটি আইন জারি করেছিলেন। মার্শাল রেস প্রথা বাদ দিয়ে পুরো দেশ থেকে সমানুপাতিক হারে নতুন সেনা সদস্য ভর্তি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

০৩.

সেনাবাহিনীর বেতন-ভাতাও কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাদেরকে অন্যসব সরকারি কর্মকর্তাদের স্তরে নিয়ে আসা হলো। কিছু ক্ষেত্রে আরো নিচে নামিয়ে দেওয়া হলো। যাতে করে সেনাবাহিনীর চাকুরিকে বেশি আকর্ষণীয় মনে না হয়।

০৪.

পুরো সেনাবাহিনীকে কয়েকটি কমান্ডে বিভক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। এটা আগেও ছিল, দেশভাগের পর নতুন করে কমান্ডগুলো বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রতিটি কমান্ডের একজন কমান্ডার ছিল। কমান্ডার নিয়োগের সিদ্ধান্ত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ই গ্রহণ করত। বর্তমানে ইন্ডিয়ান সেনাবাহিনী ৭টি কমান্ডে বিভক্ত। তার মধ্যে একটি হলো ট্রেইনিং কমান্ড। প্রতিটি কমান্ডার পদের দিক থেকে লেফটেন্যান্ট জেনারেল হয়ে থাকেন। তাদেরকে কমান্ডার ইন চিফ বলা হয়।

ক্ষমতা, পদ, মর্যাদা, সুযোগ-সুবিধায় এই কমান্ডারগণ সবাই বরাবর থাকেন। এই সাত জনের একজন সেনাপ্রধান নির্বাচিত হন। তিনি বাকি ছয় জনের তুলনায় বাড়তি কোনো র‍্যাংক বা ব্যাজের অধিকারী হন না। সেনাপ্রধান এককভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বাকি ছয় জনের সাথে কথা বলতে হয়। বাকি ছয় জনের ওপর সেনাপ্রধানের হুকুম চলে না। কারণ তারা সবাই পদের দিক থেকে সমান। আর সেনাপ্রধানকে সবসময় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের কথামতো চলতে হয়। প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সাথে দেখা করতে হলে, কথা বলতে হলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হয়। সেনাদের পদোন্নতি, বেতন-পেনশন বিষয়ক সিদ্ধান্তও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকেই আসে। সেনাপ্রধান এককভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার এক্তিয়ার রাখেন না। মার্শাল ল জারির জন্য সেনাপ্রধানের যেটুকু ক্ষমতা থাকা দরকার, ইন্ডিয়ান সেনাপ্রধানের তার ছিটেফোঁটাও নেই। সবচেয়ে বড় কথা, ইন্ডিয়ান সেনাপ্রধানের অধীনে সরাসরি কোনো 'কোর' বা বাহিনী থাকে না। সেনাপ্রধানের হাতে অন্য কোনো কমান্ডিং অফিসার নিয়োগের ক্ষমতাও থাকে না। নিজের পছন্দমতো কোনো অফিসারকে দিল্লির কাছাকাছি কমান্ডের দায়িত্বে বসিয়ে সুবিধামতো ক্যু করবেন—সেনাপ্রধানের সে ক্ষমতা নেই।

০৫.

নতুন একটি বিভাগ খোলা হয়েছে 'ইন্ডিয়ান ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো' (আইবি) নামে। এর কাজ হলো, সেনা অফিসারদের মধ্যে গোয়েন্দাগিরি করা। কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সেনা অফিসাররা কে কী করছে—সেটা দেখাই আইবির প্রধান দায়িত্ব। আইবি সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকে রিপোর্ট করে। এছাড়া ইন্ডিয়ান গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর প্রধানও প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরই নিয়োগ দিয়ে থাকে। 'র'-এর প্রধান সেনাবাহিনী থেকেই হবে—এমন কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা 'আইএসআই' বা বাংলাদেশের 'ডিজিএফআই' এর ব্যতিক্রম। পাকিস্তানের আইএসআই প্রধান কে হবে—সেটা সেনাবাহিনী থেকেই ঠিক করা হয়। সাবেক কোনো সেনা অফিসারই আইএসআইয়ের প্রধান হয়। আইএসআইয়ের অন্যসব সদস্যও সেনাবাহিনী থেকে আসে। আইএসআই রিপোর্ট করে সেনাপ্রধানের কাছে। অর্থাৎ, আইএসআই কার্যত পাক সেনাবাহিনীরই একটি শাখা। ভারতের 'র' সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। র-এর বর্তমান প্রধান সীমান্ত কুমার গোয়েল সেনাবাহিনী থেকে আসেননি; তিনি একজন ব্যুরোক্র্যাট। অন্যদিকে পাকিস্তানে আইএসআই প্রধান একজন

কর্মরত মেজর জেনারেল বা লেফটেন্যান্ট জেনারেল হয়ে থাকেন। নিচের পোস্টগুলোতেও চাকুরিরত সেনা অফিসাররাই নিয়োগ পেয়ে থাকেন।

০৬.

পাকিস্তানে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা থেকে শুরু করে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও স্থাপনাগুলোর নিরাপত্তার দায়িত্বও সেনাবাহিনীর হাতে ন্যস্ত। এটম বোমা সংরক্ষণের দায়িত্বও আর্মির হাতে। এজন্য জনগণের কাছে পাক আর্মি একধরনের বিশেষ শক্তি, সামর্থ্য ও শৌর্যবীর্যের প্রতীক। অন্যদিকে ভারতে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার দিক দেখার জন্য আলাদা নিরাপত্তারক্ষী আছে। এতে করে মার্শাল ল'র সম্ভাবনা ও সুযোগ আরো কমে গেছে। নির্দিষ্ট কোনো অফিসার বা কয়েকজন অফিসার মিলে দেশনেতাদের আটক করে সংবিধান স্থগিত করে দিবে—এমন সুযোগ নেই। তাছাড়া ইন্ডিয়ার আণবিক বোমা হেফাজতের দায়িত্বও আর্মির হাতে নেই। এজন্য আলাদা বাহিনী আছে। এদের নিয়ন্ত্রণও রাজনৈতিক সরকারের হাতে।

নেহেরু এমন আরো বেশ কিছু সংস্কার করেছিলেন। এতে করে ইন্ডিয়ান আর্মির চাকচিক্য অনেক কমে গিয়েছে; কাজের কাজ হয়েছে; মার্শাল ল জারির ক্ষমতা একেবারেই বিনাশ হয়ে গেছে। এটাকে সামরিক পরিভাষায় ক্যু-প্রুফিং (Coup-Proofing) বলা হয়। বাংলা বলা যেতে পারে 'অভ্যুত্থান নিরোধক'। ভারতীয় সেনাপ্রধান চাইলেও ক্যু করতে পারবে না। বাকি কমান্ডারদের সাথে শলা-পরামর্শ করে তাদেরকে একমত করে আইবির চোখ ফাঁকি দিয়ে পরিকল্পনাকে সাফল্যের সীমায় পৌছানো অসম্ভব এক কাজ।

০৭.

সেনা অফিসারদের ভিআইপি মর্যাদাতেও হ্রাস ঘটিয়েছিলেন নেহেরু। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ায় সেনাপ্রধানের বাসস্থান ছিল দিল্লিতে ৩০ একরবিশিষ্ট বিলাসবহুল এক প্রাসাদে। এটাকে তিনমূর্তি ভবন বলা হয়। দেশভাগের পর নেহেরু এই প্রাসাদ থেকে সেনাপ্রধানকে হটিয়ে তাকে তুলনামূলক জেল্লা-জৌলুসহীন ছোট্ট এক বাংলোতে ঠাঁই দিয়েছিলেন। নিজে এই তিনমূর্তি ভবনে বাস করতে শুরু করেছিলেন। এখন সেটা নেহেরু জাদুঘর হিসেবে পরিচিত।

নেহেরুর এসব পদক্ষেপ থেকে বোঝা যায়, তিনি প্রথম দিন থেকেই মার্শাল ল রোধের ব্যাপারে কতটা মরিয়া ছিলেন। অবসরপ্রাপ্ত সেনাপ্রধান ও অফিসারদের আত্মজীবনী পড়ে জানা যায়, তারা নিজেদের সম্মানহানিতে

ক্ষুব্ধ হলেও তাদের আসলে করার কিছু ছিল না। তারা চাইলেও সামরিক অভ্যুত্থান ঘটাতে পারতেন না। শুরুর দিকে ইন্ডিয়ান আর্মির মধ্যেও সামরিক অভ্যুত্থানের ইচ্ছা ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৯৫৭ সালে পরপর দুটি নির্বাচনে জেতার পর সেনা সদর দপ্তর পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। জেনারেল থিমায়া সেনাপ্রধান ছিলেন। পরিদর্শনের একপর্যায়ে নেহেরু তিন দরজাবিশিষ্ট বড় এক আলমারি দেখলেন। জেনারেল থিমায়ার কাছে জানতে চাইলেন :

-এটাতে কী আছে?

-স্যার, প্রথমটাতে আমাদের যাবতীয় যুদ্ধপরিকল্পনা রক্ষিত আছে। দ্বিতীয়টাতে সেনা অফিসারদের সম্পর্কে অতি গোপনীয় তথ্য সংরক্ষিত আছে।

-তৃতীয়টাতে কী আছে?

-স্যার, এটাতে আপনার সরকারকে উল্টে দেওয়ার পরিকল্পনা রাখা আছে।

নেহেরু কিছু না বলে এগিয়ে গেলেন। প্রতিটি সেনাবাহিনীতেই এমন টাস্ক থাকে। নিজের দেশে অভ্যুত্থান ঘটাতে চাইলে করণীয় কী কী হতে পারে—তার সম্ভাব্য একটা নকশা কষা থাকে। এমন গবেষনামূলক স্টাডি সব সেনাবাহিনীই করে থাকে। এজন্য ইন্ডিয়ান আর্মিকে বলা হয় 'পিপল'স আর্মি'। চায়নিজ সেনাবাহিনীর নামও 'পিপল'স আর্মি'। তার পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ চায়নিজ কমিউনিস্ট পার্টির হাতে।

০৮.

পাকিস্তান সেনাবাহিনী এত শক্তিশালী কেন? সেখানে কেনই-বা এত ঘনঘন সামরিক অভ্যুত্থান হলো?

উত্তরটা একটু পেছন থেকে শুরু করতে হবে। দেশভাগের পর পাক সেনাবাহিনীর ওপর একটা বেইনসাফি করা হয়েছিল। দেশভাগের পর পাকবাহিনীর সংখ্যার অনুপাতে তাদেরকে সম্পদ দেওয়া হয়নি। পাকবাহিনীতে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মির ৩০% বদলি হয়েছিল, ৪০% নৌবাহিনী বদলি হয়ে এসেছিল এবং ২০% বিমানবাহিনী বদলি হয়ে এসেছিল। এই বিপুলসংখ্যক বাহিনীর জন্য সম্পদ স্থানান্তর করা হয়েছে সাকুল্যে ১৭%। পাকিস্তান গঠনের প্রথমদিন থেকেই এতবড় বাহিনী পোষার মতো সম্পদ সরকারের কাছে ছিল না। হাত গুটিয়ে বসে থাকলে হবে না,

কিছু তো করতেই হবে। দেশভাগের অব্যবহিত পর থেকেই পাকিস্তানকে আমেরিকার দিকে সাহায্য প্রার্থনার হাত বাড়াতে হয়েছিল।

পাকিস্তান গঠনের মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরে ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে গভর্নর জেনারেল কায়েদে আজম মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ আমেরিকার কাছে ২ বিলিয়ন ডলারের সাহায্য চাইলেন। কায়েদে আজম এজন্য সাবেক ভাওয়ালপুর স্টেটের উপদেষ্টা মীর লায়েক আলীকে আমেরিকা পাঠিয়েছিলেন। আমেরিকার সাথে তার ভালো সম্পর্ক ছিল। আমেরিকা মাত্র ১০ মিলিয়ন ডলার মঞ্জুর করেছিল। তাও টাকা দিয়ে নয়, যুদ্ধসামগ্রী দিয়ে। পাশাপাশি আমেরিকা পরামর্শ দিয়েছিল, ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট ব্যাংকের ভায়া হয়ে আমেরিকার সাথে যোগাযোগ করতে। বর্তমানে যে ব্যাংকের নাম আইএমএফ। মীর লায়েক আলীর প্রতিনিধি দল সামরিক চাহিদার বিশাল এক ফিরিস্তিও আমেরিকার কাছে পেশ করেছিল। ১৭০ মিলিয়ন ডলার সেনবাহিনীর জন্য, ৭৫ মিলিয়ন ডলার বিমানবাহিনীর জন্য এবং ৬০ মিলিয়ন ডলার নৌবাহিনীর জন্য দেওয়ার আবেদন করা হয়েছিল। অত্যাধুনিক সমরাস্ত্রের একটি তালিকাও আমেরিকার হাতে সোপর্দ করা হয়েছিল। এই তালিকায় ছিল হাজার-হাজার যুদ্ধবিমান, ২০০ প্রশিক্ষণ বিমান, যুদ্ধজাহাজ, সাঁজোয়া যান, ক্রুজ, গানশিপ, গানবোট ও ৩টি সাবমেরিন। আমেরিকা এসব আবেদন পাশ কাটিয়ে গিয়েছিল।

পাকিস্তান সমরাস্ত্রের এই দীর্ঘ তালিকা এজন্য পেশ করেছিল যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাতাদের অনুমান ছিল, তুরস্ক থেকে জাপান পর্যন্ত দেশগুলোর মধ্যে পাকিস্তানই একমাত্র দেশ, যে এতদাঞ্চলে আমেরিকার স্বার্থ রক্ষা করতে পারে। পাকিস্তান আরো মনে করত, সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে আমেরিকার যে শীতলযুদ্ধ চলছে, ভারত সেক্ষেত্রে সোভিয়েতের পক্ষেই যাবে। কারণ, নেহেরুর চিন্তায় 'বাম' ভাইরাস ছিল। প্রথমে কায়েদে আজম, তারপর লিয়াকত আলী খান ও জেনারেল আইয়ুব খানও আমেরিকার কাছে নিজেদের সেনাসামর্থ্য বিকিয়ে ফায়দা লুটতে আগ্রহী ছিলেন। সোভিয়েতের বিরুদ্ধে আমেরিকার সাথে দাঁড়ানোর মতো অত্র অঞ্চলে পাকিস্তানের বিকল্প আর কেউ ছিল না।

৩৯.

লিয়াকত আলী খান গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যাওয়ার পর ১৯৫৩ সালে জেনারেল আইয়ুব খান ও ইস্কান্দার মির্জা যখন পাকিস্তানের শীর্ষ ক্ষমতায়, তখন

জেনারেল আইয়ুব খান আমেরিকা সফরে গিয়েছিলেন। মার্কিন কর্মকর্তারা জেনারেল আইয়ুব খানকে তাদের সামরিক স্থাপনা ও অস্ত্রশস্ত্র দেখাতে শুরু করল। আইয়ুব খানের এসব দেখার প্রতি আগ্রহ ছিল না। তিনি বারবার একটা কথাই বোঝাতে চাচ্ছিলেন, আমেরিকা যদি অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র দিয়ে পাকিস্তানকে সাহায্য করে, তাহলে সোভিয়েত আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তারা আমেরিকার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়তে পারবে। জেনারেল আইয়ুব বোঝাতে চাচ্ছিলেন, সোভিয়েত ইউনিয়নকে মধ্যএশিয়া পাড়ি দিয়ে আফগানিস্তান হয়ে 'গরম পানি' পর্যন্ত আসার ক্ষেত্রে বাধা দেওয়ার জন্য পাকিস্তানকে আমেরিকার প্রয়োজন। পাক ফৌজও এই কাজে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য পুরোদমে প্রস্তুত।

সোভিয়েতকে গরম পানি (পাক উপকূল) পর্যন্ত পৌঁছা ঠেকানোর এই পরিকল্পনা পাকবাহিনীর নিজস্ব উদ্ভাবন নয়। এই চিন্তা আরো একশ বছর বা তারও আগ থেকেই ব্রিটিশ বাহিনীর কাছে ছিল। তারা রুশ সাম্রাজ্যকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য অনেক কিছু করেছিল।

জেনারেল আইয়ুব খান যখন দেখলেন, মার্কিন কর্তৃপক্ষ তার কথায় কান দিচ্ছে না। তাকে শুধু সেনা ছাউনি আর ক্যান্টনমেন্ট দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। জেনারেল খান শেষে অতিষ্ঠ হয়ে মার্কিন সহকারী স্বরাষ্ট্র সচিব হেনরিকে বললেন : খোদার কসম, আমি এখানে সেনা ব্যারাক দেখার জন্য আসিনি। আমাদের সেনা আপনাদের সেনা হতে পারে, যদি আপনারা চান। অর্থাৎ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রথম দিন থেকেই পাক নেতারা দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধের দিকে মনোযোগ না দিয়ে সেনাবাহিনীকে সমৃদ্ধ করার দিকেই বেশি ঝুঁকে পড়েছিলেন। পাক নেতাদের আগ্রহ ছিল, কীভাবে নিজেদের সেনাশক্তি ব্যবহার করে বিশ্বের পরাশক্তিগুলোর কাছ থেকে আরো বেশি সুবিধা অর্জন করা যায়। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, শিল্পোন্নয়নের প্রতি তুলনামূলক কম মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল। এজন্য দেখা যায়, বর্তমানেও বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও সরকার, পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতাদের সাথে সম্পর্কের চেয়ে পাক জেনারেলদের সাথে সম্পর্কের গুরুত্ব বেশি দেয়। পুরো দুনিয়া পাকিস্তানকে 'গ্যারিসন স্টেট' বা সামরিক দেশ হিসেবে দেখে; ২২ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত সম্ভাবনাময় দেশ হিসেবে নয়। এসব কারণে পাক অর্থনীতি অনবরত ধুঁকতে থাকে আর মার্শাল ল বারবার ফুঁসতে থাকে।

১০.

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই কেন অনবরত আইএমএফ ও অন্যান্য বিশ্বসংস্থার কাছে ঋণগ্রস্ত থাকে? প্রতিষ্ঠাকাল থেকে আজ পর্যন্ত পাকিস্তান কেন ২২ বার আইএমএফের কাছে ঋণের জন্য ধরনা দিয়েছে? এ ছাড়া আমেরিকা, চীন, জাপান ও আরবদেশগুলোর কাছ থেকে নেওয়া ঋণ তো আছেই। আর কোনো দেশ এতবেশি এইএমএফের কাছে গিয়েছে কিনা, সন্দেহ আছে। অন্য কোনো দেশ গেলেও পাকিস্তান প্রথম দুই-তিন দেশের মধ্যেই থাকবে। উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর এই হতে পারে :

ক. প্রথম দিন থেকেই এতবড় বাহিনী পোষার মতো পর্যাপ্ত টাকা পাকিস্তানের হাতে ছিল না। কায়েদে আজমকে একপ্রকার বাধ্য হয়েই আমেরিকার দ্বারস্থ হতে হয়েছিল। দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থার দিকে তাকিয়ে পাকবাহিনী নিজেই নিজের খরচ সংগ্রহ করার কাজে নেমে পড়েছিল। এ কারণে তাদের মধ্যে একধরনের স্বায়ত্তশাসনের ভাব সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। আর শুরু থেকেই 'পাকবাহিনী' খোদ পাকিস্তানের অন্যতম প্রধান রপ্তানিযোগ্য 'পণ্যে' রূপান্তরিত হয়েছিল।

খ. পাকিস্তানে অর্থনৈতিক সমস্যার আরেকটি বড় কারণ, দেশভাগের সময় পাকিস্তানের ভাগে একটা উল্লেখযোগ্য শিল্পনগরী পড়েনি। কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ সবই ভারতের হাতে চলে গিয়েছিল। পাকিস্তানকে সবকিছু নতুন করে শুরু করতে হয়েছে। দেশভাগের পর মূলত পাকিস্তান সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে ইন্ডিয়া আগের আসল রাষ্ট্রই থেকে গিয়েছিল। তাদের নতুন করে কিছু করতে হয়নি।

গ. ১৯৭১ সালে যখন পাকিস্তান দুই টুকরা হয়ে গেল, এক ধাক্কায় দেশের জনসংখ্যা অর্ধেকের চেয়েও কমে গেল, তখনো সেনাবাহিনীর সংখ্যা প্রায় আগের মতোই ছিল। বাঙালি সেনা খুবই কম ছিল। ভৌগলিকভাবে পাকিস্তান আরো ছোট হয়ে গেল। এটাও পাক অর্থনীতির ওপর বিশাল চাপ সৃষ্টি করেছিল।

ঘ. পাক নেতারা শুরু থেকেই মারাত্মক এক ভুল বারবার করে আসছিল। সেটা হলো, প্রতিবেশীর সঙ্গে চলমান সামরিক ও সীমান্ত বিবাদের সাথে বাণিজ্যকেও জুড়ে দেওয়া। প্রতিবেশীর সাথে যুদ্ধ-সংঘাত হয়েছে? ব্যস লেনদেন বন্ধ। আমদানি-রফতানি বন্ধ। অথচ বিশ্বের অন্য দেশ ও জাতির

দিকে তাকালে এর ব্যতিক্রম চিত্রই দেখা মেলে। তাইওয়ানের সাথে চীনের চিরবৈরিতা। তারপরও তাইওয়ানের সাথে চীন প্রতি বছর ১৮৯ বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা করে। দুই দেশে পর্যটক আসা-যাওয়াতেও কোনো বাধা নেই। ভারতের সাথেও চীনের যুদ্ধ হয়েছে। এটাসেটা নিয়ে খিটিমিটি লেগেই আছে। ১০টিরও বেশি স্থানে সীমান্তবিরোধ লেগেই আছে। অরুনাচল, সিকিম, তিব্বত, আকসাই চীন নিয়ে রেষারেষি চলছেই। এসব সত্ত্বেও ভারতের সাথে প্রতি বছর ১৪০ বিলিয়নের বেশি আমদানি-রপ্তানি লেনদেন হয়। আমেরিকা স্বাধীন হয়েছিল ব্রিটেন থেকে। অত্যন্ত রক্তক্ষয়ী লড়াই করে আমেরিকা স্বাধীনতা লাভ করেছিল। তারপরও আমেরিকা একদিনের জন্যও বাণিজ্য বন্ধ করেনি। ২০২১ সালেও দুই দেশের বাণিজ্যিক লেনদেনের পরিমাণ ছিল ২৭০ বিলিয়ন ডলার। ইউক্রেন যুদ্ধ বাধার আগে আমেরিকা তার প্রাণের দুশমন রাশিয়ার সাথেও ২৮ বিলিয়ন ডলারের লেনদেন করেছে। দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক এতটাই সাবলীল ছিল যে, ডোনাল্ড ট্রাম্প মস্কোতে নিজস্ব বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের পরিকল্পনাও হাতে নিয়েছিল। ইংল্যান্ড-ফ্রান্স, জার্মানি-ফ্রান্স এরা সবাই অতীতের দুশমন আর বর্তমানের প্রতিদ্বন্দ্বী। তারপরও তাদের মাঝে প্রতি বছর বিলিয়ন-বিলিয়ন ডলারের লেনদেন হয়। তারা ভুল থেকে শিক্ষা নিয়েছে। পাকিস্তান এই সহজ বিষয়টা শিখে উঠতে পারছে না। একটা কিছু হলেই ভারতের সাথে বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক শীতল করে ফেলে।

দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কোন্নয়নের সর্বশেষ চেষ্টা ১৯৯৯ সালে হয়েছিল। বাজপায়ী ও নওয়াজ শরিফের মধ্যে। বাজপায়ী বাসে করে সরাসরি পাকিস্তানের লাহোরে এসেছিলেন। অনেক ইতিবাচক কথাবার্তা বলেছিলেন। এমনকি পাকিস্তানের প্রশংসায় স্বরচিত কবিতাও আবৃত্তি করেছিল। জেনারেল মোশাররফ ও তার চার দোস্তের ব্যর্থ কার্গিল যুদ্ধ সব উদ্যোগ নস্যাৎ করে দিয়েছিল। পাকিস্তানের পক্ষ থেকে সেই বিশ্বাস ভঙ্গের পর দুই দেশের সম্পর্ক আর জোড়া লাগেনি। আজকের মোদির ভারতের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্কোন্নয়নের চিন্তা কল্পনাতে আনাও অসম্ভব।

আফসোসের বিষয় হলো, পশ্চাদপদ সমাজ ও রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, তারা বৈদেশিক সম্পর্ক নির্ধারণে যুক্তি বা বাস্তবতা নয়, আবেগকে প্রাধান্য দেয়। অন্যদিকে উন্নত সমাজ ও রাষ্ট্র বিরোধপূর্ণ বিষয়কে বাণিজ্যিক লেনদেনের বাইরে রাখে। দুইপক্ষের রাজনৈতিক বিরোধ ও অর্থনৈতিক লেনদেন একসাথে চলমান থাকে।

যেকোনো দেশের সমস্যা সমাধানের জন্য সবচেয়ে সহজতম উপায় হলো :

০১. দেশ ও জাতির সব সমস্যার সমাধান (সংসদ, পার্লামেন্ট, মজলিসে শুরায়) উন্মুক্ত আলোচনা ও বিতর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত করা।

০২. দেশের কর্ণধারদের প্রতিটি পদক্ষেপ একটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে গৃহীত হওয়া যে, জনগণের কল্যাণই হবে একমাত্র লক্ষ্য। কোনো শত্রুতা বা ক্রোধের বশবর্তী হয়ে পদক্ষেপ না নেওয়া। জাতীয় অর্থনীতি ও দেশের স্থিতিশীলতার দিকে লক্ষ্য রেখেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

০৩. জনগণেরও একটা বিষয়ে সচেতন থাকা ভীষণ জরুরি। কোনো নেতা এসে আমাদের সব সমস্যার সমাধান করে ফেলবেন—এই আশায় বসে না থাকা। নেতারাই সব করবেন, নিজেদের কোনো দায়দায়িত্ব নেই—এমন অস্বাস্থ্যকর চিন্তা থেকে বেরিয়ে আসা জরুরি।

০৪. দেশের উন্নতির জন্য সবকিছু স্বচ্ছতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হওয়া জরুরি। স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক নির্বাচনী ব্যবস্থা, স্বচ্ছ বিচারব্যবস্থা ও স্বচ্ছ বাজেট হওয়া জরুরি। কোনো কিছুই যেন অস্পষ্ট না থাকে। নীতিনির্ধারণী মহলে জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার মানসিকতা যেন না থাকে।

শুধু শাসক নয়, জনগণকেও সৎ হতে হবে। নেতা সবকিছু ঠিক করে ফেলবেন আর প্রজারা নাকে তেল দিয়ে ঘুমুবে—এটা আকাশকুসুম কল্পনা। রাজা-প্রজা উভয়ের সম্মিলিত প্রয়াসেই দেশ গড়ে ওঠে।

পাকিস্তান'স নিউক্লিয়ার প্রোগ্রাম

২০০৩ সালের সেপ্টেম্বর। জেনারেল পারভেজ মোশাররফ নিউইয়র্কের এক হোটেল রুমে বসে আছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, কারো অপেক্ষায় করছে। সিআইএ প্রধান জর্জ টেনেট হোটেল রুমে প্রবেশ করল। কুশল বিনিময়ের পর ব্রিফকেস খুলে কাগজের একটা বান্ডিল বের করে জেনারেল মোশাররফের সামনে রাখল। মোশাররফ কাগজগুলো দেখে একদম জায়গায় জমে গেল। এগুলো কাগজ নয়, সাক্ষাৎ বোমা ছিল। জাঁদরেল জেনারেল মাথানিচু করে চরম বিব্রত ভঙ্গিতে কাগজগুলো নাড়াচাড়া করছিল। বুঝতে পারছিল না, কী জবাব দিবে। কী ছিল সেই কাগজে?

নাইন ইলেভেনের কিছু আগে পাকিস্তানের দুই অবসরপ্রাপ্ত পরমাণু বিজ্ঞানী ড. সুলতান বশির উদ্দিন মাহমুদ ও চৌধুরী আবদুল মজিদ ব্যক্তিগত এক গোপন মিশনে আফগানিস্তানে গিয়েছিলেন। এই দুই বিজ্ঞানী 'উম্মাহ তামিরে নও' (ইউটিএন) নামের এক বেসরকারি সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। তারা শায়খ ওসামা বিন লাদেন ও তার সহকারী আইমান জাওয়াহিরীর সাক্ষাৎ প্রত্যাশী ছিলেন। আমিরুল মুমিনিন মোল্লা উমরের সহযোগিতায় এই দুই পাকবিজ্ঞানী একিউ-এর আমির ও নায়েবের সাথে একাধিকবার সাক্ষাৎ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই সাক্ষাৎগুলোতে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি নিউক্লিয়ার, কেমিক্যাল ও বায়োলজিক্যাল ওয়েপন বিষয়েও আলোচনা হয়েছিল।

সে সময় আমেরিকার জোরেশোরে প্রচারণার ফলে বিশ্বজুড়ে একটা আলোচনা চলছিল, 'কীভাবে পরমাণু অস্ত্রের প্রসার রোধ করা যায়।' এজন্য আমেরিকা বিভিন্ন দেশকে 'এমবিটি' ও 'সিটিবিটি'-এর মতো চুক্তিতে স্বাক্ষর করাতে জোরদার লবিং চালিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময়ে একটি নিষিদ্ধ সংগঠনের শীর্ষনেতাদের সাথে পাকিস্তানের সবচেয়ে স্পর্শকাতর সামরিক শাখার দুই বিজ্ঞানীর গোপন বৈঠক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ছিল। এই সংবাদ মার্কিন কর্তৃপক্ষের কানে গেলে বা বিশ্বমিডিয়াতে ফাঁস হয়ে গেলে পাকিস্তানের জন্য মারাত্মক হুমকি ডেকে আনত। বাস্তবে এমনটাই ঘটেছিল।

সিআইএ প্রধান জর্জ টেনেট তার কর্মজীবনের স্মৃতিচারণমূলক বই 'এট দ্য সেন্টার অব দি স্টর্ম' বইতে লিখেছে, তাকে ইউরোপিয়ান এক গোয়েন্দা সংস্থা জানিয়েছিল, ২০০১ সালের আগস্টে পাকিস্তানের দুই পরমাণু বিজ্ঞানী আফগানে গিয়ে একিউ-এর নেতাদের সাথে গোপন বৈঠক করেছে। রাতের বেলা ক্যাম্পফায়ার ঘিরে বসে আণবিক বোমা বানানোর বিষয়ে কথাবার্তা বলেছে। এই সাক্ষাতের সংবাদ আইএসআইও পেয়েছিল। ইউটিএনের অনারারি সদস্য ছিল জেনারেল হামিদ গুল। বলা হয়ে থাকে, হামিদ গুলই (গাদ্দারি করে) এই সংবাদ আইএসআইকে দিয়েছিল।

এই সংবাদে আমেরিকা সীমাহীন বিচলিত হয়ে পড়েছিল। সিআইএর গুরুত্বপূর্ণ এক কর্মকর্তা পাকিস্তানে এসে জেনারেল মোশাররফকে সতর্ক করল। সিআইএ তাদের দাবির সপক্ষে বেশকিছু কাগজপত্রও দেখিয়েছে। এসব কাগজপত্র সিআইএ চুরি করেছিল ড. সুলতানের বাসা থেকে। কাগজে পরিষ্কারভাবে পরমাণু অস্ত্র ও বায়োলজিক্যাল ওয়েপন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ছিল। এই ঘটনা পাক সরকারের জন্যও অত্যন্ত দুশ্চিন্তার ছিল। বিব্রতকর তো বটেই। অন্যদিকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে মার্কিন চাপ দিনদিন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছিল।

২৩ অক্টোবর ২০০১ অর্থাৎ, নাইন ইলেভেনের প্রায় দেড় মাস পর ড. সুলতান ও চৌধুরী সাহেবকে ইউটিএনের আরো পাঁচসদস্যসহ আটক করা হয়। প্রত্যেককে অজ্ঞাত স্থানে রেখে পৃথক পৃথকভাবে জেরা করা হলো। প্রথমে অস্বীকার করলেও অকাট্য প্রমাণ পেশ করার পর দুই নিউক্লিয়ার বিজ্ঞানী স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। পাকিস্তানি ইন্টেলিজেন্স নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল, ইউটিএনকে ঢাল বানিয়ে এই দুই নিউক্লিয়ার সায়েন্টিস্ট একিউর সাথে গোপন তৎপরতায় লিপ্ত।

বিজ্ঞানীদ্বয়কে পাকিস্তান ও আমেরিকা উভয় দেশের গোয়েন্দারা জেরা করেছিল। সিআইএ প্রধান জর্জ টেনেট তার আত্মজীবনীতে লিখেছে, ইন্টারোগেশনে 'লাই ডিটেক্টর' ব্যবহার করা হয়েছিল। ড. সুলতান স্বীকার করেছিলেন, তার সাথে বিন লাদেনের একাধিক সাক্ষাৎ হয়েছে। তাকে পরমাণু অস্ত্রের 'খসড়া নকশা' দিয়েছিলেন। এসব তথ্যের ভিত্তিতে আমেরিকা চাচ্ছিল, দুই বিজ্ঞানীর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে। পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ ২০০২ সালের জানুয়ারিতে দুই বিজ্ঞানীকে মুক্তি দিয়ে নজরবন্দি করে রাখে। তাদেরকে সাজা দেওয়ার মতো কোনো অপরাধ সাব্যস্ত করা

যায়নি, এজন্য। এই ব্যবস্থা আমেরিকা বিলকুল পছন্দ করতে পারল না। আমেরিকা পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করল। প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলার জন্য আমেরিকা সাধারণত প্রথমে গোপন তথ্য মিডিয়ায় ফাঁস করে থাকে। এক্ষেত্রেও তাই করল। বিশ্বমিডিয়াতে দুই বিজ্ঞানী ও তাদের একিউ কানেকশনের কথা ফলাও করে প্রচারিত হলো। এবার শুধু আমেরিকাই নয়, আরো বহু দেশ থেকে পাকিস্তানের ওপর চাপ আসা শুরু হলো। এ দুই বিজ্ঞানী অত্যন্ত স্পর্শকাতর স্থানে কাজ করেছেন। দুজনেই অত্যন্ত যোগ্য ছিলেন। তাই তাদেরকে নিয়ে পরাশক্তিগুলো স্বস্তিতে ছিল না।

প্রশ্ন হলো, ড. সুলতান এমন চরম ঝুঁকিপূর্ণ কাজে কেন নামলেন? ড. সাহেব বিশ্বাস করতেন, পাকিস্তানের এটম বোমা পাকিস্তানের একার সম্পত্তি নয়, পুরো মুসলিম উম্মাহর। তিনি এক প্রেস রিলিজে পরিষ্কারভাবে বলেছেন : পুরো পশ্চিমা দুনিয়া আরবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। আরবের সুরক্ষায় পাকিস্তান ও আফগানিস্তানকেই এগিয়ে যেতে হবে। আল্লাহ তাআলা উপরোক্ত পবিত্র উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই পাকিস্তানকে পরমাণু বোমা দিয়েছেন।

ড. সাহেব এই ধরনের আরো কথা প্রকাশ্যেই বলতেন। পাকিস্তানে পরমাণু বিজ্ঞানীদের মধ্যে এই দুজনকে সবচেয়ে বেশি 'মৌলবাদী' মনে করা হতো। এজন্য দুজনকে সময়ের আগেই জোরপূর্বক অবসর দেওয়া হয়েছিল বা তারা নিজেরাই অবসর গ্রহণ করেছিলেন। অবসরের পর প্রথমে কিছুদিন তাদেরকে নজরবন্দি রাখা হয়েছিল। অবসর গ্রহণের পরই দুজনে ইউটিএন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

আমেরিকা বারবার দাবি করছিল, দুই ডক্টর গোপনে একিউকে পরমাণু বোমা বানানোর বিস্তারিত তথ্য পাচার করেছেন। দুই ডক্টর অস্বীকার করে বলে আসছিলেন, তারা বিন লাদেনের সাথে অন্য প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলেন। মুসলিম বিশ্বে কীভাবে বিজ্ঞানচর্চা বাড়ানো যায়, এ ব্যাপারে পরামর্শ ও ফান্ড সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন। তাদের এই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন আফগানিস্তান থেকে শুরু করতে চাচ্ছিলেন।

আমেরিকা এখানেই থামল না। তাদের লক্ষ্য আরো দূরে ছিল। তারা ড. আব্দুল কাদির খানকেও বিচারের কাঠগড়ায় আনতে চাচ্ছিল। ড. আব্দুল কাদির পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের কাছে ফেরেশতাতুল্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আমেরিকার দাবি ছিল, ড. খান পাকিস্তানের পরমাণু কর্মসূচির গোপন তথ্য

বাইরে পাচার করছেন। পাকিস্তানের কোনো কোনো গোয়েন্দা সংস্থার তদন্তে রিপোর্টও এমনটাই ছিল। আমেরিকা বহু আগে থেকেই ড. খানের পেছনে লেগে ছিল। একই অভিযোগ আরো আগ থেকেই করে আসছিল।

ডিজিআইএসআই লেফটেন্যান্ট জেনারেল জাভেদ নাসের একবার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের কাছে ড. খানের ব্যাপারে অভিযোগ করেছিল, ড. সন্দেহজনক তৎপরতায় লিপ্ত আছেন। তিনি টাকা কামানোর চেষ্টায় আছেন। জেনারেল জাভেদ তার অভিযোগপত্রে ড. খানের ২৩টি সম্পত্তির তালিকা দিয়েছিল, যেগুলোর মালিক হতে হলে ড. খানের অতিরিক্ত আয়-রোজগারের প্রয়োজন। বর্তমানে দৃশ্যমান এমন কোনো আয়ের উৎস ড. খানের নেই। নওয়াজ শরিফ এই অভিযোগকে পাত্তা দিলেন না। জেনারেল নাসের পরিষ্কার করে বলেছিলেন, ড. খান নিউক্লিয়ার ডকুমেন্ট বিক্রি করে বেড়াচ্ছেন। জেনারেল জাভেদ তখনকার আর্মি চিফের কাছেও দরখাস্ত করেছিল, তিনি যেন ড. খানকে বলেন, পাকিস্তানের টপ সিক্রেট ডকুমেন্ট জিএইচকিউতে জমা রাখতে।

এ ব্যাপারে শুধু জেনারেল জাভেদই তৎপর ছিল না, লেফটেন্যান্ট জেনারেল আসাদ দুরানী—যিনি ডিজিএমআই ও ডিজিআইএসআই ছিলেন—ড. খানের গতিবিধি সম্পর্কে উদ্বিগ্ন ছিলেন। ড. খান সবার সাথে অবাধে মিশতেন। বিদেশি প্রতিনিধিদের সাথেও ইচ্ছামতো কথা বলতেন। ব্যাপারটা ঝুঁকিপূর্ণ তো বটেই, সন্দেহজনকও।

৯০ দশক থেকেই গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর জোরদার সন্দেহ সত্ত্বেও কেউই ড. খানের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিল না। ড. খান ছিলেন পাকিস্তানের প্রচলিত ক্ষমতার উর্ধ্বে। ঘটনা এখানেই শেষ নয়; জেনারেল পারভেজ মোশাররফও ড. খানের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে উঠছিল। ১৯৯৯ সালের শুরুতে উত্তর কোরিয়া থেকে একদল মিসাইল ইঞ্জিনিয়ার পাকিস্তান সফরে এসেছিল। তারা এসেছিল ব্যালাস্টিক মিসাইল উন্নয়নে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বিষয়ে আলোচনা করতে। এখানে গোপন কিছু ছিল না। জেনারেল মোশাররফের বক্তব্য মতে, উত্তর কোরিয়ান প্রতিনিধিদলে মিসাইল এক্সপার্টদের মধ্যে কিছু ছদ্মবেশী নিউক্লিয়ার এক্সপার্টও ছিল। এই এক্সপার্টদেরকে কেআরএল (খান রিসার্চ ল্যাবরেটরি)-তে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ড. খান তাদের সাথে সেন্ট্রিফিউজ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

ড. খান তাদেরকে স্পর্শকাতর নিউক্লিয়ার প্লান্টও ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলেন। এসব তৎপরতা পাকিস্তানের নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত হুমকি ছিল।

আমেরিকা পাকিস্তানকে 'পরমাণু নিরোধ চুক্তি'তে সই করাতে একের এক চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছিল। পাকিস্তান যেন পরমাণু বোমা বিষয়ক তথ্য বাইরে কোথাও পাচার না করে, এ বিষয়ে আমেরিকা নিশ্চিত হতে চাচ্ছিল। এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করার জন্য পাকিস্তানকে ভয়ের পাশাপাশি লোভও দেখানো হচ্ছিল। অন্যদিকে তখন কার্গিল যুদ্ধের আবহ চলছিল। আমেরিকা আগে থেকেই উত্তর কোরিয়ার ওপর মহাখাপ্পা ছিল। একের পর এক নিষেধাজ্ঞা দিয়ে যাচ্ছিল। আমেরিকা যেকোনো মূল্যে উত্তর কোরিয়ার পরমাণু বোমা তৎপরতা রোধ করতে বদ্ধপরিকর। ড. খান উত্তর কোরিয়াকে বোমা বানানোর ফর্মুলা পাচার করছেন—এই তথ্য ফাঁস হলে দুনিয়া জুড়ে তোলপাড় হয়ে যেত।

জেনারেল মোশাররফ নিজের আত্মজীবনীতে লিখেছে, ড. খানকে তলব করা হলো। বৈঠকে ড. খান, জেনারেল মোশাররফ ও গোয়েন্দা প্রধান উপস্থিত ছিল। ড. খানের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, আপনি উত্তর কোরিয়ার এক্সপার্টদের সেন্ট্রিফিউজ সম্পর্কে ব্রিফিং করেছেন? ড. খান এই অভিযোগ সরাসরি অস্বীকার করলেন। ড. খানের কথায় জেনারেল মোশাররফ আশ্বস্ত হতে পারল না। তার মন খুঁত খুঁত করতে লাগল। তার শুধু মনে হতে লাগল, কোথাও কিছু একটা গড়বড় হচ্ছে। জেনারেল মোশাররফ তখন সেনাপ্রধান ছিল, প্রেসিডেন্ট হয়নি।

অবস্থার পরিবর্তন হলো। জেনারেল মোশাররফ সেনাপ্রধান থেকে রাষ্ট্রপ্রধান হলো। ক্ষমতা পেয়েই ড. খানের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করল। আগে ড. খান পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। এখন প্রেসিডেন্ট একটা পরিচালনা পরিষদ গঠন করে দিলো। আগে ছোটবড় যেকোনো সিদ্ধান্ত ড. খান নিতেন, এখন নবগঠিত পরিষদ সিদ্ধান্ত নিবে। পরিষদের প্রধান হবে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন সিনিয়র অফিসার। অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা বিষয়ক সিদ্ধান্ত এই পরিষদই গ্রহণ করবে।

এতকিছু করার পরও ড. খানের ব্যাপারে মোশাররফ আশ্বস্ত হতে পারছিল না। তার কাছে ড. খান সম্পর্কে নানা তথ্য আসতে থাকল। জেনারেল মোশাররফের মতে, ড. খান নিজেই এক সমস্যা হয়ে গেলেন। ২০০১ সালের ৩০ মার্চ, নাইন ইলেভেনের প্রায় সাড়ে পাঁচ মাস আগে ড. খানকে এটমিক

প্রোগ্রাম থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলো। পাকিস্তানে সাধারণ জনগণের কাছে এটা ছিল বজ্রাঘাতের মতো। এটা ছিল এক জাতীয় হিরোর অপমান। সাধারণ জনতা আক্রোশে ফেটে পড়ল।

জেনারেল মোশাররফ এতকিছু করার পরও নিশ্চিন্ত হতে পারল না। তার কাছে তখনো ড. খান সম্পর্কে তথ্য আসছিল। ড. খান দুবাই থেকে তার তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন। কী করা যায়, জেনারেল মোশাররফ এ নিয়ে ভাবছিল। কঠিন কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার চিন্তাই তার মাথায় ঘুরেফিরে আসছিল। এরই মধ্যে ২০০৩ সালে জাতিসংঘের এক বৈঠকে অংশ নেওয়ার জন্য নিউইয়র্ক যেতে হলো। বৈঠকের শেষে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ জেনারেল মোশাররফকে একপাশে ডেকে নিয়ে বলল, আপনার সময় থাকলে আগামীকাল সিআইএ চিফ জর্জ টেনেটকে একটু সময় দিবেন। জেনারেল মোশাররফের জন্য এটা এক সারপ্রাইজ ডিমান্ড ছিল। পরদিন জর্জ এলো। এক তোড়া কাগজ জেনারেলের সামনে রাখল। জর্জ বলল, ড. খান পাকিস্তানের সাথে প্রতারণা করেছেন। তিনি পাকিস্তানের সবচেয়ে স্পর্শকাতর ডকুমেন্ট বাইরে বিক্রি করে দিয়েছেন। তারপর জর্জ টেনেট একটা ড্রয়িং বের করে জেনারেলকে দেখিয়ে বলল, এই নকশা ইসলামাবাদের সুরক্ষিত কোনো ভল্টে থাকার কথা ছিল; কিন্তু এটা নিউইয়র্কের হোটেলে আমার হাতে আছে। ড্রয়িংটা ছিল পাকিস্তানের পি-১ সেন্ট্রিফিউজের ডিজাইন। ড. খান এটা ইরানের কাছে বিক্রি করেছেন।

তারপর জর্জ টেনেট দ্বিতীয় ড্রয়িং বের করল। এটা হচ্ছে, পাকিস্তানের নেক্সট জেনারেশন পি-২ সেন্ট্রিফিউজ। তারপর তৃতীয় ড্রয়িং বের করল। এটা পাকিস্তানের ইউরেনিয়াম প্রসেসিং প্লান্ট-এর ড্রয়িং। ড. খান এটাকে লিবিয়ার কাছে বিক্রি করেছেন।

জেনারেল লিখেছে, আমি ড্রয়িংটা দেখামাত্রই চিনে ফেললাম। এটা পাকিস্তানের ইতিহাসে সবচেয়ে গোপন ডকুমেন্ট। ডকুমেন্টগুলোতে হাতের লিখা ছিল, নোট ছিল। এমনকি বিজ্ঞানীদের দস্তখতও ছিল। কাগজগুলো কতটা গোপন আর স্পর্শকাতর—সেটাও আমার জানা ছিল। আমার জীবনে এর চেয়ে অধিক লজ্জা আর কখনো পাইনি। পাকিস্তানের এমন গোপন ডকুমেন্ট সিআইএ-এর হাতে থাকা সাধারণ কোনো ঘটনা ছিল না (ইন দ্যা লাইন অব ফায়ার, পৃ.: ২৯০-২৯১)।

যদিও এসব কাগজে পাকিস্তানি এটমিক প্রোগ্রামের প্রাথমিক ড্রয়িং ছিল, কাগজপত্রও এসব ছিল সর্বোচ্চ মাত্রার গোপনীয় কাগজপত্র। এসব দলিল-দস্তাবেজ থাকার কথা ছিল পাকিস্তানের সুরক্ষিততম কোনো ভল্টে। প্রশ্ন হলো, এসব কাগজ সিআই-এর হাতে কীভাবে পৌঁছল? জেনারেল মোশাররফের কাছে ড. খানের বিরুদ্ধে এমন কী তথ্য-প্রমাণ ছিল, বাহ্যিক দৃষ্টিতে যার কোনো গ্রহণযোগ্য উত্তর ড. খান বা তার সমর্থকদের কাছে ছিল না? ড. খান এসব অভিযোগের ব্যাপারে নিজে কী বলতেন? পাকিস্তানের এটমিক প্রোগ্রামের তথ্য পাচারে কি শুধু ড. খানই জড়িত ছিলেন নাকি অন্য কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দেশও জড়িত ছিল? কী ছিল পাকিস্তানের পরমাণু বোমা বানানোর পেছনের কারণ? এসব ঘটনা জর্জ টেনেট তার আত্মজীবনী *এট দ্যা সেন্টার অব দি স্টর্ম : মাই ইয়ারস এট দি সিআইএ* বইতে (পৃষ্ঠা : ২৮৫) লিখেছে।।

কিছুদিন পরের ঘটনা। পিটিভি স্টুডিওতে প্রম্পটরের সামনে ড. আবদুল কদির খান বসে আছেন। তার সামনের স্ক্রিনে একটি স্ক্রিপ্ট ছিল, সেটা তাকে পড়তে হবে। শেষ মুহূর্তে ড. খান স্ক্রিপ্ট পড়তে অস্বীকৃতি জানালেন। তিনি এমনটা কেন করলেন? ড. খান ও জেনারেল মোশাররফের মধ্যে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে কী নিয়ে কথোপকথন হয়েছিল? লিবিয়া ও ইরানের কাছে আমেরিকা কী পেয়েছিল, যদ্দরুন আমেরিকা যেকোনো মূল্যে ড. খানকে আমেরিকা নিয়ে যেতে চাচ্ছিল। আমেরিকার এই দুরভিসন্ধি কীভাবে ব্যর্থ হলো?

২০০২ সালের আগস্ট, ইরানের দুই গোপন এটমিক সাইট ইউরেনিয়াম এনরিচম্যান্ট প্লান্টের অস্তিত্ব ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। ইরানের দুই নির্বাসিত ব্যক্তি এই ফাঁসের ঘটনায় জড়িত ছিল। নাতানজ ও আরাক শহরে ছিল উক্ত দুই ইউরেনিয়াম এনরিচম্যান্ট ফ্যাসিলিটি। গুগল আর্থের সাহায্যে তথ্য নিশ্চিত করা হলো। এটমিক টেকনোলজি নিয়ে কাজ করা সংগঠন, আইএই তদন্ত শুরু করে দিলো। অস্ট্রিয়ার ভিয়েনাতে এটার সদর দপ্তর। জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো আইএই-কে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে থাকে। সংস্থার পক্ষ থেকে ইরানের কাছে দুটি সাইটের পরিদর্শনের অনুমতি চাওয়া হলো। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর ২০০৩ সালের জুনে ইরান অনুমতি দিয়ে দিলো। আইএই তদন্ত করে দেখতে চাচ্ছিল, ইরানের নিউক্লিয়ার প্রোগ্রাম বেসামরিক কাজের জন্য নাকি এটম বোমা বানানোর জন্য

তেহরান থেকে ৩০০ কিলোমিটার দূরে মরুভূমিতে ছিল নাতানজের সেই গোপন সাইট। এখানে ইউরেনিয়াম এনরিচম্যান্টের জন্য প্রায় ১০০টির মতো সেন্ট্রিফিউজ ইনস্টল করার কাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। প্ল্যানে ১০০০ ইনস্টলেশনের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা ছিল। হাজার খানেক কেসিংসও প্রস্তুত ছিল। পরিদর্শন টিমের অন্যতম সদস্য ছিলেন ব্রিটিশ মেটালারজিস্ট (Metallurgist-'ধাতুবিদ্যা') বিশারদ ট্রেভর এডওয়ার্ডস। পরবর্তীতে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, আমি ইরানি সেন্ট্রিফিউজের ডিজাইন দেখার দশ সেকেন্ডেই বুঝে গিয়েছিলাম, এটা তো হুবহু ইউরেনকোর ডিজাইন। ১৯৭০ সালে এই ডিজাইন তৈরি হয়েছিল। আমি আর ড. খান তখন একই সময়ে ইউরেনকোতে চাকরি করতাম। ড. খান এই ডিজাইন হল্যান্ড থেকে পাকিস্তানে নিয়ে এসেছিলেন। ইউরেনকো হচ্ছে হল্যান্ডের নিউক্লিয়ার গবেষণাকেন্দ্র।

এই ডিজাইন অত্যন্ত গোপনীয় ছিল। কালোবাজারে পাওয়া সম্ভব ছিল না। ইরানি এক্সপার্টদের কাছে জানতে চাওয়া হলো, আপনারা এত জটিল বা অত্যাধুনিক সেন্ট্রিফিজগুলো কীভাবে বানিয়েছেন?

-এটা ইরানি এক্সপার্টদের নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি। প্রয়োজনীয় তথ্য ইন্টারনেট ও বইপত্র থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এটা আমাদের জেনুইন ডিজাইন। বাইরের কোথাও থেকে ধার করে আনা হয়নি।

তদন্তকারী দলের লোকজন সাধারণ কেউ ছিল না। সবাই ছিল অত্যন্ত উঁচুমাপের নিউক্লিয়ার এক্সপার্ট। তাদেরকে যা তা বলে প্রবোধ দেওয়া সম্ভব ছিল না। তদন্ত দল সেখানকার বাকি ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ফরেনসিক টেস্ট করে দেখল। ওখানে এমন কোনো ফ্যাসিলিটি ছিল না, যার মাধ্যমে সেন্ট্রিফিউজ তৈরি করা যাবে।

ইরানি কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চাওয়া হলো, বর্তমান মডেল বানানোর জন্য যে ফ্যাসিলিটিজ দরকার—সেটা কোথায়? জেনারেল মোশাররফের বক্তব্য অনুযায়ী, আইএই-এর এমন বেমক্বা প্রশ্নে ইরানি কর্তৃপক্ষ থতমত খেয়ে গেল। তারা আমতা আমতা করে কোনো দেশ বা সংগঠনের নাম না নিয়ে স্বীকার করল, তারা সেন্ট্রিফিউজের টেকনোলজি 'আউটসাইড সোর্স' থেকে সংগ্রহ করেছে। ইরানের এই জবাবে বহু সন্দেহ ও প্রশ্নের জন্ম দিলো। এই সন্দেহ জেনারেল মোশাররফ পর্যন্ত পৌঁছানো হলো। এসব সন্দেহ হালে পানি

যেত না, যদি না দুবাই বন্দর ছেড়ে যাওয়া একটি জাহাজের ঘটনা সামনে না আসত।

২০০৩ সালের শীতের মওসুম শুরু হয়েছে। মালয়েশিয়ার এক গোপন ফ্যাক্টরিতে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকারী সেন্ট্রিফিউজ তৈরি করা হয়েছে। এসব সেন্ট্রিফিউজ কন্টেইনারে লুকিয়ে প্রথমে দুবাই পৌছানো হলো। তারপর বিবিসি চায়না নামক এক বাণিজ্যিক জাহাজে করে লিবিয়া পাঠানোর বন্দোবস্ত করা হলো। পুরো প্রক্রিয়ার পেছনে ছিলেন এক শ্রীলঙ্কান ব্যবসায়ী বিএস তাহের (বোখারি সাইয়েদ আবু তাহের)। *পাকিস্তান'স নিউক্লিয়ার বম্ব* বইয়ের লেখক, হাসান আব্বাসের মতে, বিএস তাহের ছিলেন ড. খান-এর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ড. খান-এর মালয়েশিয়াভিত্তিক গোপন ব্যবসায়িক নেটওয়ার্কের শীর্ষকর্তা ছিলেন বিএস তাহের।

জনাব তাহের মালয়েশিয়ান কোম্পানি স্কোমির মাধ্যমে সহস্রাধিক সেন্ট্রিফিউজের উপাদান প্রস্তুত করিয়েছেন। স্কোমি তেল ও গ্যাস আমদানি-রপ্তানির কাজ করে। এছাড়া ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি বিষয়েও কাজ করে। এই কোম্পানি মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের অয়েল ইন্ডাস্ট্রির জন্য নানারকমের যন্ত্রপাতি নির্মাণ করত। পাশাপাশি গোপনে সেন্ট্রিফিউজের উপাদান (Component) ও মাল-মশলাও তৈরি করত। এই কোম্পানিতে ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থার এক ডাবল এজেন্ট কাজ করত। এই চর এমআই-৬-কে ২০০৩ সালে সংবাদ দিয়েছিল, দুবাই থেকে একটি জাহাজ লিবিয়া যাচ্ছে। সেটাতে অমুক অমুক কন্টেইনারে সেন্ট্রিফিউজের উপাদান রয়েছে। এমআই-৬ ও সিআইএ-এর কাছে সংবাদ পৌছার আগেই জাহাজটি দুবাই বন্দর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। এমআই-৬ ব্রিটেনের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে জাহাজকে সাগরে মাঝপথে থামানোর চেষ্টা শুরু করে দিলো। এসব করতে করতে জাহাজ মিশরের সুয়েজ ক্যানেল পার হয়ে ভূমধ্যসাগরে চলে গেছে। এক্ষুনি ঠেকাতে না পারলে লিবিয়ার বন্দরে পৌছে যাবে। এমন টানটান উত্তেজনার মধ্যে জাহাজের ক্যাপ্টেন মালিকপক্ষ থেকে জরুরি এসওএস পেল। বিবিসি চায়নাকে ইতালির বন্দর টরেন্টোতে নোঙর ফেলতে হবে। ২০০৩ সালের ৪ নভেম্বর জাহাজে তল্লাশি শুরু হলো। এমআই-৬ ও সিআইএ-এর জয়েন্ট অপারেশন ছিল এটি। তাদের হাতে মাত্র দুই ঘণ্টা সময় ছিল। এই সময়ের মধ্যেই তাদেরকে ২০০ বড় বড় কন্টেইনারের মধ্য থেকে শুধু ৪টি কন্টেইনার খুঁজে বের করতে হবে, যেগুলোতে সন্দেহ ও বিপজ্জনক উপাদান ছিল।

তাদের চিন্তার কিছু ছিল না; কারণ কন্টেইনারের নাম্বার ও অবস্থান তাদের জানা ছিল। খুঁজে পেতে বেগ পেতে হলো না। কাঠের খোলস ভেঙে দেখা গেল, সত্যিই সেগুলোতে বিপুল পরিমাণে সেন্ট্রিফিউজের কম্পোনেন্ট থরে থরে সাজানো আছে।

তখন লিবিয়া বিশ্বশক্তির পক্ষ থেকে চরম চাপে ছিল। পুরো বিশ্ব লিবিয়াকে ক্রমাগত চাপ দিয়ে যাচ্ছিল, লিবিয়া যেন তার এটমিক প্রোগ্রাম পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়। কর্নেল গাদ্দাফী বিশ্বের দাবিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে আপন লক্ষ্যে অনঢ় ছিলেন। বিবিসি চায়নার শিপম্যান্ট হাতেনাতে ধরা পড়ার পর ব্রিটেনের হাতে সাক্ষ্যপ্রমাণ এসে গেল। ব্রিটেন এর মাধ্যমে লিবিয়াকে এটমিক প্রোগ্রাম বন্ধ করে দিতে বাধ্য করেছিল। কর্নেল গাদ্দাফী বিশ্বশক্তির নজিরবিহীন চাপে সমস্ত প্ল্যান্টসকে ইন্সপেকশনের জন্য উন্মুক্ত করে দিলেন। পরবর্তীতে কর্নেল গাদ্দাফী ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে বিষয়টি ঘোষণা দিয়ে জানিয়েছিলেন। তখন ২০০৩ সালের ১৯ ডিসেম্বর।

তদন্তকারী দল লিবিয়ার গোপন কেমিক্যাল ফ্যাক্টরিতে তল্লাশি শুরু করল। ফ্যাক্টরিগুলোতে অসংখ্য সিলড কন্টেইনার পাওয়া গেল। পাশাপাশি একটি শপিং ব্যাগ পাওয়া গেল। জেনারেল মোশাররফের বক্তব্য মতে, শপিং ব্যাগটি ছিল ইসলামাবাদের এক ট্রেইলার দোকানের, যেখান থেকে ড. খান নিজের স্যুট-সাফারি বানাতেন। সেই শপিং ব্যাগে নিউক্লিয়ার ওয়েপনের ডিজাইন মজুদ ছিল। ইরান ও লিবিয়ার মতো উত্তর কোরিয়া থেকেও পাক গোয়েন্দাদের হাতে এমন কিছু তথ্য-প্রমাণ এসেছিল। ওদিকে আমেরিকাও জেনারেল মোশাররফকে বেশুমার তথ্য-প্রমাণ দিয়ে রেখেছে। আমেরিকার দেওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ ছিল সিআইএ চিফ জর্জ টেনেটের দেওয়া তথ্যাদি। যেগুলো নিউইয়র্কের হোটেলরুমে জেনারেল মোশাররফকে দেখিয়েছিল।

জর্জ টেনেট লিখেছে, তারা এসব কাগজপত্র ইরান ও লিবিয়া থেকেই সংগ্রহ করেছে। সিআইএ-এর মতো আইএসআই-ও ২০০৪ সালের কিছু আগে ড. খান-এর দুটি অতি গোপন চিঠি হাতিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিল। একটি চিঠি ইরানি বিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছিল। তাতে লেখা ছিল, তদন্ত-তল্লাশি চলাকালে কোনো অবস্থাতেই তার নাম যেন উচ্চারণ না করা হয়। যেসব নিউক্লিয়ার এক্সপার্ট ইতিমধ্যে মারা গেছে, তাদের নাম নেওয়া যেতে পারে। এসব প্রমাণাদি দেখিয়ে আমেরিকা জেনারেল মোশাররফের কাছে

একটি দাবি পেশ করে আসছিল। জেনারেল মোশাররফ মার্কিন দাবি না শুনে নানা ছুতোয় এড়িয়ে যাচ্ছিল। সেই মার্কিন দাবি ছিল, ড. খানকে আমেরিকার হাতে সোপর্দ করা হোক।

জেনারেল মোশাররফের পক্ষে মার্কিন দাবি মানা প্রায় অসম্ভব ছিল। চরম আত্মঘাতিও ছিল বটে। তখনকার দুনিয়া ৯/১১-এর পর আমূল বদলে গিয়েছিল। পশ্চিমা মিডিয়া ড. খানকে ঘিরে সত্য-মিথ্যার মিশেল দিয়ে অকথা-কুকথার ছাইপাঁশ ছাপতে লাগল। টাইম ম্যাগাজিন ড. খানের ছবি প্রচ্ছদে দিয়ে মোটা অক্ষরে শিরোনাম দিয়েছে : দি মার্চেন্ট অব মেনেস (MENACE) তথা 'অনিষ্টের বেনিয়া।'

ড. খানের ব্যক্তিগত তৎপরতার সাথে পাকিস্তান সরকারের কোনো সম্পর্ক বা সম্পৃক্তি ছিল না। তারপরও পশ্চিমা মিডিয়া পাক সরকারকেও ড. খানের সহযোগী হিসেবেই প্রচার করছিল। এজন্য পুরো পাকিস্তানের ওপর চারিদিক থেকে অবিশ্বাস্য রকমের চাপ আসতে লাগল। অতএব, অবস্থার প্রতিকারে কিছু করতেই হবে।

স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান ডিভিশনের প্রধান, লেফটেন্যান্ট জেনারেল খালেদ কিদওয়ায়ীকে দায়িত্ব দেওয়া হলো। তাকে একটি প্রেজেন্টেশন প্রস্তুত করতে বলা হলো। যথাসময়ে প্রেজেন্টেশন প্রস্তুত হলো। জনসমক্ষে প্রদর্শনের আগে কিছু সাংবাদিককে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে তলব করা হলো। এর মধ্যে ড. খান বারো পৃষ্ঠার এক স্বীকারোক্তিনামায় স্বাক্ষর করেছিলেন, যাতে ড. খান ইরান, লিবিয়া ও উত্তর কোরিয়াতে এটমিক টেকনোলজি পাচারের কথা স্বীকার করেছেন। সাংবাদিকদের আড়াই ঘণ্টা ধরে ১৯৮৯ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত এটমিক টেকনোলজি ক্রয়-বিক্রয়ের খতিয়ান সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সহকারে দেখানো হলো। প্রেজেন্টেশনে এটাও দেখানো হলো, এই ক্রয়-বিক্রয় কার্যক্রমে তিন জার্মানি ও এক লংকান ব্যবসায়ী তাহেরও শরিক ছিল। এসব কথা গার্ডিয়ানের সাংবাদিক এড্রিয়ান লেভি তার বই *ডিসেপশনে* লিখেছে।

জেনারেল মোশাররফের মতে, এই ক্রয়-বিক্রয় কার্যক্রমে কয়েকজন ভারতীয়ও জড়িত ছিল। উক্ত প্রেজেন্টেশনের আগে কেআরএল-এ কর্মরত বিজ্ঞানীদেরও আলাদা আলাদা করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তারপর ড. খানের সাথে জেনারেল মোশাররফের রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে তৃতীয় কারো উপস্থিতি ছিল না। মজার বিষয় হলো, পরবর্তীতে এই বৈঠকের বিবরণ

দুজনেই সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন দিয়েছিলেন। জেনারেল মোশাররফ সাক্ষাৎকারে বলেছে : আমি যখন ড. খানের সামনে সমস্ত প্রমাণাদি রাখলাম। জানতে চাইলাম, ডক্টর সাহাব, আপনে ইয়ে কেয়া কর্ দিয়া?

জেনারেল মোশাররফের বক্তব্যমতে, 'ড. খান এসব অকাট্য প্রমাণ দেখে আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। এমনকি এক পর্যায়ে আমার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়লেন। বারবার মাফ চাইতে লাগলেন। বলতে লাগলেন, 'আমি অত্যন্ত অনুতপ্ত, লজ্জিত। আমি সরকারি ক্ষমা চাই'।'

জেনারেল মোশাররফ লিখেছে, আমি ড. খানকে বললাম, 'সরকার নয়, আপনি জনগণের কাছে ক্ষমা চান।'

এই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে ড. খান সম্পূর্ণ ভিন্ন বক্তব্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'ওই বৈঠকে আমাকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়েছিল। আমার ক্ষমাপ্রার্থনাতেই নাকি দেশ ও দশের সার্বিক কল্যাণ রয়েছে। এজন্য আমি বাধ্য হয়ে জেনারেল মোশাররফের কথা মেনে নিয়েছিলাম।'

দীর্ঘ তর্কবিতর্কের পর একটি সংক্ষিপ্ত স্বীকারোক্তিনামা প্রস্তুত করা হলো। ২০০৪ সালের ৪ এপ্রিল ড. খানকে পিটিভির স্টুডিওতে লাইভ ক্যামেরার সামনে বসিয়ে দেওয়া হলো। আমেরিকার চাহিদামতো, ড. খানকে ইংরেজিতে স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য করা হয়েছিল। ড. খানের সামনে প্রম্পটরে সরকারের পক্ষ থেকে সরবরাহ করা স্বীকারোক্তির স্ক্রিপ্ট দেখানো হচ্ছিল।

শেষ মুহূর্তে ড. খান প্রম্পটর ব্যবহার করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। ড. খান নিজের সামনে সর্বসম্মতিক্রমে নির্ধারিত হওয়া স্বীকারোক্তিনামার একটা কপি রেখেছিলেন। ড. খানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ড. শফিকের মতে, জনাব খান এমনটা করার কারণ হলো, দর্শকরা যাতে বুঝতে পারে, ড. সাহেব নিজ থেকে নয়, কারো লিখে দেওয়া স্ক্রিপ্ট পড়ছেন। জেনারেল মোশাররফ পিটিভি কর্তৃপক্ষকে বলে দিয়েছিল, ড. খানের স্বীকারোক্তিনামা যেন একটু বিলম্ব করে সম্প্রচার করা হয়। রেকর্ডকালে ড. খান নিজের থেকে কোনো কথা যোগ করে দিলে সেটা যেন সম্পাদনার সুযোগ থাকে। তাই করা হয়েছিল। ড. খান জাতির উদ্দেশ্যে স্বীকারোক্তিনামা পড়তে শুরু করলেন। তিনি স্বীকার করেছেন, 'আমাকে এমন সব প্রমাণাদি দেখানো হয়েছে, যার বেশিরভাগই সত্য'।

ড. খান স্ক্রিপ্টে যা ছিল হুবহু তাই পড়ে দিয়েছেন। তবে মাঝামাঝিতে কিছু শব্দ নিজের থেকে যোগ করেছিলেন। এর মধ্যে একটা শব্দ ছিল, Good Faith। এই শব্দটা স্ক্রিপ্টের অংশ ছিল না। এই স্বীকারোক্তির পর পূর্ব চুক্তিমতো ড. খানকে 'ট্রায়াল' থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলো[১]। তারপর ড. খানকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়। এরপর পুরো পাকিস্তানে একটা সংবাদ চাউর হয়ে গিয়েছিল, ড. খানকে আমেরিকার হাতে সোপর্দ করে দেওয়া হবে। পারভেজ মোশাররফ এক সংবাদ সম্মেলনে পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা দিয়েছিল, আই এম স্ট্যান্ডিং বিটুইন ড. খান এন্ড দ্যা ওয়ার্ল্ড। আমার জীবন থাকতে তার কোনো ক্ষতি হতে দিব না। মোশাররফ এ কথা বলার কারণ ছিল, ড. খানের ব্যাপারে আমেরিকার সাথে তার অঘোষিত এক চুক্তি হয়েছিল। ড. খানের বিষয়টা কীভাবে সামাল দেওয়া হবে, সেটাই ছিল গোপন আঁতাতের অংশ। এর প্রমাণ হিসেবে বলা যায়, ড. খানের স্বীকারোক্তি সম্প্রচারের পর মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব কন্ডোলিজা রাইস এক বিবৃতি দিয়েছিল। যার সারাংশ হচ্ছে, ড. খান-এর বিষয়টা একপ্রকার পরিণতি লাভ করেছে।

মোশাররফও এরপর নিজেকে বাঁচানোর জন্য পাশ্চাত্যের সমালোচনার সুরে সাক্ষাৎকারে বলেছিল, দুনিয়ার সমস্ত দেশই নিউক্লিয়ার টেকনোলজি অন্য কোনো দেশ থেকেই চুরি করেছে। জেনারেলের মতে, সবার আগে জার্মানি এটমিক টেকনোলজির প্রোলিফিকেশন শুরু করেছিল। আমেরিকা সেখান থেকে চুরি করেছে। তারপর রাশিয়া সেখান থেকে চুরি করেছে। শুধু পাকিস্তান বা অন্য কোনো দেশকে চুরি বা বিক্রির দায়ে অভিযুক্ত করা ঠিক নয়।

কিছুদিন পর যখন ড. খানের নজরবন্দি থাকার মেয়াদ শেষ হলো, তিনি একটা সাক্ষাৎকার দিলেন। তিনি বড়ই দুঃখের সাথে সাংবাদিক সুহাইল উরাইচকে বলেছিলেন, আমার একটা বিষয়ে ভীষণ দুঃখ আছে। জীবনে একটা বিষয় নিয়ে আমি খুবই আফসোস করি। সেটা হলো, এই জাতির জন্য কাজ করা। অন্য কোনো কাজ করতাম, সেটাই ভালো ছিল। সুখে থাকতে পারতাম।

ড. খানের স্বীকারোক্তির পরপরই তৎকালীন পাক প্রধানমন্ত্রী মীর জাফরুল্লাহ জামালীকে ইস্তফা দিতে বাধ্য করা হয়েছিল। মীর জামালীর কথা ছিল, জেনারেল মোশাররফ ড. খানকে আমেরিকার হাতে সোপর্দ করতে চাচ্ছিল;

[১] ইন দ্যা লাইন অব ফায়ার : ২৯৩

ইরাকে সাদ্দামের বিরুদ্ধে সেনা পাঠাতে চাচ্ছিল ও বেলুচিস্তানে আকবর বুগটির বিরুদ্ধে সেনা অভিযান চালাতে চাচ্ছিল। আমি এসবের বিরোধিতা করার কারণে আমাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে জেনারেলের বক্তব্য ছিল, মীর জামালি 'ইনকম্পিটেন্ট' তথা দায়িত্ব পালনে অযোগ্য। এজন্য তাকে ইস্তফা দিতে বলা হয়েছে।

মোদ্দাকথা, ড. খানের সম্পর্কে যত কথাই বলা হোক; এ কথা সত্যি, পাকিস্তান নিউক্লিয়ার শক্তির অধিকারী হওয়ার পেছনে ড খানের অবদানই বেশি। তিনিই হল্যান্ড থেকে নিউক্লিয়ার টেকনোলজি পাকিস্তানে নিয়ে এসেছিলেন। একার হাতেই পাক নিউক্লিয়ার কার্যক্রম শুরু করেছেন। এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

পরমাণু বোমা তৈরির গোড়ার কথা

ইমরান খান আত্মজীবনীতে লিখেছেন, তাকে তিনবার রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। একবার জেনারেল জিয়াউল হক তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তখন মিয়া নওয়াজ শরিফ পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। দ্বিতীয়বার ১৯৯২ সালে পাকিস্তান যখন ক্রিকেট বিশ্বকাপ জিতেছিল, তখন নওয়াজ শরিফ খান সাহেবকে রাজনীতিতে আসার দাওয়াত দিয়েছিলেন। তৃতীয়বার কাকড় নীতির আলোকে নওয়াজ শরিফের সরকারকে যখন বরখাস্ত করা হয়েছিল, তখন ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী মইনুদ্দিন কুরেশী ইমরান খানকে মন্ত্রীপরিষদে যোগ দেওয়ার দাওয়াত দিয়েছিলেন। তিনটি প্রস্তাবই খান সাহেব বিনয়ের সাথে এড়িয়ে গেছেন। তার বক্তব্য ছিল, দেশের রাজনৈতিক অবস্থা তাকে উদ্বিগ্ন করে তুলছিল। রাজনীতিও আমার পিছু পিছু দৌড়াচ্ছিল। সাংবাদিকরাও সাক্ষাৎকারে বারবার একই প্রশ্ন করে যাচ্ছিল, আপনি কবে রাজনীতিতে আসছেন? খান সাহেব স্পষ্ট করে কিছু বলতেন না।

এর মধ্যে দুটি ঘটনা ঘটল। ১৯৯৪ সালের অক্টোবর। ইমরান খানের ড্রিম প্রজেক্ট শওকত খানম হাসপাতালের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। ডাক্তার, নার্স নিয়োগ দেওয়া হয়ে গেছে। আনুষ্ঠানিকভাবে চিকিৎসার কাজ শুরু হবে। সমস্যা হলো, ফান্ড শেষ হয়ে গিয়েছে। জরুরি কিছু যন্ত্রপাতি কেনার জন্য আরো ৪০ লাখ ডলার দরকার ছিল। কোথাও কোনো আশার আলো দেখা যাচ্ছিল না। খান সাহেবের বন্ধু তাহের আলী খান পরামর্শ দিলো, তুমি ভিক্ষার ঝুলি হাতে রাস্তায় নেমে পড়ো। লক্ষ-কোটি রুপিয়া তো কেউ দিবে

না: সাধারণ জনগণের কাছ থেকেই না হয় এক-দুই টাকা করে তোলা শুরু হোক। পরামর্শটা খান সাহেবের মনে ধরল। গাড়ি নিয়ে লাহোরের রাস্তায় নেমে পড়লেন। ভোজবাজির মতো কাজ হলো। অল্প সময়ের মধ্যেই ৫ লাখ রুপিয়া উঠে গেল। কৌশলটা কাজে লাগায় খান সাহেব পুরো পাকিস্তানে মিশন ছড়িয়ে দিলেন। সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বাজারে টাকা সংগ্রহ অভিযান চালানো হলো। সাত সপ্তাহ পর যখন 'মাধুকরি' সংগ্রহ অভিযানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হলো, তখন ৪০ লাখ ডলারের পরিবর্তে ৫০ লাখ ডলার জমা হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ, এক মিলিয়ন ডলার অতিরিক্ত। এই অভিযানে শুধু টাকাই জমা হয়নি, অপ্রত্যাশিত আরেকটি বড় বিষয়ও অর্জিত হয়েছিল। খান সাহেবের ভাষায়, আমি কল্পনাও করতে পারিনি, পাকিস্তানের জনগণ এত বড় মনের। আমার ওপর তারা কতবেশি আস্থা রাখে—সেটাও পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলাম। লোকজন আমাকে এভাবে দিল খুলে মদদ করবে, পয়সাও দিবে, দোয়াও দিবে, শুকরিয়াও আদায় করবে—এতটা ভাবিনি। আমি পুরো দেশের সাধারণ মানুষের যতই শুকরিয়া আদায় করি, এই ঋণ কিছুতেই শোধ হওয়ার নয়।

এই ঘটনার পর থেকেই খান সাহেব রাজনীতিতে আসার কথা গুরুত্বের সাথে ভাবতে শুরু করলেন। আশেপাশের লোকজনের কাছে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ব্যাপারে তার আগ্রহের কথাও বলা শুরু করলেন। অক্টোবরে টাকা সংগ্রহ শেষ হয়েছে; ডিসেম্বরে হাসপাতাল উদ্বোধনের তারিখ নির্ধারণ করা হলো। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারী ব্যক্তিগতভাবে ম্যাসেজ পাঠালেন, তিনি নিজেই হাসপাতাল উদ্বোধন করতে চান। ইমরান খান ঠিক করেছিলেন, হাসপাতালের উদ্বোধন ক্যান্সার আক্রান্ত এক বালিকাকে দিয়ে করাবেন। খান সাহেব উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টো ও তার স্বামী প্রেসিডেন্ট জারদারীকে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি করা তো দূরে থাক, দাওয়াতই দিলেন না। এই ঘটনায় পিপলস পার্টির মিয়া-বিবি বেজায় নাখোশ হলো।

পিটিভিতে তখন ক্যান্সার হাসপাতালের প্রচারণামূলক এড প্রচারিত হতো। বেনজির ভুট্টো রেগেমেগে টিভির বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দিলেন। রমযান মাসেই সবচেয়ে বেশি চাঁদা উঠত। হাসপাতালের বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দেওয়াতে ক্যান্সার হাসপাতালের তহবিল সংগ্রহ ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হলো। এর মধ্যে প্রিন্সেস ডায়ানা হাসপাতাল পরিদর্শনে এলেন। হাসপাতালের সংবাদ বিশ্বমিডিয়াতে

চলে গেল। খান সাহেবের এমন উত্তরণ, প্রতিষ্ঠিত পাক রাজনীতিবিদদের মনে অশনিসংকেত বাজিয়ে দিলো। এই টানাহ্যাঁচড়া এক বছর পর্যন্ত চলল।

এরপর একটা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটল। ১৯৯৬ সালের ১৪ এপ্রিল সকালে ইমরান খান বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নাসিম সেহগালকে হাসপাতাল পরিদর্শনে নিয়ে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এমন সময় হাসপাতালে বোমা বিস্ফোরণ ঘটল। বোমার আঘাতে দুটি ক্যান্সারাক্রান্ত শিশু মারা গেল। পাকিস্তানের ইতিহাসে কোনো হাসপাতালে এটি ছিল প্রথম বোমা হামলা। এই ঘটনায় ৭ জন নিহত ও ৩৫ জন গুরুতর আহত হয়েছিল। হাসপাতালের কোটি কোটি রুপির ক্ষতি হলো। বেনজির ভুট্টো সেদিনই ক্ষতিগ্রস্ত হাসপাতাল পরিদর্শনে এলেন। বেনজির ভুট্টোর প্রতি খান সাহেব এত বেশি নাখোশ ছিলেন যে, প্রধানমন্ত্রী পৌঁছার আগমুহূর্তে হাসপাতাল ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। পরদিন খান সাহেবের কাছে জানতে চাওয়া হলো, আপনি প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানালেন না যে? খান সাহেব বললেন, বেনজির ভুট্টো নাটক করার জন্য এসেছে। বেনজির ভুট্টোর সাথে সম্পর্ক তখনই ঠিক হতে পারে, টিভির বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দেওয়ার ফলে হাসাপাতালের যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে, বেনজির ভুট্টো সেটা যখন পুষিয়ে দিবে।

সেদিন নওয়াজ শরিফও হাসপাতাল পরিদর্শনে এলেন। ইমরান খান নিজেই শরিফকে অভ্যর্থনা জানালেন। নওয়াজের প্রশংসা করে খান বললেন, নওয়াজ শরিফ তার শাসনামলে হাসপাতাল নির্মাণে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেননি। এক প্রশ্নের জবাবে খান সাহেব বলেছিলেন, 'আমি সরকারের সাথে নেই, পরিবর্তন কামনাকারীদের সাথে আছি।' খান সাহেব যখন এই কথা বলেছিলেন, তখন নওয়াজ শরিফ সরকার পরিবর্তনের আন্দোলন করছিলেন। খান সাহেবের ইশারা নওয়াজ শরিফের দিকে ছিল।

বোমা বিস্ফোরণের এগারো দিন পর, ২৫ এপ্রিল ১৯৯৬ সালে লাহোরের এক হোটেলে প্রেস কনফারেন্স করে তার নিজস্ব রাজনৈতিক দল 'তেহরিকে ইনসাফ' প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছিলেন। দলের ইশতেহারে বলেছিলেন, তিনি পাক রাজনীতিতে চলমান 'ভিআইপি' কালচার খতম করবেন, ভাঙচুর ও নেতিবাচক রাজনীতি তারা করবেন না। দুর্নীতি ও বেকারত্ব খতম করবেন। তিনি কিছুতেই কাঠপুতলি প্রধানমন্ত্রী হবেন না। খান সাহেব তরুণ শ্রেণি ও নারীদের প্রতি বিশেষ আবেদন রেখেছিলেন। তাদেরকে দলে যোগ দেওয়ার

উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন, তার দলে কখনোই অতীতের লুটেরা রাজনীতিবিদদের স্থান দিবেন না। এই ঘোষণা দেওয়ার সময় তার পাশে গুটিকয়েক আত্মীয়-পরিজন ছাড়া আর কেউ ছিল না।

তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টো প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বলেছিলেন, ইমরান খান রাজনীতিতে এসেছেন ভালো কথা। আশা করি, কাপ্তান সাহাব বল ট্যাম্পারিং করবেন না। খান সাহেব জবাবে বলেছেন, মুহতারামা, নিউট্রাল আম্পায়ার রাখুন। তারপর দেখুন বল ট্যাম্পারিং কে করে।

দৈনিক জং পত্রিকায় ছাপা হওয়া নিবন্ধে বলা হলো, 'তাহরিক' নাম দিয়ে শুরু হওয়া রাজনৈতিক দল কখনো সফল হয়নি। বিশ্বমিডিয়ায়ও ইতিবাচক কিছু ছিল না। ভারতের পত্রপত্রিকা ইমরান খানকে মৌলবাদীদের দোসর আখ্যা দিয়েছিল। অস্ট্রেলিয়ান পত্রিকায় তেহরিকে ইনসাফের ইশতেহারকে 'কাল্পনিক' আখ্যা দিয়েছিল। বিবিবি ও ভয়েস অব আমেরিকা বলেছিল, ইমরান খানের পরিবর্তনের ইশতেহার অস্পষ্ট।

ঘরোয়া রাজনীতিতে বেনজির ভুট্টোর যেমন এক প্রতিদ্বন্দ্বী তৈরি হলো, পররাষ্ট্র বিষয়েও বেনজির এক ধাক্কা খেলেন। ১৯৯৬ সালের শুরু থেকেই আমেরিকা ও পাকিস্তানের সম্পর্ক ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছিল। এর পেছনে কারণ ছিল চায়নিজ মিসাইল ও একটি ওভারকোট। আমেরিকার অভিযোগ ছিল, পাকিস্তান চীনের কাছ থেকে এম-৯ মিসাইল পেয়েছে। এই নবনির্মিত মিসাইলের মাত্রা ছিল ৬০০ কিলোমিটারেরও বেশি। পাকিস্তানকে এই মিসাইল দিয়ে চীন আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করেছে। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে, এক দেশ আরেক দেশকে দূরপাল্লার মিসাইল ও প্রযুক্তি সরবরাহ করতে পারবে না। চীন প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিল, তারা পাকিস্তানকে এ-১১ মিসাইল দিয়েছে। এটার মাত্রা ৩০ কিমি পর্যন্ত। এতে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘিত হয়নি। আমেরিকা এখানেই থামল না; আরো অভিযোগ করল, পাকিস্তানকে এটমিক রিং ম্যাগনেটও চীন দিয়েছে। এই রিং ম্যাগনেট দিয়ে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করার গ্যাস সেন্টিফিউজকে এটমিক উইপন বানানোর উপযুক্ত করে তোলে। এই অভিযোগের অভিঘাত, এক বছর আগে বেনজিরের অত্যন্ত সফল আমেরিকা সফরের খুশিতে পানি ঢেলে দিয়েছিল। আমেরিকার পররাষ্ট্র দপ্তর নব উদ্যমে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কড়া বিবৃতি দাগাতে শুরু করল।

এম-৯ মিসাইল বা রিং ম্যাগনেট পাক-মার্কিন সম্পর্কে টানাপোড়েনের

একমাত্র কারণ ছিল না। আরো একটা কারণ ছিল, যার কারণে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে নাজুক করে তুলছিল। বেনজির ভুট্টো ১৯৯৩ সালের ডিসেম্বরে ক্ষমতা গ্রহণ করেই চীন ও উত্তর কোরিয়া সফরে গিয়েছিলেন। এই সফরের কারণে মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগ বুঝতে পেরেছিল, ডাল মে বহুত কুচ কালা হ্যায়। বেনজির সফর শেষ করে ফিরে আসতে না আসতেই মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগ হইচই শুরু করে দিলো। তারা বলল, বেনজির উত্তর কোরিয়া থেকে নওডং ও ইয়ারো ডং নামক দূরপাল্লার মিসাইল প্রযুক্তি নিয়ে এসেছে। বিনিময়ে পাকিস্তান উত্তর কোরিয়াকে এটমিক টেকনোলজি বিক্রি করেছে। এটা নিয়ে দুই দেশের মধ্যে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। ২০০৪ সালে এক জাপানি পত্রিকায় দেওয়া সাক্ষাৎকারে বেনজির স্বীকার করেছিলেন, পাকিস্তান উত্তর কোরিয়া থেকে মিসাইল টেকনোলজি ক্রয় করেছে। এই প্রযুক্তি টাকা দিয়ে কেনা হয়েছে। পাকিস্তান উত্তর কোরিয়াকে আণবিক প্রযুক্তি দেয়নি।

২০০৭ সালে বেনজির নিহত হয়েছেন। ২০০৮ সালে ভারতীয় লেখক শ্যাম ভাটিয়া বেনজিরের জীবনী লিখেন। বইয়ের নাম ছিল গুডবাই শাহজাদি। শ্যাম ভাটিয়া একজন ওয়ার করেসপনডেন্ট। সুদান ও আফগান যুদ্ধ কভার করেছিলেন। ভারতের পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ে শ্যামকে একজন বিশেষজ্ঞ বিবেচনা করা হয়। নিজের বইতে শ্যাম দাবি করেছেন, ২০০৩ সালে এক সাক্ষাৎকারে বেনজির স্বীকার করেছিলেন, উত্তর কোরিয়াকে আণবিক প্রযুক্তি দেওয়া হয়েছিল। সেখানে শ্যামও উপস্থিত ছিলেন। এ কথা বলার সময় বেনজিরের দৃষ্টি বেশ উজ্জ্বল চকচকে হয়ে গিয়েছিল। বেনজির বলেছিলেন, 'আমি উত্তর কোরিয়াকে এটমিক টেকনোলজির তথ্যসংবলিত সিডি সরবরাহ করেছি'। তবে কয়টা সিডি দিয়েছেন, কাকে দিয়েছেন—এ বিষয়ে কোনো তথ্য বেনজির বলেননি। শ্যাম পরবর্তীতে বারবার বেনজিরের কাছে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চেয়েছিলেন। বেনজির মুখ খোলেননি। শ্যাম লিখেছেন, উত্তর কোরিয়া যাওয়ার আগে বেনজির ইসলামাবাদ থেকে বড়সড় ওভারকোট ক্রয় করেছিলেন। কোটের পকেটগুলো ছিল বেশ গভীর। এই কোটের পকেটেই সিডিগুলো পুরেছিলেন। সিডিতে সেন্ট্রিফিউজের এক শ-এরও বেশি ড্রইং আর ছবি ছিল। বিনিময়ে উত্তর কোরিয়াও তাদের লংরেঞ্জ মিসাইলের প্রযুক্তি সিডিগুলোতে কপি করে দিয়েছিল। নওডং মিসাইলের রেঞ্জ ছিল ১২শ থেকে ১৫শ কিমি। এসব মিসাইল আজও উত্তর কোরিয়া ব্যবহার করে। শ্যাম ভাটিয়ার গল্প যদি সত্যি হয় তাহলে বলতে হবে, বেনজির ভুট্টো নিজের

প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে পাকিস্তানকে মিসাইল টেকনোলজি এনে দিয়েছিলেন। কারণ, আমেরিকা যদি আগে টের পেত, পাকিস্তান ও উত্তর কোরিয়ার মধ্যে এটমিক প্রযুক্তি লেনদেন হতে চলছে—তাহলে এটা রোধ করার জন্য আমেরিকা যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে পিছপা হতো না। ইতিহাস সাক্ষী, আমেরিকা নিজের স্বার্থের জন্য আণবিক বোমা ব্যবহার করতে দ্বিধা করে না। যাত্রীবাহী বিমানও ভূপাতিত করে ফেলে। আমেরিকা ১৯৮৮ সালের ৩ জুলাই একটি ইরানি যাত্রীবাহী বিমান ভূপাতিত করেছিল। বিমানে থাকা ২৯০ জন যাত্রীর সবাই মারা গিয়েছিল। এর মধ্যে ৬৬ জন শিশু ছিল।

শ্যাম ভাটিয়া যাই বলুক, বেনজির ভুট্টো আজীবন বলে গেছেন, তিনি উত্তর কোরিয়া থেকে মিসাইল টেকনোলজি টাকা দিয়ে কিনে এনেছিলেন। বিনিময়ে আণবিক প্রযুক্তি দেননি। হ্যাঁ, বেনজিরের শাসনামলে পাকিস্তানের মিসাইল ও আণবিক কর্মসূচি তেজিয়ান গতিতে এগিয়ে চলেছিল। পাকিস্তান আণবিক বোমা বানানোর দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছিল। এই সময় বেনজিরের ওপর নওয়াজ শরিফ মহাখাপ্পা ছিলেন। বেনজির ভুট্টো নওয়াজ শরিফের পিতা ও ছোট ভাই শাহবাজ শরিফকে গ্রেফতার করেছিলেন। বেনজির সরকারের পতন ঘটানোর জন্য জামাআত নেতা কাজি হুসাইন আহমাদও নওয়াজ শরিফের সাথে ছিলেন।

পাকিস্তানে সরকার পতনের বহুল আলোচিত পদ্ধতি ছিল, প্রেসিডেন্ট বিশেষ ক্ষমতাবলে সংসদকে বিলুপ্ত ঘোষণা করতেন। পাক সংবিধানে প্রেসিডেন্টের এই ক্ষমতা যোগ করেছিলেন জেনারেল জিয়াউল হক। নওয়াজ শরিফদের জন্য হতাশার কারণ ছিল, তখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ছিলেন বেনজিরের অত্যন্ত আস্থাভাজন ফারুক লেঘারী। সরকারের পতন ঘটানো তো দূরের কথা, প্রেসিডেন্ট ফারুক লেঘারী চাচ্ছিলেন, সরকার বিলুপ্তির ক্ষমতাসম্পন্ন ধারা ৫৮-২বি রহিত করতে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, এহেন প্রিয় আর আস্থাভাজন লেঘারী সাহেবও বেনজির সরকারকে প্যাকেট করে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কথিত আছে, ফারুক লেঘারী কোনো এক পক্ষ থেকে বহুমূল্য উপঢৌকন পেয়ে এই কাজ করেছিলেন।

১৯৯৭ সালে ভারতের সামরিক শক্তি পাকিস্তানের চেয়ে অনেক বেড়ে গিয়েছিল। প্রথাগত অস্ত্র : মেশিনগান, তোপ, কামান ইত্যাদিতে ভারত অনেক বেশি উন্নত করে এগিয়ে যাচ্ছিল। এমনকি মিসাইল টেকনোলজিতেও ভারত হাত পাকাতে শুরু করেছিল। বাধ্য হয়ে পাকিস্তানকেও এই ময়দানে নামতে

হয়েছিল। পাকিস্তান অবশ্য অনেক আগ থেকেই এ ব্যাপারে প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। মিসাইল দ্বৈরথ দুই দেশকে পারমাণবিক বিস্ফোরণ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

১৯৯৮ সালে কট্টরপন্থী বিজেপি অটল বিহারি বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী হন। মুসলিম ও পাকিস্তান বিরোধিতা আর হিন্দুত্ববাদ ছিল এই দলের প্রধান শক্তি। এই দলের হাতেই কয়েক বছর আগে ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ শহীদ হয়েছিল। দুই দেশের সম্পর্ক আরো অবনতি ঘটেছিল। আমেরিকা এতদিন পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠ মিত্র ছিল, এবার ভারতের সাথে দহরম-মহরম বাড়িয়ে দিলো। আগে শুধু পাকিস্তানকেই সামরিক সহায়তা দিত। এখন ভারতকেও সামরিক সহায়তা দিতে শুরু করল। মাত্র ছয় বছরে ভারতের সাথে আমেরিকার বাণিজ্যিক লেনদেন ১০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছিল। ভারত কনভেনশনাল ওয়েপনে (প্রথাগত অস্ত্রে) পাকিস্তানের চেয়ে এতটাই আগে বেড়ে গিয়েছিল যে, যুদ্ধ বাঁধলে পাকিস্তানের পক্ষে ময়দানে টিকে থাকাই মুশকিল হয়ে পড়ত। কাগজে-কলমে আনকনভেনশনাল ওয়েপনেও ভারত পাকিস্তানের চেয়ে বহুদূর এগিয়ে গিয়েছিল। ভারত এরই মধ্যে পৃথ্বী-৩৫০, ২০০০ কিলোমিটার রেঞ্জের অগ্নি-২ মিসাইল নির্মাণের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। অন্যদিকে পাকিস্তানের হাতে ছিল এম-১১ মিসাইল। এর রেঞ্জ ছিল মাত্র ৩০ কিলোমিটার। ভারতের সাথে পাল্লা দেওয়ার জন্য পাকিস্তান প্রাণপণে লড়ে যাচ্ছিল। স্বল্পপাল্লা ও দূরপাল্লার মিসাইল তৈরি করাটা পাকিস্তানের জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। পাকিস্তান বেশ আগে থেকেই এই প্রকল্পে হাত দিয়েছিল।

পাকিস্তান ৬ এপ্রিল ১৯৯৮ হাতাফ-৫ এর সফল পরীক্ষা চালাতে সক্ষম হয়। এটাকে ঘোরি মিসাইলও বলা হয়। এর রেঞ্জ ছিল ১৫০০ কিলোমিটার। ভারত এতদিন যেসব মিসাইল বানিয়েছিল, ঘোরি ছিল সবগুলোর মুখে এক প্রচণ্ড চপেটাঘাত। পাক এক্সপার্টদের দাবি মতে, ঘোরিকে কোনো এন্টি মিসাইল সিস্টেম ট্রেস করতে পারবে না। মাত্র ১০ মিনিটে লক্ষে পৌঁছে আঘাত হানতে সক্ষম ছিল ঘোরি। ভারতের রাজধানী দিল্লি, মুম্বাই, আহমেদাবাদ, মাদ্রাজ (চেন্নাই), নাগপুর, জলন্ধর, জয়সলমিরসহ বড় বড় শহরগুলো ঘোরির টার্গেটের আওতায় এসে গিয়েছিল। ঘোরি এসে পাক-ভারতের সামরিক ভারসাম্য অনেকটা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিল। বলা যায়, ঘোরির মাধ্যমে দৌড়ে পিছিয়ে পড়া পাকিস্তান ফের শুধু ময়দানেই ফিরে আসেনি,

ভারতকে পেছনে ফেলে বহুদূর এগিয়েও গিয়েছিল। দুই দেশের সামরিক ক্ষমতায়ও মোটামুটি ভারসাম্য এসে গিয়েছিল।

ভারতের কট্টর হিন্দুত্ববাদী সরকার বিজেপির গায়ে আগুন ধরে গেল। তারা পাকিস্তানবিরোধী প্রচারণা ও প্রপাগান্ডা চালিয়েই ক্ষমতায় এসেছিল। বিজেপি সরকার পাকিস্তানের এই অর্জন হজম করতে পারল না। পাকিস্তানের জনগণ ঘোরির আনন্দে রাস্তায় নেমে এসেছিল। মিষ্টি বিতরণ করে আনন্দ উদ্‌যাপন করছিল। ওদিকে দিল্লিতে বাজপায়ী পাল্টা চাল দিলো। ক্ষমতার লড়াইয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য পারমাণবিক বিস্ফোরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। পাকিস্তানের মিসাইল পরীক্ষার কারণে ভারতের হাতে বাড়তি উৎসাহ যোগ হয়েছিল। ১৯৯৮ সালের ১১ মে প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ কাজাখাস্তান সফরে ছিলেন। তিনি একটা মেসেজ পেলেন। গোপন মেসেজটা জনাব শরিফকে জীবনের সবচেয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করে দিলো। মেসেজটি ছিল, ভারত রাজস্থানের পোখরানে তিনটি আণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। এই জায়গায় ভারত ১৯৭৪ সালেও আণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। ভারত যখন আণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল, সে সময় পাকিস্তানে অবস্থিত আরব আমিরাতের দূতাবাসে সে দেশের প্রতিরক্ষা দিবস উপলক্ষ্যে সেমিনার চলছিল। সেই প্রতিরক্ষা সেমিনারে পাক আর্মি চিফ জেনারেল জাহাঙ্গীর কারামত ও ড. আবদুল কাদির উপস্থিত ছিলেন। জেনারেল জাহাঙ্গীর চোয়ালবদ্ধ প্রতিজ্ঞা করে বললেন, ভারতের এই বিস্ফোরণের জবাব দেওয়া ভীষণ জরুরি। ড. কাদির মুচকি হেসে বললেন, আমরা শতভাগ প্রস্তুত।

পাকিস্তানের সাধারণ নাগরিক থেকে শুরু করে সেনাপ্রধান, প্রধানমন্ত্রী সবাই জবাবি আণবিক বিস্ফোরণের জন্য উন্মুখ প্রস্তুত ছিলেন। সমস্যা বাঁধল আরেক জায়গায়। সে সময় আমেরিকা বিশ্বজুড়ে আণবিক অস্ত্রবিরোধী তুমুল প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছিল। 'পরমাণু অস্ত্রমুক্ত পৃথিবী' আন্দোলন চালাচ্ছিল। পাকিস্তান সতর্ক পদক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছিল। জবাবি বিস্ফোরণ ঘটালে বিশ্ব প্রতিক্রিয়া কেমন হতে পারে—আন্দাজ করার চেষ্টা করছিল। আমেরিকা, ব্রিটেন, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, জাপানসহ বিশ্বের তাবড় শক্তিগুলো ভারতীয় বিস্ফোরণের নিন্দায় সরব হয়ে উঠেছিল। আমেরিকা ১২ কোটি ডলারের সামরিক সহায়তাও বন্ধ করে দিয়েছিল। বিশ্বশক্তির মতে, ভারত এই মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে 'পরমাণু অস্ত্রমুক্ত বিশ্ব'—আন্দোলনকে ভীষণ

ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। জাপানের জনগণ এই বিস্ফোরণের বিরোধিতায় রাস্তায় নেমে এসেছিল। তারা ১৯৪৫ সালে পরমাণু হামলার শিকার হয়েছিল। জাপান, ডেনমার্ক, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ভারত থেকে নিজেদের দূত ফিরিয়ে নিয়েছিল। শুধু তাই নয়, এসব রাষ্ট্র ভারতের জন্য ঘোষিত সামরিক ও বেসামরিক সহায়তা স্থগিত করে দিয়েছিল। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, এতসব চাপ কিছুদিনের মধ্যেই উধাও হয়ে গিয়েছিল। আমেরিকা সামরিক সহায়তা স্থগিত করলেও বিভিন্ন মার্কিন কোম্পানির ভারতে বিনিয়োগ করা ৭ বিলিয়ন ডলার বহাল তবিয়তে ছিল। এসব কোম্পানি মার্কিন সরকারকে চাপ দিয়েছিল, মার্কিন প্রশাসন যেন ভারতের ওপর কঠিন কোনো নিষেধাজ্ঞা জারি না করে। এমন নিষেধাজ্ঞায় আমেরিকারই ক্ষতি।

ভারত দুইদিন পর আরো দুটি বিস্ফোরণ ঘটাল। এসব ঘটনা পাকিস্তানের জন্য অত্যন্ত হতাশাজনক ছিল। এর চেয়েও হতাশাজনক ঘটনা ঘটেছিল কদিন পর অনুষ্ঠিত হওয়া জি-৮ শীর্ষ সম্মেলনে। এই সম্মেলন দুনিয়ার সবচেয়ে বড় আটটি অর্থনীতিধারী রাষ্ট্রগুলোর সংগঠনের। এই বৈঠকে দেশগুলো বিশ্বপরিস্থিতি ও অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই বৈঠকে ভারতীয় বিস্ফোরণকে নিন্দা তো করেইনি, উল্টো রাশিয়ার পক্ষ থেকে বলা হলো, ভারত চাইলে আরো চারটি বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে।

যেসব রাষ্ট্র কদিন আগে ভারতের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের হম্বিতম্বি করছিল, তারা অর্থাৎ আমেরিকা, চীন ও অস্ট্রেলিয়া ভারতে আরো বেশি বিনিয়োগের চুক্তি করল। এখানেই শেষ নয়; শীর্ষ সম্মেলন চলাকালে জার্মান চ্যান্সেলর ঘোষণা দিলেন, 'পাকিস্তান আণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ফেলেছে।' এই সংবাদ সঠিক ছিল না। তারপরও পাকিস্তানের না ঘটানো বিস্ফোরণের সংবাদ পুরো দুনিয়ায় দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল। কয়েকটা রাষ্ট্র তৎক্ষণাৎ নিন্দাও জানিয়ে বসল। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থিত পাক দূতাবাসগুলোতে সংবাদের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য ফোনের পর ফোন আসতে লাগল।

বিশ্বের এমন দ্বিমুখী আচরণে বিজেপি প্রধান অটল বিহারি বাজপায়ীকে আরো বেপরোয়া করে তুলল। বাজপায়ী খোলাখুলি পাকিস্তানকে আণবিক হুমক দিতে শুরু করল। আণবিক বোমা বিস্ফোরণের স্তর পেরিয়ে ভারতের কথাবার্তা সরাসরি আণবিক হামলার হুমকিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। এতবড় পদে বসে

এমন ছেলেখেলা করা উচিত হচ্ছিল না; তারপরও বাজপায়ী তা করে চলছিল। লাইন অব কন্ট্রোলে গরিব কৃষক বোমা হামলায় মারা পড়ছিল, দুই পক্ষই সীমান্তে ভারী ভারী অস্ত্র মোতায়েন শুরু করে দিলো। এতসব চাপ-চ্যালেঞ্জ একাই মোকাবেলা করছিলেন একজন ব্যক্তি—পাক প্রধানমন্ত্রী। কারণ, পরমাণু বিস্ফোরণের সিদ্ধান্তও তাকে নিতে হবে, বিস্ফোরণের পর চারিদিক থেকে ধেয়ে আসা চাপও তাকেই মোকাবেলা করতে হবে। বিস্ফোরণ ঘটালে কী পরিণতি হতে পারে—সেটা বলার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন ফোন করল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট হুমকি দিয়ে বলেছিল, পাকিস্তান যদি বিস্ফোরণ ঘটায় তাহলে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে। আমেরিকা পাকিস্তানের অনেক বড় এক্সপোর্ট পার্টনার ছিল। নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলে পাক অর্থনীতির মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার আশঙ্কা ছিল। শুধু হুমকি দিয়েই ক্ষান্ত হলো না ক্লিনটন, পাশাপাশি ৫ বিলিয়ন ডলার সহায়তা ও এফ-১৬ কেনার টাকাও ফেরত দেওয়ার আশ্বাস দিলো। নওয়াজ শরিফ চুপচাপ মার্কিন প্রেসিডেন্টের কথা শুনে যাচ্ছিলেন। চুপ থাকাকে মৌন সম্মতি ধরে নিয়ে ক্লিনটন আরেক ধাপ আগে বেড়ে উচ্চক্ষমতাবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল পাকিস্তানে পাঠিয়ে দিলো। এই দলের একটাই কাজ ছিল, কোনো না কোনোভাবে পাক রাজনীতিবিদদের মুখ থেকে এই স্বীকারোক্তি আদায় করা যে, পাকিস্তান আণবিক বিস্ফোরণ ঘটাবে না। এই দলে মার্কিন সেনা কর্মকর্তা জেনারেল এন্থনি ও সহকারি পররাষ্ট্র সচিব ডালপোর্টও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই দল এসেই পাকিস্তানকে চাপ, লোভ, ধমকি সব পন্থায় বাগে আনার চেষ্টা-কসরত করতে শুরু করে দেয়। এতসব দৌড়ঝাঁপ সত্ত্বেও মার্কিন প্রতিনিধি দল ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট আবার ফোন করে বিস্ফোরণ না করার অনুরোধ (হুকুম) করল। মিয়া নওয়াজ শরিফ বেশি কিছু না বলে ছোট্ট একটি জবাব দিয়ে কথা শেষ করলেন, 'আমি কথা দিতে পারছি না।'

যখন আমেরিকা ও ভারত নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল, পাকিস্তান বিস্ফোরণ ঘটালেই—তারা শেষ অস্ত্র ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিল। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে একটা সিদ্ধান্ত পাস করানো হবে, 'আজকের পর যে কেউ পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটালে তার ওপর ইরাকের মতো সর্বাত্মক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে।' এই সিদ্ধান্ত পাস করানোর জোরদার প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছিল।

আজকের উত্তর কোরিয়ার ওপর যে ধরনের নিষেধাজ্ঞা, ইরাকের ওপরও ঠিক সে রকমের নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছিল। শুধু খাবার ও ওষুধ ছাড়া ইরাক বাহির থেকে আর কিছুই ক্রয় করতে পারত না, বিক্রিও করতে পারত না। পৃথিবীর বেশিরভাগ রাষ্ট্রের সাথে ইরাকের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। মার্কিন-ব্রিটিশ বিমান অনবরত ইরাকের আকাশে চক্কর লাগাত। মোটকথা, ইরাককে আক্ষরিক অর্থেই প্রস্তর যুগে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল।

নিরাপত্তা পরিষদে পরমাণু বিস্ফোরণবিরোধী আইন পাস হয়ে গেলে পাকিস্তানকেও ইরাকের ভাগ্য বরণ করতে হতো। এমন সময় ভারতের একটি ভুল পাকিস্তানকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। পাকিস্তানের পাশাপাশি চীনকেও হুমকি-ধমকি দিতে শুরু করেছিল ভারত। ভারত বলতে শুরু করেছিল, ১৯৬২ সালে ভারত-চীন যুদ্ধে ভারতের যেসব জায়গা চীন দখল করে নিয়েছিল, সেগুলো অবিলম্বে ফেরত দিতে হবে। ভারতের লম্ফঝম্পে চীন বেজায় ক্ষেপে গেল। এদিকে চীন-পাকিস্তান আগ থেকেই জিগর দোস্ত ছিল। চীন নিরাপত্তা পরিষদে পয়গাম পাঠাল, পরমাণু বিস্ফোরণবিরোধী আইন নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপিত হলে চীন তাতে ভেটো দিবে। চীনের ঘোষণায় বিশ্বশক্তিগুলোর পাকবিরোধী অপতৎপরতা জলে ভেসে গেল।

এহেন উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে আরেকটি বিস্ফোরক সংবাদ ফাঁস হলো, ইসরায়েল ভারতের সাথে মিলে পাকিস্তানি এটমিক প্লান্টে হামলার পরিকল্পনা করছে। ইসরায়েল ১৯৮০ সালে ইরাকি পরমাণু চুল্লিতে হামলা করেছিল। এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার পর নিউইয়র্কে পাকিস্তানি দূতাবাসের প্রধান কর্মকর্তার সাথে ইসরায়েলি চিফ অব স্টাফ সাক্ষাৎ করে নিশ্চিত করেছিল, পাকিস্তানি পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রে কোনোরকমের হামলা করার পরিকল্পনা ইসরায়েলের নেই; কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। পাকিস্তান সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল। একদিকে আন্তর্জাতিক চাপ আর ভারতের হুমকি-ধমকি ছিল, আরেকদিকে বিস্ফোরণের পক্ষে আভ্যন্তরীণ চাপও দিনদিন বিস্ফোরণোন্মুখ হয়ে উঠছিল। ইমরান লাহোরে বিক্ষোভ সমাবেশে স্লোগান দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন, রুখি সুখি খায়েঙ্গে, এটম বম বানাইংগে। জামাআতে ইসলামিও একের পর এক আল্টিমেটাম দিয়ে যাচ্ছিল। বেনজির ভুট্টোও নওয়াজ শরিফকে জেনারেল নিয়াজির মতো 'ফেল্টুস' বলে খোঁচা দিতে ছাড়ল না।

ঘটনা এমন পর্যায়ে গড়াল যে, রাওয়ালপিন্ডিতে শিশুদের একটা মিছিল বের হলো। তাদের স্লোগান ছিল, আমাদের ফিডার চাই না, নিউক্লিয়ার ব্লাস্ট চাই।

এমন অকল্পনীয় দ্বিমুখী চাপ নওয়াজ শরিফের জন্য কী ভয়ংকর ছিল—সহজেই অনুমেয়। পাকিস্তান বিস্ফোরণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। পাশাপাশি পাকিস্তান বিশ্বশক্তির কাছে একটা দাবি জানাল, ভারত যদি তার কাছে থাকা যাবতীয় পরমাণু বোমা ধ্বংস করে দেয় তাহলে পাকিস্তানও এই পথ থেকে সরে আসবে। বিশ্বশক্তি এমন ভান করল, তারা যেন পাকিস্তানের দাবি শোনেইনি।

এসব টানাহ্যাঁচড়ার মাঝে মার্কিন স্যাটেলাইটে ইরান-আফগান বর্ডারের কাছে চাগাই নামক একটি পাহাড়ি উপত্যকায় অস্বাভাবিক নড়াচড়া ধরা পড়ল। পাকিস্তান আরো ২০ বছর আগে আণবিক বিস্ফোরণের জন্য এই জায়গা নির্বাচন করে রেখেছিল। এখানে দুটি জায়গা প্রস্তুত করা হয়েছিল। এখন জরুরি সরঞ্জামও সেখানে নিয়ে যাওয়া হলো। চাগাই উপত্যকাকে নির্বাচন করার দুটি বড় কারণ ছিল :

ক. প্রচণ্ড গরম ও পানি শূন্যতার কারণে এখানে বলতে গেলে কোনো আবাদিই ছিল না। আজও দুটি ইসরায়েল সমপরিমাণ চাগাই উপত্যকার জনসংখ্যা এক লাখেরও কম। চাগাই উপত্যকার আশেপাশে কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত এলাকা খালি করা হয়েছিল, যাতে বিস্ফোরণ পরবর্তী তেজস্ক্রিয়ায় কোনো মানুষের ক্ষতি না হয়।

খ. জায়গাটা এতই দুর্গম, মার্কিন স্যাটেলাইট ছাড়া আর কারো পক্ষেই গোয়েন্দাগিরি করা অসম্ভব ছিল। এখানে আসা-যাওয়ার কোনো যানবাহন ছিল না। আরো ২০ বছর আগ থেকেই অত্র এলাকার প্রতি ইঞ্চি পাক গোয়েন্দাদের শ্যেনদৃষ্টিতে ছিল। চাগাই পাহাড়ে ইংরেজি এল-এর মতো করে দুটি গর্ত খোঁড়া হলো। যাতে তেজস্ক্রিয়া পাহাড়ের বাইরে বেরোতে না পারে।

পাকিস্তান এখন পুরোপুরি প্রস্তুত। ডেডলাইনের আর মাত্র চার দিন বাকি। এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটল। এমন কিছু ঘটতে পারে—কারো কল্পনাতেও ছিল না। এমনকি বিষয়টি পরমাণু বিস্ফোরণের পরিকল্পনাকেও হুমকির মুখে ফেলে দিলো। ঘটনাটি ছিল, ২৪ মে পিআইএর একটি বিমান বেলুচিস্তানের তুরবত

থেকে করাচির দিকে যাচ্ছিল। বিমানটি গোয়াদরে অবতরণ করল। গোয়াদর থেকে কিছু যাত্রী বিমানে উঠল। এদের মধ্যে তিনজন যাত্রীর মতিগতি সুবিধার ছিল না। বিমানটি ২৪ জন যাত্রী ও ৫ জন ক্রুসহ করাচির দিকে উড়াল দিতেই ওই তিন যাত্রী যে যার অস্ত্র বের করে বিমানকে হাইজ্যাক করল। হাইজ্যাকাররা পাইলটকে বলল, বিমানের রোখ ভারতের দিকে ফেরাতে হবে। হাইজ্যাকাররা বোম্বের এয়ার কন্ট্রোলের সাথে যোগাযোগ করল। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ বিমানটিকে বোম্বাইয়ের নিকটবর্তী একটি এলাকায় অবতরণের অনুমতি দিলো। পাক কর্তৃপক্ষ যেকোনো মূল্যে বিমানটিকে ভারতে যাওয়া ঠেকাতে বদ্ধপরিকর ছিল। পাক গোয়েন্দারা বিদ্যুৎ গতিতে চমৎকার এক পরিকল্পনা সাজাল। পাক কর্তৃপক্ষ পাইলটকে বলল, বিমানের রোখ সিন্ধের হায়দারাবাদের দিকে করতে। পাইলট ভান করল, বিমান ভারতের যোধপুরের দিকে যাচ্ছে। হাইজ্যাকাররা বিশ্বাস করে নিশ্চিন্তে সাফল্য উদযাপন করতে লাগল।

হায়দারাবাদে বিমান অবতরণ করল। পাইলট বলল, যোধপুর এসে গেছি। হাইজ্যাকাররা পরম নিশ্চিন্তে বিমান থেকে নেমে এলো। বিমান বন্দরে পাক গোয়েন্দারা ভারতীয় শহর যোধপুরের স্থানীয় বাসিন্দাদের ক্যামোফ্লেজ নিয়ে অপেক্ষমাণ ছিল। গোয়েন্দারা হিন্দি ভাষায় হাইজ্যাকারদের সাথে কথাবার্তা শুরু করল। হাইজ্যাকাররা ছদ্মবেশী পাক গোয়েন্দাদের ভারতীয় মনে করে আলাপে অংশ নিল। পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে দুটি দাবিও উত্থাপন করল :

ক. পাকিস্তান চাগাইতে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো থেকে সরে আসতে হবে।

খ. বেলুচিস্তান সরকারের আটকে দেওয়া ফান্ড এখুনি অবমুক্ত করে দিতে হবে।

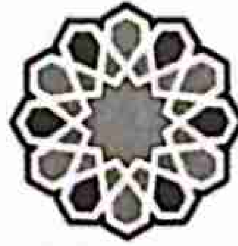
পাক কর্তৃপক্ষ হাইজ্যাকারদের বলল, বিমানে থাকা নারী ও শিশুদেরকে মুক্তি দিয়ে আলোচনার জন্য বিমান থেকে নেমে আসতে। হাইজ্যাকাররা দাবি মেনে নিল। নারী-শিশুদের মুক্তি দিয়ে তারা বিমান থেকে নেমে এলো। পাক কমান্ডোরা এবার অভিযান শুরু করল। তিন হাইজ্যাকারকে জীবিত পাকড়াও করতে সক্ষম হলো। পরবর্তীতে তদন্তে প্রমাণ হয়েছিল, তিন হাইজ্যাকার 'র'-এর এজেন্ট ছিল। তারা গোয়াদর এয়ারপোর্টে ১ লাখ রুপিয়া ঘুষ দিয়ে

অস্ত্রসহ বিমানে আরোহণ করেছিল। তাদের পরিকল্পনা ছিল, বিমানটিকে যোধপুর থেকে রাজধানী দিল্লিতে নিয়ে যাবে। সেখানে পাক কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি পেশ করবে। যেটা লাইভ সম্প্রচারিত হবে। চৌকশ পাক গোয়েন্দারা 'র'-এর ভয়ংকর ষড়যন্ত্র ধূলোয় মিশিয়ে দিয়েছিল।

পাকিস্তান জিগরি দোস্ত সৌদি আরব ও চীনকে পরিকল্পনার কথা অবহিত করে পুরো বিশ্বকে জানিয়ে দিলো, তোমরা পারলে ঠেকাও। ২৮ মে ১৯৯৮ বৃহস্পতিবার চাগাইয়ের আশপাশের ১০০ কিমি এলাকা পাক ফৌজ ঘিরে ফেলল। চাগাইয়ের আকাশে পাক ফাইটার বিমান ক্রমাগত চক্কর দিতে শুরু করল। সম্ভাব্য ভারতীয় হামলার মোকাবেলায় ঘোরি ও হাতাফ মিসাইলকে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোর দিকে তাক করে সম্পূর্ণ প্রস্তুত করে রাখা হলো। পাক সময় দুপুর ৩:১৬ মিনিটে চাগাই পর্বতশ্রেণি পাঁচ-পাঁচটি এটমিক ব্লাস্টে কেঁপে কেঁপে উঠল। এটা ছিল চাগাই-১। মের ৩০ তারিখে আরো একবার পরমাণু পরীক্ষা চালানো হলো। এটা ছিল চাগাই-২। ৫টি ভারতীয় পরমাণু বিস্ফোরণের মোকাবেলায় পাকিস্তান ৬টি বিস্ফোরণ ঘটাল। এই বিস্ফোরণের সাথে সাথে পাকিস্তান বিশ্বের পরমাণু শক্তিধর দেশের প্রেস্টিজিয়াস তালিকায় সপ্তম পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল। বিস্ফোরণের সংবাদে গোটা পাকিস্তান নাচতে নাচতে রাস্তায় নেমে এসেছিল। মিষ্টির দোকানগুলো মুহূর্তেই শূন্য হয়ে গেল। বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পাকিস্তানিরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। মুসলিম বিশ্বেও আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। ওদিকে দিনরাত পরমাণু হামলার হুমকি-ধমকি দিতে থাকা দিল্লিতে নেমে এসেছিল শ্মশানের নীরবতা। শুধু তাই নয়, তখন দিল্লিতে লোকসভার অধিবেশন চলছিল। পাক পরমাণু বিস্ফোরণের সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে পুরো লোকসভা জুড়ে হইচই পড়ে গেল। স্পিকার এজলাস বরখাস্ত করতে বাধ্য হলো।

বিস্ফোরণ তো হলো। ক্রিয়ার বদলে এবার প্রতিক্রিয়া। পরমাণু বিস্ফোরণবিরোধী দেশগুলো পাকিস্তানের ওপর একে একে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে শুরু করল। অন্যদিকে বন্ধু রাষ্ট্রগুলো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলো। জার্মানি সাহায্য বন্ধ করে দিলো। বিল ক্লিনটন পাকিস্তানের ওপর অবরোধ আরোপ করে সাজা দেওয়ার ঘোষণা দিয়ে দিলো। সুইডেন পাকিস্তানের কাছে অস্ত্র বিক্রি বন্ধ করে দেওয়ার ঘোষণা দিলো। এমনকি চীনও বিস্ফোরণের জন্য

মৌখিক দুঃখ প্রকাশ করল। জাপানও পাকিস্তানের ওপর অবরোধ আরোপ করল। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এশিয়ান ব্যাংক সাহায্য বন্ধ করে দিলো। পাকিস্তানের ওপর তখন ৩২ বিলিয়ন ডলার করজ ছিল। পাক কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রিজার্ভ ছিল সাকুল্যে ১.২৬ বিলিয়ন ডলার। চরম অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, পকেট সম্পূর্ণ খালি। পাকিস্তান কীভাবে এই অচলাবস্থা কাটিয়ে উঠেছিল, সেই গল্প না হয় পরের খণ্ডের জন্য তোলা থাক।



দ্য ফল অব ইউনাইটেড স্টেটস

০১.

তালেবানদের প্রথম শাসনামলে কাবুলে নৈশ নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিতদের মধ্যে একজন মৌলবী ছিলেন। তার হাতে একটি লম্বা রড জাতীয় 'তার' থাকত। কাবুলের যেসব বাসিন্দা মৌলবীর কথা শুনত না, তাদের পায়ে, টাখনুতে সপাং করে সেই মোটা তার দিয়ে আঘাত করতেন আর বলতেন, আমার সাথে সহযোগিতা করো আর রাতে দরজা খুলে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ো।

৭ অক্টোবর ২০০১ সালে আমেরিকা 'এনডিউরিং ফ্রিডম' (স্থায়ী স্বাধীনতা) নামে অভিযান শুরু করেছিল আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে। হামলার কয়েকদিনের মধ্যেই তালেবান শাসন ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। রীতিমতো তাসের ঘরের মতো হুড়মুড় করে ভেঙে পড়েছিল। আমেরিকা আকাশপথে হামলা করেছিল। এর ধাক্কা সামাল দেওয়া বা প্রতিরোধ করার সামর্থ্য ও প্রস্তুতি তালেবানের ছিল না। মার্কিন বোমাবর্ষণ সম্পর্কে পরবর্তীতে মৌলবী কেবল এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, মার্কিন বিমানগুলোর বোমাবর্ষণ এতটাই তীব্র ছিল যে, বিস্ফোরণের ধাক্কায় আমাদের দাঁত কপাটি লেগে ঠকঠক করে আওয়াজ করছিল। প্রচণ্ড আওয়াজের ধাক্কায় আমাদের হাড়গোড় গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

এই অকল্পনীয় বর্বরোচিত হামলার প্রতিরোধে তালেবানের কিছুই করার ছিল না। আমেরিকা ও যৌথবাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর বদলে তালেবান নেতারা একে একে আত্মগোপনে চলে যেতে শুরু করলেন। এমন বেসামাল মুহূর্তে তালেবান নেতাদের কাছে সর্বসম্মত, পূর্বনির্ধারিত ও সুস্পষ্ট কোনো কৌশল ছিল না; থাকা সম্ভবও ছিল না। যিনি যেখানে ছিলেন, সেখান থেকেই কোনোরকমে প্রাণ বাঁচিয়ে গা ঢাকা দেওয়ার কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। মৌলবী ক্যাবলও অন্যদের পথ ধরলেন। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে করাচি এসে ছোটখাটো ব্যবসা করার চেষ্টা করলেন। কিছুদিন পর ইরান চলে গেলেন।

২০০২ সালে কাবুলে মার্কিনিরা ঘাঁটি গেড়ে বসার পর আফগান প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাই তালেবানদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করল। মৌলবী ক্যাবল ইরান থেকে কাবুলে ফিরে এলেন। মোবাইল সার্ভিসিং দোকান খুললেন। স্থানীয় লোকেরা তাকে চিনে ফেলল। পুলিশ এসে বিরক্ত করতে শুরু করল। দিনদিন পুলিশ-গোয়েন্দাদের তৎপরতা বেড়েই চলল। শেষে অতিষ্ঠ হয়ে একদিন দোকানের শাটার বন্ধ করে ক্লাসিনকভ হাতে নিয়ে অজানার উদ্দেশ্যে পা বাড়ালেন। এরপর তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। হয়তো একসময় তিনিও লাখো শহীদের মিছিলে শামিল হয়ে গিয়েছিলেন।

বিখ্যাত সাংবাদিক সামি ইউসুফ জাইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মাজার-এ-শরিফের কমান্ডার মৌলবী আবদুর রহমান আখুন্দযাদা বলেছিলেন, 'মার্কিন হামলার সময় বিভিন্ন স্থানে মাটির বাংকারে পাল্টা হামলার জন্য তাজাদম তালেবান ফৌজ প্রস্তুত ছিল। বিমান হামলা এতটাই তীব্র হতো যে, মাটির নিচে আত্মগোপনে থাকা তালেবান ফৌজ সেখানেই বেঘোরে মারা পড়তেন। এককেটি হামলায় কর্তিত ফসলের মতো তালেবান সেনারা লুটিয়ে পড়তেন। যারা বেঁচে যেতেন, তাদের নাক, কান ও গলা দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরোতে শুরু করত। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া সাথিদের দাফন করার মতো পরিস্থিতিও থাকত না।

মৌলবী আখুন্দযাদার অধীনেও প্রায় ৪০০-এর মতো তালেবান ফৌজ মজুদ ছিল। তিনি প্রাণ হাতে নিয়ে পাকিস্তান চলে গিয়েছিলেন। করাচিতে কিছুদিন টমেটো বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেছেন। মৌলবী হক্কানীও পাকিস্তানে চলে এসেছিলেন। আসার সময় নিজের সাদা লেবাস বাদ দিয়ে রঙচঙা সেলোয়ার-কুর্তা পরে বেশ বদল করে নিয়েছিলেন। আফগান সীমান্ত পার হয়ে পাকিস্তানে পা দেওয়ার আগে এক উঁচু পাহাড়ে দাঁড়িয়ে শেষবারের মতো আফগানিস্তানের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেছিলেন, সম্ভবত আর কখনো ইমারাতে ইসলামিয়াতে পা রাখতে পারব না।

মার্কিন হামলায় তালেবান নেতারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল। প্রথমাবস্থায় একজনের সাথে আরেকজনের কোনো যোগাযোগ ছিল না। আমিরুল মুমিনিনের সাথেও না। যোগাযোগ রাখা সম্ভবও ছিল না। কারণ, আফগানে হানাদার বাহিনী আর পাকিস্তানে জেনারেল মোশাররফ বাহিনী। মোশাররফ

খুঁজে খুঁজে তালেবান-একিউ সদস্য ধরে আমেরিকার হাতে সোপর্দ করছিল। পাকিস্তানে নিযুক্ত তালেবান রাষ্ট্রদূত মৌলবী আবদুস সালাম জাইফকে মারপিট করে অত্যন্ত অপমানজনকভাবে আমেরিকার হাওয়ালা করা হয়েছিল। মৌলবী জাইফকে কুখ্যাত গুয়ানতানামো কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আত্মজীবনীতে তিনি বড় দুঃখ ও মনোবেদনা নিয়ে বলেছিলেন, 'আমাকে একদিকে মার্কিনিরা বেদম প্রহার করছিল, অন্যদিকে পাকিস্তানের সেনারা সেটা চুপচাপ দেখে যাচ্ছিল; অথচ আমি ছিলাম তাদের মেহমান। তাদের দেশে রাষ্ট্রদূত।' ২০০৫ সালে মুক্তির পর দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, আমার কষ্ট মার্কিনিদের প্রতি নয়; পাকিস্তানীদের প্রতি। পাকবাহিনীই পেশাওয়ারে আমাকে আমেরিকার হাতে তুলে দিয়েছিল। মার্কিন সেনারা আমাকে উলঙ্গ করে চরমভাবে লাঞ্ছিত করেছে। আত্মজীবনীতে তিনি পাকিদের সম্পর্কে আরো অনেক কঠিন কথা বলেছেন। তার আত্মজীবনী পড়লে অনেক অজানা তথ্য পাওয়া যায়।

মোটকথা, একজন সাধারণ সেনা থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রদূত পর্যন্ত পাকিস্তানে নিরাপদ ছিল না। পাকিস্তানে যারা গা-ঢাকা দিয়েছিলেন, ধরা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় একে-অন্যের সাথে ঠিকমতো যোগাযোগ করে উঠতে পারছিলেন না। অনেক তালেবানের ভাষ্য ছিল, অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, আফগানে মার্কিন দখলদারত্ব দশকের পর দশক চলতেই থাকবে। ২০০১ থেকে ২০০২ সালে ভয়াবহতম মার্কিন হামলা চলাকালে ঘটনাক্রমে তালেবান নেতাদের পরস্পরে দেখা-সাক্ষাৎ হয়ে গেলে তাদের আলোচনায় এমন কথাও উঠে আসত, আমাদের আফগান রাজনীতি ও নবগঠিত সরকারের অংশ হয়ে যাওয়া উচিত।' কারণ এমন প্রস্তাব কারজাই সরকারের পক্ষ থেকে অনবরত আসছিল। মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোটের পরিকল্পনাও ছিল এমন। তারা তালেবানকে প্রচলিত রাজনীতি, ভোট, নির্বাচন ও সরকারব্যবস্থার অংশ করতে চাচ্ছিল। সব তালেবান নেতা এমন ভাবত তা নয়, পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে কারো কারো ভাবনা এমন ছিল।

প্রথম কার্যকর পদক্ষেপ

এই ভাবনা হালে পানি পায়নি। বড় ও প্রভাবশালী তালেবান নেতারা এই চিন্তার কঠিন বিরোধী ছিলেন। তারা আমেরিকার নেতৃত্বাধীন কারজাই সরকারের অংশ হওয়ার পক্ষে ছিলেন না। ২০০২ সালের পর তালেবান

নেতাগণ একটা নীতিতে অঘোষিতভাবে ঐকমত্যে পৌঁছেছিলেন যে, 'দুর্বল অবস্থানে থেকে কোনোকিছু করা যাবে না; আগে শক্তি অর্জন করতে হবে।' যেই ভাবা সেই কাজ। ধীরে ধীরে শক্তি অর্জিত হতে শুরু করল। এটাই ছিল তালেবানদের ফিরে আসার প্রথম কার্যকর ও ফলপ্রসূ সিদ্ধান্ত।

শক্তিটা কীভাবে অর্জিত হয়েছিল?

২০০২ এর মাঝামাঝি পর্যন্ত মুক্ত থাকা তালেবান নেতারা আফগান, করাচি, কোয়েটাতে দেখা-সাক্ষাৎ করতে শুরু করে দিলেন। দীর্ঘ-দীর্ঘ বৈঠকে আফগানের বর্তমান রাজনীতি, দেশের ভবিষ্যৎ ও মার্কিন দখলদারির অবসান কীভাবে হবে—এসব বিষয়ে মত বিনিময় করতে শুরু করলেন। নেতারা নিজের পরিচিতজনদের মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাগিয়ে তোলার মেহনতে নেমে পড়লেন। পাকিস্তানে হিজরত করে আসা পশতুন মুহাজিরদের দখলদারবিরোধী লড়াইয়ের জন্য ভর্তি করতে শুরু করলেন। কমান্ডাররা নিজস্ব দল গঠন করতে থাকলেন। সবাই 'তালেবান' নামে পরিচিতি লাভ করলেও দলগুলো কেন্দ্রীয় কোনো নেতৃত্বের অধীনে ছিল না। নেতার নামেই দলটিকে ডাকা হতো। যেমন মৌলবী ফারুক বাহিনী, মৌলবী দাদুল্লাহ বাহিনী ইত্যাদি। এসব বাহিনীতে সাধারণত ১০ থেকে ১০০ পর্যন্ত সদস্য থাকত। দলের সমস্ত দায়দায়িত্ব কমান্ডারের ওপর থাকত। দলের খাবারদাবার, হাতিয়ার সব কমান্ডারই জোগাড় করতেন। তিনিই হামলার পরিকল্পনা করতেন, তিনিই অভিযানের অর্থ সংগ্রহ করতেন। জয়-পরাজয়ের সমস্ত দায় নেতারই হতো। আমিরুল মুমিনিন বা উচ্চপদস্থ নেতাদের সাথে এসব বাহিনীর কোনো সম্পর্ক ছিল না। হ্যাঁ, একে অপর সম্পর্কে কমবেশি জানতেন। একে অপরের খবরাখবর রাখতেন।

এরা টাকা কোথায় পেতেন?

মার্কিন হামলায় তালেবানদের সামরিক উপকরণ বলতে গেলে পুরোটাই বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তবে যারা তালেবানদের খরচের যোগান দিত তারা তো শেষ হয়ে যায়নি। প্রথমদিকে এসব অর্থ যোগানদাতাদের সম্পর্কে আমেরিকার খবরও ছিল না। প্রথম প্রথম স্থানীয় জনগণের সাহায্য-সহযোগিতাতেই তালেবানদের প্রয়োজন পুরো হতো।

মেহনতের দ্বিতীয় ধাপ

২০০২ ও ২০০৩ সালে এই ছোট ছোট বাহিনীগুলো মোটামুটি তিনটি প্রদেশে (হেলমান্দ, কান্দাহার ও গজনি) ছড়িয়ে পড়েছিল। ছোটখাটো তৎপরতা চলছিল। এই পর্যায়ে তালেবান মেহনতের দ্বিতীয় ধাপ শুরু হলো। একদম শুরুতে কর্মতৎপরতা কেমন ছিল, এমন নামমাত্র উপকরণ নিয়েই দানবীয় শক্তিময় ন্যাটো ফৌজের ওপর কীভাবে হামলা করতেন—এটা বোঝার জন্য আমরা কান্দাহারের একটি গ্রাম 'নিশান'-এর ঘটনায় কান পাততে পারি। স্থানীয় এক মুরুব্বি ঘটনাটি শুনিয়েছেন। বিশ্বমিডিয়া ও ২০০২ সালের পরে লিখিত অনেক বইপত্রেও ঘটনাটি স্থান পেয়েছে।

'পাশের গ্রাম নিশানে বিয়ের দাওয়াতে গিয়েছি। পুরো গ্রাম তালেবানের দখলে এসে গিয়েছিল। প্রায় চার শ'র মতো তালেবান দেখেছি সেদিন। সবাই পরিধেয় চাদরের নিচে মেশিনগান আর ক্লাসিনকভ নিয়ে ঘুরছিলেন। তারা পুরো গ্রামে ঘুরে ঘুরে তল্লাশি করছিলেন। জানতে চাচ্ছিলেন, কারা কারা আমেরিকাকে সাহায্য করছে? কারা আমেরিকার মদদপুষ্ট সরকারের সহযোগিতা করছে? কাগজপত্র বা অন্য কোনোভাবে আমেরিকা বা আফগান সরকারের সাথে সম্পৃক্তির প্রমাণ পাওয়া গেলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিচ্ছিলেন। এসব ক্ষেত্রে তালেবান অপরাধ বুঝে শাস্তি দিত। কাউকে মেরে ফেলা হতো, কাউকে গোপন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হতো। টাকা বা জীবিকার লোভে অনেকেই আমেরিকার অধীনে চাকুরি নিত। মার্কিনিদের খাবার সাপ্লাই, গাড়ি চালানো ও বিভিন্ন প্রজেক্টে ঠিকাদারির কাজ করত। কেউ কেউ আফগান সরকারের অধীনে চাকুরি করত। তালেবানের কাছে এসব শাস্তিযোগ্য অপরাধ ছিল।

কান্দাহারের নিশান গ্রামটি ছিল তালেবানদের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বিজিত এলাকা। কাবুল থেকে সরে আসার এক বছর পরে এই বিজয় অর্জিত হয়েছিল। নিশান আমেরিকা ও আফগান সরকারের আওতার বাইরে ছিল। এতদূরে বিদেশি হানাদার শক্তি তাদের হিংস্র থাবা বিস্তার করতে পারেনি, এজন্য অনায়াসেই তালেবানরা দখল করতে পেরেছিল। এটা ছিল তালেবানদের দূরদর্শী সিদ্ধান্ত, যা মৌলবী ফারুকের নেতৃত্বে এই বিজয় অর্জিত হয়েছিল। কান্দাহার জুড়ে তার তৎপরতা অন্যান্য দলগুলোর তুলনায় বেশি সক্রিয় আর শক্তিশালী ছিল। তার অধীনে বারো শ'র মতো সদস্য ছিল।

একই সময়ে মৌলবী আখতার মনসুরও হেলমান্দ প্রদেশের নহরসেরাজ জেলায় কর্মতৎপরতা শুরু করে দিয়েছিলেন। শুরুতে তাকে কেউ চিনত না। রাতের বেলা কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। ঘরে ঘরে গিয়ে নির্দেশনামূলক চিঠি দিয়ে আসতেন। এসব চিঠিকে 'নাইটলেটার' বা নৈশচিঠি বলা হতো। চিঠিতে মার্কিনিদের সাহায্য না করার জন্য বলা হতো। অমান্যকারীদের প্রতি কঠিন শাস্তির হুমকি থাকত। প্রথম দিকে তালেবান রাতের বেলা চাদরে পুরো শরীর ঢেকে মুখোশ পরে আসত। পরে দিনের বেলাও আসতে শুরু করেছিল।

গজনিতেও এই ধাঁচে মেহনত শুরু হয়েছিল। মৌলবী ফোলাত, ওয়াসেক, কমান্ডার দাউদ নিজ নিজ দল নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন। সবার কাজের পরিধি ছিল সীমিত। তারা নবগঠিত আফগান সরকারের কাজে বাধা সৃষ্টি করত, লোকজনকে দখলদার ও তাবেদার সরকারের বিরুদ্ধে জাগিয়ে তুলত। তালেবানদের বক্তব্য ছিল, কেউ যেন কাফের সরকারকে কোনো ধরনের সহযোগিতা না করে। বর্তমান সরকারের পতন ঘটিয়ে আগের তালেবান সরকার পুনর্বহাল করার সবাই যেন কাজে সর্বান্তকরণে এগিয়ে আসে।

আফগান সরকারে অংশ নেওয়া লোকদেরকে হুমকি-ধমকি দেওয়া হতো। ক্ষেত্রবিশেষে অপরাধভেদে হত্যাও করা হতো। মার্কিন হামলা শুরু হওয়ার এক-দেড় বছরের মধ্যে এই মেহনতগুলো শুরু হয়েছিল। কান্দাহার, হেলমান্দ, গজনির সম্মিলিত দলগুলোকে একসাথে দক্ষিণা বাহিনী (সাউথ ফ্রন্ট) বলা হতো। এটা কোনো সাংগঠনিক নাম ছিল না। অন্যদের দেওয়া নাম। বাস্তবে একদলের সাথে আরেকদলের নিয়মতান্ত্রিক কোনো যোগাযোগ ছিল না। দলগুলো কোনো কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অধীনেও ছিল না। যে যার সুবিধামতো কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। যে যার মতো সদস্য সংগ্রহ করছিল।

তালেবানদের তৎপরতা শুরু হওয়ার পর দখলদার ও তাবেদার বাহিনী পুরোদমে দমন অভিযানে নেমে পড়ল। একদলের সাথে আরেকদলের যোগাযোগ না থাকার কারণে তালেবানরা বেধড়ক দখলদার-তাবেদার বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে যাচ্ছিল। আকস্মিক হামলায় বেঘোরে মারা পড়ছিল অনেকে। হানাদাররা কীভাবে এত সহজে তালেবানদের অবস্থান জেনে যেত?

দখলদার-তাবেদার বাহিনীর কাছে গোয়েন্দা মারফত সংবাদ আসত, অমুক স্থানে তালেবানরা নতুন সদস্য ভর্তি করাচ্ছে। তাবেদার বাহিনীও তাদের নিজস্ব লোকদের নাম ভাঁড়িয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য পাঠাত। ভর্তি শেষ হওয়ার

সব সরকারি গোয়েন্দা গোপনে সংবাদ পাঠাত। আচানক রাতের বেলা হানাদার-তাবেদার বাহিনী এসে ঘুমন্ত তালেবানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। বেশিরভাগ বন্দি হতো। পালাতে গিয়ে অনেকে ব্রাশফায়ারের মুখে পড়ত। এ ধরনের অতর্কিত হামলার মুখে শুরুর দিকে তালেবানরা ভীষণ ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। নতুন সদস্য ভর্তি ও হানাদারবিরোধী তৎপরতার গতি শ্লথ হয়ে গিয়েছিল। আফগান নওজোয়ানরা উভয়সংকটের সম্মুখীন হলো। তালেবান দলে শামিল হলে হানাদার-তাবেদারের হাতে মারা পড়তে হচ্ছে, তালেবান দলে শামিল না হলে নানাবিধ হুমকি-ধমকির সম্মুখীন হতে হয়। তাছাড়া একদম হাত গুটিয়ে বসে থাকলে দেশ শত্রুমুক্ত হবে কী করে? এই প্রশ্নও যুবকদের বিবেকে দংশন সৃষ্টি করত।

তালেবানদের মেহনত শুরু হতে না হতেই মুখ থুবড়ে পড়ার উপক্রম হলো। তবে মেহনত একেবারে থেমে যায়নি। ধীরগতিতে থেমে থেমে চলতে থাকল। এমন মন্দা সময়ে দক্ষিণের সাথে সাথে দেশের পূর্বাঞ্চলেও একটি অঘোষিত জোটের অস্তিত্ব দানা বাঁধতে শুরু করেছিল। কান্দাহার, কুনার, নুরিস্তান অঞ্চলে স্পেনগার বাহিনী, জারিয়া শুরা ও তোরাবোরা শুরার নামে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বাহিনী গড়ে উঠেছিল। এসব দলের কমান্ডাররা ততবেশি পরিচিত ছিলেন না। তাদের ব্যক্তিত্বও আকর্ষণীয় ছিল না। এতে লাভ হয়েছিল এই, তাদের বাহিনীকে গোয়েন্দারা অতবেশি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেনি। এই তিন বাহিনীর খ্যাতিও তেমন ছড়ায়নি। এই তিন দলের কাছে প্রতিবেশী বা অন্য কোনো দেশ থেকেও অর্থকড়ি আসত না। এসব দলের সদস্য সংখ্যা মেরেকেটে এক শ'র আশেপাশে থাকত।

কাবুলের উত্তরে বাগলান প্রদেশে অর্থাৎ উত্তর আফগানেও একটি বড়সড় বাহিনী গড়ে উঠেছিল। নেতা ছিলেন মৌলবী রহমতুল্লাহ বাগলানী। এই দলে চার শ'র মতো যোদ্ধা ছিল। পরে বাড়তে বাড়তে আট-নয় শ পর্যন্ত পৌঁছেছিল। এখানে একটি বিখ্যাত মাদরাসা আছে 'মাদরাসা খালেদ বিন ওয়ালিদ'। এই নামেই দলটি বাহিনী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিল। মার্কিন দখলদারির মাত্র দুই বছরের মধ্যে কাবুলের চারিদিকেই তালেবানবাহিনী গড়ে উঠেছিল। হেলমান্দ, কান্দাহার, গজনি, নাঙ্গারহার, কুনার, নুরিস্তান, বাগলানে মেহনত শুরু হয়েছিল।

এসব দলের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল জনসমর্থন। জনসমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়া কোনো সশস্ত্র সংগ্রামই সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছতে পারে

না। মজার বিষয় হলো, এই দলগুলো খোদ আমেরিকা থেকেই বেশি সাহায্য পেয়েছিল।

কীভাবে?

আমেরিকা ও তাবেদার বাহিনী হঠাৎ করে দূর-দূরান্তের গাঁও-গেরামে ক্র্যাকডাউন-সাঁড়াশি অভিযান চালাত। হামলাকালে হানাদার বাহিনী পশতুন ঐতিহ্য, রীতিনীতি ও মূল্যবোধ দুমড়ে-মুচড়ে ফেলত। সন্দেহভাজন বা অভিযুক্ত কাউকে পাকড়াও করার জন্য জুতো পায়ে মসজিদে ঢুকে পড়ত। নারী-শিশু-বৃদ্ধদের সাথে চরম অবমাননাকর আচরণ করত। শিশু ও নারীদের গায়ে হাততোলা পৌরুষ নয়। হানাদাররা অহরহ এহেন ন্যক্কারজনক কাজ করত। স্থানীয় লোকজন এসব দেখতে দেখতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিল।

অন্যদিকে এসব গাঁয়ে চুরিচামারি, খুন-রাহাজানি বা ডাকাতি-ছিনতাই হলে হানাদারদের দেখা মিলত না। এসবের বিচার পাওয়া যেত না। গ্রামের লোকেরা মাসের পর মাস থানা-আদালতে ঘুরে মরেও ইনসাফ পেত না। বিচারের রায় মিলত না। অপরাধীরা সাজা পেত না। এভাবে অপরাধীরা আরো বেপরোয়া হয়ে যেত। এই বিষয়টাই ছিল গ্রামের লোকদের সাথে তালেবানদের যোগাযোগের সবচেয়ে মূলসূত্র। এসব ছোটখাটো সমস্যায় তালেবান সবার আগে এগিয়ে আসত। তাদেরকে হাতের কাছে পাওয়া যেত। তালেবানরা সাধ্যানুযায়ী মাজলুমের কাছে ইনসাফ পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করত। শরিয়াহ মোতাবেক দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা করত। অপরাধীকে উপযুক্ত সাজা দিত। শান্তি, নিরাপত্তা ও সুবিচার যার কাছে পাওয়া যাবে, তাকেই মানুষ আপন মনে করে। তার প্রতিই মানুষ আস্থা রাখে। এসবের বিনিময়ে তালেবানরা গ্রামে একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করতে সক্ষম হতো।

সহজ-সরল পশতুনরা ধর্ম ও গোত্রীয় ঐতিহ্যকে জীবনের চেয়েও বেশি মূল্যবান মনে করে। তাদের সন্তানকে 'তালেবানদের' সহযোগিতার অভিযোগে প্রায়ই তাবেদার সরকারের পুলিশ ধরে নিয়ে যেত। তাদের ছাড়ানোর জন্য গরিব মানুষগুলোকে বাড়িঘর বিক্রি করে দৌড়াদৌড়ি করতে হতো। অনেক সময় সবকিছু বিক্রি-বন্ধক রেখেও কাজ হতো না। বিচার দূরে থাকুক—লাশও মিলত না। ঘুষখোর পুলিশ অফিসাররা টাকার লোভেও যাকে তাকে ধরে নিয়ে যেত। বিপুল ঘুষ খেয়ে ছেড়ে দিত। টাকা দিতে না পারলে কোর্টে

চালান করে দিত। না হয় 'তালেবান' বানিয়ে দখলদারদের হাতে তুলে দিত।

এমন জোরজুলুমের সামনে তালেবানরা ছিল ইনসাফ-সুবিচারের মূর্তপ্রতীক। মানুষের কাছে দুটি দল ছিল। জুলুমবাজ তাবেদার সরকার ও ইনসাফগার তালেবান সমাজ। স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধিতে মানুষ কোন দিকে যাওয়ার কথা? অবশ্যই তালেবানদের দিকে। এভাবেই তালেবানরা পা জমিয়ে বসার সুযোগ করে নিয়েছিল। এই সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছিল খোদ আমেরিকা। তালেবানরা গোপন আস্তানা থাকে প্রতি রাতে গ্রামে টহল দিতে আসত। গ্রামে তাদের প্রতিনিধি থাকত। কোথায় কী হচ্ছে না হচ্ছে—খবরাখবর তাৎক্ষণিকভাবে জায়গামতো পৌঁছে যেত। তরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণে বিশেষ বেগ পেতে হতো না। ভুক্তভোগী মানুষরাই প্রতিশোধের জন্য তালেবানদের কাছে ছুটে যেত। গাঁয়ের আরো যুবককেও তালেবান দলে নিজ উদ্যোগে ভর্তি করিয়ে দিত। সন্তানহারা বুড়ো বাবারাও বদলার লড়াইয়ে শরিক হতো।

এমনই পরিস্থিতির শিকার ছিল কান্দাহারের ছোট গ্রাম মেওয়ান্দ। এখানকার এক যুবক প্রথম তালেবান সরকারে সাধারণ পর্যায়ের ছোটখাটো মন্ত্রী ছিলেন। হানাদার বাহিনীর হাতে আটক হয়ে জেল খেটেছেন। কারজাই সরকার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর মুক্তি পেয়ে ঘরে ফিরে এসেছেন। তিনি আপাতত নতুন করে কোনো গেরিলা লড়াইয়ে অংশ নিতে চাচ্ছিলেন না। তিনি নিরুপদ্রব জীবন কাটাতে চাইলেও তাবেদার ও হানাদারদের কারণে পেরে উঠলেন না। কয়েকদিন পরপরই হানাদার বাহিনী তার কাছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হাজির হতো। শেষে তিনি অতিষ্ঠ হয়ে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে কোয়েটায় তালেবান সাথিদের খুঁজে নিলেন। তিনি ছিলেন মৌলবী আখতার মনসুর। আমিরুল মুমিনিনের অবর্তমানে তিনি তালেবানদের আমির বনেছিলেন।

২০০২ সালের শেষ নাগাদ আফগানের বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয়ভাবে ছোট ছোট তালেবান দল গড়ে উঠেছিল। দলগুলোর সদস্যদের প্রশিক্ষণ, নতুন অস্ত্রশস্ত্রের প্রশিক্ষণ, সদস্যদের বেতন, নতুন অস্ত্রসংগ্রহ, কালোবাজার থেকে অস্ত্র ক্রয়, সীমান্ত পারাপারে নিরাপদ ব্যবস্থা, শত্রুদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি, নিজেদের ভেতরে ঘাপটি মেরে থাকা শত্রুপক্ষের চর শনাক্তকরণের উল্লেখযোগ্য কোনো ব্যবস্থা ছিল না। এ সবকিছুর জন্য একটি পরিচালনা পর্ষদ দরকার ছিল, যার অনুমোদনে দলগুলো মেহনত চালিয়ে যাবে। কেন্দ্রীয় অনুমোদনের ব্যবস্থা থাকলে কাজেও শৃঙ্খলা থাকবে।

তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ

এই প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে মজলিসে শুরা কায়েম হতে শুরু হলো। এটা ছিল তালেবানরা লড়াইয়ে ফিরে আসার তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

ফিরে আসার লড়াইয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল গিরি গুহাগুলো। কান্দাহার ও তোরাবোরা পাহাড়ের অসংখ্য গুহায় সোভিয়েত আমলের বিপুল অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তালেবান জামানায়ও এসব গুহায় অপরিমেয় অস্ত্র মজুত করা হয়েছিল। কিছু গুহা ছিল প্রাকৃতিক। বেশিরভাগ গুহা সোভিয়েত আমলে আফগান মুজাহিদিন পাকিস্তান, সৌদি ও আমেরিকার অর্থায়ন আর কারিগরি সহায়তায় নির্মাণ করেছিলেন। পরবর্তীতে তালেবানরাও বহু নতুন গুহা তৈরি করেছিল। বেশিরভাগ গুহা ভেতর থেকে পরস্পর যুক্ত ছিল। নতুন কেউ এসব গুহায় ঢুকে পড়লে গোলকধাঁধায় আটকে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। তালেবানদের প্রথম শুরার নাম ছিল 'গারদি জঙ্গল (Girdi Jungle) শুরা'। এই শুরা বিভিন্ন গুহায় লুকিয়ে রাখা অস্ত্রগুলো তালেবানের মাঝে বিলি-বণ্টন করে দিয়েছিল। গারদি জঙ্গল এলাকাটি ছিল পাক-আফগান সীমান্ত থেকে একটু ভেতরে পাকিস্তানের একটি জায়গা। এখানে বিপুলসংখ্যক আফগান মুহাজিরিন অবস্থান নিয়েছিলেন।

তালেবান জামানায় কান্দাহারের গভর্নর মৌলবী মুহাম্মাদ হুসাইন ২০০২ সালের শেষদিকে একটি মজলিসে শুরা কায়েম করেছিলেন। এই শুরার প্রভাববলয় কান্দাহার, হেলমান্দ, জাবুল, উরুজগান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই শুরা গঠিত হয়েছিল পাকিস্তানের মাটিতে গারদি জঙ্গলে থাকা মুহাজির ক্যাম্পে। এজন্য এই শুরার নামও গারদি জঙ্গল শুরা হয়ে গিয়েছিল। এই শুরার হাতে প্রথম দিকে টাকাপয়সা ছিল না। মাত্র কিছুদিন আগে আমেরিকা উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। এত তাড়াতাড়ি অর্থ সংগ্রহের উৎস বের করা কঠিন ছিল। মৌলবী হোসাইন ছাড়া আর কোনো উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি এই দলে ছিল না। অর্থকড়ি ছাড়াই কষ্টসৃষ্টে মেহনত জারি ছিল।

কিছু তালেবান নেতার পক্ষ থেকে বাধা এলো। মৌলবী ফারুক, দাদুল্লাহ, আবদুল গনি বেরাদর, সিরাজুদ্দিন হক্কানী, আখতার মনসুর ইত্যাদি নেতারা বাধা দেওয়ার কারণ ছিল, তারা একটা কেন্দ্রীয় শুরা কায়েমের জন্য দৌড়ঝাঁপ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তাদের শুরার নাম দিয়েছিলেন 'রাহবরি শুরা'। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, সমস্ত দলগুলোকে একক নেতৃত্বাধীনে নিয়ে আসা।

২০০২-২০০৩ সালে মৌলবী দাদুল্লাহ একটি পা নিয়েই আফগান, করাচি, কোয়েটা, কান্দাহার, হেলমান্দে অনবরত দৌড়াদৌড়ি করে যাচ্ছিলেন। ১৯৮০ এর দশকে সোভিয়েতবিরোধী লড়াইয়ে তার একটি পা মারাত্মক যখম হয়েছিল। পরে করাচি এসে অপারেশন করে সেটাকে কেটে ফেলেছিলেন। তিনি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা তালেবানদের এক পতাকাতলে শামিল করতে চাচ্ছিলেন। পাশাপাশি সংখ্যাবৃদ্ধির প্রতিও মনোযোগ দিয়েছিলেন। তিনি খুবই দূরদর্শী ছিলেন। আমেরিকা হামলা করার এক বছর আগে থেকেই তিনি নিজের লোকদের সংগঠিত করতে শুরু করেন। তিনি খুবই কট্টরপন্থী হিসেবে পরিচিত। অভিযানে পাঠানোর সময় সদস্যদের বলে দিতেন : 'সফল হলে ফিরে এসো, নইলে ফেরার প্রয়োজন নেই।' তার কঠোর অবস্থান আর রাগচটা স্বভাবের কারণে সাধারণ তালেবান তো বটেই, নেতৃস্থানীয় তালেবানরাও তাকে ভয় পেত, সমঝে চলত। কিছু তালেবান নেতা বিদেশি পত্রিকায় সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ২০০৫-২০০৬ সালের দিকে তারা মৌলবী দাদুল্লাহকে বোঝা মনে করতে শুরু করেছিলেন। (কারো কারো মতে) কিছু কিছু ক্ষেত্রে শত্রুর প্রতি তার আচরণ ও প্রতিক্রিয়া ইনসাফের সীমা অতিক্রম করে যেত। তার কিছু কিছু হামলার কারণে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক মিডিয়াতে তালেবানদের ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছিল বলে দাবি করা হতো।

মৌলবী দাদুল্লাহ ইস্তেশহাদি বাহিনী তৈরি করেছিলেন। শত্রুর ওপর ইস্তেশহাদি হামলা করে ভিডিও ধারণ করে অনলাইনে ছেড়ে দিতেন। তার কর্মকৌশল ছিল অনেকটা 'ইসলামিক স্টেট'-এর মতো। এজন্য তাকে কেউ কেউ 'আবু মুসআব যারকাবী'-এর আফগান ভার্সন মনে করত। মৌলবী দাদুল্লাহ রাহবরি শুরা গঠনের জন্য সবার আগে মেহনত শুরু করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি কোয়েটায় অবস্থানরত উচ্চপদস্থ তালেবান নেতাদের সাথে অনবরত যোগাযোগ করে যাচ্ছিলেন। ওদিকে কোয়েটায় মৌলবী আবদুল গনিও একটি কেন্দ্রীয় শুরা গঠনের চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। সবার চেষ্টা-মেহনতে অবশেষে রাহবরি শুরা গঠিত হলো। এই শুরাই বিশ্বমিডিয়ায় কোয়েটা শুরা নামে পরিচিত ছিল। বাস্তবে এই নামে তালেবানদের কোনো শুরার অস্তিত্বই ছিল না। যেহেতু শুরাটা গঠিত হয়েছিল বেলুচিস্তানের রাজধানী কোয়েটাতে, তাই কোয়েটা শুরা নামটাই ছড়িয়ে পড়েছিল। সীমান্তের ওপারে কান্দাহার, হেলমান্দ এপারে পাকিস্তনের বেলুচিস্তান।

রাহবরি শুরায় ছিলেন মৌলবী হাইবাতুল্লাহ (বর্তমান আমির), দাদুল্লাহ, আবদুল গনি (বর্তমান উপ প্রধানমন্ত্রী), মুহাম্মাদ মুত্তাকী (বর্তমান

পররাষ্ট্রমন্ত্রী), আখতার মানসুর (যিনি ড্রোন হামলায় মারা গিয়েছেন), মুহাম্মাদ ফারুক। সবমিলিয়ে ২০-২৫ জনের পরিচালনা পর্ষদ ছিল। তারা তালেবানদের প্রথম জামানাতেও কোনো না কোনো সরকারি দায়িত্বে ছিলেন। শুরার সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করে দেওয়া হলো। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সামরিক (মিলিটারি) বিভাগ। মৌলবী দাদুল্লাহকে এর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। বিচার বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ফিকাহ বিশেষজ্ঞ মৌলবী হাইবাতুল্লাহকে। তিনি প্রথম তালেবান জামানাতেও শরিয়াহ কোর্টের প্রধান ছিলেন। রাজনৈতিক বিষয়ে আবদুল গনিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ, তহবিল সংগ্রহের দায়িত্ব আমির মুহাম্মাদ মুত্তাকীকে দেওয়া হয়েছিল। ২০০৩ সালের জুন মাসে একটি প্রেস রিলিজের মাধ্যমে এই শুরা গঠনের ঘোষণা দেওয়া হয়।

একটা বিষয় পরিষ্কার থাকা দরকার, আমিরুল মুমিনিন এই শুরা গঠনের সাথে কোনোভাবেই সম্পৃক্ত ছিলেন না। হ্যাঁ, পরে তিনি একটি ঘোষণার মাধ্যমে রাহবরি শুরাকে অনুমোদন দিয়েছিলেন।

রাহবরি শুরা গঠনের পর মৌলবী আবদুল গনি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শুরাগুলোকে এক করার কাজে নেমে পড়লেন। গারদি জঙ্গল শুরার আমির মৌলবী হুসাইনকে পয়গাম পাঠালেন। রাহবরি শুরার অধীনে চলে আসার অনুরোধ করলেন। মৌলবী ফারুক রাহবরি শুরার অধীন হতে অস্বীকৃতি জানিয়ে লড়াই থেকে অবসর নিলেন। তার সহযোদ্ধারা কোয়েটা শুরায় যোগ দিয়েছিল। মৌলবী ফারুক কান্দাহার ছেড়ে পাকিস্তানের ওয়াজিরিস্তানে চলে এসেছিলেন। এখানেই তার মৃত্যু হয়েছিল। ২০০২ সালে গঠিত প্রথম শুরা (গারদি জঙ্গল) ২০০৩ সালে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। পুরো দেশজুড়ে আরো যত শুরা ছিল, সবগুলো ধীরে ধীরে রাহবরি শুরার অধীনে চলে এসেছিল।

মৌলবী আবদুল গনি অঘোষিতভাবেই রাহবরি শুরার প্রধান হিসেবে পরিচিতি পেয়ে যান। তিনি তালেবানের সহকারি প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন। মৌলবী বেরাদর সব শুরাকে এক পতাকাতলে জমায়েত করতে সক্ষম হলেও একটি শুরায় গিয়ে কঠিন বাধার সম্মুখীন হলেন।

৫২.

সেটি ছিল পূর্ব আফগানিস্তানের অত্যন্ত শক্তিশালী শুরা। সামরিক দিক থেকে এই শুরা অতুলনীয় শক্তির অধিকারী ছিল। এই শুরাকে রাহবরি শুরার আয়ত্তে

র আনুগত্যে আনা মোল্লা দাদুল্লাহ ও মোল্লা বেরাদরের জন্য অত্যন্ত কঠিন ছিল। এই শুরার নাম ছিল মিরানশাহ শুরা। এর নেতা ছিলেন জালালুদ্দিন হক্কানী রহ.। পাকিস্তানের কাবায়েলি এলাকা মিরানশাহের সাথে তার গভীর সম্পর্ক ছিল, এজন্য শুরার নামও তাই হয়েছে। এই শুরা আন্তর্জাতিক মিডিয়াতে হক্কানী নেটওয়ার্ক নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। ২০০৩ সালের এপ্রিলে এই শুরা গঠিত হয়েছিল। বলা হয়ে থাকে, এই শুরার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জেনারেল হামিদ গুল ও মাওলানা ফজলুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। গারদি জঙ্গল শুরার চেয়েও এই শুরা বহুগুণ তাগড়া ছিল। সদস্য সংখ্যাও ছিল বেশি। যোগাযোগ, অর্থ, অভিজ্ঞতা—সবদিক দিয়ে মিরানশাহ শুরা এগিয়ে ছিল। মোল্লা জালালুদ্দিন হক্কানীর ছেলে মোল্লা সিরাজুদ্দিন হক্কানী এই শুরার প্রধান কমান্ডার ছিলেন। এই শুরার প্রাথমিক কর্মপরিধি পূর্ব আফগান প্রদেশ পাকতিয়া, খোস্ত, লোগোর অর্থাৎ, কাবুল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পুরো পূর্ব আফগানিস্তান এই শুরার প্রভাববলয়ে ছিল। প্রায় ৪টি প্রদেশের ৪৬টি জেলায় তাদের নেটওয়ার্ক ছিল। এসব এলাকায় তাদের ছায়া সরকার শাসন করত। শুরু থেকেই হক্কানী নেটওয়ার্ক (মিরানশাহ শুরা) কেন্দ্রীয় শক্তির মর্যাদা লাভ করেছিল। মিরানশাহ শুরার নিজস্ব কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদ ছিল। তাদের অভ্যন্তরীন যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। আমেরিকা ও তার মিত্র বাহিনীর ওপর ২০ বছরে এই শুরার সদস্যরাই বেশি হামলা করেছে। এদের হামলায় হানাদার বাহিনী রীতিমতো নাকানিচোবানি খেয়েছে। আফগানে মার্কিন হামলার পর থেকেই এই শুরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে শুরু করেছিল। প্রথম দিকে তারা বিপুল ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। এর সমাধান হিসেবে তারা ব্যাপকহারে নতুন সদস্য ভর্তি শুরু করে দিয়েছিল। নতুন সদস্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পাক-আফগান সীমান্তের মাদরাসাগুলোতে দাঈ পাঠানো হতো। এই কৌশল অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হয়েছিল। হক্কানী নেটওয়ার্কের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র ছিল 'ইস্তেশহাদি হামলা'। তারা এটাকে ফেদাঈ হামলা বলত। এই কাজে পাক-আফগান সীমান্তের মাদরাসাগুলো থেকে নিরঙ্কুশ সহযোগিতা লাভ করেছিল। এখানকার মাদরাসাগুলোর তালেবান-জনতা স্বেচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফেদাঈ হামলার জন্য নিজেকে পেশ করত।

মোল্লা দাদুল্লাহ ও মোল্লা বেরাদর চাচ্ছিলেন, যেকোনো মূল্যে মিরানশাহ শুরাকে রাহবরি শুরার অধীনে নিয়ে আসতে। তাহলে পুরো যুদ্ধ এক কেন্দ্র থেকে পরিচালনা করা যাবে। বিশ্ববাসীকেও নিজেদের ঐক্য দেখানো যাবে।

২০০৩ সালে কোয়েটা শুরার নেতৃবৃন্দ মিরানশাহ শুরার উদ্দেশ্যে আহ্বান জানিয়েছেন, তারা যেন রাহবরি শুরার আনুগত্য স্বীকার করে নেয়। মোল্লা সিরাজুদ্দিন হক্কানী কিছু শর্তসাপেক্ষে প্রস্তাব মেনে নিয়েছিলেন। তবে হক্কানী নেটওয়ার্ক বিলুপ্ত করা হলো না। রাহবরি শুরার অনুমোদনক্রমে তারা নিজেদের কাঠামোতে থেকেই মেহনত চালিয়ে যেতে থাকল। বলা যেতে পারে, রাহবরি শুরার চেয়ে হক্কানী নেটওয়ার্কই গেরিলা যুদ্ধে বেশি পারদর্শিতা দেখিয়েছে। হক্কানী নেটওয়ার্কই হানাদারবিরোধী লড়াইটাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে গেছে। অন্যরাও সাধ্যমতো মেহনত করেছে। যখন রাহবরি শুরা কাবুল থেকে বহুদূরে ছিল, তখনো মিরানশাহ শুরা কাবুলের অভ্যন্তরে বোমা হামলাসহ আরো বড় বড় অভিযান পরিচালনা করেছে। হক্কানী নেটওয়ার্কের প্রভাব-প্রতিপত্তি এত বেশি ছিল যে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট, স্বরাষ্ট্রসচিব, পররাষ্ট্রসচিব, পেন্টাগন—সবার মুখে শুধু হক্কানী নেটওয়ার্কের নামই উচ্চারিত হতো।

২০০৩ সাল নাগাদ তালেবান একটি কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদ গঠন করতে সক্ষম হয়েছিল। এই পরিষদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, আমেরিকা ও বাকি বিশ্বের সামনে নিজেদের 'বারগেইন পজিশন' তথা দরকষাকষি অবস্থান মজবুত করা। শুরুতে আমেরিকাকে আফগান থেকে বের করার বিষয়টি তাদের প্রধানতম এজেন্ডার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। হ্যাঁ, চূড়ান্ত লক্ষ্য একটাই ছিল, শেষপর্যন্ত হানাদার বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে আফগান ত্যাগে বাধ্য করতেই হবে। উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থকড়ি দরকার ছিল। রাহবরি শুরা তহবিল সংগ্রহের জন্য স্থানীয় জমিদার, ব্যবসায়ীদের শরণাপন্ন হয়েছিল। আরব, পাকিস্তান ও ইরানের গুপ্ত সংগঠনগুলো থেকেও অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছিল। এমনকি চীনের গোয়েন্দা সংস্থার সাথেও যোগাযোগ করেছিল। ২০০৩ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে রাহবরি শুরা ২০ মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিল। এই অর্থ রাহবরি শুরার আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিয়েছিল। রাহবরি শুরার নেতৃবৃন্দ পাকিস্তান ও ইরানি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সীমান্ত অতিক্রম করার ছাড়পত্রও হাসিল করে। এই ছাড়পত্র এমনি এমনি ছিল না। গিভ এন্ড টেকের ভিত্তিতে হয়েছিল। এ সবকিছু হয়েছিল মৌখিক আলোচনার ভিত্তিতে। লেখাপড়া করে নয়। রাহবরি শুরাকে পাকিস্তান-ইরানের কিছু পণ্য সীমান্ত পাড়ি দেওয়ার সময় দেখেও না দেখার ভান করতে হতো। বিনিময়ে তারাও নির্বিঘ্নে দুই দেশের সীমান্ত পাড়ি দিতে পারত।

২০০৪ সাল থেকে কোয়েটা শুরা নিয়মতান্ত্রিকভাবে কাজ শুরু করে দেয়। তাদের প্রধান মিশন ছিল, আফগান প্রদেশগুলোতে ছায়া সরকার গঠন করা। প্রদেশগুলোতে শুরার পক্ষ থেকে গভর্নর নিয়োগ করা হলো। গভর্নরদের নিয়মিত শুরার কাছে কাজের অগ্রগতি বিষয়ে জবাবদিহি করতে হতো। ছায়া গভর্নরদের কাজ ছিল কর সংগ্রহ করা, নতুন সদস্য ভর্তি করা, তালেবান যোদ্ধা ও নেতৃবৃন্দের নিরাপত্তা বিধান করা, সমস্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব রাহবরি শুরার কাছে পাঠানো। গভর্নরের অধীনে তালেবান যোদ্ধারা রাতের আঁধারে বাইকে করে এসে আমেরিকা ও হামিদ কারজাইর সহযোগীদের হত্যা করত। এর প্রতিক্রিয়ায় এলাকায় ভীতি ছড়িয়ে পড়ত, সরকারি লোকজন এলাকা ছেড়ে পালাত। সরকারি লোকেরা পালানোর পর তালেবান এসে সবার আগে নিজেদের একজন মৌলবীকে এনে স্থানীয় মসজিদে বসিয়ে দিত। মসজিদ থেকে দাওয়াতি কাজ চালানো হতো : ইহুদি-নাসারাদের ষড়যন্ত্রে আফগানিস্তান দখল করে নেওয়া হয়েছে। আমেরিকা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে। এজন্য কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য তালেবানের সাহায্য করা সবার ধর্মীয় ও জাতীয় কর্তব্য। যুবকশ্রেণির রক্ত গরম করার জন্য মসজিদের মাইকে উচ্চ আওয়াজে জিহাদি তারানা প্রচার করা হতো। এসব তারানায় তরুণ তো বটেই, বৃদ্ধদের রক্তেও জোশের বান ডাকত।

তালেবানের সামনে এখন অনেক কাজ। আফগান সরকার, পুলিশ, মার্কিন সেনাদের কাজকর্মে জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। হানাদারদের কাজকর্ম আফগান ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত হয়েছিল। এতে লাভ হয়েছে তালেবানের। জনগণকে পাশে টানার কাজ সহজ হয়ে গিয়েছিল। তালেবানের মূল মিশন শুরু হলো। এবার তাদের আদর্শ বাস্তবায়নের পালা। তালেবান কিছু কাজ যেকোনো মূল্যে বাস্তবায়ন করার পেছনে সর্বশক্তি ব্যয় করেছিল। ২০০৪ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়েছিল। হামিদ কারজাই প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিল। তালেবান এই নির্বাচনের ঘোরতর বিরোধী হলেও নিজেদের সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে নির্বাচন ঠেকাতে পারেনি। ২০০৫ সালে আফগানিস্তানের সংসদ নির্বাচন হয়েছিল। তালেবান ততদিনে গুছিয়ে উঠেছে। তালেবান গণতন্ত্রের ঘোরবিরোধী। তালেবান যেকোনো মূল্যে এই নির্বাচনকে ঠেকাতে চাচ্ছিল। রাহবরি শুরা কতটা শক্তিশালী—সেটা দেখানোর এই প্রথম সুযোগ তালেবানের সামনে এলো। তখন পর্যন্ত সিআইএ বা মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা—কারো কাছেই কোয়েটা শুরা বা হক্কানী নেটওয়ার্কের কোনো হদিস ছিল না।

২০০৫ সালের নির্বাচন ঠেকানোর জন্য তালেবান প্রতিবেশী (ইরান-পাক) দেশের সাথে যোগাযোগ করল। সৌদিসহ অন্য আরব দেশের সাথেও পুরোনো সম্পর্ক জোড়া লাগানোর চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিল। চারিদিকে দৌড়ঝাঁপের বরকতে তালেবানের হাতে সন্তোষজনক টাকা জমা হয়েছিল। প্রতিবেশী দেশের গোয়েন্দা সংস্থার কাছ থেকে ৩০ মিলিয়ন ডলার তহবিল জমা হয়েছিলো। এই টাকা দিয়ে তালেবান তাদের প্রথম কর্মসূচি (নির্বাচন ঠেকানো) বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা করল। ততদিনে তালেবান কিছুটা সংগঠিত হয়ে গেলেও শক্তিশালী ছিল না। এজন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ২০০৫ সালের সংসদ নির্বাচনে মাত্র ১০% প্রভাবিত করতে পেরেছিল। সেবার ৩০/৪০ জেলায় ভোট রোধ করতে পেরেছিল। এসব জেলা প্রত্যন্ত অঞ্চলে হওয়ায় নিরাপত্তারক্ষী ছিল না বললেই চলে। এজন্য কাজটা সহজ হয়ে গিয়েছিল। বাকি এলাকায় নির্বাচন রোধের জন্য তালেবান মসজিদসমূহে নির্বাচনবিরোধী বয়ান-এলান করে দিত। এর বেশি কিছু করার মতো শক্তি ছিল না। বয়ান-এলানে বলা হতো, গণতন্ত্র এক কুফরি মতবাদ। এজন্য নির্বাচনে অংশ নেওয়া যাবে না।

রাহবরি শুরা দ্বিতীয় যে কাজটি করেছে সেটা হলো, স্কুল: বিশেষ করে মেয়েদের স্কুল বন্ধ করার কাজ। ক্ষেত্রবিশেষে অনেক স্কুল গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। প্রশ্ন উঠতে পারে, তালেবান স্কুলের পেছনে কেন পড়েছিল? এই কাজের পেছনে তালেবানের একটি আদর্শিক চিন্তা কাজ করত। মোল্লা ওমরের আমলে স্কুলগুলোর জন্য একটি পরিপূর্ণ কারিকুলাম তৈরি করা হয়েছিল। তালেবান সেটাকে ইসলামি কারিকুলাম বলে বিশ্বাস করত। তালেবান মনেপ্রাণে বিশ্বাস করত, আফগান স্কুলগুলোতে সেই কারিকুলামই পড়ানো উচিত। যে কারিকুলাম ২০০১ সালের পর আফগান স্কুলগুলোতে পড়ানো হচ্ছিল, সেটাকে তালেবান শরিয়তবিরোধী কারিকুলাম আখ্যা দিয়েছিল। যেকোনো মূল্যে সেই কারিকুলামকে প্রতিরোধ করতে চাচ্ছিল। এই উদ্দেশ্যে কোয়েটা শুরার শিক্ষা কমিশন ২০০৫ সালে এক কর্মকৌশল নির্ধারণ করেছিল। প্রথমে পুরো আফগানিস্তানে ঘোষণা দেওয়া হলো, ২০০১ সালের পর প্রণয়নকৃত কারিকুলাম নিষিদ্ধ। এটা কোমলমতি শিশুদের পড়ানো চলবে না। এই কারিকুলাম সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে হবে।

দ্বিতীয় ধাপে সেসব স্কুলের খোঁজ করা হতো, যেগুলোতে তালেবানের নিষেধাজ্ঞা মানা হতো না। প্রথমে স্কুল পরিচালনা পরিষদকে সতর্ক করা

হতো। তারপরও নতুন সিলেবাস পড়ানো হলে কর্তৃপক্ষকে হুমকি-ধমকি দেওয়া হতো। ক্ষেত্রবিশেষে ধরপাকড় করা হতো। কখনো মারধরও করা হতো। এরপরও নতুন সিলেবাস পড়ানো হলে দায়ী ব্যক্তিদের গ্রামচ্যুত করা হতো। কখনো হত্যা করা হতো, কখনো স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হতো। কখনো স্কুল গুঁড়িয়ে দেওয়া হতো।

তৃতীয় ধাপে রাহবরি শুরা নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তির বলয় সম্প্রসারিত করতে শুরু করেছিল। যেসব এলাকায় পশতুন বেশি থাকত, সেখানে তালেবান সহজেই প্রভাব বিস্তার করতে পারত। সেখান থেকে দেদার নতুন সদস্য সংগৃহীত হতো। কিছু এলাকায় মোল্লা ওমরের যুগ থেকেই তালেবানের প্রভাব তুলনামূলক কম ছিল। পশ্চিম আফগানের হেরাত, উত্তর আফগানের মাজার-ই-শরিফ ইত্যাদি। এসব এলাকায় প্রভাব বৃদ্ধি করা খুবই জরুরি আবার কঠিনও ছিল। আমেরিকান মিত্র ও কারজাই সরকার এসব অঞ্চলে শক্ত অবস্থানে ছিল। তালেবান শুরুতে সরাসরি প্রশাসনের বিরুদ্ধে না নেমে কৌশলে অগ্রসর হলো। খুঁজে খুঁজে মার্কিন ও সরকারবিরোধী গোষ্ঠীগুলো বের করল। তাদের সাথে গোপন আঁতাত গড়ে তুলল। এই মিত্রদের অনেকের সাথে ইতিপূর্বে তালেবানের আদর্শিক বিরোধ ছিল চরম মাত্রার। এখনো যে বিরোধ মিটে গেছে তা নয়। শত্রুর শত্রু বন্ধু—তালেবান এই নীতি অবলম্বন করে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। যেমন হেরাতের গভর্নর ছিল আবদুল গনি খান। তালেবান তার বিরোধীপক্ষকে খুঁজে বের করে তাদের সাথে মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ হলো। তালেবান তাদের সাধ্যমতো সাহায্য করল। অস্ত্র দিয়ে, গোপন তথ্য সরবরাহ করে, যোদ্ধা দিয়ে, ডলার দিয়ে। তালেবান স্থানীয় মিত্রদেরকে প্রশাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাহায্য করত। তালেবানের সাহায্য-সমর্থন পেয়ে অনেক সংখ্যালঘু গোষ্ঠী প্রশাসনের শক্তিশালী প্রতিপক্ষ হয়ে গিয়েছিল। রাহবরি শুরার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, আমরা বিরোধী আদর্শের লোকজনকে সাহায্য করছি না, বরং শত্রুপক্ষকে পরাজিত করতে সাহায্য করছি। কাবুলের উত্তরে বাগলান, পশ্চিমে ফারয়াব প্রদেশে ২০০৫ সাল নাগাদ তালেবানের শক্তিশালী যোদ্ধাদল গড়ে ওঠে। এতদিক সামাল দিতে রাহবরি শুরার অনেক টাকাপয়সার দরকার। সেটা আসত কোত্থেকে?

বাহির থেকে বিপুল পরিমাণ তহবিল আসত। আফগানের ভেতর থেকেও মোটা অঙ্কের তহবিল আসত। কারো কারো মতে, সবচেয়ে বেশি টাকা আসত পপি থেকে। এই পপি থেকেই হেরোইন তৈরি হয়। পুরো

আফগানিস্তান না হলেও কান্দাহার, নাঙ্গারহার অঞ্চলে পপিচাষ থেকে যাসা টাকা রাহবরি শুরা তহবিলে জমা হতো। দক্ষিণাঞ্চলের প্রদেশ কান্দাহার ও হেলমান্দে হামিদ কাইজাই সরকার পপিচাষে কঠিন নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। মার্কিন ও আফগান ফৌজ পপিক্ষেত দেখামাত্রই ধ্বংস করে দিত। আফগান চাষীরা পপি থেকে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করত। পপি শ্রমিকরাও তুলনামূলক বেশি পারিশ্রমিক উপার্জন করত। পপিচাষ বন্ধ করে দিলে বহুলোক হঠাৎ বেকারত্বের শিকার হতো। অনেক পুঁজিপতি সর্বশান্ত হয়ে যেত। আফগানে এমনিতেই বেকারত্বের হার অনেক উঁচু ছিল।

মার্কিন চাপে আফগান সরকার যখন পপিক্ষেত ধ্বংস করতে শুরু করল, তখন পপি চাষীরা তালেবানের সাথে যোগাযোগ করল। তারা প্রস্তাব দিলো, তাদের পপিক্ষেত হেফাজত করতে পারলে বিনিময়ে চড়া হারে কর দেবে। তালেবানের তখন বিপুল অর্থের প্রয়োজন। তালেবান পপিক্ষেত সুরক্ষায় বাহিনী মোতায়েন করল। ফলাফল হাতেনাতে। পপিক্ষেত অধ্যুষিত অঞ্চলগুলো পাকা ফলের মতো তালেবানের অধীনে চলে এলো। লোকজন তালেবানের প্রতি বশ্যতা স্বীকার করে নিল। স্থানীয় লোকজনের বড় একটি অংশই পপিচাষের সাথে জড়িত ছিল। পপিবাণিজ্যের ওপরই তাদের জীবন ও জীবিক নির্ভরশীল ছিল। আবার পপি ফসল যখন সীমান্ত পার হতো, তখনো তালেবান ও সংশ্লিষ্ট দেশের সীমান্ত চৌকিগুলো মোটা অঙ্কের পয়সা কামাত। পপিকে ঘিরে টাকা আয়ের একটি বৃত্ত গড়ে উঠেছিল। পপিবাণিজ্য থেকে অনেকেই পয়সাকড়ি কামাত। এজন্য দেখা যেত, আফগান সীমান্তে কাজ করা কর্মকর্তারা অল্পদিনেই আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে যেত। আফগান সীমান্তে কাজ করা যেমন ঝুঁকিপূর্ণ, তেমনি লোভনীয়ও ছিল। পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সীমান্তরক্ষী বাহিনীতে আফগান সীমান্তে পোস্টিং পাওয়াটা পরম আরাধ্য বিষয় ছিল। বাংলাদেশে যেমন বিদেশি মিশনে যাওয়াটা প্রায় সব সেনার আরাধ্য বিষয় হয়ে থাকে। এসব দেশের সীমান্তকর্তারা আফগান সীমান্ত থেকে বদলি হয়ে আসার পরই বিভিন্ন খাতে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করতে শুরু করে। পরিচিত সবার মুখে হাসি ফোটে, মনে মনে ভাবে, ভালোই কামিয়েছে।

১৯৯৬-২০০১ সালে আফগানে তালেবান শাসন ছিল। অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, তখন তো তালেবান পপিচাষ নিষিদ্ধ করেছিল। জি হ্যাঁ, এটা সম্পূর্ণ সত্য কথা। আবার এটাও সত্য, পপিচাষ নিষিদ্ধের বিষয়টি কাগজ-কলম পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। আইনটি বাস্তবায়িত হয়নি বা বাস্তবায়ন করার

সময় ও সুযোগ হয়ে ওঠেনি। তার আগেই মার্কিন আগ্রাসন শুরু হয়ে গিয়েছিল। তালেবান শাসনামলে কান্দাহারে এন্টি ড্রাগ কন্ট্রোল ফোর্সের প্রধান মোল্লা আবদুর রশিদের কাছে পাকিস্তানের বিখ্যাত সাংবাদিক আহমাদ রশিদ জানতে চেয়েছিল, আপনারা কান্দাহারে পপিচাষ বন্ধ করছেন না কেন? মোল্লা আবদুর রশিদ উত্তর দিয়েছিলেন, আমরা পপি থেকে হাশিশ উৎপাদনের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছি। কারণ, আফগান ও মুসলমানরা হাশিশ ব্যবহার করে; আফিম-হেরোইন তো পশ্চিমের কাফেররা ব্যবহার করে। তাই পপির চাষাবাদে আমাদের কোনো ক্ষতি নেই।

তালেবান শাসনামলে জাতিসংঘের ড্রাগ কন্ট্রোল প্রোগ্রাম (ইউএনডিসিপি) পপিচাষ নিয়ন্ত্রণে তালেবানের সাথে দীর্ঘ আলোচনা করেছে। এই আলোচনা বছরের পর বছর চলেছে। কাজের কাজ কিছু হয়নি।। জাতিসংঘ চেয়েছিল, আফগানে পপিচাষ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিতে। তখন তালেবান কর্তৃপক্ষ জাতিসংঘের কাছে দাবি জানিয়েছিল, পপিচাষ বন্ধ করলে চাষী ও শ্রমিকদের যে ক্ষতি হবে, তা পুষিয়ে নেওয়ার মতো ফান্ড দেওয়া হোক। আমাদের বিকল্প কোনো ফসল দেওয়া হোক, যা দিয়ে পপির ক্ষতি কাটিয়ে ওঠা যাবে। জাতিসংঘ এই দাবিতে সাড়া দেয়নি। মোটকথা, পপিচাষ থেকে তালেবান সরকার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আয় করত। জাতিসংঘের রিপোর্ট মোতাবেক, ১৯৯৫ সালে যখন তালেবানের ক্ষমতা কান্দাহার পর্যন্ত ছিল—তখনো কাবুল দখলে আসেনি—শুধু কান্দাহারে ২,৪৬০ হেক্টর জমি থেকে ৭৯ মেট্রিক টন পপি উৎপাদিত হয়েছিল। ১৯৯৬ সালে যখন কাবুলও তালেবানের দখলে চলে এসেছিল, সে বছর কান্দাহারে ৩,১৬০ হেক্টর জমি থেকে ১২০ মেট্রিক টন পপি উৎপাদিত হয়েছিল। পরের বছর ১৯৯৭ সালে যখন কাবুল ও উত্তরে তালেবানের শাসন আরো মজবুত হয়েছিল, তখন পপি উৎপাদন ২৫% বৃদ্ধি হয়ে ২,৮০০ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছিল।

আমাদের আলোচনা চলছিল, তালেবান কীভাবে নিজেদের পুনর্গঠিত করে গেরিলা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল—সেটা নিয়ে। রাহবরি শুরার প্রায় প্রত্যেকেরই নিজস্ব বাহিনী ছিল। সবাই যে যার মতো করে তহবিল সংগ্রহের চেষ্টা করতেন। মোল্লা বেরাদর নিজের বাহিনীর জন্য ইরান, পাকিস্তান, আরব দেশসমূহ থেকে তহবিল সংগ্রহ করতেন। মোল্লা ফারুকের সাথে পাকিস্তানের বনিবনা হতো না। তিনি আরব থেকেই সাধ্যমতো তহবিল সংগ্রহ করতেন। চীন থেকেও কোনো কোনো সূত্রে তহবিল আসত। মোল্লা ওমরের পর

তালেবানের নেতা হয়েছিলেন মোল্লা আখতার মনসুর। তিনি ইরান ও একিউ (আল কায়েদা) থেকে বেশি সাহায্য পেতেন। তিনি পাকিস্তান থেকেও সাহায্য পেয়েছেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, আমেরিকা এসব দেখেও চুপ কেন ছিল? মজার বিষয় হলো, আমেরিকা খোদ এমন কিছু যোদ্ধাদলকে সাহায্য করছিল, কোনো না কোনোভাবে সে সাহায্য তালেবানের হাতে পৌঁছে যাচ্ছিল। হামিদ কারজাই সরকারকে যে পরিমাণ সাহায্য করছিল আমেরিকা, তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি সাহায্য করছিল বিভিন্ন যোদ্ধাদলকে। আমেরিকা-ইউরোপ অভিযোগ করে, পাকিস্তান তালেবানকে সাহায্য করেছে। বাস্তবে দেখা গেছে, পাকিস্তান, সৌদি, ইরানের চেয়েও কয়েকগুণ বেশি সাহায্য আমেরিকা এমন আফগান দলকে গোপনে করেছে, যার পরিমাণ পাক-ইরান-সৌদির সম্মিলিত সাহায্যের চেয়েও বহু-বহুগুণ বেশি। এই সাহায্যপ্রাপ্ত দলগুলোরই কোনো কোনোটি তালেবানকে আবার ক্ষমতায় ফিরতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছে।

<u>০৩.</u>

প্রথম দিকে যখন তালেবান হামলা শুরু করেছিল, সে সময়কার হামলাগুলোর তেমন কোনো ভিডিও পাওয়া যায় না। ২০০৭ সালের পর থেকে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ হামলাগুলোর ভিডিও জনসমক্ষে আসা শুরু হয়েছে। এর কারণ হলো, রাহবরি শুরা বিভিন্ন দলকে টাকা দেওয়ার সময় বলে দিত, টাকাগুলো ব্যয়ের পরিপূর্ণ হিসাবের খতিয়ান যেন দাখিল করে। বিভিন্ন অঞ্চলের গভর্নরদের ওপরও নিজ এলাকা থেকে অর্জিত যাকাত, সাধারণ দান-সদকার একটি অংশ কেন্দ্রীয় শুরার তহবিলে পাঠানোর দায়িত্ব ছিল। পাশাপাশি তাদের আয়-ব্যয়ের হিসাবও।

সাধারণত যুদ্ধরত সেনারা টাকাপয়সার হিসাব-কিতাবে অতটা পটু হয় না. এজন্য হিসেবে গরমিল হয়ে যেত। সারাক্ষণ জীবন ও নিরাপত্তার ঝুঁকিতে থাকা, অনবরত স্থান বদল করতে থাকার কারণে হিসাবের স্থায়ী বন্দোবস্ত করা আসলেই কঠিন ছিল। কোথাও কোথাও যে অনিয়ম হতো না—এটাও হলফ করে বলা যায় না। যুদ্ধপরিস্থিতিতে হিসাবপত্রে শতভাগ সচ্ছতা রাখা সম্ভবও ছিল না। ২০০৮ সালে রাহবরি শুরা এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এবার থেকে প্রতিটি দল তাদের হামলাগুলোর ভিডিও বানিয়ে শুরার কাছে জমা দিবে। তাহলে বোঝা যাবে, কারা কেমন কাজ করছে এবং কাদের ব্যয় কেমন হচ্ছে। এর আগে আল কায়েদা বা অন্য সংগঠনগুলোতে নিজেদের

হামলার ভিডিও ধারণ করার রেওয়াজ থাকলেও তালেবানের মধ্যে সাংগঠনিকভাবে বিষয়টা সর্বাত্মক চর্চায় ছিল না। ভিডিওর মাধ্যমে সংগঠনের প্রচার-প্রসার হয়, নতুন তহবিল পেতেও সহায়তা হয়। নতুন সদস্য পেতেও বেগ পেতে হয় না। শত্রুদের মধ্যেও মানসিক চাপ তৈরি হয়। আগে তালেবানের মোল্লা দাদুল্লাহ সীমিত পরিসরে নিজেদের হামলার ভিডিও চিত্র ধারণ করে প্রকাশ করতেন।

তালেবান যখন ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল, নিজেদেরকে সুশৃঙ্খলভাবে গড়ে তুলছিল, স্থানীয় জনগণও তালেবানের ডাকে সাড়া দিতে শুরু করছিল, তখন আফগানিস্তান নিয়ে আমেরিকায় দুটি পক্ষের টানাপোড়েন শুরু হয়ে গিয়েছিল। মার্কিন প্রশাসনের দুটি অংশ :

ক. হোয়াইট হাউজ। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। ক্ষমতাসীন দলের লোকজন। এখানকার কর্মকর্তারা সবসময় চেষ্টা-লবিং করে, প্রেসিডেন্ট যেন তাদের দেওয়া পরামর্শ অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

খ. পেন্টাগন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।

আফগানে হামলা চালানোর পর থেকেই দু পক্ষে একটি বিষয় নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া চলে আসছিল, আফগানিস্তানে আমেরিকা কতদিন অবস্থান করবে? হোয়াইট হাউজ আফগানের পুনর্গঠন চাইত। পুরো আফগানকে নিজেদের মতো করে ঢেলে সাজাতে চাইত। আফগানকে আর্থিক সাহায্য করতে চাইত, আফগান সেনাদের আধুনিকায়নও করতে চাইত। হোয়াইট হাউজ চাইত, আফগানিস্তানে পরিপূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে দেশটিকে এমনভাবে স্বাবলম্বী করে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে দিতে, যাতে ভবিষ্যতে কখনো তালেবান বা আল কায়েদা মাথাচাড়া দিতে না পারে। এককথায় 'জাতিগঠন' করতে চাচ্ছিল। হোয়াইট হাউজের চিন্তা ছিল এমন, আমরা যদি আফগানিস্তানকে এই অবস্থায় ছেড়ে চলে যাই, তার অর্থ হবে, আল কায়েদা বা তালেবানকে আবার ফিরে আসার রাস্তা করে দেওয়া। এজন্য যাওয়ার আগে আফগান সরকারকে শক্ত পায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে যাওয়া আমাদের কর্তব্য।

এর বিপরীতে পেন্টাগন অর্থাৎ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় যার নেতৃত্বে ছিল প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফিল্ড। তাদের বক্তব্য ছিল, আমরা তালেবান উৎখাত করেছি। আল কায়েদাকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছি। আমাদের আর আফগানে থাকার দরকার নেই। সেখানে অকাতরে ডলার বিলানোরও দরকার

নেই। আমরা আগের দুই বছরে ১৭ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে ফেলেছি। আরো বেশি সময় আফগানে থাকলে মার্কিন করদাতাদের আরো বিলিয়ন-বিলিয়ন ডলার খরচ হতে থাকবে। যত দ্রুত সম্ভব আমাদেরকে সেখান থেকে ফেরা উচিত। আফগান জনগণের দায়িত্ব তাদের নিজের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত। জাতিগঠন আমাদের কাজ নয়।

দুই পক্ষের লড়াইয়ে বেশি লাভবান হয়েছে পেন্টাগনের সমর্থন-সাহায্যপ্রাপ্ত দল। তারা ছিল আফগানের ওয়ারলর্ড (যুদ্ধবাজ) নেতা। এই যুদ্ধবাজ নেতারা নিজস্ব ক্ষমতাবলে আফগানের বিভিন্ন অঞ্চল শাসন করত। আল কায়েদা-তালেবান সদস্যদের ব্যাপকহারে পাকড়াও করার জন্য পেন্টাগন এই ওয়ারলর্ডদের সাহায্য নিয়েছিল। অবস্থাটা এমন দাঁড়িয়েছিল, হোয়াইট হাউজ টাকা দিত কারজাই সরকারকে। পেন্টাগন টাকা দিত যুদ্ধবাজ নেতাদের। বেশিরভাগ সময় এমন হয়েছে, আফগান সরকার অতীব প্রয়োজনীয় ফান্ডের কারণে ধুঁকছে, অন্যদিকে ওয়ারলর্ডদের ওপর নিয়মিত ডলারবৃষ্টি হয়ে চলছে। পেন্টাগন যুদ্ধবাজ নেতাদেরকে ঠিকাদারের মতো ব্যবহার করেছে। টাকা দিয়ে কাজ আদায় করার কৌশল অবলম্বন করেছিল। হোয়াইট হাউজ কারজাই সরকারকে মুক্তহস্তে দান করত—এমনও নয়। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর প্রেসিডেন্ট বুশকে বারবার বুঝিয়েও কারজাই সরকারের জন্য প্রয়োজনীয় ফান্ড মঞ্জুর করাতে প্রায়ই ব্যর্থ হতো। কারজাই সরকারের অবস্থা এমন হয়েছিল, প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের ছাদ মেরামতের টাকাও ছিল না। ছাদ চুইয়ে পানি পড়লেও কিছু করার ছিল না। কারজাই নামমাত্র আফগান প্রেসিডেন্ট ছিল। তার ক্ষমতার পরিধি স্রেফ কাবুলেই সীমাবদ্ধ ছিল। সেটাও মার্কিন সেনাদের প্রহরায়। কারজাই প্রথম প্রথম মনে করেছিল, আমেরিকা যেহেতু তাকে এনে বসিয়েছে, তাকে প্রয়োজনীয় টাকাপয়সাও দিবে। পুরো আফগানিস্তানে ক্ষমতা সংহত করতে হাত খুলে সাহায্য করবে। কারজাইর এই আশার গুড়েবালি পড়তে দেরি হলো না। আবার এ কথা ভাবাও ঠিক হবে না, আমেরিকা কিছুই দেয়নি। আমেরিকার ওপর ভরসা করে হামিদ কারজাই মসনদে বসেই পুরো বিশ্ব থেকে লেখাপড়া জানা উচ্চশিক্ষিত আফগান নাগরিকদের দেশে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। তাদের দিয়ে দেশ পুনর্গঠনের কাজ চালানো হবে। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ তাদের দায়িত্বে ছেড়ে দেওয়া হবে। হামিদ কারজাইর পরিকল্পনা ছিল, অতি দ্রুত আফগানিস্তানকে নিজের পায়ের ওপর দাঁড় করাতে না পারলে এই দেশে আবার তালেবান-আল

কায়েদা ফিরে আসার পথ সুগম হবে। হামিদ কারজাইর উদ্যোগে সারা বিশ্ব থেকে আসা উচ্চশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৫২ বছর বয়েসি একজন অর্থনীতিবিদও ছিল। তার নাম আশরাফ ঘানি। বৈরুত ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা শেষ করে বিশ্বব্যাংকে কাজ করেছিল। ক্যান্সারের কারণে অন্ত্রের একাংশ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ঘানি শারীরিকভাবে অতটা সুস্থ ছিল না। বেশিদিন বাঁচার আশাও ছিল না। আশরাফ ঘানির লক্ষ্য ছিল এমন, মৃত্যুর আগে যতটা সম্ভব আফগানিস্তানের জন্য কিছু করে যাবে। তাকে অর্থমন্ত্রীর পদ দেওয়া হলো। নতুন অর্থমন্ত্রীর সামনে এমন এক আফগানিস্তান ছিল, যে দেশে কোনো শিল্প বা পণ্য ছিল না, যেটা রপ্তানি করে আফগান অর্থনীতি দাঁড় করানো যায়। কোনো শিল্প-কারখানা ছিল না, রপ্তানিযোগ্য ফল-ফসল ছিল না। নামমাত্র যা ছিল, সেটা না থাকার বরাবর। একমাত্র পপি ছিল, যার মাধ্যমে আফগানিস্তানে মোটা অঙ্কের টাকা আসত। টাকা আসত চোরাই পথে। সে টাকায় আফগান অর্থনীতির খুব একটা সুসার হতো বলে মনে হয় না। পপি বিক্রির টাকা গুটিকয়েক ব্যবসায়ীর পকেটেই জমা হতো; গণমানুষের কোনো কাজে আসত না। তাছাড়া পপি চাষাবাদ থেকে শুরু করে রপ্তানি পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়াটাই আন্তর্জাতিকভাবে নিষিদ্ধ ছিল। মোদ্দাকথা, নতুন অর্থমন্ত্রী ঘানির আফগানে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি বলতে কিছু ছিল না বললেই চলে। হামিদ কারজাই আর আশরাফ ঘানি দুজনেই সারাক্ষণ হাভাতের মতো আমেরিকার ভিক্ষার দিকে জুলজুল করে তাকিয়ে থাকত। তাদের হাতে বিকল্প কিছু ছিল না।

২০০২ সালে ভার্জিনিয়া মিলিটারি একাডেমিতে বক্তব্য দিতে গিয়ে বুশ বলেছিল, আমরা আফগানিস্তানের জন্য একটি মার্শাল প্ল্যান জারি করব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত ইউরোপকে পুনর্গঠনের জন্য আমেরিকা মার্শাল প্ল্যান জারি করেছিল।

মার্শাল প্ল্যান

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলার গ্রিস দখল করে নিয়েছিল। হিটলারের বিরুদ্ধে গ্রিসের দুটি দল প্রতিরোধযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। একটি দল গ্রিসে বিরাজমান রাজতন্ত্রের সমর্থক আর আরেকটি কমিউনিস্ট পার্টি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে গ্রিসে পুনরায় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কমিউনিস্টরা রাজতন্ত্রের অধীনে ফিরে যেতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু

করে। ব্রিটেন তখন গ্রিসের রাজতন্ত্র রক্ষায় এগিয়ে এসেছিল। বেশিদিন সহায়তা করা সম্ভব হয়নি। ইউরোপের অন্যান্য দেশের মতো ব্রিটেন নিজেও যুদ্ধবিধ্বস্ত। ব্রিটিশ সাহায্য বন্ধ হয়ে যাওয়ায় গ্রিসের রাজা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। কমিউনিস্টদের ক্ষমতা দখলের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। সেটি ছিল পুঁজিবাদী ইউরোপের জন্য অশনিসংকেত।

তখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ছিল হ্যারি এস ট্রুম্যান। ১৯৪৭ সালে 'সেক্রেটারি অব দ্য স্টেট' পদে জর্জ মার্শালকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। সাবেক সেনা কর্মকর্তা মার্শাল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কয়েকটি যুদ্ধে মিত্রবাহিনীর সফল নেতৃত্ব দিয়েছিল। এ কারণে আমেরিকায় তার সুনাম ছিল। জর্জ মার্শাল দায়িত্ব গ্রহণ করার পর গ্রিসের সমস্যাটা তার সামনে এলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অস্ত্র বিক্রি করে আমেরিকার অর্থনীতি তখন ফুলেফেঁপে উঠেছিল। গ্রিসকে সাহায্য না করলে কমিউনিস্টরা জিতে যাবে। জর্জ মার্শাল প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানকে বোঝাল, পশ্চিম ইউরোপকে সোভিয়েতের কবলমুক্ত রাখতে চাইলে তাদেরকে বিপুল আর্থিক সহায়তা দেওয়া জরুরি। তাছাড়া ইউরোপের দেশগুলোকে ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ দেওয়া হলে ভবিষ্যতে আমেরিকা তার উৎপাদিত পণ্যের বাজার হিসেবে ইউরোপকে ব্যবহার করতে পারবে। তখন ১৯৪৮ সালে মার্কিন আইনসভায় 'ইকোনমিক কো-অপারেশন অ্যাক্ট' পাশ করা হয়। জর্জ মার্শালের নামানুসারে এই অর্থনৈতিক সাহায্য 'মার্শাল প্ল্যান' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। মার্শাল পরিকল্পনার অধীনে ইউরোপের ষোলোটি দেশকে প্রায় তেরো বিলিয়ন ডলার সহযোগিতা দেওয়া হয়। সেদিনের তেরো বিলিয়ন আজকের হিসেবে ১০০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি। ইউরোপীয় দেশগুলোতে সুপরিকল্পিতভাবে কাজে লাগানোর জন্য আমেরিকা থেকে অসংখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা প্রেরণ করা হয়। ১৯৪৮-১৯৫১ তিন বছরে আর্থিক সহায়তা প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পশ্চিম ইউরোপের অনেক দেশেই বেশ জোরেশোরে কমিউনিজম থাবা বিস্তার করতে শুরু করেছিল। দেশগুলোর অর্থনৈতিক দুর্দশার সুযোগেই মূলত লালঝান্ডা তাদের কার্যক্রম চালাতে পেরেছিল। মার্শাল পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কারণে দেশগুলোর অর্থনীতি খুব দ্রুত পূর্বের অবস্থায় ফিরে গিয়েছিল। এ কারণে কমিউনিস্ট দলগুলো রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের মতো জনসমর্থন তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছিল। এর জেরে আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে একধরনের মৃদু উত্তেজনা শুরু হয়েছিল। পরবর্তীতে যা স্নায়ুযুদ্ধে রূপ নিয়েছিল।

প্রেসিডেন্ট বুশের ঘোষণা মতো আফগানিস্তানে নতুন মার্শাল প্ল্যান বাস্তবায়ন করলে আফগানের ইতিহাস হয়তো ভিন্ন হতো। আফগান সেনাবাহিনী পুনর্গঠিত হতো। শিক্ষা ও চিকিৎসাখাত উন্নত হতো। দেশের অর্থনীতির চাকা সচল হয়ে যেত। কার্যত বুশ এ বিষয়ে কিছুই করেনি। সম্ভবত পেন্টাগন তাকে ভিন্ন কিছু বুঝিয়েছিল। হামিদ কারজাই ও আশরাফ ঘানি আমেরিকার দিক থেকে নিরাশ হয়ে ইউরোপের কাছে ধরনা দিতে শুরু করেছিল। ইউরোপ দেখল, আমেরিকা যেখানে সাহায্য করতে গড়িমসি করছে, আমরা কেন সেখানে টাকা নষ্ট করতে যাব? আফগান তো আমেরিকারই এজেন্ডা। কারজাই সরকার তখনো অল্পবিস্তর যা কিছু ভিক্ষা পাচ্ছিল, সেটা জাতিসংঘ থেকেই মিলছিল।

আমেরিকা কারজাই সরকারকে প্রয়োজনীয় টাকা না দিলেও পেন্টাগন নিয়মিত ওয়ারলর্ডদেরকে ডলার দিয়ে যাচ্ছিল। আফগানের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলেই কিছু যুদ্ধবাজ নেতা ছিল। তাদের নিজস্ব সেনাবাহিনী ছিল। এই যুদ্ধবাজ নেতারা কারজাই সরকারের সাথেও ছিল না, তালেবানের সাথে তো নয়ই। এরা নিজ নিজ এলাকায় অনেকটা স্বাধীন শাসকের মতো জীবনযাপন করত। পেন্টাগন সরাসরি এই যুদ্ধবাজ নেতাদের সাথে লেনদেন করত। ২০০৫-২০০৬ সালের দিকে কাবুলের বাইরে পুরো আফগানিস্তানই এই ওয়ারলর্ডদের কবজায় ছিল। যেমন :

ক. পশ্চিম আফগানিস্তানের কয়েকটি প্রদেশ ইসমাইল খানের কবজায় ছিল। হেরাত ছিল তার প্রধান কেন্দ্র।

খ. উত্তর আফগানিস্তানে দুজন ওয়ারলর্ড ছিল। জেনারেল ফাহিম ও জেনারেল আবদুর রশিদ দোস্তাম উত্তরাঞ্চল ভাগাভাগি করে নিয়েছিল। জেনারেল ফাহিম তাজিক ছিল। আহমদ শাহ মাসুদ নিহত হওয়ার পর ফাহিম উত্তরাঞ্চলীয় জোটের কমান্ডার হয়েছিল। আরেক তাজিক ওয়ারলর্ড ছিল জেনারেল দাউদ। কুন্দুজসহ চারটি পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ দাউদের অধীনে ছিল। পূর্ব আফগানিস্তান ওয়ারলর্ড আবদুল কাদিরের অধীনে ছিল। তার রাজধানী ছিল পাকিস্তান লাগোয়া নাঙ্গারহারে।

গ. দক্ষিণ আফগানিস্তানে কান্দাহারসহ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ গুল আগা শেরজাইয়ের অধীনে ছিল।

ঘ. আফগানিস্তানের মধ্যবর্তী অঞ্চল, যেখানে হাজারা শিয়াদের বসবাস,

সেখানে কমান্ডার করিম খলিলির রাজত্ব ছিল। তার সাথে সাইয়েদ আকবরী ও মুহাম্মাদ মুহাক্কাকও ছিল।

এই ওয়ারলর্ডরা অতীতে আমেরিকার সহায়তায় সোভিয়েতের বিরুদ্ধে লড়েছিল। সোভিয়েত চলে যাওয়ার পর ক্ষমতা নিয়ে নিজেরাই কামড়াকামড়ি শুরু করে দিয়েছিল। মোল্লা ওমর এদের বিরুদ্ধেই জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন। তালেবান এই দুর্নীতিবাজ ওয়ারলর্ডদেরকে জালেম আখ্যা দিয়েছিল। তালেবান সরকার পড়ে যাওয়ার পর এই যুদ্ধবাজ নেতারা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। এরা টাকাপয়সা, প্রভাব-প্রতিপত্তির জন্য সাধারণ জনগণের রক্ত চুষত আবার একে অপরের বিরুদ্ধে জীবনমরণ লড়াইয়েও অবতীর্ণ হতো।

আমেরিকা এই ওয়ারলর্ডদের কাছে তালেবান-আল কায়েদা নির্মূলের ব্যাপারে সাহায্য চাইলে তারা এককথায় রাজি হয়ে গিয়েছিল। এই যুদ্ধবাজ নেতারা আমেরিকার সাহায্যকে নিজেদের পারস্পরিক শত্রুতা চরিতার্থ করার জন্যও কাজে লাগিয়েছিল। আল কায়েদা-তালেবানের সংবাদ মার্কিন কর্তৃপক্ষকে জানানোর বিনিময়ে যুদ্ধবাজ নেতাগুলো মিলিয়ন-মিলিয়ন ডলার কামাত। তবে বেশিরভাগ সময় তালেবান-আল কায়েদার সংবাদ দেওয়ার নাম করে এমন জায়গা বা স্থাপনার ঠিকানা দিত, যেখানে তার ব্যক্তিগত বা গোত্রগত শত্রু বাস করত। আমেরিকা ওয়ারলর্ডদের 'চিপস' দিয়ে বলত, এটাকে তালেবান-একিউর অবস্থানস্থলে রেখে দিবে। আমরা সেখাবে বিমান হামলা চালাব। যুদ্ধবাজ নেতাগুলো মার্কিন চিপস বেশিরভাগ সময় এমন জায়গায় রেখে আসত, যেখানে তার শত্রুপক্ষীয় ওয়ারলর্ড বা তার স্বার্থ জড়িত। জুলাই ২০০১ সালে আরজাগান প্রদেশের বেশ কয়েকটি স্থানে মার্কিন বিমান হামলা চালিয়েছিল। এসব স্থানে আল কায়েদা-তালেবানের চিহ্নও ছিল না। এক জায়গায় বিয়ের অনুষ্ঠানে নারী ও শিশুসহ ৫৪ জন নিরীহ মানুষ বেঘোরে মারা পড়েছিল। আরজাগানেরই আরেকটি জায়গায় মার্কিন বিমান হামলায় ৮০ জন নিরীহ মানুষ মারা গিয়েছিল।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন গ্লোবাল এক্সচেঞ্জ বলেছিল, ২০০২ সালের শুধু জুন মাসেই মার্কিন বিমান হামলায় ৮১২ জন আফগান সাধারণ নাগরিক মারা গিয়েছিল। এসব হামলার কারণে বিশ্বজুড়ে আমেরিকার বিশ্বাসযোগ্যতা ও ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। গ্লোবাল এক্সচেঞ্জের ভাষ্য মতে, এতবেশি নিরীহ মানুষ মারা যাওয়ার কারণ ছিল, মার্কিন গোয়েন্দাদেরকে ভুল

দেওয়া হচ্ছিল। মার্কিন গোয়েন্দারা ওয়ারলর্ডদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য যাচাই-বাছাই করা ছাড়াই নির্বিচারে হামলা চালিয়েছিল। মার্কিন ড্রোন হামলাকে এই শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়ংকর, নির্মম, নৃশংস ও অমানবিক ঘটনা বললে একবিন্দুও ভুল হবে না। কারণ, ড্রোন হামলায় আজ পর্যন্ত এতবেশি নিরপরাধ মানুষ মারা গিয়েছে, যাদেরকে মারার জন্য ড্রোন হামলা করা হয়েছে, তাদের সবার সম্মিলিত হাতেও এত বেশি মানুষ মারা যায়নি।

আমেরিকার এসব মিত্র ওয়ারলর্ডরা অনেক সময় ডাবলক্রসও করত। একই সাথে একাধিক দেশ বা পক্ষের হয়ে কাজ করত। সবদিক থেকে পয়সা কামাত। উত্তর আফগানিস্তানের জেনারেল দোস্তাম তুরস্ক ও রাশিয়া—উভয় দেশ থেকে সাহায্য নিত আবার আমেরিকার সাথেও কাজ করত। হাজারা গোষ্ঠীভুক্ত শিয়া কমান্ডার করিম খলিলী ও হেরাতের কমান্ডার ইসমাইল খান আমেরিকা ছাড়া ইরানের কাছ থেকেও ভরপুর সাহায্য লাভ করত। প্রশিক্ষণ, অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থ—সব ধরনের সাহায্য। তারা কীভাবে ডাবল গেইম খেলত? ইসমাইল খানের কথাই ধরা যাক। তাকে হেরাতের শের বলা হতো। কিছুদিন আগেও ইসমাইল খান আলোচনায় এসেছিলেন। তালেবানের কাছে আত্মসমর্পণ করে সংবাদের শিরোনাম হয়েছিলেন। আজ থেকে প্রায় ৪০-৪৫ বছর আগে যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তান দখল করেছিল, হেরাতেও তাদের প্রতিনিধি ছিল। ইসমাইল খান সে সময় আফগান সেনাবাহিনীতে ক্যাপ্টেন ছিল। হেরাতেই পোস্টিং ছিল। হেরাতে রুশ বাহিনীর কয়েকজন উর্ধ্বতন অফিসারসহ একটি বাহিনী মোতায়েন ছিল। ক্যাপ্টেন ইসমাইল খান বিদ্রোহ করে ১৯৭৯ সালে এক রাতে রাশিয়ান সেনা অফিসার ও তাদের পরিবারসহ প্রায় পঞ্চাশ জনকে হত্যা করে হেরাত কবজা করেছিল। তিন দিনের বেশি এই দখল স্থায়ী হয়নি। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সোভিয়েত লালফৌজ হেরাতের ওপর এতবেশি বোমা বর্ষণ করেছিল যে, অসংখ্য ঐতিহাসিক নিদর্শনের শহর হেরাত অর্ধেকের বেশি সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। এই হামলায় পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি আফগান নাগরিক মারা গিয়েছিল। হাজার হাজার লাশ গোটা শহরজুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। পচাগলা শবদেহের দুর্গন্ধে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠেছিল। ইসমাইল খান সঙ্গীসাথিসহ হেরাত থেকে বের হয়ে সোভিয়েতবিরোধী লড়াইয়ে শরিক হয়েছিল। বলা হয়ে থাকে, ইসমাইল খান এই বিদ্রোহে ইরানের আয়াতুল্লাহ খোমেনীর মদদ পেয়েছিল। ইসমাইল খান হেরাত থেকে সরে এসে উত্তর

আফগানিস্তানে চলে গিয়েছিল। ১৯৯২ সাল নাগাদ ইসমাইল খান বিখ্যাত ওয়ারলর্ড বনে গিয়েছিল। এই বছরই জেনারেল নাজিবের সেনাদের হটিয়ে মুজাহিদিনের সহায়তায় হেরাত দখল করেছিল। তারপর উত্তরাঞ্চলীয় জোটের অংশ হয়ে তালেবানের বিরুদ্ধেও লড়েছে। দুই বছর তালেবানের হাতে বন্দিও ছিল। তালেবানের বন্দিখানা থেকে কোনোভাবে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ২০০১ সালে যখন তালেবান সরকার বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তখন ইসমাইল খান তালেবানের কাছ থেকে হেরাত পুনরায় দখল করে নিয়েছিল। আমেরিকা ইসমাইল খানকেই হেরাতের গভর্নর নিয়োগ দিয়েছিল। এরপরের ঘটনা থেকে ইসমাইল খানের ডবল গেইম সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে। একদিকে আমেরিকার কাছ থেকেও দু হাতে সাহায্য সংগ্রহ করছিল অন্যদিকে ইরানের কাছ থেকেও সহযোগিতা লুটছিল। হেরাত প্রদেশটি ইরান-আফগান সীমান্তে অবস্থিত হওয়ার কারণে সীমান্তবাণিজ্যের পরিপূর্ণ হিস্যাও ইসমাইল খানের পকেটে যেত। হেরাতের সীমান্তচৌকি 'ইসলামকেল্লা' পুরোপুরি ইসমাইল খানের কবজায় ছিল। এই পথ দিয়ে প্রতিদিন হাজার-হাজার ট্রাক আফগানিস্তানে প্রবেশ করে। এসব ট্রাকে জাপানি টায়ার, ইরানি তেল, সেকেন্ড হ্যান্ড ইউরোপিয়ান কার, তুর্কমেনিস্তানের গ্যাস সিলিন্ডার, আরবদেশ থেকে আসা পণ্যসামগ্রী থাকত। সীমান্ত স্থলবন্দর থেকে অর্জিত করের পুরোটাই ইসমাইল খানের ট্রেজারিতে জমা হতো। তীব্র অর্থসংকটে ধুঁকতে থাকা কাবুলের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এক পয়সাও যেত না। এক হিসাব মতে, প্রতি মাসে ইসমাইল কিল্লা থেকে প্রায় ৫ মিলিয়ন ডলার আয় করত। কেন্দ্রীয় সরকার এই আয়ের অর্ধেক পেলেও তার অনেক সমস্যা সমাধান করতে পারত। আমেরিকার অনুমোদন ছাড়া ইসমাইল খান এতটা বেপরোয়া হতে পারত না। মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ড নিজে গিয়ে ইসমাইল খানের সাথে দেখা করেছে। শুধু ইসমাইল খান নয়, অন্য যেসব ওয়ারলর্ড সীমান্ত অঞ্চল শাসন করত, তাদের অবস্থাও রমরমা ছিল।

আফগানিস্তানের সাথে মোট ৬টি দেশের সীমান্ত আছে। আফগানিস্তানের পূর্বে ও দক্ষিণে পাকিস্তান, পশ্চিমে ইরান, উত্তরে তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান ও তাজিকিস্তান, উত্তর-পূর্বে গণচীন। সীমান্তচৌকি থেকে আহরিত আয়ের সিকিভাগও যে কাবুলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যাচ্ছে না—এটা আমেরিকা জানলেও কিছুই বলত না। কাবুল সরকারেরও মার্কিন মদদপুষ্ট ওয়ারলর্ডদের বিরুদ্ধে কিছু করার মুরোদ ছিল না। মার্কিন সরকার সিআইএ-কে ব্ল্যাংক চেক

দিয়ে রেখেছিল ওয়ারলর্ডদেরকে যথেচ্ছ স্বাধীনতা দেওয়ার ব্যাপারে। বেশিরভাগ ওয়ারলর্ড সরাসরি সিআইএ থেকেই অর্থ ও অস্ত্র পেত। সিআইএ একই সাথে পরস্পরবিরোধী ওয়ারলর্ডদেরও সাহায্য করত। নাঙ্গারহারের গভর্নর জেনারেল আবদুল কাদির সিআইএ-এর মদদপুষ্ট ছিল। তার ঘোরতর শত্রু হযরত আলীও সিআইএ-এর মদদে ১৮ হাজার জোয়ানের মিলিশিয়া বাহিনী পেলেপুষে রাখত। হযরত আলী নিজের নামটা পর্যন্ত লিখতে পারত না। আমেরিকার আশীর্বাদে নিরক্ষর লোকটাও ওয়ারলর্ড বনে গিয়েছিল। তবে তার ভালো কাজও ছিল। কথিত আছে, তোরাবোরা পাহাড়ের গুহা থেকে ওসামা বিন লাদেনকে নিরাপদ জায়গায় চলে যেতে হযরত আলীর লোকেরাই সাহায্য করেছিল। বলা হয়ে থাকে, এর বিনিময়ে মোটা অঙ্কের টাকাও সে নিয়েছিল। সিআইএ এসব ওয়ারলর্ডদের পেছনে বিপুল পরিমাণে টাকা ঢালার কারণ ছিল, এদের দিয়ে আল কায়েদা ও তালেবানকে শায়েস্তা করতে চাইত। আমেরিকা মনেপ্রাণে চাইত, তারা সরাসরি প্রতিপক্ষের সাথে না লড়ে জাতিভাইদের মাধ্যমে আল কায়েদা-তালেবান দমন করতে।

আমেরিকার কাছ থেকে আফগান ওয়ারলর্ডরা নানা উপায়ে টাকা কামাত। মার্কিন সেনাক্যাম্পগুলোতে তেল, খাবার, প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ করেও আফগান ওয়ারলর্ডরা প্রচুর ডলার কামিয়েছে। তারা আমেরিকার কাছে ১ ডলারের জিনিস ১০ ডলারে বিক্রি করত। বিক্রির লভ্যাংশ পুরোটাই নিজের পকেটে পুরত। কান্দাহারের ওয়ারলর্ড গুল আগা শেরজাই ছিল তেমন এক কামেল আদমি। কান্দাহার ও উত্তর আফগানিস্তানে থাকা সমস্ত মার্কিন সেনানিবাসে নির্মাণসামগ্রী, খাবার-দাবার, জ্বালানি ও অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহ করত। এই কাজ করে গুল আগা প্রতি মাসে ১৫ লক্ষ ডলার অতিরিক্ত উপার্জন করত। কান্দাহার বিমানবন্দরের রানওয়ে সংস্কারের ঠিকাদারিও গুল আগা পেয়েছিল। রানওয়ের গর্ত-খানাখন্দ ভরাট করার জন্য নিয়ে আসা গুঁড়ো পাথর ও অন্যান্য সামগ্রীভর্তি ট্রাক প্রতি খরচ হতো ৮ ডলার। শেরজাই প্রতি ট্রাক আমেরিকার কাছে ১০০ ডলারে বিক্রি করেছে। প্রতিদিন প্রায় ৩০০ ট্রাক রানওয়ে নির্মাণসামগ্রী নিয়ে আসত। এ ধরনের সরবরাহ কয়েক বছর ধরে চলেছে। এটা থেকে আন্দাজ করা যায়, শেরজাই কত লক্ষ ডলার কামিয়েছে। এ ছাড়া কান্দাহারসহ অন্যান্য মার্কিন সেনাক্যাম্পে হাজার-হাজার শ্রমিক, কর্মী, মজুর ও নিরাপত্তারক্ষী সরবরাহ করেছে। এর বিনিময়ে প্রত্যেক মজদুরের জন্য আমেকিরার কাছ থেকে কমিশন নিত। অন্যদিকে প্রত্যেক

মজদুরের মাসোহারা থেকেও নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা কেটে রাখত। গাছেরটাও খেত, তলারটাও কুড়াত।

আমেরিকা শুধু টাকা-পয়সা দিয়েই ওয়ারলর্ডদের পেলেপুষে রাখছিল তা নয়, তাদেরকে অন্যান্য সহযোগিতাও করত। যখনই কোনো আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ওয়ারলর্ডদের বিরুদ্ধে আঙুল তুলত, তখনই আমেরিকা তাদের মুখ বন্ধ করে দিত। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বারবার বলে আসছিল, আফগানিস্তান স্থিতিশীল না হওয়ার পেছনে এই ওয়ারলর্ডরাও কম দায়ী নয়। ওয়ারলর্ডদের পক্ষ থেকে আমেরিকা জবাব দিত, আমরা ওয়ারলর্ডদের সাহায্য করছি, এজন্য তারা শক্তিশালী—ব্যাপারটা এমন নয়। তারা শক্তিশালী হওয়ার কারণ, স্থানীয় জনগণের মধ্যেই তাদের জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা বেশি। আফগানের মাটিতে তাদের শেকড় অনেক গভীরে প্রোথিত। অথবা প্রকৃত সত্য হলো, যুদ্ধবাজ নেতারা আমেরিকার আশীর্বাদেই আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছিল।

প্রেসিডেন্ট বুশ আফগানিস্তানের ভাগ্য সিআইএ আর প্রতিরক্ষামন্ত্রী রামসফিল্ডের হাতে ছেড়ে দিয়েছিল। আফগানিস্তানকে পুনর্গঠনের ব্যাপারে রামসফিল্ডদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। তারা প্রেসিডেন্টকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে তুষ্ট করে রেখেছিল। আফগানিস্তানকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে শুধু ওয়ারলর্ডদের কাজে লাগিয়ে আল কায়েদা-তালেবানকে সম্পূর্ণ নির্মূল করতে পারলেই আমেরিকার জন্য যথেষ্ট হবে। আফগান ওয়ারলর্ডদেরকে সাহায্য করার কারণে পরোক্ষভাবে তালেবানই উপকৃত হচ্ছিল। সেটা এভাবে, সাধারণ লোকজন দিনদিন ওয়ারলর্ডদের প্রতি ভীষণ রুষ্ট হচ্ছিল, আর তাদের পরিবর্তে তালেবানের প্রতি ঝুঁকছিল।

২০০৬ সালে তালেবান পুরোদমে হামলা শুরু করে দিয়েছিল। ঠিক তখনই তালেবান বড় একটা ধাক্কা খেয়েছিল। ধাক্কাটা এসেছিল হক্কানী নেটওয়ার্ক ও আরেকটি অত্যন্ত শক্তিমান শুরার পক্ষ থেকে। এই শক্তিমান শুরার পরিচয় কী? মার্কিনবিরোধী যুদ্ধের একপর্যায়ে কোয়েটা শুরা প্রায় বিলীন হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। বিপরীতে আরেকটি বিরোধী গ্রুপ অর্থে ও অস্ত্রে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। মোল্লা আবদুল গনি বেরাদরকে কেন গ্রেফতার করা হয়েছিল? তিনি কীভাবে গ্রেফতার হয়েছিলেন? তার শূন্যস্থান কারা পূরণ করেছিল? মোল্লা আখতার মনসুর কীভাবে তালেবানের কমান্ডার হয়েছিলেন?

০৪.

তালেবান ২০০৬ সালে আমেরিকার বিরুদ্ধে পুরোদমে যুদ্ধ শুরু করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিল। তালেবান কান্দাহার থেকে মেহনত শুরু করেছিল। কান্দাহার ছিল তালেবানের আধ্যাত্মিক রাজধানী। তালেবানের প্রতিষ্ঠাতা মোল্লা ওমর কান্দাহার থেকেই মেহনত শুরু করেছিলেন। কান্দাহার দক্ষিণ আফগানিস্তানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ। কান্দাহারের ঐতিহাসিক গুরুত্বও অপরিসীম। ১৭৪৭ সালে এই শহর থেকেই পশতুনরা স্বাধীন আফগানিস্তানের সূচনা করেছিল। এই শহরে আফগানের অন্যতম সেরা সমরনায়ক ও শাসক আহমদ শাহ দুররানী (১৭২২-১৭৭৩)-এর মাজারও অবস্থিত। তাকে আধুনিক আফগানিস্তানের জনক বলা যেতে পারে। এই মাজারে নবীজি সা.-এর একটা কামিস মুবারক সংরক্ষিত আছে। কথিত আছে, এই চৌগা জামাটি নবীজি মেরাজের সফরে পরেছিলেন। মেরাজের রাতে নবীজি সা. বোরাকে চড়ে সাত আসমান ঘুরে এসেছিলেন। এই চৌগা মুবারককে কখনোই খানকা শরিফ থেকে বাইরে বের করা হয় না। আফগানিস্তানের ওপর ভয়ংকর কোনো বিপদ নেমে এলেই চৌগাটি বের করা হয়। মোল্লা ওমরের বিখ্যাত ছবি আছে। এটা নভেম্বর ১৯৯৬ সালে তোলা ছবি। তিনি উঁচু একটি জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন। চারপাশ থেকে লোকজন তাকে ঘিরে আছে। ঝাপসা সেই ছবিতে দেখা গেছে, মোল্লা ওমর হাতে জামাসদৃশ কিছু একটা ধরে রেখেছেন। এই চৌগা হাতে নিয়ে মোল্লা ওমর লোকজনের বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন। লোকজন তাকে আমিরুল মুমিনিন হিসেবে মেনে নিয়েছিল। এই চৌগাটি বোখারার আমির মুরাদ বেগ ১৭৬৮ সালে উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন আহমদ শাহ দুররানীকে। বোখারা আজকের উজবেকিস্তানে অবস্থিত। এই অমূল্য চৌগাটি উপহার দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল, দুররানি সালতানাতের সাথে বোখারার সুসম্পর্ক গড়ে তোলা ও সে সম্পর্ক অটুট রাখা। কান্দাহার আরো নানা কারণে তালেবানের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান ছিল।

কান্দাহার থেকে তালেবানের মেহনত শুরু হয়েছিল; কান্দাহারে মোল্লা ওমরের বাড়ি এবং এখানেই মহামূল্যবান চৌগা শরিফ আছে। এসব কারণে কান্দাহার থেকেই মার্কিনবিরোধী মেহনত শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। ২০০৬ সালে কান্দাহার থেকে তালেবান সরাসরি হামলা চালাতে শুরু করেছিল। এর আগে তালেবান চোরাগোপ্তা গেরিলা হামলা চালিয়ে আবার

আত্মগোপনে চলে যেত। কোথাও রাস্তায় মাইন পুঁতে রাখত। এখন মুখোমুখি লড়াইয়ের জন্য তালেবান সার্বিকভাবে প্রস্তুত। শীতকাল চলছে। তালেবান বসন্তকাল আসার অপেক্ষায় আছে। বর্ষা ও শীতকালে আফগানিস্তানে যাতায়াত ও সরবরাহব্যবস্থা প্রায় অচল হয়ে পড়ে। গেরিলাযোদ্ধারা অধীর আগ্রহে বসন্তকালের প্রতীক্ষায় থাকে। তালেবান কান্দাহারের চারিদিকে পাহাড়ে-গুহায় বসে হামলার জন্য জোরদার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, এই সংবাদ নিশ্চয়ই মার্কিন সেনাদের কাছেও গিয়েছে। ক্ষমতা হারানোর পাঁচ বছর পর তালেবান হামলা করার অবস্থানে চলে এসেছে। মার্কিন কর্তৃপক্ষ শুধু হামলার খবরই রাখত না, তালেবান যোদ্ধার সংখ্যা ও শক্তি সম্পর্কেও তাদের কাছে গোয়েন্দা তথ্য ছিল। ২০০৫ ও ২০০৬ সালের দিকে মার্কিন-ন্যাটোর গোয়েন্দারা রিপোর্ট দিয়েছিল, দক্ষিণ আফগানিস্তানে সব মিলিয়ে তালেবানের সেনা সংখ্যা দুই হাজারের বেশি নয়। সেই রিপোর্টে এ কথাও লেখা ছিল, কোয়েটা শুরার সামরিক শাখার প্রধান মোল্লা দাদুল্লাহর অধীনে তিনশ'র বেশি যোদ্ধা ছিল না। এসব তথ্যের ভিত্তিতে মার্কিন কর্তৃপক্ষ তালেবানের সম্ভাব্য হামলা নিয়ে অতটা চিন্তিত ছিল না। বিদেশি হানাদাররা নিশ্চিন্ত হয়ে নিজেদের জুলুম-নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছিল। বাস্তবে মার্কিনিদের মাথার ওপর বিপদের খড়গ ঝুলছিল। শুধু তাই নয়, লজ্জা ও হয়রানিও অপেক্ষা করছিল। এর ছোট্ট একটি কারণ ছিল। কারণ হলো, তাদের গোয়েন্দা তথ্যে ভুল ছিল। অন্যদিকে তালেবানও জানত, মার্কিনিদের কাছে তালেবানের সঠিক সদস্যসংখ্যা সম্পর্কে দূরতম ধারণাও ছিল না।

তালেবানের হাতে ছিল পৃথিবীর প্রাচীন ও অব্যর্থতম অস্ত্র। এই অস্ত্র প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে আজ পর্যন্ত অপরিবর্তনীয় রয়ে গেছে। এই যুদ্ধকৌশলের নাম—সারপ্রাইজ। তালেবান নিজেদের শত্রুকে বড়সড় সারপ্রাইজ দিতে যাচ্ছিল। সারপ্রাইজ দেওয়ার আগে আমেরিকার শক্তি যাচাই করার জন্য তালেবান ছোট ছোট হামলা করতে শুরু করল। এসব হামলার মাধ্যমে তালেবান বুঝতে চাচ্ছিল, শত্রু কেমন প্রতিক্রিয়া দেখায়, কোন অস্ত্রের মাধ্যমে পাল্টা আক্রমণ করে, প্রতিরোধ করে, তাদের সেনা সংখ্যা কত, ড্রোন ও যুদ্ধবিমান কতক্ষণ পর তাদের সাহায্যে অকুস্থলে এসে পৌঁছায়, কোথা থেকে ড্রোন-বিমান আসে। সবচেয়ে বেশি জরুরি ছিল, তালেবান কীভাবে আমেরিকার মোকাবেলা করতে পারে—এটা ভালো করে বোঝা। এসব ছোট ছোট হামলা ২০০৫-২০০৬ সালের শীতকাল থেকে শুরু করে

দেওয়া হয়েছিল। তালেবান প্রথম পরীক্ষামূলক হামলা করেছিল কান্দাহার ও হেলমান্দের সীমান্তবর্তী জেলা সঙ্গিনের ওপর। এই এলাকা হেলমান্দের অধীনে ছিল। সঙ্গিনে ছিল সদ্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আফগান সেনাদের সদরদপ্তর। এরা সরাসরি মার্কিন সেনাদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তাদের প্রশিক্ষণ ছিল আন্তর্জাতিক মানের। তাদের মাসোহারাও আমেরিকা বহন করত। সঙ্গীন সেনাঘাঁটিতে থাকা সেনারা জাতিতে আফগান হলেও প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রশস্ত্রে প্রায় মার্কিন সেনাদের মতোই ছিল।

২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারির প্রচণ্ড ঠান্ডায় সঙ্গিন সেনাঘাঁটিতে তালেবান বাহিনী বিদ্যুৎগতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আফগান সেনাদের ওপর যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। তুমুল গোলাবর্ষণ আর মুহুর্মুহু রকেট হামলার মুখে আফগান সেনারা রীতিমতো দিশেহারা হয়ে পড়ল। আফগান সেনাদের মনে হচ্ছিল, আক্রমণকারী তালেবানের সংখ্যা কয়েক ডজন নয়, কয়েক হাজার। তালেবানের এমন আগ্রাসী হামলার কথা মার্কিন মদদপুষ্ট আফগান সেনাদের কল্পনাতেও ছিল না। তালেবানের অগ্রগামী সেনাদের পথ পরিষ্কার করার জন্য একদল ইস্তেশহাদি হামলাকারীও একের পর এক হামলা চালিয়ে নিজেদের শহীদ করে দিচ্ছিল। ইস্তেশহাদি হামলাকারীরা বেছে বেছে দুশমনের দুর্বল জায়গাগুলোতে গিয়ে আঘাত হানছিল। আফগান সেনাদের প্রতিরোধ সম্পূর্ণ ধসে পড়েছিল। এই হামলায় সঙ্গিন সেনাক্যাম্প অপূরণীয় ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। এমন দিশেহারা অবস্থায় কোনো কূলকিনারা করতে না পেরে আফগান সেনারা ন্যাটো সেনাক্যাম্পের সাথে যোগাযোগ করেছিল। আফগান সেনারা চারিদিক থেকে তালেবানের ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। সাক্ষাৎ মৃত্যুই ছিল আফগান সেনাদের অনিবার্য পরিণতি। সংবাদ পাওয়া মাত্রই ন্যাটো দ্রুত অকুস্থলে এসে পৌঁছল। এমআই-১৭, ব্ল্যাকহক হেলিকপ্টার আর বোমারু বিমান দিয়ে একযোগে হামলা শুরু করল। আকাশের দিক থেকে হামলা ঠেকানোর মতো শক্তি তালেবানের কাছে ছিল না। শুধু তালেবানই বলি কেন, পৃথিবীর সমস্ত গেরিলাগোষ্ঠীই রাষ্ট্রযন্ত্রের আকাশশক্তির কাছে পর্যুদস্ত হয়। সরকারপক্ষ আকাশশক্তি ব্যবহার করে যাবতীয় বিদ্রোহ দমনের প্রয়াস চালায়।

এতক্ষণ ধরে নিরঙ্কুশ বিজয়ীর ভূমিকায় থাকা তালেবান এবার পরাজয়ের তিক্ত স্বাদ পেতে শুরু করল। অবশ্য সর্বগ্রাসী হামলার প্রথম ধাক্কাতেই আফগান সেনাদের ক্ষতি যা করার, করে ফেলা হয়েছিল। বিমান হামলা শুরু হওয়ার

পর তালেবানি হামলার তীব্রতা কমে আসে। এই ফাঁকে আফগান সেনারা ধাতস্থ হওয়ার সুযোগ পেল। তারা গুছিয়ে উঠে পাল্টা হামলা শুরু করল। তালেবানও অফেনসিভ (আক্রমণাত্মক) পজিশন থেকে ডিফেনসিভ পজিশন (আত্মরক্ষামূলক অবস্থান)-এ চলে গেল। তবে ময়দান ছেড়ে চলে গেল না। হামলার কৌশল বদল করল। এই হামলার মাধ্যমে তালেবান দুশমনের নাড়ি-শিরা পরীক্ষা করতে চাচ্ছিল। সেটা পুরোপুরি অর্জিত হয়ে গেছে। ন্যাটোর তীব্র হামলা সত্ত্বেও তালেবান তিন দিন পর্যন্ত মাটি কামড়ে পড়ে থাকল। ময়দান ছেড়ে একচুলও নড়ল না। তালেবান 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' নীতি অবলম্বন করে অসম লড়াই চালিয়ে গেল। পুরো হামলায় ৪০ জনের বেশি তালেবান শহীদ হয়েছিলেন। বাকিরা চতুর্থ রাতে চুপিচুপি পশ্চাদপসরণ করেছিল। আফগান সেনাদের হতাহত আর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও ছিল বিপুল।

প্রথম হামলায় তালেবান পরাজিত হয়েছিল—এ কথা সত্য। তারা সঙ্গিন জেলাকে দখল করতে পারেনি। পাশাপাশি ৪২ দেশ মিলে গঠিত ন্যাটো বাহিনীর কাছে একটা কথা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তালেবানের ব্যাপারে তাদের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল ছিল। আমেরিকার টনক নড়ল। নতুন করে গোয়েন্দা কার্যক্রম চালিয়ে মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ করল। সে তথ্যের ভিত্তিতে দক্ষিণ আফগানে তালেবানকে হারানোর জন্য নতুন করে কৌশল সাজাল। আমেরিকা-ন্যাটোজোটের সর্বাত্মক হামলা শুরু হলো। এই হামলার নাম দেওয়া হয়েছিল 'অপারেশন মাউন্টেন থ্রাস্ট'। ২০০৬ সালের ১৫ মে এই হামলা শুরু হয়েছিল। এই হামলায় আমেরিকা ৬০ ফুট চওড়া, ৯৮ ফুট লম্বা, দুই ব্লেডবিশিষ্ট দৈত্যাকার চিনুক হেলিকপ্টার দেদারসে ব্যবহার করেছিল। পর্বতপ্রমাণ হেলিকপ্টারগুলোর তিমিসদৃশ পেটভর্তি মার্কিন-ন্যাটো সেনাদেরকে অভিযান স্থলে দ্রুত পৌঁছে দেওয়া হতো। হানাদার জোটবাহিনী তালেবানের গোপন আস্তানা ও প্রশিক্ষণ শিবিরে অতর্কিতে হামলা চালাত। বিরাটাকায় বি-৫০ বোমারু বিমানের সাহায্যে সম্ভাব্য তালেবান ঘাঁটিতে হামলা চালানো হতো। বেশিরভাগ তালেবানই আগে থেকে এ ধরনের হামলার জন্য প্রস্তুত থাকত। সর্বগ্রাসী মার্কিন হামলা চলাকালে তালেবান শুধু আত্মরক্ষাতেই ব্যতিব্যস্ত থাকেনি, তারা কান্দাহারের গুরুত্বপূর্ণ জেলা ও কৌশলগত স্থানে পাল্টা হামলাও চালিয়ে গিয়েছিল।

এসব হামলায় কোয়েটা শুরার পক্ষ থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মোল্লা আখতার ওমর উসমান। মোল্লা ওমরের পর তালেবানের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন। মোল্লা দাদুল্লাহ তালেবানের সামরিক দায়িত্বে ছিলেন। মোল্লা দাদুল্লাহর ভাষ্যমতে, তার কাছে মার্কিন-ন্যাটো হামলা মোকাবেলা করার জন্য ১২ হাজার যোদ্ধা ছিল। তখন মার্কিন জোটের সেনা সংখ্যাও ১২ হাজারের মতোই ছিল। দুইপক্ষের জানপ্রাণ লড়াই সে বছর জুলাই পর্যন্ত একটানা চলেছিল। মার্কিন হামলায় তালেবান কান্দাহার ছেড়ে সরে যাওয়ার পর এটাই ছিল তালেবানের সর্বপ্রথম সঙ্ঘবদ্ধ হামলা ও প্রতিরোধ যুদ্ধ। যুদ্ধ শেষে দেখা গেল, ১ হাজারের মতো তালেবান শহীদ হয়েছেন। ১৯১ মার্কিন জোটসেনা নিহত হয়েছে। এ সময় তালেবান সাময়িকের জন্য কিছু জেলা দখল করে নিয়েছিল, মার্কিন জোট তালেবানের কিছু আস্তানা গুঁড়িয়ে দিয়েছিল।

৯/১১-এর পর তালেবান ও মার্কিনজোটের এই প্রথম মুখোমুখি লড়াইয়ে কোনো পক্ষই জেতেনি। বলা যায় উভয়পক্ষই হেরেছে। মার্কিনজোট হেরেছে, কারণ অপারেশন মাউন্টেন থ্রাস্টের প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল, দক্ষিণ আফগানিস্তান থেকে তালেবান নির্মূল করা ও তালেবানের সমস্ত ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেওয়া। মার্কিনজোট এই উদ্দেশ্য হাসিলে লজ্জাজনকভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। মার্কিনজোটের ধারণার চেয়েও তালেবান অনেক বেশি সংগঠিত ছিল, অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল, পরিমাণেও অনেক বেশি ছিল। অন্যদিকে তালেবানও তাদের প্রথম যুদ্ধে হেরেছে, কারণ তারা কান্দাহার কবজা করতে পারেনি। হেলমান্দের দুটি দখলকৃত অঞ্চল সঙ্গিন ও কেল্লা মুসাও তালেবানের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। এই দুটি অঞ্চল দখল করতে তালেবান অবিশ্বাস্য বীরত্ব দেখিয়েছিল। হানাদার জোটের বিমান হামলার মুখে তালেবান টিকতে পারেনি; টেকা সম্ভবও নয়। অসংখ্য তালেবান যোদ্ধা গ্রেফতার হয়েছিল। তালেবান বিপুল ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছিল।

এই যুদ্ধে কোনোপক্ষ না জেতার মানে এই নয়, কোনো পরিবর্তনও হয়নি। তালেবান-মার্কিনজোটের প্রথম নিয়মতান্ত্রিক মুখোমুখি লড়াই আফগানে কেমন গ্রেট গেইমের স্কেচ আগাগোড়া বদলে দিয়েছিল। কীভাবে বদলেছিল?

১. তালেবান বুঝতে পেরেছিল, তাদের সামনে একমাত্র বাধা হলো মার্কিনজোটের এয়ার পাওয়ার। মার্কিনজোটের বিমান সাহায্য ছাড়া আফগান

সেনারা তাদের সামনে এক ঘণ্টাও টিকতে পারবে না। এই হামলায় তালেবানের সবচেয়ে বড় লাভ হয়েছে, তারা একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছিল। ২০০৬ সালের পর থেকে সর্বাত্মক হামলা বন্ধ করে দিয়েছিল। তারা ইস্তেশহাদি হামলা ও সীমিত পরিসরে গুরুত্বপূর্ণ টার্গেটের ওপর হামলা করা শুরু করে দিয়েছিল। বড়সড় হামলা করতে গেলে বিমান আক্রমণে নিজেদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

২. হানাদার মার্কিন-ন্যাটো জোটের দৃষ্টিভঙ্গিতেও পরিবর্তন এসেছিল। পুরো আফগানিস্তানের প্রতিটি ইঞ্চি নিজেদের দখলে রাখবে—এই চিন্তা পরিহার করে নিজেদেরকে নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলে সীমাবদ্ধ করে নিয়েছিল। হানাদার সেনারা নিজেদের ঘাঁটি ও প্রয়োজনীয় স্থান ছেড়ে বাইরে বেরোত না বললেই চলে। মার্কিনজোটের ঘাঁটির বাইরে তালেবান প্রকাশ্য দিবালোকে ঘুরে বেড়াত। হানাদারদের বেরোনোর সাহস হত না। হানাদারদের যতসব বীরত্ব ছিল বিমান হামলায়। হানাদার জোট শুধু আত্মরক্ষামূলক ক্ষেত্রে ঘাঁটি ছেড়ে বেরোত অথবা বিশেষ কোনো তথ্যের ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ অভিযানকালে জায়গা ছেড়ে নড়ত। তার মানে এই নয়, হানাদার বাহিনী তালেবানের বিরুদ্ধে লড়ত না। তারা আফগান সেনাদের সামনে ঠেলে দিত। আফগান ওয়ারলর্ডদের কাজে লাগাত।

৩. আগে থেকেই আমেরিকা ও ন্যাটো (এসাফ) জোটের মধ্যে নানা বিষয়ে মতভেদ ছিল। তালেবান হামলার পর হানাদারদের মধ্যে মতভেদ তীব্র আকার ধারণ করেছিল। মার্কিন-ন্যাটো জোটে শুধু নামেই ৪২টি দেশ ছিল। সবমিলিয়ে ৫০ হাজারের মতো সেনা ছিল। এত সেনা থাকা সত্ত্বেও শুধু আমেরিকাই গা লাগিয়ে তালেবানের সাথে লড়ার জন্য প্রস্তুত থাকত। এ ছাড়া আরো ৪টি দেশ (ব্রিটেন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও হল্যান্ড)-এর সেনারা একান্ত বাধ্য হলে অনেক গড়িমসি করে লড়াইয়ে শরিক হতো। এই ৫ দেশ ছাড়া বাকি সমস্ত দেশ ঘোষণা দিয়েই রেখেছিল, আমরা সহযোগী হিসেবে থাকব। কোনো ধরনের সশস্ত্র লড়াইয়ে আমরা অংশ নিবো না। এসব দেশ মোটেও চাচ্ছিল না, তাদের সেনারা তালেবানের হাতে বেঘোরে মারা পড়ুক। এসব দেশের শাসকদের আশঙ্কা ছিল, তাদের সেনারা যদি দেদারসে মরতে থাকে, সেনাদের লাশ এয়ারপোর্ট হয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে যেতে থাকে, সংবাদ মাধ্যমে সেসব ফলাও হয়ে প্রচারিত হয়, জনগণের মনে প্রশ্ন উঠবে, আমাদের সেনারা ভিনদেশি মাটিতে কেন মারা পড়ছে? তালেবানের সাথে আমাদের কী

লেনদেন? তালেবান আমাদের দেশের জন্য কোন ধরনের ঝুঁকি? এসব প্রশ্ন উত্থাপিত হলে শাসকদের তখত উল্টে যেতে পারে ও দলীয় সমর্থনও তলানিতে ঠেকতে পারে। জার্মানিসহ কয়েকটি দেশ শুরুতেই শর্ত দিয়েছিল, তাদের সেনাদেরকে লড়াই থেকে দূরে রাখতে হবে। আমেরিকাসহ বাকি চারদেশ বারবার অভিযোগ করছিল, ন্যাটো জোটের বাকি দেশগুলো কেন আরো সেনা পাঠাচ্ছে না? ন্যাটো জোটে সেনাসংকট দেখা দিয়েছে। অতীব প্রয়োজনীয় স্থানেও সেনা মোতায়েন করা যাচ্ছিল না। এই সুযোগে তালেবান সংগঠিত হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল। তখন ন্যাটো জোটে সেনাসংখ্যা ৫০ হাজার হলেও একসময় হানাদার জোটে সেনাসংখ্যা সোয়া লাখে উন্নীত হয়েছিল। বেশিরভাগ সেনা আমেরিকার। পরবর্তীতে কমতে কমতে সংকটজনক পর্যায়ে উপনীত হয়।

৪. আরেকটা বিষয়ও এসাফ বাহিনীকে ভীষণ মুশকিলে ফেলছিল। পাক-আফগান বর্ডার দিয়ে বলতে গেলে স্রোতের মতো তালেবানের জন্য আর্থিক, আত্মিক ও সামরিক সাহায্য আসতেই থাকত। মার্কিনজোট দেখছিল, পাকিস্তানের কাবায়েলি এলাকা থেকে তালেবান যখন যত ইচ্ছা নতুন সদস্য সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে পারছে। প্রয়োজনে ফেরতও পাঠাতে পারছে। ২৬৪০ কিলোমিটারব্যাপী দীর্ঘ পাক-আফগান সীমান্ত পাহারা দিয়ে রাখা অসম্ভব বিষয়। এই দীর্ঘ বর্ডারের প্রায় পুরোটাই উন্মুক্ত আর অরক্ষিত ছিল। কাঁটাতারের বেড়া, সাগর বা অন্য কোনো প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতাও ছিল না।

তখন পাক-আফগান সীমান্তে বসবাসরত পশতুনদের অনেকেই নিজ নিজ ঘরে অস্ত্র কারখানা বসিয়ে নিয়েছিল। এসব কারখানায় ইস্তেশহাদি হামলায় ব্যবহৃত জ্যাকেট, আইইডিএস, রিমোট কন্ট্রোল বোমা, গ্রেনেড দেদারসে বানানো হতো। এসব অস্ত্র তালেবানের হাতে যেমন যেত, পাকিস্তানের টিটিপির কাছেও যেত। এসব অস্ত্রে ওদিকে মার্কিনজোট, এদিকে পাক ফৌজ হামলার শিকার হচ্ছিল।

মার্কিনজোটের কাছে এই তথ্যও ছিল, আফগানে লড়াইরত তালেবানের ব্রেন পাওয়ার পাকিস্তানেই থাকে। বেলুচিস্তান ও ফাটার গোপন স্থান থেকেই তালেবানের শীর্ষ নেতারা আফগানের অভিযানগুলো পরিচালনা করে থাকে। এখান থেকেই তালেবান শুরা সবকিছু দেখাশোনা করে।

৫. অপারেশন মাউন্টেন থ্রাস্ট ব্যর্থ হওয়ার রসালো অজুহাতও এসাফ সেনারা পেয়ে গিয়েছিল। তারা আফগানে ময়দানি লড়াই চালাতে চাচ্ছিল না, এসব

কথাকে পাশ কাটিয়ে তাদের ব্যর্থতার সমস্ত দায় পাকিস্তানের ওপর চাপাতে শুরু করল। পাক-আফগান সীমান্তবর্তী কার্যক্রমকে নিজেদের মুখ রক্ষার ঢাল বানিয়ে দিন-রাত হাউকাউ শুরু করে দিলো। সামরিক কমান্ডাররা পাকিস্তানের ওপর অভিযোগের তোপ দাগাতে শুরু করলেও সংশ্লিষ্ট দেশের শাসকরা পাকিস্তানের ওপর অঙ্গুলি তাক করতে অনিচ্ছুক ছিল। রাজনৈতিক নেতারা সামরিক কমান্ডকে পাকিস্তানের ওপর দোষ চাপাতে নিষেধ করল। বিভিন্ন দেশ আফগানে তালেবান-আল কায়েদার সাথে যুদ্ধ করলেও তাদের প্রধান সমস্যা আফগানের মাটি নয়, নিজেদের ভূমিতে ছিল। এসব দেশের প্রধান মাথাব্যথা ছিল, আল কায়েদা বা তাদের সমর্থক কোনো সংগঠন যেন তাদের মাটিতে হামলা না করে, বিমান হাইজ্যাক না করে। আল কায়েদা ও তার সমর্থিত দলগুলো এমনটাই করেছিল। ২০০৫ সালের ৭ জুলাইয়ের ঘটনা সবার জানা আছে। লন্ডনে চারটি ইস্তেশহাদি হামলা হয়েছিল। ৫৬ জন মারা যায় এবং অসংখ্য মানুষ আহত হয়। এসব হামলা থেকে সুরক্ষিত থাকার জন্য বিভিন্ন দেশের গোয়েন্দা বিভাগকে নিয়মিত পাকিস্তানের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখতে হতো। কারণ আইএসআইয়ের গোয়েন্দারা তালেবান-একিউর ভেতরের খবরও রাখত। পাকিস্তান যাতে বেজার না হয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা দেশগুলোর জন্য জরুরি ছিল। একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা আরো পরিষ্কার হয়ে যাবে। ২০০৬ সালে একিউর কিছু সদস্য লন্ডনে বড় ধরনের হামলার পরিকল্পনা করেছিল। লন্ডনে ১২টি যাত্রীবাহী বিমান ইস্তেশহাদি হামলার মাধ্যমে উড়িয়ে দেওয়া হবে। ৯/১১ এর মতোই আরেকটি ঘটনা ঘটানোর পরিকল্পনা ছিল তাদের। এই হামলার উদ্দেশ্য ছিল, তালেবানের বিরুদ্ধে অংশ নেওয়ার কারণে ব্রিটেনকে শাস্তি দেওয়া। হামলা করতে যাওয়ার আগে পাক-আফগান সীমান্তে পাক গোয়েন্দারা এক সন্দেহভাজন যুবক রাশেদ রউফকে গ্রেফতার করে। জিজ্ঞাসাবাদে রাশেদ জানিয়েছিল, তার কিছু সঙ্গী ব্রিটেনে ১২টি বিমানে হামলা করতে যাচ্ছে। পাক গোয়েন্দারা তৎক্ষণাৎ এসব তথ্য এমআইসিক্সকে জানাল। ব্রিটিশ গোয়েন্দারা সাথে সাথে তৎপর হয়ে উঠল। সম্ভাব্য হামলার সাথে সংশ্লিষ্ট যে যেখানে ছিল, সবাইকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হলো। এই ঘটনা থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়, উন্নত দেশ বিশেষ করে আফগানে যুদ্ধরত ন্যাটো জোটভুক্ত দেশগুলো নানা কারণে পাকিস্তানের ওপর নির্ভরশীল ছিল। এসব দেশ যেকোনো মূল্যে পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে চাইত। সম্পর্ক খারাপ হওয়ার মতো কোনো ধরনের পদক্ষেপ

গ্রহণের আগে হাজারবার চিন্তা করত। এসব দেশের কাছে নিজেদের ভূমির নিরাপত্তাই সবার আগে ছিল। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য এসব দেশ যেকোনো কিছু করতে প্রস্তুত থাকে। মার্কিন-ন্যাটো জোটভুক্ত দেশগুলো অসংখ্য বিষয়ে নিয়মিত গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদান করত। সে সময় এসাফ সর্বাধিনায়ক ছিল ডেভিড রিচার্ড। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার জেনারেল ডেভিডকে কড়াভাবে নিষেধ করে দিয়েছিল, কোনো অবস্থাতেই যেন পাক সরকারের সমালোচনা করা না হয়। পাশাপাশি এই নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল, তালেবান-আল কায়েদা সদস্যের পিছু ধাওয়া করতে করতে কোনো অবস্থাতেই যেন পাক সীমান্ত পাড়ি দিয়ে এপাশে চলে না আসে।

জেনারেল ডেভিড নিজ সরকারের নির্দেশনা মেনে চলছিল। একবার পরিস্থিতি প্রায় নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছিল। তালেবানের হামলা এতবেশি তীব্র আকার ধারণ করেছিল, এসাফ কমান্ডার ডেভিডের মনে হচ্ছিল এই বুঝি কান্দাহার তাদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। তখন অর্থাৎ ২০০৬ সালের শেষদিকে জেনারেল ডেভিড পাক প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফকে ধমকি দিয়ে বলেছিল, তালেবান কান্দাহার দখল করে নিতে সক্ষম হলে ইসলামাবাদে আপনার মসনদও উল্টে যেতে পারে। এসব ঠুনকো হুমকিতে কোনো কাজ হয়নি। যে যার লক্ষ্য অনুযায়ী খেলছিল। কান্দাহার রক্ষা করতে না পারা ন্যাটোর ব্যর্থতা। সে দায় পাকিস্তানের ওপর চাপানো নির্বুদ্ধিতা ও কাপুরুষতা।

২০০৬ সালের ঘটনাবহুল বসন্ত ও গ্রীষ্মকাল শেষ হলো। বছর ঘুরে আবার শীতকাল এসে গেল। কান্দাহার-কাবুল বরফের চাদরে ঢেকে যাচ্ছিল। নদীনালা, ঝরনা ধীরে ধীরে জমে বরফ হতে শুরু করেছিল। দুইপক্ষের প্রথম মুখোমুখি লড়াই আপাতত সমাপ্ত হলো। এই যুদ্ধে ৯৮ মার্কিন, ৩৯ ব্রিটিশ সেনা নিহত হয়েছিল। সর্বমোট ১৯১ ন্যাটো সেনা মারা পড়েছিল। হাজারো তালেবান শহীদ হয়েছিলেন। তালেবান এই হামলায় বিজয়ী হতে না পারলেও তাদের লড়াইয়ের ধরন দেখে সারাবিশ্বের যুদ্ধবিশারদরা বুঝে গেল, আজ বা কাল যখনই মার্কিনজোট আফগান থেকে বের হয়ে যাবে, কাবুল দখলে তালেবানকে কেউ বাধা দিয়ে রাখতে পারবে না। তালেবানও বুঝে গিয়েছিল, তাদের হাতে সময়ের অভাব নেই। খোলা ময়দানে মুখোমুখি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়ে নিজেদের মূল্যবান যোদ্ধাদের হারানোর কোনো মানে হয় না। তালেবান এবার থেকে বুঝেশুনে যাচাই-বাছাই করে হামলা করতে শুরু

করল। তালেবান ইস্তেশহাদি ও গেরিলা হামলার ওপর জোর দিল। তালেবান নিজের শক্তিকে যতটা সম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখার প্রতি মনোযোগী হলো। যাতে কখনো দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা শুরু হলে তাদের বারগেইনিং পজিশন মজবুত থাকে। আলোচনার টেবিলে তাদের দেওয়া শর্ত মোতাবেকই চুক্তি সম্পাদিত হয়। তালেবানের কৌশল শতভাগ কার্যকর প্রমাণিত হয়। খুব বেশিদিন যায়নি, আলোচনার প্রস্তাব এসে গেল। তবে আলোচনার নামে আমেরিকা এক ঐতিহাসিক 'ধোঁকা' খেল। কী সেই ধোঁকা?

কোয়েটা শুরা প্রায় খতম হওয়ার উপক্রম হয়েছিল কেন?
কারা তাদেরকে এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি করেছিল?
তারা কীভাবে এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করেছিল?
মোল্লা বেরাদর কীভাবে গ্রেফতার হলেন?
তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন কে?
মোল্লা আখতার মনসুর কীভাবে দ্বিতীয় আমির হয়েছিলেন?

<u>০৫.</u>

২০১০ সালের কথা। কোয়েটা শুরার কাছে এক তালেবান কমান্ডার এলেন নিজ দলের প্রয়োজনীয় অর্থ ও অস্ত্র নেওয়ার জন্য। কোয়েটা শুরার সামরিক সচিব বললেন, বাইতুল মালে আপাতত কোনো অর্থঅস্ত্র নেই। কোয়েটা শুরা অপেক্ষায় আছে, এক জায়গা থেকে কিছু টাকা-পয়সা ও অস্ত্রশস্ত্র আসবে। তারপর সবাইকে চাহিদামতো বরাদ্দ দিতে পারবে। ভাবনার বিষয় হলো, ২০০৬ সালে এমন সফল অভিযান পরিচালনার পর মাত্র চার বছরের ব্যবধানে কী এমন ঘটে গেল, যার জেরে তালেবানের অবস্থা এমন সঙ্গিন হয়ে গেল? ২০১৩ সাল নাগাদ কোয়েটা শুরা বিলুপ্তির কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল।

সময়ের সাথে সাথে সবকিছুতে পরিবর্তন আসে। আফগানের পরিস্থিতিতেও পরিবর্তন আসছিল। খালি চোখে সেটা অনেকের কাছে ধরা পড়ছিল না। কোয়েটা শুরার ওপর যে সমস্যা নেমে এসেছিল, তার সূচনা হয়েছিল মোল্লা দাদুল্লাহকে দিয়ে। মোল্লা দাদুল্লাহ কোয়েটা শুরার সামরিক শাখার প্রধান ছিলেন। তাকে সবাই ভয় পেত। সবাই একবাক্যে তার নির্দেশনা মেনে চলত। মোল্লা দাদুল্লাহর নেতৃত্বশক্তি ছিল অনস্বীকার্য। ২০০৭ সালের ১৩ মে, হেলমান্দে অনুষ্ঠিত এক গোপন সভায় মোল্লা দাদুল্লাহকে দাওয়াত দেওয়া হলো। মোল্লা দাদুল্লাহ যথাসময়ে সভাস্থলে পৌঁছলেন। এই গোপন সভার

সংবাদ মার্কিন-ন্যাটোজোট পেয়ে গিয়েছিল। তারা মোল্লা দাদুল্লাহর কাফেলার ওপর গুলিবর্ষণ করে। মোল্লা দাদুল্লাহর শরীরে তিনটি গুলি লেগেছিল। একটা গুলি মাথার পেছনে লাগে। সেই গুলিতেই তার মৃত্যু হয়েছিল। মোল্লা দাদুল্লাহকে সবাই ভয় পেলেও তার নেতৃত্ব নিয়ে কারো মনে কোনো প্রশ্ন ছিল না। মোল্লা দাদুল্লাহ বাস্তবিকই সামরিক প্রতিভা ছিলেন। তার মৃত্যুতে তালেবানের সামরিক বিভাগ ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তার মৃত্যু আফগান সরকারের জন্য ভীষণ খুশির ছিল। প্রশাসন বিশ্বাসই করতে পারছিল না, মোল্লা দাদুল্লাহ শহীদ হয়েছেন। মোল্লা দাদুল্লাহর মৃতদেহ কান্দাহারের গভর্নর আসাদুল্লাহ তার সরকারি প্রাসাদে রেখে দিয়েছিল। লোকজন দলে দলে এসে শহীদের মৃতদেহ দেখে গিয়েছিল। মোল্লা দাদুল্লাহ ক্যারিশমেটিক কমান্ডার ছিলেন। অধীনস্থদের মাঝে ঐক্য ধরে রাখা ও তাদেরকে দিয়ে জটিল জটিল অভিযান সফলভাবে পরিচালনার বিরল যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। তার মৃত্যুতে তালেবানের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হলো।

মোল্লা দাদুল্লাহর ভাই মোল্লা মনসুর দাদুল্লাহকে সামরিক প্রধান বানানো হলো। মোল্লা মনসুর ভাইয়ের মতো নেতা ছিলেন না। মোল্লা দাদুল্লাহর স্থান পূরণ করার মতো আর কেউ তখন ছিল না। কিছুদিন পর মোল্লা দাদুল্লাহর শূন্যস্থান পূরণের একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। সাবেক তালেবান কমান্ডার মোল্লা আবদুল কাইয়ুম জাকের গুয়ানতানামোতে বন্দি ছিলেন। তিনি ২০১০ সালে মুক্তি পেয়ে তালেবানের মেহনতে শামিল হলেন। তাকে পেয়ে সবার মনে আশা জেগে উঠল। মোল্লা জাকের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতায় কোয়েটা শুরা প্রধান মোল্লা বেরাদরের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিলেন না। ক্ষেত্রবিশেষে এগিয়েও ছিলেন। গুয়ানতানামো বে থেকে মুক্তি পেয়ে আসার কারণে তার কদর আরো বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। মোল্লা জাকেরকে তালেবানের সামরিক শাখার প্রধান নির্বাচিত করা হলো। দায়িত্ব পেয়ে মোল্লা জাকের পুরো আফগানে ছড়িয়ে থাকা দলগুলোতে ব্যাপক রদবদল করতে শুরু করে দিলো। তার উদ্দেশ্য ছিল, সামরিক কাঠামোকে ঢেলে সাজিয়ে দখলদারবিরোধী লড়াইকে নতুন গতি দান করা। এই পরিবর্তন করতে গিয়ে তিনি মোল্লা বেরাদরের পক্ষ থেকে প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হলেন। মোল্লা জাকের বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নরদের চেয়ে সেখানকার যোদ্ধা কমান্ডারদেরকে বেশি প্রাধান্য দিতে চাচ্ছিলেন। অন্যদিকে মোল্লা বেরাদর গভর্নরদেরকে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে দেখতে চাইতেন। মোল্লা বেরাদর চাইতেন, আফগান

সরকারের সাথে আলোচনা করে পরিস্থিতি অনুকূলে নিয়ে আসতে। মোল্লা জাকের এ ধরনের আলোচনার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। গুয়ানতানামো থেকে ফেরার পর কোয়েটা শুরায় স্থান পাওয়ার ক্ষেত্রে পাক গোয়েন্দা বিভাগের সহযোগিতা ছিল। ইরান, সৌদি আরবের সাথেও মোল্লা জাকেরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। দুই দেশের দাতাগোষ্ঠীর সাথেও মোল্লা জাকেরের সম্পর্ক ছিল। দুই প্রধান নেতার দ্বন্দ্বের কারণে কোয়েটা শুরা দিনদিন দুর্বল হতে থাকল। পাক গোয়েন্দারা মোল্লা জাকেরের সাথে সম্পর্ক রেখে চলত। পাকিস্তান শুরু থেকেই তালেবান শুরা ও আফগান সরকার উভয়ের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে আসছিল। ইরান, আরব, চীন-রাশিয়াও তাই করত। পাকিস্তান চাইত, তালেবান-আমেরিকা বা তালেবান-আফগান সরকার দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় এমন কোনো সিদ্ধান্ত যেন না হয়, যা পাকিস্তানের স্বার্থবিরোধী। এজন্য পাক প্রশাসন উভয়পক্ষের ওপর প্রভাব বজায় রাখতে চাইত। এই খেলায় পাকিস্তানের ভূমিকা নিঃসন্দেহে অনস্বীকার্য ছিল।

মোল্লা জাকের দেখলেন, মোল্লা বেরাদর নিজের মতো করে আফগান-আমেরিকার সাথে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। ময়দানের যুদ্ধও নিজের মতো করে চালাতে চাচ্ছে। মোল্লা জাকের এই দ্বন্দ্বের সংবাদ পাকিস্তানের কাছে ফাঁস করে দিয়েছিল। কোয়েটা শুরার দাতাগোষ্ঠী বুঝতে পারছিল, এই শুরাকে সক্রিয় রাখতে হলে দুই নেতার মধ্যে যেকোনো একজনকে বেছে নিতে হবে। এক জঙ্গলে দুই শের হতে পারে না। ২০১০ সালে করাচিতে অত্যন্ত গোপনে এক অভিযান চালানো হলো। এই অভিযানে সিআইএ ও আইএসআই উভয়ে অংশ নিয়েছিল। তালেবানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন কমান্ডার আটক হলেন। আটককৃতদের মধ্যে মোল্লা বেরাদর ও মোল্লা জাকের দুজনেই ছিলেন। এতবড় ঘটনার সামান্যতম আঁচও পাকমিডিয়াতে প্রকাশ পেল না। শুধু ডন পত্রিকায় ছোট্ট করে সংবাদটা ছাপা হয়েছিল। মার্কিন মিডিয়াও কোনো কূলকিনারা করতে পারছিল না। এর চেয়েও বিস্ময়কর বিষয় হলো, কিছুদিন পর কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই মোল্লা জাকেরকে ছেড়ে দেওয়া হলো। মোল্লা জাকের ফিরে এসে আবার কোয়েটা শুরার সামরিক প্রধানের পদ অলংকৃত করলেন। মোল্লা বেরাদরকে যথারীতি আটক করে রাখা হলো। আমেরিকা বারবার মোল্লা বেরাদরের সাথে কথা বলতে চেয়েছে। পাক গোয়েন্দারা নানা ছুতোয় মার্কিন খায়েশ উপেক্ষা করে গেছে। মোল্লা বেরাদরকে আমেরিকার হাতে সোপর্দ করার দাবিও পাক সরকার না শোনার

গ্রান করে গেছে। মোল্লা বেরাদর একটানা ৮ বছর বন্দি জীবন কাটিয়েছেন। অবশ্য বেশিরভাগ সময় তিনি গৃহবন্দি হয়েই কাটিয়েছেন। আমেরিকার আফগান বিষয়ক বিশেষ দূত ঝালমেই খলিলযাদের বিশেষ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মোল্লা বেরাদরকে ৮ বছর পর মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। খলিলযাদের সাথে মোল্লা বেরাদরের আগে থেকেই এক ধরনের বোঝাপড়া ছিল। আগেও দুজন দ্বি-পাক্ষিক আলোচনায় বসেছিলেন।

মোল্লা দাদুল্লাহর মৃত্যু, মোল্লা বেরাদরের গ্রেফতার—এই দুটি কারণ ছাড়া কোয়েটা শুরা দুর্বল হওয়ার পেছনে আরো দুটি বিষয় ছিল। যার প্রভাবে কোয়েটা শুরার কোমর ভেঙে দিয়েছিল। বিস্ময়ের বিষয় হলো, কারণগুলো কোয়েটা শুরাকে দুর্বল করলেও একই সাথে পুরো আফগান, পূর্বে, পশ্চিমে ও উত্তরে তালেবানকে পা জমিয়ে বসতে সাহায্যও করেছিল। ২০১০ ও ২০১১ সালের দিকে হঠাৎ করে বিশ্বমিডিয়াতে তালেবানের তুমুল অগ্রগতির সংবাদ ছাপা হতে শুরু করে। বিভিন্ন গ্রাফ, মানচিত্র ও নকশার সাহায্যে দেখানো হচ্ছিল, তালেবান এতদিন আফগানের কতটুকু জায়গা দখল করতে পেরেছিল আর এখন অতি দ্রুত কতবেশি জায়গা দখলে নিতে সক্ষম হয়েছে। এসব নকশার ব্যাপক প্রচার মূলত শুরু হয়েছিল মোল্লা বেরাদর গ্রেফতার হওয়ার পর।

এই তুমুল অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল কোয়েটা শুরার কমান্ড না মেনে যেসব গ্রুপ স্বাধীনভাবে নিজেদের কাজ চালিয়ে যেত, তাদের মাধ্যমে। এ বিষয়টা বুঝতে হলে তালেবানের সবচেয়ে বড় শক্তি জালালুদ্দিন হক্কানীকে জানতে হবে। জালালুদ্দিন হক্কানী ছিলেন আফগান জিহাদের অন্যতম সেরা কমান্ডার। সোভিয়েতবিরোধী লড়াইয়ে জালালুদ্দিন হক্কানী ছিলেন অন্যতম স্তম্ভ। মার্কিন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা তার সাথে ছবি তুলতে পারলে বর্তে যেত। জালালুদ্দিন হক্কানীকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান 'ফ্রিড্রম ফাইটার'-স্বাধীনতাযোদ্ধা আখ্যা দিয়েছিলেন। এমনকি জালালুদ্দিন হক্কানীকে সিআইএ নিজেদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র আখ্যা দিয়েছিল। পাকিস্তানের মিরানশাহে হক্কানিদের প্রধান কেন্দ্র ছিল। এই জায়গার নামেই হক্কানিদের বিখ্যাত মিরানশাহ শুরা পরিচিতি পেয়েছিল। আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ লাগার, নাঙ্গারহার, পাকতিকা ও পাখতিয়াতেও হক্কানি নেটওয়ার্কের অত্যন্ত শক্তিশালী অবস্থান ছিল। মার্কিন হামলায় তালেবান ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর হক্কানি নেটওয়ার্কের হাতেই আমেরিকা সবচেয়ে বেশি নাকানিচোবানি খেয়েছিল। কোয়েটা শুরা

প্রতিষ্ঠার বহু আগে মিরানশাহ শুরা মার্কিনবিরোধী মেহনত শুরু করে দিয়েছিল। পরে রাহবরি শুরা প্রতিষ্ঠার পর মিরানশাহ শুরার কার্যক্রমকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। ২০০৬ সালের সর্বাত্মক হামলায় হক্কানি নেটওয়ার্কই সবচেয়ে কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছিল। ২০০৬ সালের পর থেকে রাহবরি শুরা ও হক্কানি নেটওয়ার্কের মধ্যে বিরোধ দিনদিন বেড়েই চলছিল। আগেও এই বিরোধ ছিল, তবে ২০০৬ সালে অভিযানের পর বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করেছিল। বিষয়টি ছিল এই, জালালুদ্দিন হক্কানীর ছেলে সিরাজুদ্দিন হক্কানী রাহবরি শুরায় নিজেদের অবস্থান নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না।

১. সিরাজুদ্দিন হক্কানীর কথা ছিল, তালেবান যেভাবে আমেরিকার ওপর হামলা চালিয়ে যাচ্ছে, সেটা খুবই দুর্বল আর অকার্যকর। এভাবে আমেরিকার কিছু করা যাবে না।

২. সিরাজুদ্দিন এটাও মনে করতেন, পুরো আফগানিস্তান জুড়ে মেহনতরত কমান্ডারদের সাথে রাহবরি শুরার সরাসরি যোগাযোগ থাকা উচিত। কমান্ডারগণ তাদের মেহনতের কারগুজারি রাহবরি শুরার কাছে পেশ করবেন। ভবিষ্যৎ অভিযানের পরিকল্পনাও কেন্দ্রীয় শুরাকে জানাবেন। কেন্দ্রীয় শুরা অভিজ্ঞ কমান্ডারদের সাথে পরামর্শ করে সেসব পরিকল্পনাকে আরো নিখুঁত ও আরো কার্যকর করে তুলবে।

৩. সিরাজুদ্দিন হক্কানীর পক্ষ থেকে এই অভিযোগও ছিল, রাহবরি শুরা নামকাওয়াস্তে সামরিক বিভাগ খুলে নিশ্চিন্তে বসে আছে। বিভিন্ন ময়দানে মেহনতরত কমান্ডারদের সাথে রাহবরি শুরার কোনো সম্পর্কই নেই। স্থানীয় কমান্ডাররা যে যার মতো অভিযান পরিচালনা করছে। অনেক কমান্ডার যেহেতু এতটা অভিজ্ঞ ছিলেন না, তাই তাদের হামলার পরিকল্পনাগুলো অতটা নিখুঁত হতো না। দুয়েকটা অভিযান সফল হলেও ব্যর্থতার পরিমাণও কম ছিল না। এই পরিকল্পনাগুলো যদি অভিজ্ঞ কারো সাথে পরামর্শ করে সম্পন্ন করা হতো, তাহলে সাফল্যের হার অনেক বেড়ে যেত। পাশাপাশি ব্যর্থ অভিযানের মাত্রা কমে আসার সাথে সাথে তালেবান সদস্যদের মূল্যবান জীবন রক্ষা পেত এবং ব্যর্থ অভিযানে বিপুল অর্থব্যয়ও কমে আসত।

৪. সিরাজুদ্দিন হক্কানী মনে করতেন, তালেবানকে ইস্তেশহাদি হামলা ও গেরিলাযুদ্ধের নতুন কৌশলগুলোও কাজে লাগানো উচিত।

সিরাজুদ্দিন হক্কানী বারবার এসব প্রস্তাব কোয়েটা শুরার কাছে পেশ করতেন আর প্রতিবারই শুরা তার প্রস্তাবগুলো রদ করে দিত বা পাশ কাটিয়ে যেত। পাশাপাশি সিরাজুদ্দিন হক্কানী এই অভিযোগও করে আসছিলেন, কোয়েটা শুরাতে যোগ দেওয়ার সময় তারা যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ পেতেন, এখন আর আগের মতো পাচ্ছেন না।

এই অভিযোগুলো ২০০৬ সালের আগেও ছিল। তবে তখন এসব অতটা সামনে আসেনি। তখন হক্কানি নেটওয়ার্কের সর্বেসর্বা ছিলেন পিতা জালালুদ্দিন হক্কানী। তার কথাই চূড়ান্ত, অকাট্য ও অনিবার্য ছিল। ২০০৭ সালের দিকে জালালুদ্দিন হক্কানীর শরীর ক্রমশ খারাপ হতে লাগল। বয়সও হয়েছিল। তিনি মিরানশাহ শুরার সমস্ত দায়িত্ব ছেলে সিরাজুদ্দিন হক্কানীর কাছে সোপর্দ করে দিলেন। এটাই ছিল টার্নিং পয়েন্ট। সিরাজুদ্দিন হক্কানী এখন আফগানিস্তানের সবচেয়ে শক্তিশালী যোদ্ধাদলের নেতা। রাহবরি শুরার বিরুদ্ধে সিরাজুদ্দিন হক্কানীর আরো একটি অভিযোগ ছিল।

৫. কোয়েটা শুরা পরিচালনায় থাকা কমান্ডারগণ এক অলিখিত নিয়ম মেনে চলতেন। মোল্লা বেরাদর, মোল্লা দাদুল্লাহ, মোল্লা আখতার মনসুরসহ সবাই। এটা ছিল এক অলিখিত নিয়ম। নিয়মটা কেউ মুখে উচ্চারণ করত না তবে মানত সবাই। এই অলিখিত, অকথিত, অনুচ্চারিত নিয়ম-রহস্যের কথা সিরাজুদ্দিন হক্কানী ভালো করেই জানতেন। কোয়েটা শুরার নেতারা সবাই একবাক্যে হক্কানি নেটওয়ার্ককে নিজেদের সবচেয়ে শক্তিশালী সামরিক অংশীদার মানতেন; কিন্তু রাজনৈতিক অংশীদার মানতেন না। শত্রুর ওপর হামলায় হক্কানীর ওপর সবচেয়ে বেশি ভরসা করতেন; কিন্তু প্রতিপক্ষের সাথে কখন আলোচনা করবেন, কোথায় আলোচনা করবেন, কীভাবে আলোচনা করবেন, কারা আলোচনায় অংশ নিবে—এসব বিষয়ে কোয়েটা শুরা কখনো হক্কানিদের সাথে আলোচনা বা পরামর্শ করত না। রাহবরি শুরা এই ধরনের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে হক্কানি নেটওয়ার্কের সাথে কথা বলত না। এর ফলাফল প্রকাশ পেল ২০০৭ সালের ৭ আগস্টে। এই দিন সিরাজুদ্দিন হক্কানী কোয়েটা শুরা থেকে নিজেদেরকে পৃথক করার ঘোষণা দিলেন। মিরানশাহ শুরাকে পুরানো স্বাধীন অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন।

হক্কানি নেটওয়ার্কের আগে থেকেই নিজস্ব তহবিল ছিল। তহবিল সংগ্রহের নানা উৎস ছিল। রাহবরি শুরা থেকে আলাদা হওয়ার পরও তাদের তহবিলে

ঘাটতি দেখা দেয়নি। আগের উৎসগুলোর সাথে নতুন করে যোগাযোগ করল। পরবর্তী বছর অর্থাৎ ২০০৮ সালেই মিরানশাহ শুরা ৬৬ মিলিয়ন (৬ কোটি ৬০ লাখ) ডলারের তহবিল সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিল। এসব তহবিলের বেশিরভাগ এসেছিল পাকিস্তান ও সৌদি আরব থেকে। আল কায়েদার কাছ থেকেও বছরে ২০ মিলিয়ন (২ কোটি) ডলারের মতো তহবিল পেত। পাশাপাশি আল কায়েদার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার সুবাদে হক্কানি নেটওয়ার্ক নিয়মিত এমনসব অভিজ্ঞ যোদ্ধা ও বিশেষজ্ঞদের সাথে ওঠাবসা করার সুযোগ পাচ্ছিল, যা কোয়েটা শুরার ছিল না। হক্কানি নেটওয়ার্কের ১০% যোদ্ধা আসত পাকিস্তান থেকে। পাকিস্তানের লশকরে তৈয়েবা, টিটিপি, লশকরে জঙ্গি থেকেই এসব সদস্য আসত। এ ছাড়া আল কায়েদার সূত্রে মধ্য এশিয়া, চীন ও আরব থেকেও প্রচুর তাজাদম মুজাহিদ হক্কানি নেটওয়ার্কে যোগ দিত। সবমিলিয়ে হক্কানি নেটওয়ার্ক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সংগঠন; বলা ভালো, স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্র ছিল। তহবিল ও যোদ্ধার সংকট না থাকায় হক্কানি নেটওয়ার্কের কার্যক্রম সবচেয়ে শক্তিশালী, লক্ষ্যভেদী আর সুদূরপ্রসারী ছিল। কার্যক্রম বেশি হওয়ার কারণে আন্তর্জাতিক তহবিল সংগ্রহ করাও সহজ হয়ে গিয়েছিল। আর্থিক সংগতি থাকার কারণে প্রয়োজনীয় অস্ত্র সংগ্রহ করতেও বেগ পেতে হতো না। ড্রোনের পর আমেরিকার সবচেয়ে ভয়ংকর অস্ত্র 'নাইট রেইড' অর্থাৎ, নৈশ অভিযান থেকে বাঁচার কৌশলও আয়ত্ত করে ফেলেছিল। কালোবাজার থেকে নাইটভিশন গগলস কিনতে শুরু করেছিল। রাতের অভিযানে তালেবান অসহায়ের মতো বেঘোরে মারা পড়ত। মার্কিন সেনারা ঘুটঘুটে অন্ধকারেও দিবালোকের মতো সবকিছু দেখতে পেত। অন্যদিকে তালেবানকে হাতড়ে হাতড়ে চলাফেরা করতে হতো। হক্কানি নেটওয়ার্ক এই মহাসমস্যা কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল। হক্কানি নেটওয়ার্কের এক সমরবিশেষজ্ঞ বলেছিল, ড্রোন হামলার আশঙ্কা না থাকলে পুরো আফগানিস্তান দখল করে নেওয়া এক মাসের ব্যাপার।

হক্কানি নেটওয়ার্কের যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ইরানের 'পাসদারানে ইনকিলাব' থেকে বিশেষজ্ঞরা আসত। পাক ফৌজ থেকেও গোপন পরামর্শক আসত। আইআরজিসি (পাসদারানে ইনকিলাব) থেকে হক্কানি নেটওয়ার্ক প্রশিক্ষণও পেত, তহবিলও পেত। কোয়েটা শুরা, মিরানশাহ শুরাসহ আফগানে আরো যত শুরা ছিল, সবাইকে ইরানি শহর মাশহাদে অফিস খোলার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। এটাকে মাশহাদ দপ্তর বলা হতো।

আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার কয়েক বছর পর বিশেষ করে ২০০৬ সালের পর পুরো দুনিয়া বুঝতে পেরেছিল, আজ না হয় কাল—তালেবান আবার কাবুল দখল করে নিবেই। এজন্য সমস্ত প্রতিবেশী শক্তি, মুসলিম বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলো তালেবান অর্থাৎ, গুরুত্বপূর্ণ শুরাগুলোর সাথে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যোগাযোগ রেখে চলত। এসব দেশ তালেবানকে নানাভাবে আর্থিক, সামরিক ও তথ্যপ্রযুক্তিগত সাহায্য দিয়ে যেত। ইরানও এই উদ্দেশ্যেই মাশহাদে তালেবানকে অফিস খোলার সুযোগ দিয়েছিল। পরবর্তীতে কাতারেও এ ধরনের অফিস খোলা হয়েছিল। মার্কিন হামলার পর বহু তালেবান পরিবার ইরানে চলে গিয়েছিল। মাশহাদ অফিসের মাধ্যমে আফগানে মার্কিনবিরোধী লড়াইয়ে অবতীর্ণ দলগুলোর সাথে ইরান সম্পর্ক রেখে চলত। তেহরানে থাকা আফগান দূতাবাসের মাধ্যমে কাবুলের সাথেও ইরান কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখত। হক্কানি নেটওয়ার্কে ইরানি পরামর্শক ও তহবিলের উপস্থিতি ২০১২ ও ২০১৩ সালের দিকে সমস্যা হয়ে দেখা দিলো। সৌদি ও পাকিস্তান চাপ দিতে শুরু করল, হক্কানি নেটওয়ার্ককে ইরানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। এজন্য হক্কানি নেটওয়ার্ক ২০১৩ সালে সমস্ত ইরানি পরামর্শকদের ফেরত পাঠিয়েছিল। অন্যান্য শুরাগুলোর ওপরও পাক-সৌদি চাপ সৃষ্টি করেছিল। বাহ্যিকভাবে সমস্ত শুরা ইরানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল। ভেতরে ভেতরে কেউ কেউ ইরানের সাথে সীমিত পরিসরে হলেও সম্পর্ক বজায় রেখেছিল আর প্রকাশ্যে পাক-সৌদির সাথে সম্পর্ক রেখে চলত। ইরানের সাথে সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন করা প্রায় অসম্ভব ছিল। আফগানে ইরানেরও নিজস্ব স্বার্থ ছিল। তাই উভয়পক্ষই নিজের প্রয়োজনেই সম্পর্ক রেখে চলত। সম্পর্ক ছিন্ন করার পরও মাশহাদে নিয়মিতই সমস্ত শুরার প্রতিনিধি অবস্থান করত। ইরান কাউকে বের করে দেয়নি।

২০১৩ সাল নাগাদ হক্কানি নেটওয়ার্ক অত্যন্ত শক্তিশালী কিছু শাখা তৈরি করে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। সবচেয়ে খতরনাক শাখা ছিল 'ফেদাইন'। ফেদাইন যোদ্ধাদেরকে ইস্তেশহাদি হামলার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল। জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ অভিযানে ফেদাইনদের ব্যবহার করা হতো। অত্যন্ত উঁচুদরের প্রশিক্ষণ দিয়ে ফেদাইনদের প্রস্তুত করা হতো। এই দলের সদস্যদের গড়পড়তা বয়েস ১৪ থেকে ২৩ বছর পর্যন্ত। তাদেরকে তিন মাসের অত্যন্ত কঠোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। প্রশিক্ষণশিবিরে সুদক্ষ আফগান ও বিদেশি প্রশিক্ষক থাকতেন। প্রতিটি ইউনিটে কয়েকজন করে ফেদাইন দেওয়া হতো।

হক্কানি নেটওয়ার্ক শুরুর দিকে ফেদাইন দলে কিছুটা বয়স্কদের ভর্তি করাতে চাইত। এমন সদস্য নেওয়ার পর দুটি সমস্যা দেখা দিয়েছিল। বয়স্ক ফেদাইনরা হামলা করতে যাওয়ার পথে অনেক সময় ধরা পড়ে যেত। আর ক্ষেত্রবিশেষে বয়স্কদেরকে ফেদাঈ হওয়ার জন্য মোটিভেট বা ব্রেন প্রস্তুত করা কঠিন হয়ে যেত। অভিজ্ঞতার আলোকে পরবর্তীতে ফেদাইন দলে শুধু অল্প বয়েসিদেরই ভর্তি করা হতো। মিরানশাহ শুরার নায়েব এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিল, ২০১৫ সালে তাদের অধীনে ১০ থেকে ৩৫ বছরের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হাজারো ফেদাইন মজুদ ছিল। এদের মধ্যে বেশিরভাগের বয়স ১৪ থেকে ২৩ বছর ছিল।

ফেদাইনের মতো গ্রেনেড/মাইন স্কোয়াডও ছিল। প্রতিটি দলে ১০ জন করে সদস্য থাকত। এই ১০ জনের সাথে আরো ১০ জনের অগ্রগামী বাহিনী থাকত। উভয়দলের যৌথ উদ্যোগে হামলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হতো। অগ্রগামী বাহিনী বিদ্যুৎ গতিতে হামলা করে বিদ্যুৎ গতিতে পিছিয়ে আসত। শত্রুবাহিনী পিছু ধাওয়া করতে করতে মাইনফিল্ডে এসে ধড়াধড় বিস্ফোরণে মারা পড়ত। এভাবে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে নিজেদের এলাকা দখলে রাখত। হক্কানি নেটওয়ার্কের এসব কৌশল আফগানিস্তানের জন্য নতুন ছিল। হক্কানি নেটওয়ার্ক এসব কৌশল ভিয়েতনাম ও ল্যাটিন আমেরিকার গেরিলাদের কাছ থেকে শিখেছিল। এ ছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা থেকেও অনেক কৌশল আবিষ্কার করেছিল। চীন, ইরান ও পাকিস্তানের কাছ থেকেও নিয়মিত পরামর্শ পেত। এসব কারণে হক্কানি নেটওয়ার্কের বহুমুখী তৎপরতায় মার্কিনজোট ভীষণ পেরেশান ছিল। কাবুলে বড় বড় হামলার মাস্টারমাইন্ড হক্কানি নেটওয়ার্ক ছিল। মার্কিন দূতাবাসেও হামলা করেছিল হক্কানি নেটওয়ার্ক। ইন্ডিয়ান দূতাবাসেও হামলা করেছিল। ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলেও ইস্তেশহাদি হামলা করেছিল।

কোয়েটা শুরা দুর্বল হওয়ার তৃতীয় কারণ হলো, হক্কানি নেটওয়ার্ক আলাদা হয়ে যাওয়ার কারণে রাহবরি শুরা কার্যত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। অন্যদিকে হক্কানি নেটওয়ার্ক একের পর এক অভিযানের মাধ্যমে পূর্ব আফগানিস্তানে নিজেদের অবস্থান মজবুত করে নিয়েছিল। এর মাধ্যমে মূলত তালেবানের অবস্থানই সুসংহত হয়েছিল। আফগানিস্তানে তালেবান একটি ব্র্যান্ডের নাম ছিল। সবাই এই ব্র্যান্ড ব্যবহার করে নিজ নিজ পরিধিতে কার্যক্রম চালাত। ছোট ছোট দলগুলো বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীনভাবে নিজেদের মতো মেহনত

হলেও একে অপরের শত্রু ছিল, এমন নয়। আবার সবাই সব বিষয়ে শতভাগ একমত ছিল, এমনও নয়। ছোটখাটো মতভেদ ছিল। কখনো দুই দলে সংঘাতও লেগে যেত। তবে দুটি বিষয়ে সবদলই একমত ছিল :

ক. যেকোনো মূল্যে বিদেশি হানাদারদের দেশ থেকে তাড়াতে হবে।

খ. সামরিক কার্যক্রম যেভাবেই চলুক—রাজনৈতিক নেতৃত্ব মোল্লা ওমরের অনুমোদনকৃত কোয়েটা শুরার হাতেই থাকবে।

কোয়েটা শুরা দুর্বল হওয়ার চতুর্থ কারণ—এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সবচেয়ে শক্তিশালী কারণও বটে—যে, এই বিষয়টাই কোয়েটা শুরাকে আর্থিকভাবে সর্বশান্ত করে ছেড়েছিল। অন্যদিকে তালেবানকে আফগানিস্তানের এ মাথা থেকে ও মাথায় ছড়িয়ে দেওয়ার পেছনে এ বিষয়টাই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল। সেটা ছিল পেশাওয়ার শুরা। পেশাওয়ার শুরা কী? এটার জন্ম হলো কীভাবে? কীভাবে এত শক্তিশালী হয়ে গেল? কোয়েটা শুরাকেও তহবিলের জন্য পেশাওয়ার শুরার দিকে কাঙালের মতো কেন হাত পাততে হতো? এই শুরা কে চালাত? যারা এই শুরার নেতৃত্বে ছিল, আজকের আফগানিস্তানে তাদের অবস্থান কী?

এই সময়, অর্থাৎ ২০১০ ও ২০১২-এর মাঝে তালেবানের মাঝে একটা প্রশ্ন ছড়িয়ে পড়েছিল, মোল্লা ওমর কোথায়? মোল্লা বেরাদর গ্রেফতার হওয়ার পর কে তালেবানের নেতৃত্ব দেবে—সেটা মোল্লা ওমর কেন সেটা ঠিক করে দিচ্ছেন না? মোল্লা জাকের ও মোল্লা আখতার মনসুরের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব কেন নিরসন হচ্ছে না? মোল্লা ওমর কেন ফয়সালা করে দিচ্ছেন না?

এসবের পেছনে কাহিনিটা কী ছিল? মোল্লা ওমরের মৃত্যু কখন হয়েছিল? কতদিন পর্যন্ত তাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল? কে তাকে লুকিয়ে রেখেছিল? পাকিস্তান ও আফগান সরকার কখন এ ব্যাপারে প্রকৃত সত্য জানতে পেরেছিল? মোল্লা ওমরের পর নতুন আমির কীভাবে বাছাই করা হয়েছিল? নতুন আমির এত দ্রুত ড্রোন হামলায় কীভাবে শহীদ হলেন? নতুন ব্যবস্থায় মোল্লা ওমরের ছেলে মোল্লা ইয়াকুবের কী অবদান ছিল?

৩৬.

হক্কানি নেটওয়ার্ক যখন রাহবরি শুরা থেকে নিজেদেরকে পৃথক করে নিচ্ছিল, তখন পূর্ব আফগানিস্তানে থাকা পশতুন যোদ্ধারাও কোয়েটা শুরার অধীনে

কাজ করতে প্রস্তুত ছিল না। কোয়েটা শুরা দক্ষিণ আফগানিস্তানে নেতৃত্বদানে যথেষ্ট সফল হলেও পূর্ব ও উত্তর আফগানে কোয়েটা শুরা অতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারছিল না। তাই বলে এসব এলাকায় মার্কিনবিরোধী কোনো কাজ হচ্ছিল না, তা নয়। এসব জায়গায় হক্কানি নেটওয়ার্ক ছাড়া আরো বেশ কিছু শক্তিশালী যোদ্ধাদল ছিল। হ্যাঁ, তারা হক্কানি নেটওয়ার্কের মতো বিপুল শক্তির অধিকারী ছিল না; তবে কার্যক্রমে খুব একটা পিছিয়েও ছিল না। এসব এলাকায় কোয়েটা শুরা ঠিকমতো অর্থ ও অস্ত্র সাহায্য পাঠাতে পারছিল না। কোয়েটা শুরার এই ঘাটতি পূরণে এগিয়ে এসেছিল এখানকার দুটি শক্তিশালী শুরা :

ক. আজরাইয়া শুরা।

খ. শামসেতো শুরা।

শামসেতো শুরা রাজনৈতিকভাবে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। শামসেতো একটা জায়গার নাম। আরো নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে একটা শরণার্থী শিবিরের নাম। পাকিস্তানের পেশাওয়ার থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে আফগান মুহাজিরিনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল। এই মুহাজির ক্যাম্পের প্রায় প্রতিটি সদস্য, কোনো না কোনোভাবে আফগান নেতা গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের সংগঠন, হিযবে ইসলামির সাথে সম্পৃক্ত ছিল। তাদের সংখ্যা ২ হাজারের চেয়ে কিছু বেশি ছিল। স্থান ও ক্যাম্পের নামানুসারে শুরার নামকরণ হয়ে গিয়েছিল। শামসেতো মুহাজির ক্যাম্পে শামসেতো শুরা, আজরাইয়া শুরা ও পূর্ব আফগানে মেহনতরত কয়েকটি দলের সম্মিলিত শুরা মিলে আরেকটা জোটশুরা গঠন করা হয়েছিল। এই জোটই পরবর্তীতে পেশাওয়ার শুরা নামে পরিচিতি পেয়েছিল।

আজরাইয়া শুরার প্রধান কারী খালেদ নবগঠিত জোটশুরার প্রথম প্রধান নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরবর্তীতে দ্রুতগতিতে আরো বেশ কিছু প্রধান নির্বাচিত হয়েছিল। জোটশুরা গঠিত হওয়ার পরবর্তী তিন-চার বছর পূর্ব ও উত্তর আফগানিস্তান থেকে কোয়েটা শুরার একচ্ছত্র আধিপত্য প্রায় খতম করে দিয়েছিল। কারী বেলাল এই শুরার যবরদস্ত কমান্ডার ছিলেন। তালেবানের সবচেয়ে চৌকশ কমান্ডো ৩১৩ ফোর্সের কমান্ডারও তিনি ছিলেন। কাবুল দখলের পর তিনি কাবুলের গভর্নর হয়েছেন। পেশাওয়ার শুরা আফগানে নতুন শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। আফগান পশতুনরা পেশাওয়ার শুরার

অধীনে নতুন করে সংগঠিত হয়েছিল। পশতুন শুরার অধীনে তালেবান এমন জায়গাতেও শক্তিশালী বাহিনী গঠন করতে সক্ষম হয়েছিল, যেসব জায়গায় ইতিপূর্বে তালেবানের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল না। উত্তর আফগানে তাজিক ও উজবেক জনগোষ্ঠী বেশি। এই অঞ্চলেও পেশাওয়ার শুরা ব্যাপক হারে নতুন যোদ্ধা ভর্তি করতে সক্ষম হয়েছিল। তাজিক ও উজবেক সদস্যদের ভর্তি করার জন্য পেশাওয়ার শুরা 'জুনদুল্লাহ' নামে নতুন একটি বাহিনী গঠন করেছিল। শেষদিন পর্যন্ত এই দল ইরানের ভরপুর আর্থিক ও সামরিক সাহায্য পেয়ে এসেছিল। এ কারণে পেশাওয়ার শুরা শক্ত পায়ের ওপর দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছিল। পেশাওয়ার শুরার শক্তির আরেকটি বড় উৎস ছিল সীমান্ত নিয়ন্ত্রণক্ষমতা। আফগানিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তও পেশাওয়ার শুরা দখলে নিতে সক্ষম হয়েছিল।

প্রসিদ্ধ হলো, তালেবানের কাছে অস্ত্রশস্ত্র পাকিস্তান থেকেই আসত। চেমন ও তুরখাম সীমান্ত দিয়েই পাকিস্তান থেকে আফগানে চোরাই অস্ত্র প্রবেশ করত। অথচ বাস্তবতা হলো, ইরান, উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান থেকেও দেদারসে চোরাই অস্ত্র আফগানে প্রবেশ করত। রাশিয়া ও ইরানও এই পথ দিয়ে অস্ত্র পাঠাত। অস্ত্র সরবরাহ নির্বিঘ্ন রাখার জন্য সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ নিয়ে তালেবানের বিভিন্ন দলের মধ্যে লড়াই-সংঘাত লেগেই থাকত। এমনই একটি জায়গা হলো উত্তর আফগানের ফারিয়াব প্রদেশ। ফারিয়াব মূলত তুর্কমেনিস্তান সীমান্ত লাগোয়া প্রদেশ। এই সীমান্তে তুর্কমেনিস্তান ও উজবেকিস্তান থেকে আসা চোরাই অস্ত্র প্রকাশ্যে বিক্রি হতো। কোয়েটা শুরাপ্রধান মোল্লা বেরাদর এই সীমান্ত নিজের দখলে রাখার জন্য স্বতন্ত্র দল গঠন করেছিলেন। এখানে ছায়া প্রশাসনও গড়ে তুলেছিলেন। নিজস্ব লোককে গভর্নর নিয়োগ দিয়েছিলেন। ২০০৬-২০০৭ সালের দিকে পেশাওয়ার শুরা এখানে তাদের তৎপরতা বাড়িয়ে দিয়েছিল। তারা কোয়েটা শুরার সদস্যদেরকে নিজেদের দলে ভর্তি করাতে শুরু করেছিল। কোয়েটা শুরা থেকে যারা দলত্যাগ করে এসেছিল, তাদের কেউ কেউ পদোন্নতি লাভে ব্যর্থ, কেউ কেউ মাসোহারা নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিল এবং কেউ কেউ নিজ কমান্ডারের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। কেউ কেউ পরিচালনা পরিষদের সাথে মিলেঝুলে চলতে পারছিল না। এমন লোকেরাই পেশাওয়ার শুরাতে যোগ দিয়েছিল। এভাবে একদল থেকে আরেক দলে আসা-যাওয়া স্বাভাবিক ঘটনা ছিল। এটাকে বড় কিছু মনে করা হতো না। পেশাওয়ার শুরা এমন অসন্তুষ্ট লোকদের লুফে নিয়েছিল। তাদের নিয়ে নতুন

দল গঠন করেছিল। নতুন দলকে সহজ কিছু শর্তের ভিত্তিতে স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা দিয়েছিল। শর্ত ছিল :

১. দলগুলো নিজেরাই নিজেদের নেতা নির্বাচন করতে পারবে। কোয়েটা শুরার মতো পেশাওয়ার শুরা দলগুলোর ওপর নেতা চাপিয়ে দিবে না।
২. যেকোনো পরামর্শ বা সিদ্ধান্তের জন্য পেশাওয়ার শুরার কাছে দৌড়ে আসতে হবে না। সরাসরি দেখা করারও দরকার হবে না। ফোনে বা অন্য কোনো মাধ্যমেও কাজ চালিয়ে নেওয়া যাবে।
৩. সমস্ত কার্যক্রম ও আয়-ব্যয়ের হিসাব জমা করতে হবে।
৪. প্রতিটি যোদ্ধাকে মাসে ১ হাজার আফগানি ভাতা দেওয়া হবে।
৫. স্কুল ধ্বংস করবে না। বিদেশি এনজিওকে এমন কাজ করার অনুমতি দিবে, যেসব কাজ সাধারণ আফগানিস্তানিদের উপকার হয়।

মোল্লা বেরাদর ও মোল্লা দাদুল্লাহ বছরের পর বছর মেহনত করে এসব এলাকায় নিজ নিজ দল তৈরি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এখন আচানক পেশাওয়ার শুরা আবির্ভূত হয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে জেলার পর জেলা নিজেদের কবজায় নিয়ে নিতে শুরু করেছিল। ফারইয়াবের মতো বাগলান প্রদেশও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পাকিস্তান সীমান্তের বাইরে এই বাগলান দিয়েই মার্কিনজোটের অস্ত্রশস্ত্র বাইরে থেকে আসত। বাগলান দখলে রাখার অর্থ, সময়-সুযোগমতো মার্কিন সরবরাহ ট্রাকে হামলা করে অস্ত্রশস্ত্র দখল করার ষোলোআনা সুযোগ। এখানেও দুই শুরার মধ্যে সংঘাত দেখা দিয়েছিল। পেশাওয়ার শুরা এখানেও বাগড়া দিতে শুরু করেছিল। নতুন সদস্য ভর্তি করাতে আরম্ভ করল। সহজ শর্তের কারণে দলে দলে নতুন নতুন দল এসে পেশাওয়ার শুরাতে যোগ দিতে থাকল। পেশাওয়ার শুরায় মাসোহারাও বেশি ছিল। পেশাওয়ার শুরার তৎপরতা এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে, ২০০৯-২০১০ সাল নাগাদ কোয়েটা শুরার অবস্থা এমন হলো, এসব অঞ্চলে নিজেদের অনুগত দলের কাছে অর্থ-অস্ত্র পৌছানোর মতো শক্তিও অবশিষ্ট ছিল না।

মোল্লা দাদুল্লাহর লোইয়া শুরা, মোল্লা বেরাদরের শুরার কিছু নেতা এসব অঞ্চলে শেষদিন পর্যন্ত পেশাওয়ার শুরার সাথে অস্তিত্বের লড়াই চালিয়ে গিয়েছিল। এসব লড়াইয়ে হতাহতের ঘটনাও ঘটত। লোগোর ও পাখতিয়া প্রদেশে ভর্তি শুরু করার পর হক্কানি নেটওয়ার্কের সাথেও পেশাওয়ার শুরার সংঘাত শুরু হয়েছিল। পেশাওয়ার শুরার পক্ষ থেকে হক্কানিকে প্রস্তাব দেওয়া

হয়েছিল, ১২০ মিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে আপনারা আমাদের সাথে একীভূত হয়ে যান। সিরাজুদ্দিন হক্কানী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কিছুদিন পর প্রতি অল্প সময়ের জন্য পেশাওয়ার শুরার সংসদে হক্কানি নেটওয়ার্ক একটি আসন লাভ করেছিল। হক্কানি নেটওয়ার্ক নিজেদের এলাকা পূর্বাঞ্চলে অন্য কোনো দলকে প্রবেশ করতে দিত না। নিজেদের এলাকায় তারা একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর ছিল। পূর্বাঞ্চল ছিল হক্কানিদের স্ট্রংহোল্ড। পেশাওয়ার শুরা হক্কানি অঞ্চলে এসে শক্ত ধাক্কা খেয়েছিল। এই প্রথম ব্যর্থতার স্বাদ পেল। ২০১৪ সাল নাগাদ পেশাওয়ার শুরাই তালেবানের সবচেয়ে শক্তিমান শুরায় পরিণত হয়েছিল। মাঝে কিছু সময় এমনও হয়েছিল, পেশাওয়ার শুরা সবচেয়ে বেশি টাকা চীনের কাছ থেকেই পেত। সৌদি, ইরান, পাকিস্তান ও আরব দেশের বিত্তশালী শায়খদের সাহায্য তো ছিলই। ২০১২ সাল নাগাদ কোয়েটা শুরা এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে, অর্থ-অস্ত্রের জন্য পেশাওয়ার শুরার কাছে হাত পাততে হতো। কারণ, বাইরের দাতাগোষ্ঠী পেশাওয়ার শুরাকেই টাকাপয়সা দিচ্ছিল।

উপরোক্ত ৪টি কারণে কোয়েটা শুরা দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে গিয়েছিল। কোয়েটা শুরা ছিল মোল্লা ওমরের অনুমোদনকৃত। এই শুরা দুর্বল হয়ে পড়াটা তালেবানের জন্য ভীষণ দুশ্চিন্তার ছিল। পেশোয়ার শুরার মাধ্যমে লাভও কম হয়নি। পুরো আফগানে তালেবান আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। ২০১২ সালের পর হানাদারদের বিরুদ্ধে তালেবানের লড়াই তীব্র আকার ধারণ করেছিল। মোল্লা ওমরের সাথে কারো দেখা-সাক্ষাৎ হচ্ছিল না। তার খোঁজখবর পাওয়া যাচ্ছিল না। ওসামা বিন লাদেন পাকিস্তানে শহীদ হয়ে গিয়েছেন। তালেবানের শুরাতে বারবার প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছিল, মোল্লা ওমর কোথায়? তিনি সামনে আসছেন না কেন? মোল্লা বেরাদর গ্রেফতার হওয়ার পর মোল্লা আখতার মনসুরই একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন, যার সাথে মোল্লা ওমরের সরাসরি সাক্ষাৎ হতো। এই দুজন ছাড়া আর কারো সাথে মোল্লা ওমরের কোনো ধরনের যোগাযোগ ছিল না।

কোয়েটা শুরা ঈদ ও বিভিন্ন উপলক্ষ্যে মোল্লা ওমরের বিবৃতি-অভিনন্দন প্রকাশ করত। মোল্লা বেরাদর ও মোল্লা আখতার মনসুরের সাথে নতুন শক্তিমান নেতা হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন মোল্লা জাকের। তিনিও কোয়েটা শুরার নীতিনির্ধারকের ভূমিকায় ছিলেন। মোল্লা জাকের সুদক্ষ সেনানায়ক ছিলেন। গুয়ানতানামো বেতে জেল খেটে এসেছেন। মোল্লা জাকের আসার

পর বিরোধ দেখা দিলো, আফগান সরকার বা আমেরিকার সাথে আলোচনা করা হবে কি, হবে না। মোল্লা জাকের সবধরনের আলোচনা বিরোধী ছিলেন। পাকিস্তানের পক্ষ থেকে মোল্লা আখতার মনসুর ও হক্কানি নেটওয়ার্ককে আলোচনায় অংশ নেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। মোল্লা জাকের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। মোল্লা জাকের সংবাদ পেলেন, তার অধীনে থাকা কিছু কমান্ডার গোপনে পশ্চিমা দূতাবাসগুলোর সাথে যোগাযোগ রাখছে। মোল্লা জাকের তাদের প্রতি ভীষণ নারাজ হলেন। মোল্লা জাকের এ ধরনের আলোচনাকে তালেবান আদর্শের সাথে গাদ্দারি মনে করতেন। আলোচনায় আগ্রহী ১৭ জন কমান্ডারকে মোল্লা জাকের গ্রেফতার করে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন। মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্তদের মধ্যে কারী ইসমাইল নামক এক কমান্ডারও ছিলেন। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার সময় মোল্লা আখতার মনসুর সরাসরি হস্তক্ষেপ করে কারী ইসমাইলসহ আরো কিছু কমান্ডারকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। মৃত্যুদণ্ড রদ করার সপক্ষে নিজের বক্তব্য তুলে ধরতে গিয়ে মোল্লা আখতার মনসুর বলেছিলেন, মোল্লা ওমর বলেছেন, কারী ইসমাইল ও তার সাথিদের মৃত্যুদণ্ড মওকুফ করা হোক। মোল্লা জাকের উত্তেজিত হয়ে বললেন, এদেরকে গাদ্দারির সাজা দেওয়া হবে না কেন? মোল্লা জাকের চ্যালেঞ্জ করে বললেন, আমাকে মোল্লা ওমরের কাছে নিয়ে চলুন। আমি তার কাছে জানতে চাইব, এই গাদ্দারদেরকে কোন ইসলামি আইনের আওতায় মাফ করা হয়েছে? মোল্লা জাকেরের প্রস্তাবকে মোল্লা আখতার মনসুর নানা কৌশলে এড়িয়ে যেতে থাকল। এটা ২০১২ সালের ঘটনা। এরপর মোল্লা জাকেরের লোকজন বিভিন্ন স্থানে মারা পড়তে শুরু করল। ওদিকে মোল্লা জাকের বারবার মোল্লা ওমরের সাথে সাক্ষাৎ করার আবেদন করেই গেলেন। একপর্যায়ে মোল্লা জাকের ও তার সহযোগীদের মধ্যে প্রশ্ন দেখা দিলো, মোল্লা ওমর সত্যিই জীবিত আছেন নাকি মারা গেছেন? এমন হচ্ছে না তো, মোল্লা মনসুর নিজের সিদ্ধান্তকেই মোল্লা ওমরের নামে চালিয়ে দিচ্ছেন? গোপনে অগোচরে মোল্লা আখতার মনসুর ধীরে ধীরে তালেবানের সমস্ত দলকে নিজের আনুগত্যে নিয়ে আসতে সক্ষম হলেন। এই কাজে পাক গোয়েন্দা ও ইরানি প্রভাব-প্রতিপত্তি ভরপুর ব্যবহার করেছেন। পপিচাষীদের কাছ থেকে বাড়তি ট্যাক্স আদায় করা শুরু হলো। কোয়েটা শুরার অধীনস্থ শুরাগুলোর দাতাগোষ্ঠীকে সফল কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে মোল্লা মনসুর এ বিষয়ে সম্মত করাতে সক্ষম হলেন, তারা সমস্ত দান সরাসরি কোয়েটা শুরার ফান্ডে

জমা করবেন। মোল্লা মনসুরের এই কূটনৈতিক তৎপরতার কারণে কোয়েটা শুরা আবার আর্থিকভাবে পেশাওয়ার শুরা ও মিরানশাহ শুরার চেয়েও শক্তিশালী হয়ে উঠল। এই অভাবনীয় অর্জনের জন্য মোল্লা আখতার মনসুরকে মূল্য চোকাতে হয়েছে। মোল্লা আখতার মনসুর দৌড়ঝাঁপ চালানোর সময় সমস্ত দল ও পক্ষকে কিছু ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এবার সেই ওয়াদাগুলো পূরণের সময় এসে গেল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ওয়াদা ছিল, তিনি তালেবানকে আলোচনার টেবিলে নিয়ে আসবেন। আফগান সরকার বা আমেরিকা—যার সাথেই হোক, মোল্লা আখতার মনসুর তালেবানকে আলোচনার জন্য প্রস্তুত করবেন। ওয়াদা মোতাবেক মোল্লা আখতার মনসুর কোয়েটা শুরার বৈঠকে আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন।

২০১৫ সালের দিকে যখন আফগান সরকারের সাথে আলোচনা শুরু হচ্ছিল, তখন আফগান সরকারের প্রতিনিধি দাবি করল, আমরা মোল্লা ওমরের সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই। যাতে নিশ্চিত হতে পারি, তালেবানের সর্বোচ্চ নেতা চলমান আলোচনাকে অনুমোদন করছেন। এমন যাতে না হয়, আমরা যাদের সাথে আলোচনায় বসছি, তারা বাস্তবে মোল্লা ওমরের প্রতিনিধিই নন। আলোচনাবিরোধী তালেবান নেতারাও একই দাবি তুলছিল। ২০১৩ সালেই পাক গোয়েন্দারা কিছু তালেবান কমান্ডারকে গোপনে জানিয়ে দিয়েছিল, মোল্লা ওমর ২০১০ সালের কিছু পরে ইন্তেকাল করেছেন। তখন মোল্লা বেরাদর বন্দি ছিলেন। কারো মতে তিনি ২০১৩ সালে ইন্তেকাল করেছেন। তবে বেশিরভাগ বিশ্লেষকের মত, মোল্লা ওমর ২০১০ সালের আশেপাশে ব্রেন টিউমারে ইন্তেকাল করেছেন। এমন গুজবও ছড়ানো হয়েছিল, তিনি করাচিতে ইন্তেকাল করেছেন। অথচ মোল্লা ওমর জীবনে কখনো করাচি আসেননি। তিনি আফগানিস্তানের জাবুল প্রদেশে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটির একদম কাছাকাছি তিন থেকে চার কিমি দূরের একটি জায়গায় আত্মগোপনে থাকাবস্থায় ইন্তেকাল করেছিলেন। পুরো সময় তিনি এখানেই আমেরিকানদের নাকের ডগায় ছিলেন। ব্রেন টিউমারের কারণে মৃত্যুর বেশ ক'বছর আগে থেকেই তিনি শারীরিকভাবে কর্মক্ষম ছিলেন না। কোনো বিষয়ে মতামত দেওয়া, দিকনির্দেশনা দেওয়া, নেতৃত্ব দেওয়া বা পরিচালনা করার অবস্থায়ও ছিলেন না।

এসব বিষয় স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর তালেবানের কাছে একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেছে, এতদিন পর্যন্ত অন্য কেউ মোল্লা ওমরের নাম ভাঙিয়ে তাদেরকে

পরিচালনা করে গেছে। বিশেষ করে মোল্লা বেরাদরের গ্রেফতারির পর থেকে মোল্লা আখতার মনসুরই এই কাজ করেছিলেন। এর জেরে তালেবানের মধ্যে মোল্লা আখতার মনসুরের প্রতি প্রচণ্ড ক্ষোভ জন্ম নিল। মোল্লা জাকির আগে থেকেই মহাখাপ্পা ছিলেন। এর মধ্যে ঈদের বার্তা বা আলোচনা অনুমোদনের বার্তা মোল্লা ওমরের নামে প্রচার করা হয়েছিল। এক ঈদের বার্তা তো মোল্লা ওমরের গলার স্বর নকল করে প্রচার করা হয়েছিল। এসব ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর বিশেষ করে গলার স্বর নকল করে প্রচার করা ঈদবার্তার কারণে বহু তালেবান নিজেদের প্রতারিত ভাবতে শুরু করেছিল। এ কারণে ২ হাজারের মতো তালেবান দল ত্যাগ করে ইসলামিক স্টেটসহ আরো বিভিন্ন দলে যোগ দিয়েছিল আর কেউ কেউ নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছিল।

মোল্লা আখতার মনসুরের কাছে যুক্তিসঙ্গত উত্তর প্রস্তুত ছিল। তালেবানের ঐক্য ধরে রাখার জন্যই তিনি এই কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিলেন। ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ নয়; হানাদারবিরোধী লড়াইয়ে যাতে ফাটল না ধরে, এই নিয়তেই তিনি মোল্লা ওমরের গলার স্বর নকল করাসহ অন্যান্য পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করেছিলেন। মোল্লা ওমরের মতো অবিসংবাদিত নেতা আর কেউ হতে পারত না। যুদ্ধ চলাকালে সেনাপতির মৃত্যু অনেকের মনোবল ভেঙে দিতে পারত। সংগঠনও ভেঙে যেতে পারত। ২০১৫ সালে আমেরিকাসহ পুরো বিশ্বের কাছে শতভাগ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল, মোল্লা ওমর আর নেই। কোয়েটা শুরাও বিবৃতির মাধ্যমে বিষয়টি পরিষ্কার করে দিয়েছিল। এখন তালেবানের নতুন নেতা নির্বাচন করা আবশ্যক হয়ে দাঁড়াল। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে গ্রহণযোগ্যতা, তহবিল সংগ্রহের যোগ্যতা, কূটনৈতিক দক্ষতা ও ব্যক্তিগত দলবলের দিক থেকে মোল্লা আখতার মনসুর সবদিক দিয়ে এগিয়ে ছিলেন। মোল্লা ওমরের সাথে যোগাযোগও তার বেশি ছিল। মোল্লা বেরাদরও কম ছিলেন না; তিনি তালেবানের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি বন্দি থাকায় মোল্লা আখতার মনসুরই এগিয়ে ছিলেন। এছাড়া মোল্লা ওমরের ভাই আবদুল মান্নান, মোল্লা ওমরের ছেলে ইয়াকুব, পেশাওয়ার শুরার সামরিক প্রধান কারী বড়িয়াল, হক্কানি নেটওয়ার্কের প্রধান সিরাজুদ্দিনও তালেবানের নতুন আমির হওয়ার মতো যোগ্যতা রাখতেন।

তালেবানের নতুন আমির নির্বাচনের উদ্দেশ্যে মোল্লা আখতার মনসুর ২০১৫ সালের ৩০ জুলাই অতি গোপনীয় এক স্থানে জিরগার আহ্বান জানালেন। প্রায় পনেরো শ'র মতো লোক সমাগম হয়েছিল। তালেবান কমান্ডার, স্থানীয়

মুরুব্বি, বিভিন্ন দলীয় প্রধান, মসজিদের ইমাম বা মাদরাসার শিক্ষক-পরিচালকগণও শামিল ছিলেন। পাক গোয়েন্দাদের পক্ষ থেকে মোল্লা আবদুল মান্নান, মোল্লা ইয়াকুব, মোল্লা সিরাজুদ্দিনের কাছে বার্তা পাঠানো হয়েছিল, সবাই যেন মোল্লা মনসুরের পক্ষে ভোট দেন। কারণ মোল্লা মনসুরই আলোচনা এগিয়ে নিতে বেশি আগ্রহী ছিলেন। এজন্য নানা পদক্ষেপও নিয়েছিলেন। মার্কিনজোটের পক্ষ থেকে পাকিস্তানের ওপর প্রবল চাপ ছিল, তালেবানকে যেকোনো মূল্যে আলোচনার টেবিলে নিয়ে আসতে হবে। মোল্লা মনসুরের সাথে পাক কর্তৃপক্ষের ভালো বোঝাপড়া ছিল। এই মহা জিরগাকে সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য মোল্লা বেরাদরকেও সাময়িক মুক্তি দিয়ে বৈঠকে হাজির করা হয়েছিল। মোল্লা বেরাদর জিরগায় উপস্থিত হয়ে পুরো সময় বলতে গেলে চুপচাপ ছিলেন। কাউকে ভোট দেননি। মোল্লা আবদুল মান্নান ও মোল্লা ইয়াকুব আগে থেকে সবকিছু সাজানো বুঝতে পেরে সভার মাঝপথেই উঠে গেছেন। তারা বুঝতে পেরেছিলেন, সভা যেভাবে চলছে, তাতে মোল্লা আখতার মনসুরকেই আগে থেকে আমির নির্বাচিত করে রাখা হয়েছে। জিরগা স্রেফ আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। সিরাজুদ্দিন হক্কানীও নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলেন। তিনি কাকে ভোট দিয়েছিলেন—সেটা পরিষ্কার নেই। জিরগার মাধ্যমে মোল্লা মনসুর তালেবানের নতুন আমির নিযুক্ত হলেন। বলা যেতে পারে, তিনি নিজেকে আমির বানিয়ে নিয়েছেন। নিজে আমির হওয়ার মাধ্যমে মোল্লা মনসুর নিজের অনেক শত্রু তৈরি করেছিলেন। শত্রুরা যে সে ছিল না, তালেবানের শক্তিমান অনেক কমান্ডার ছিলেন এই দলে। মোল্লা মনসুর অযোগ্য ছিলেন না। তিনি অত্যন্ত চৌকশ ও সতর্ক মানুষ ছিলেন। আশেপাশে কী ঘটছে, সে খবর তিনি রাখতেন। ইরান, পাকিস্তান, সৌদি আরব ইত্যাদি দেশের সাথে সম্পর্ক আরো পোক্ত করে নিয়েছিলেন। সিরাজুদ্দিন হক্কানীও সবদিক বিবেচনায় মোল্লা মনসুরকে সাময়িকভাবে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। দোস্ত মোল্লা ইয়াকুবকেও বুঝিয়ে-শুনিয়ে রাজি করিয়েছিলেন। মোল্লা ইয়াকুব এতদিন কোয়েটা শুরার অর্থ বিষয়ক জিম্মাদার ছিলেন। তিনি এই দায়িত্বে ফিরে যেতে অস্বীকৃতি জানালেন। দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিলেন। মোল্লা মনসুর আমির হওয়ার পর মোল্লা জাকিরকে সামরিক প্রধানের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে নিজের কাছের লোক ইবরাহিম সদরকে সামরিক প্রধান নিয়োগ দিলেন। সিরাজুদ্দিন হক্কানী নিজের কয়েকজন লোককে নতুন শুরায় গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন করলেন।

তালেবানের অভ্যন্তরে অন্তর্দ্বন্দ্ব চলতে থাকল। মোল্লা মনসুর যে পদ্ধতিতে আমির হয়েছেন, তাতে অনেকের তীব্র আপত্তি ছিল। সিরাজুদ্দিন হক্কানী পাক গোয়েন্দাদের সহায়তায় সবাইকে মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন; কাজ হয়নি। গোপন জায়গায় বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল। এই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হলো, ২০১৫ সালের ১৫ আগস্ট আবার আমির নির্বাচন হবে। এই বৈঠকে কাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হবে, সেটাও ঠিক করে রাখা হলো। বাছাই করা কিছু লোককেই শুধু আমন্ত্রণ জানানো হবে, এই সিদ্ধান্তও হলো। সেদিন গোটা আফগানের সর্বমোট ৩০০ শুরা থেকে মাত্র ১৭ জন প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানানো হলো। মোল্লা ইয়াকুব ৭ ভোট, মোল্লা আখতার মনসুর ৬ ভোট, মোল্লা মনসুর দাদুল্লাহ ৩ ভোট, মোল্লা জাকের ১ ভোট পেয়েছিলেন। মোল্লা জাকের তার ভোট মোল্লা ইয়াকুবকে দিয়ে দিয়েছিলেন। ভোটের ফলাফলকে মোল্লা আখতার মনসুর মানতে অস্বীকৃতি জানালেন। তার যুক্তি ছিল, নির্বাচনের জন্য বাছাই করা লোকজন ডাকা হয়েছে। ডাকা দরকার ছিল বড় বড় উলামায়ে কেরাম ও প্রতিটি শুরার প্রতিনিধিকে। এই জমায়েত কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই শেষ হয়েছিল। এরপর মোল্লা আখতার মনসুর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কয়েক মাস পর ২০১৬ সালের শুরুতে তিনি ইরানে চলে গিয়েছিলেন। সেখানেই তার পরিবার-পরিজন থাকত।

ইরানের মাশহাদ অফিসেও তার ভালো প্রভাব ছিল। মোল্লা আখতার মনসুর নিয়মিতই চিকিৎসা ও পরিবারের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে ইরান আসা-যাওয়া করতেন। এবার গিয়ে কয়েক সপ্তাহ থাকলেন। ১৬ মে কোতাফতান বর্ডার দিয়ে জাল পাসপোর্ট ব্যবহার করে বেলুচিস্তানে প্রবেশ করেছিলেন। সাদা টয়োটা কারে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে কোয়েটা যাচ্ছিলেন। গাড়ি চলাবস্থাতেই কোনো কারণে তার আন্দাজ হয়ে গিয়েছিল, তার লোকেশন কোনো পক্ষের কাছে চলে গেছে। অনেক পরে তার অতি কাছের এক বন্ধু মিডিয়া সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, শেষমুহূর্তে মোল্লা আখতার মনসুর তার ভাই ও পরিবারের সাথে যোগাযোগ করে বলেছিলেন, তিনি যেকোনো মুহূর্তে মারা যেতে পারেন। পরিবারের ঐক্য ধরে রাখতে হবে, আর্থিক লেনদেনের ব্যাপারে অসিয়ত-নসিহত করেছেন।

মোল্লা আখতার মনসুরের অনুমান সঠিক ছিল। মোল্লা আখতার মনসুরের গলার আওয়াজ মার্কিন গোয়েন্দা ডিভাইস শনাক্ত করে ফেলেছিল। মোল্লা

মনসুরের গাড়ির ওপর দিয়ে মার্কিন হেলফায়ার মিসাইল উড়ে চলছিল। উপযুক্ত জায়গার অপেক্ষায় ছিল। মোল্লা মনসুরের গাড়ি যখন বেলুচিস্তানের জাতীয় সড়কের আহমাদওয়াল গ্রামের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, মিসাইলটা এসে আঘাত হানল। মুহূর্তেই গাড়িটা কয়লায় পরিণত হয়েছিল। চালক ও আরোহী দুজনেই সাথে সাথে মারা গিয়েছিলেন। তালেবান ও কোয়েটা শুরা আবার আমির নির্বাচনের ঝামেলার মুখোমুখি হলো। এবার সিরাজুদ্দিন হক্কানী ও মোল্লা ইয়াকুব আগেই নিজেদের নাম প্রত্যাহার করে নিলেন। ২৫ মে গোপন সভার ডাক দেওয়া হলো। তালেবানের নতুন আমির হিসেবে কোয়েটা শুরার তৃতীয় সারির সদস্য মোল্লা হাইবাতুল্লাহ আখুন্দজাদার নাম প্রস্তাব করলেন সিরাজুদ্দিন হক্কানী। মোল্লা ইয়াকুবও আগে বেড়ে তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করলেন। এরপর সবাই একে একে বাইয়াত দিয়েছে। একজন জুনিয়র সদস্যকে আমির বানানোর কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে, তালেবানের প্রথম সারির ৫ জনের কোনো একজনকে আমির নির্বাচিত করলে তালেবানের মধ্যে ফাটল ধরার আশঙ্কা ছিল। মোল্লা আখতার মনসুরের মতো জাঁদরেল লোককে নির্বাচিত করার পর যা হয়েছিল, সেটা সবার মাথায় ছিল। বিজ্ঞ মুফতি, শরিয়াহ আদালতের কাজি মোল্লা হাইবাতুল্লাহকে নির্বাচনের মাধ্যমে তালেবান ভাঙন রোধ করতে সক্ষম হলো। কোয়েটা শুরা আবার মজবুত হয়ে গেল। মোল্লা সিরাজুদ্দিন ও মোল্লা ইয়াকুবকে নবনির্বাচিত আমির হাইবাতুল্লাহর যুগ্ম নায়েব বানিয়ে দেওয়া হলো। নতুন আমিরের নেতৃত্বে গোটা আফগানে নানা শুরা ও দলে বিভক্ত তালেবান আবার একসুতোয় গেঁথে উঠতে সক্ষম হলো। সেই ঐক্য আজ পর্যন্ত অটুট আছে, আফগান শাসন করছে। এবার তালেবানের সামনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল, আমেরিকার সাথে আলোচনার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া।

আলোচনার নামে আমেরিকার সাথে চাঞ্চল্যকর কৌতুক করা হয়েছিল। কী ছিল সেই কৌতুক? আমেরিকা গোপনে আলোচনা সারতে চেয়েছিল, সেটা ব্যর্থ হয়েছিল। কীভাবে? শেষের দিকে আমেরিকা এত দ্রুত কেন পালাল? তালেবান আচানক এত তাড়াতাড়ি কীভাবে বিদ্যুৎ গতিতে গোটা আফগান দখল করে নিতে সক্ষম হলো? অথচ বিশ্বের প্রায় সব যুদ্ধবিশারদ বলছিল, কাবুল পর্যন্ত পৌঁছতে তালেবানের আরো কয়েক মাস লেগে যাবে। কীভাবে এটা সম্ভব?

০৭.

২০১০ সালে বেলুচিস্তান থেকে একজন সৌম্যদর্শন, ভাবগম্ভীর আফগান পশতুন ব্যক্তি আফগান সরকারের এক কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে জানাল, আমি তালেবান কমান্ডার মোল্লা আখতার মনসুর। আমি আফগান সরকারের সাথে আলোচনায় বসতে চাই। ২০১০ সালের পরিস্থিতি বিবেচনায় এটা ছিল এক ব্রেকিং নিউজ। কথিত মোল্লা আখতার মনসুর যে ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করেছিল, সে ব্যক্তির সাথে তালেবানের বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সরকারের উচ্চপর্যায়ের সাথে ভালো সম্পর্ক ছিল। সেই আফগান কর্মকর্তা অত্যন্ত খুশি হয়ে দৌড়ে গেল জেনারেল ম্যাক ক্রিস্টালের কাছে। সিআইএ, এমআই-৬ সবার কাছে এই মহাখুশির সংবাদ পৌঁছে দেওয়া হলো, তালেবান অবশেষে নমনীয় হয়েছে। তারা আলোচনার জন্য প্রস্তুত। আফগান সরকারও মহাখুশি। মোল্লা আখতার মনসুর এও জানিয়েছিল, অপরপক্ষ আলোচনায় রাজি থাকলে পরবর্তী বৈঠকে আরো সঙ্গীসাথিসহ এসে আলোচনার শর্ত-শরায়েত পেশ করব।

নির্ধারিত সময়ে আফগান সরকার ও এমআই-৬ কর্মকর্তারা মোল্লা আখতার মনসুরের সাথে সাক্ষাৎ করল। প্রাথমিক কথাবার্তা হলো, কুশল বিনিময় হলো। সৌজন্য বিনিময় শেষে আফগান প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাইর সাথে সাক্ষাতের সময় নির্ধারণ করা হলো। যাওয়ার সময় মোল্লা আখতার মনসুরদের হাতে একতাড়া ডলার গুঁজে দেওয়া হলো। পরবর্তী সাক্ষাতের সময় মোল্লা আখতার মনসুর সদলবলে এলেন। ব্রিটিশ গোয়েন্দারা তালেবান প্রতিনিধিকে সি-১ থার্টি বিমানে বসিয়ে পুরো প্রটোকলের সাথে কাবুলে পৌঁছে দিলো। এখানে আফগান ও মার্কিন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা অপেক্ষমাণ ছিল। এবারের বৈঠকে প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাই ছিল কি না, সেটা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এই বৈঠকে মোল্লা আখতার মনসুর তিনটি শর্ত পেশ করেছিলেন :

১. তালেবানের সমস্ত কমান্ডারদেরকে নিরাপদে আফগানিস্তানের ফেরার সুযোগ দিতে হবে।
২. তালেবান যোদ্ধাদেরকে সরকারি চাকুরি দিতে হবে।
৩. সমস্ত তালেবান বন্দিকে মুক্তি দিতে হবে।

এসব শর্ত আফগান সরকার-আমেরিকার কাছে হালুয়া-মিষ্টির মতো ছিল। তারা এসব শর্তের কথা শুনে যারপরনাই অবাক হলো। তাদের মনে ক্ষীণ

সন্দেহ দেখা দিলো। যার সাথে আলোচনা করছে, সত্যি সত্যি মোল্লা আখতার মনসুর? মোল্লা আখতার মনসুরের ছবি দেখিয়ে বন্দি তালেবান যোদ্ধাদের প্রশ্ন করা হলো, এই লোকই কি মোল্লা আখতার মনসুর? কিছু তালেবান যোদ্ধা বলল, হ্যাঁ, ইনিই মোল্লা আখতার মনসুর। বেশিরভাগ তালেবান যোদ্ধা বললেন, আমরা কখনো তাকে সরাসরি দেখিনি। সেজন্য বলতে পারছি না।

আমেরিকার কাছে আফগানিস্তান গলার কাঁটা হয়ে গিয়েছিল। যেকোনো মূল্যে তারা আফগানিস্তান ছেড়ে যেতে চাচ্ছিল। তালেবানকে আলোচনার টেবিলে আনতে বাধ্য করতে পেরেছে, জেনারেল ম্যাক ক্রিস্টাল এই খুশি কোথায় রাখবে—বুঝে উঠতে পারছিল না। জেনারেল সাহেব নিজের কাঁধেই সব কৃতিত্ব টেনে নিচ্ছিলেন। তার নেতৃত্বাধীন বাহিনীর কঠোর হামলা সহ্য করতে না পেরেই তালেবান নাকে খত দিয়ে আলোচনায় বসতে বাধ্য হয়েছে। হোয়াইট হাউজ থেকে নিউইয়র্ক টাইমস ও অন্যান্য পত্রিকায় হুকুম পাঠানো হলো, তালেবানের সাথে আলোচনার সংবাদ গোপন রাখতে পারলে ভালো। একান্ত যদি ছাপতেই হয়, মোল্লা আখতার মনসুরের নাম যেন গোপন রাখা হয়।

নাম গোপন রাখার ব্যাপারে সতর্কতার কারণ ছিল, মার্কিন কর্তৃপক্ষ ভাবছিল, মোল্লা আখতার মনসুরের নাম প্রকাশ পেয়ে গেলে যেসব তালেবান কমান্ডার মোল্লা মনসুরবিরোধী, তারা সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে; আলোচনা ভেস্তে দিতে পারে। আলোচনা শুরু হতে না হতেই শেষ হয়ে যাবে। আফগানিস্তান থেকে বিজয়ী হয়ে ফেরার সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনাশ হয়ে যাবে। মার্কিন মিডিয়া হোয়াইট হাউজের নির্দেশনা মোতাবেক সংবাদ পরিবেশন করল। তৃতীয় সাক্ষাতের জন্য আবার তালেবান প্রতিনিধিকে নির্ধারিত স্থানে নিয়ে আসা হলো। এবার মার্কিনপক্ষ নিজেদের শর্ত নিয়ে আলোচনা করল। ফেরার সময় আগের মতো সবার হাতে ডলারের বোন্দা গুঁজে দেওয়া হলো। বিমানে করে কোয়েটাতে নামিয়ে দেওয়া হলো। এটা ছিল শেষ বৈঠক। এই বৈঠকে আফগান সরকার নতুন এক ব্যক্তিকে তাদের সাথে রেখেছিল। লোকটা পুরো আলোচনার সময় কোনো কথা বলেনি। শুধু পর্যবেক্ষণ করছিল। এই লোক কয়েক বছর আগে মোল্লা আখতার মনসুরের সাথে সাক্ষাৎ করেছিল। ব্যক্তিগতভাবে মোল্লা মনসুরকে চিনত। আলোচনা শেষে নতুন ব্যক্তিটি বলল, তালেবান প্রতিনিধি প্রধানকে ঠিক মোল্লা মনসুরের মতো লাগছে না। তার

কথা সবাই তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলো। আফগান কর্মকর্তা, মার্কিন প্রতিনিধি ও বৃটিশ প্রতিনিধি দৃঢ়ভাবে বলল, এই লোকই মোল্লা আখতার মনসুর।

তৃতীয় আলোচনার পর বেশ কিছুদিন কেটে যাওয়ার পরও আফগান-মার্কিন কর্তৃপক্ষ অনেক চেষ্টা করেও মোল্লা আখতার মনসুরের সাথে যোগাযোগ করতে পারল না। পরবর্তী আলোচনার তারিখ পেরিয়ে গেছে। আফগান-মার্কিন কর্তৃপক্ষ নিজেদের সোর্সের মাধ্যমে রাহবরি শুরার সাথে যোগাযোগ করে জানতে পারল, আসল মোল্লা আখতার মনসুরের সাথে এই আলোচনার কোনো সম্পর্কই নেই। আফগান সরকার, সিআইএ ও এমআই-৬ ভীষণ লজ্জিত হলো। সবার মাথা হেঁট হয়ে গেল। সেই বহুরূপী আফগান বিশ্বের সবচেয়ে বাঘা বাঘা গোয়েন্দাদের ঘোল খাইয়ে রীতিমতো হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছিল। অনেক অনুসন্ধানের পর এটুকু জানা গেছে, সেই বহুরূপী ব্যক্তিটি কোয়েটার শহরতলির এক সাধারণ বালুচ দোকানদার ছিল। দোকানদারির সূত্রে তার সাথে অনেক মানুষের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হতো। কিছু আফগান সরকারি কর্মকর্তার সাথেও তার দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছিল। নানাশ্রেণির মানুষের সাথে কথা বলে তার মাথায় হয়তো এমন দুর্দান্ত আইডিয়া এসেছিল।

কথিত মোল্লা আখতার মনসুরের পরিচয় ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর আফগান সরকার থেকে শুরু করে হামিদ কারজাই, একযোগে সবাই এই সাক্ষাৎ ও আলোচনার কথা অস্বীকার করার প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ল। মার্কিন-ব্রিটিশ মিডিয়া তাদের জেনারেল ও রাজনীতিবিদদের তুলোধুনো করে ছাড়ল। তাদের যোগ্যতা ও মেধাবুদ্ধি নিয়ে হাসি-মশকরাও কম হয়নি। বিশ্বমিডিয়াতেও পরম কৌতুকের বিষয় হয়ে দাঁড়াল, একজন বালুচ দোকানদার দুঁদে গোয়েন্দাদের নাকানিচোবানি খাইয়ে ছেড়ে দিয়েছে। এই দোকানদারের পেছনে কে আছে? এই প্রশ্নের উত্তরে আফগান-মার্কিন-ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কখনো আইএসআইয়ের ওপর অভিযোগ আরোপ করেছে, কখনো তালেবানের পক্ষ থেকে টেস্ট গেইম বলে গা বাঁচানোর চেষ্টা করা হয়েছে। অন্যদিকে তালেবানের কাছেও এ কথা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল, হানাদার বাহিনীর কাছে তাদের নেতৃবৃন্দের ছবি বা ফিঙ্গারপ্রিন্ট কিছুই নেই। যে কেউ তাদেরকে বেকুব বানাতে পারে। বাস্তবে বেকুব বনেছেও।

বহুরূপী মোল্লার ঘটনায় আরেকটা দিকও সামনে এসেছিল। কিছু তালেবান কমান্ডার সত্যি সত্যি আফগান সরকার ও আমেরিকার সাথে আলোচনার

পক্ষপাতি ছিলেন। তারা বুঝতে পেরেছিলেন, অপরপক্ষও আলোচনার জন্য মুখিয়ে আছে। এজন্য হানাদার পক্ষ যেকোনো শর্তে রাজি। এই কমান্ডাররা কোনো এক উপায়ে মার্কিন সরকারের সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হলো। ব্যাপারটার সূচনা এভাবে হয়েছিল। রাহবরি শুরা তাদের উচ্চপদস্থ সদস্যের মাধ্যমে এক সৌদি নাগরিকের সাথে যোগাযোগ করল। সেই সৌদি নাগরিক মার্কিন কর্মকর্তা বার্নার্ড ওয়াবেনের সাথে যোগাযোগ করল। ওবামা প্রশাসনে পাক-আফগান বিষয়ক কর্মকর্তা ছিল রিচার্ড হলোব্রুক। তার অধীনেই বার্নার্ড ওয়াবেন কাজ করত। সেই অজ্ঞাতনামা সৌদি নাগরিক দুবাইতে বার্নার্ড ওয়াবেনের সাথে সাক্ষাৎ করল। তাকে জানানো হলো, মোল্লা ওমরের নেতৃত্বাধীন রাহবরি শুরা আমেরিকার সাথে আলোচনার জন্য প্রস্তুত। রাহবরি শুরার পক্ষ থেকে তৈয়ব আগাকে প্রতিনিধি নির্ধারণ করা হলো। তিনি প্রথম তালেবান সরকারে মোল্লা ওমরের চিফ অব দ্য স্টাফ ছিলেন। মোল্লা ওমরের আত্মীয়ও ছিলেন। অনর্গল ইংরেজি বলতে পারতেন। ইউরোপিয়ানদের সাথে দীর্ঘ সময় কাটানোর সুবাদে তাদের মেজাজ-মর্জি বুঝতেন। আলোচনার জন্য তিনি উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন।

আলোচনা শুরু করতে গিয়ে একটা সমস্যা দেখা দিলো। রাহবরি শুরা পাকিস্তানকে পাশ কাটিয়েই আলোচনা করতে গিয়েছিল। পাকিস্তান ব্যাপারটাকে সুনজরে দেখল না। পাক প্রশাসন তালেবান-আমেরিকা আলোচনা বন্ধ বা বানচাল করার জন্য উঠেপড়ে লাগল। যেকোনো মূল্যে মার্কিন দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ রোধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করল। পাক প্রশাসন সৌদি আরবকে অনুরোধ করেছিল, তারা যেন তালেবানকে আমেরিকার সাথে যোগাযোগ করতে সাহায্য না করে। তৈয়ব আগাও কম যান না। তিনি এরই মধ্যে এক আফগান প্রবাসীর মাধ্যমে জার্মান ইন্টেলিজেন্সের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন। ২০১০ সালে জার্মান গোয়েন্দারা কাতারের রাজধানী দোহায় তৈয়ব আগার সাথে সাক্ষাৎ করেছিল। জার্মান গোয়েন্দারা এ বিষয়ে মার্কিন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করল। তালেবান সৌদি ও জার্মান দুটি সূত্রে আমেরিকার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেছিল। আমেরিকা যখন জার্মান ইন্টেলিজেন্সের পক্ষ থেকে তালেবানের প্রস্তাব পেল, তারা একে অপরের মুখে তাকাতাকি করতে লাগল। তারা ঘরপোড়া গরু। আগের লজ্জাজনক স্মৃতি এখনো দগদগে হয়ে আছে। সেবার এক বহুরূপী লাখো ডলার হাতিয়ে চম্পট দিয়েছিল। মার্কিনিরা এবার আর বলির পাঠা হতে নারাজ। তারা সতর্কতার

সাথে ধীরে-সুস্থে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। তারা বুঝতে চাইছিল, এবারকার প্রস্তাবদাতা আগের জালঠগী আখতার মনসুর না তো? মার্কিন গোয়েন্দারা নিশ্চিত হওয়ার জন্য তৈয়ব আগার সামনে দুটি প্রস্তাব রাখল। দুটি প্রস্তাবের মাধ্যমে তৈয়ব আগা তালেবানের প্রকৃত প্রতিনিধি হওয়া, না হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

প্রথম প্রস্তাব : তালেবানের হাতে বন্দি থাকা মার্কিন সেনা জীবিত থাকার ব্যাপারে প্রমাণ পেশ করবে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব : এবার ঈদ উপলক্ষে দেওয়া শুভেচ্ছাবাণীতে মোল্লা ওমর যেন সোমালিয়ার মুসলমানদের কথাও উল্লেখ করেন।

তৈয়ব আগা প্রস্তাব দুটি পূরণের ব্যবস্থা করলেন। বন্দি মার্কিন সেনা সম্পর্কে তথ্য এনে দিলেন এবং ঈদের বাণীতে সোমালিয়ার মুসলমানদের কথাও উল্লেখ থাকল। মার্কিনিরা বুঝতে পারল, তৈয়ব আগার তালেবান প্রধানের সাথে যোগাযোগ আছে। ২০১০ সালের নভেম্বরে তৈয়ব আগার সাথে মুখোমুখি বসার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। বৈঠকটা জার্মানির মিউনিখ শহরের কোনো সেফ হাউজে হওয়ার কথা ছিল। তৈয়ব আগাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাতারের রাজধানী দোহাতে একটি জার্মান বিমান অপেক্ষমাণ ছিল। উড়োজাহাজে ওঠার আগমুহূর্তে এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল। তৈয়ব আগা বিমানে উঠতে অস্বীকৃতি জানালেন। তিনি আশঙ্কা করছিলেন, এই বিমান তাকে জার্মানি নয়, কুখ্যাত গুয়ানতানামো বেতে নিয়ে যাবে। তৈয়ব আগাকে নিতে আসা জার্মান কর্তৃপক্ষ ভীষণ পেরেশানিতে পড়ে গেল। তারা মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সাথে যোগাযোগ করল। ওবামা নিজের পক্ষ থেকে গ্যারান্টি দিলো, তৈয়ব আগাকে আলোচনা শেষে সসম্মানে দোহায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিজ দায়িত্বে এই কাজ করবেন। তৈয়ব আগা আশ্বস্ত হয়ে বিমানে উঠলেন।

বাহ্যিক বেশবাসে তৈয়ব আগা তালেবানের চেয়ে ব্যতিক্রম ছিলেন। খোঁচা খোঁচা দাড়ি আর সাধারণ পোশাক পরে তৈয়ব আগা আমেরিকান প্রতিনিধির সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তালেবানের মতো সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবি পরেননি। তালেবানের পক্ষ থেকে তিনি একাই গিয়েছিলেন আলোচনায় অংশ নিতে। প্রথম বৈঠকে তালেবানের পক্ষ থেকে খুব বেশি দাবি-দাওয়া পেশ করা হয়নি। শুধু বলা হয়েছে, তালেবান কয়েদিদের মুক্তি দেওয়া হোক এবং

তালেবানের একটা রাজনৈতিক দপ্তর খোলার অনুমতি দেওয়া হোক। তাহলে তালেবানের একটা স্থায়ী ঠিকানা থাকবে। দুই পক্ষের যোগাযোগও সহজ হবে। অন্যদিকে আমেরিকার পক্ষ থেকে দাবি ছিল, তালেবানের হাতে বন্দি থাকা মার্কিন সেনা ও কর্মকর্তাদের মুক্তি দেওয়া হোক। দ্বিতীয় দাবি ছিল, আফগানিস্তানে চলমান শান্তি প্রক্রিয়ায় তালেবানকেও অংশ নিতে হবে।

আলোচনা আরো অগ্রসর হওয়ার পর আমেরিকা তালেবানের কাছে তিনটি শর্ত পেশ করল :

১. তালেবান চরমপন্থা বর্জন করবে।
২. আল কায়েদার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে।
৩. আফগানিস্তানের আইনকে মেনে নিবে।

আমেরিকা এসব আলোচনার কথা গোপন রেখেছিল। এমনকি আফগান ও পাক সরকারকেও জানতে দেয়নি। কাবুল কোনোভাবে এসব আলোচনার সংবাদ জেনে গিয়েছিল। ২০১১ সালের ২৫ মে কাবুল সরকার এসব গোপন আলোচনার সংবাদ জার্মান পত্রিকা দ্যা স্প্যাগলের কাছে ফাঁস করে দিয়েছিল। সুনির্দিষ্টভাবে তৈয়ব আগার নামও উল্লেখ করেছিল। এই সংবাদে পাক সরকার বেজায় গোস্‌সা হলো। আমেরিকার জন্য এতকিছু করার পরও কেন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় পাকিস্তানকে অচ্ছুত করে রাখা হলো? ওসামা বিন লাদেন শহীদ হওয়ার এক মাসও হয়নি; পাকিস্তানের মাটিতে এতবড় মার্কিন হামলার কারণে পাকিস্তান এমনিতেই আমেরিকার ওপর ক্ষুব্ধ ছিল, এখন তালেবান-আমেরিকা দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় পাকিস্তানকে সাথে না রাখার অর্থ হলো, আমেরিকা তাদেরকে গোনায় ধরছে না। অপরিসীম ঝুঁকি সত্ত্বেও আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার প্রথম থেকে সহযোগিতার এই বুঝি পুরস্কার? পাক কর্তৃপক্ষ কোনোভাবেই নিজেদের এই অপমান সহ্য করতে পারছিল না।

পাক সরকারের গোস্‌সা ভাঙানোর জন্য মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন তড়িঘড়ি ইসলামাবাদ সফর করল। আমেরিকা আপাতত পাকিস্তানকে কোনো রকমভাবে শান্ত করতে সক্ষম হলো। তালেবান-আমেরিকার দ্বিপাক্ষিক আলোচনা এই যে শুরু হলো, আর ছিন্ন হয়নি। ওসামা বিন লাদেন শহীদ হওয়ার পর আমেরিকা নিজেদেরকে চলমান যুদ্ধে জয়ী ভাবতে শুরু করেছিল। তালেবানের সাথে আলোচনার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল। প্রথম দ্বিপাক্ষিক আলোচনার প্রায় আড়াই বছর পর ২০১৩ সালে কাতারের রাজধানী

দোহায় তালেবান রাজনৈতিক দপ্তর খোলার অনুমতি পেল। দপ্তর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান লাইভ দেখানো হয়েছিল। তালেবান তাদের নতুন দপ্তর প্রাঙ্গণে নিজেদের পতাকা উত্তোলন করল। কালেমাখচিত সাদা পতাকা। পতাকা উত্তোলনকারীগণ সবাই সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবি ও কালো কোট পরিহিত ছিলেন। ভবনটি ছিল দুইতলা বিশিষ্ট। বাইরে লেখা ছিল, পলিটিক্যাল অফিস অফ দ্যা ইসলামিক ইমারাত অফ আফগানিস্তান। প্রথমদিকে এই দপ্তরে নিয়মিত বসতেন তৈয়ব আগা, শের মোহাম্মাদ আব্বাস স্ট্যানিকজাই, শাহাবুদ্দিন দিলাওয়ার। সুহাইল শাহিনকে এই দপ্তরের মুখপাত্র নিয়োগ করা হলো। শেষ পর্যন্ত তিনিই মুখপাত্র ছিলেন।

কাতারে তালেবানের দপ্তর খোলার অনুমতি দেওয়া মূলত কাবুল সরকারের পিঠে পেছন থেকে খঞ্জর মারার নামান্তর ছিল। তালেবান উৎখাত করে আমেরিকাই কাবুল সরকারের জন্ম দিয়েছিল। এই সরকারকে পেলেপুষে হৃষ্টপুষ্ট ও নাদুস-নুদুস করেছিল। দোহায় তালেবানকে দপ্তর খোলার অনুমতি দেওয়ার অর্থ, আমেরিকা আফগানিস্তানে তালেবানকেও একটি বৈধ পক্ষ হিসেবে মেনে নিয়েছে। তালেবান এখন আর আমেরিকার দৃষ্টিতে সন্ত্রাসী নয়। দপ্তর খোলার আগে তালেবানের সাথে আমেরিকার আলোচনা অফ দ্যা রেকর্ড ছিল। এখন দ্বিপাক্ষিক আলোচনা অফিসিয়াল হয়ে গেছে। কাবুলের কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে, আমেরিকা এখন আর কাবুল সরকারকে গোনায় ধরছে না। তাদেরকে বাইপাস করেই তালেবানের সাথে আলোচনা এগিয়ে নিতে ইচ্ছুক। কাবুল সরকার মার্কিন নাগরের এতটা উপেক্ষা সহ্য করতে পারল না। দোহায় দপ্তর খোলার বিরুদ্ধে কাবুল সরকার তীব্র প্রতিবাদ জানাল। তাদের মুখ বন্ধ করার জন্য তালেবানের দোহা দপ্তর থেকে পতাকা নামিয়ে দেওয়া হলো। দপ্তরের সামনে থেকে নামফলকও উঠিয়ে দেওয়া হলো। এই বাহ্যিক পরিবর্তনে কীইবা আসে যায়? মূল কাজ তো ঠিকই চলছিল। দুইপক্ষের নিয়মিত আলোচনা-বৈঠক আয়োজিত হচ্ছিল। দপ্তর খোলার অন্যতম উপকার এই ছিল, গোটা দুনিয়া থেকে এখন যে কেউ চাইলে তালেবানের সাথে যোগাযোগ করতে পারে।

তালেবান এরইমধ্যে মার্কিন সেনা বো বরবিদালকে মুক্তি দিয়েছে। তার মুক্তি দ্বিপাক্ষিক আলোচনার পালে জোর হাওয়া লাগাল। বিনিময়ে আমেরিকাও ৫ তালেবান বন্দিকে গুয়ানতানামো থেকে মুক্তি দিয়ে কাতারে পৌঁছে দিলো। ২০১৪ সাল তালেবান ও আমেরিকা দুইপক্ষের জন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বছর

ছিল। এই বছর আমেরিকা ও ন্যাটো বাহিনীর আফগান অভিযান একপ্রকার সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। গুয়ানতানামো থেকে তালেবান বন্দিরা একে একে ফেরত আসতে শুরু করল। দুইপক্ষের বরফ দ্রুত গলতে শুরু করল। আচানক এক নাজুক মোড় সৃষ্টি হলো। ২০১৬ সালে মার্কিন ড্রোন এক চাঞ্চল্যকর কাণ্ড ঘটাল। পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের জাতীয় মহাসড়কে আমেরিকা ড্রোন হামলা চালিয়ে তালেবানের সর্বোচ্চ নেতা মোল্লা আখতার মনসুরকে হত্যা করল। মোল্লা আখতার মনসুরই এতদিন দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় তালেবানের নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলেন। তিনি অবশ্য আলোচনায় অংশ নিতেন না। পর্দার আড়ালে থেকেই পরিচালনা করতেন। মোল্লা আখতার মনসুরের হত্যাকাণ্ড দ্বিপাক্ষিক আলোচনার জন্য ভীষণ হুমকি হয়ে দেখা দিলো। মোল্লা হাইবাতুল্লাহ আখুন্দজাদাকে তালেবানের সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচন করা হলো। নতুন আমির চলমান আলোচনাকে বন্ধ করলেন না। ওবামার শাসনকালে বড় ধরনের কোনো অগ্রগতি হয়নি। এর কারণ, মার্কিন প্রশাসন চাচ্ছিল, তালেবান কাবুল সরকারের সাথেই আলোচনা করুক। অন্যদিকে আফগান সরকার কাবুলের বাইরে দোহা বা নরওয়েতে গিয়ে তালেবানের সাথে আলোচনায় বসতে রাজি ছিল না। আফগান সরকারের খাহেশ ছিল, তালেবান কাবুলে এসে তাদের সাথে আলোচনায় বসুক। বিপরীতে তালেবান কাবুলকে বৈধ সরকার বলেই স্বীকার করত না। আসল প্রতিপক্ষ তো আমেরিকা। কাবুলের কারজাই-ঘানি তো কাঠপুতলি। আলোচনা হবে আমেরিকার সাথে। একটি শর্তের ওপর আলোচনা হবে, আমেরিকা কবে আফগান ছেড়ে যাবে।

২০১৭ সালে ট্রাম্প আসার পর আলোচনায় গতি এসেছিল। ততদিনে পুরো আফগান জুড়ে তালেবানের অবস্থান অনেক মজবুত হয়ে গিয়েছে। কাবুলের বাইরে আফগান সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না বললেই চলে। নামকাওয়াস্তে কয়েকটি প্রদেশ কাবুল প্রশাসনের অধীনে ছিল। সেসব প্রদেশও কার্যত তালেবানের নিয়ন্ত্রণেই ছিল। ২০১৮ সালের ৩১ জানুয়ারিতে বিবিসি বলেছিল, যে তালেবানকে পরাজিত করার জন্য আমেরিকা নেতৃত্বাধীন বাহিনী বিলিয়ন-বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছিল, সে তালেবান এখন আফগানিস্তানের ৭০% অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করে। এসব অঞ্চলে তালেবান প্রকাশ্য দিবালোকে স্বাধীনভাবে তাদের তৎপরতা চালায়। এ সময় তালেবান উত্তর আফগানের গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ কুন্দুজের রাজধানীর ওপর বারবার হামলা করছিল। এ

ধরনের হামলায় মার্কিন-ন্যাটো জোটের বিমান-ড্রোন হামলার কারণে বারবার পিছু হটতে বাধ্য হতো; তবে তালেবান দমে যেত না। একের পর এক হামলা করে স্থলভাগে থাকা আফগান সেনাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলত। প্রতিটি তালেবান হামলাতেই বিপুল পরিমাণ আফগান সেনা নিহত হতো। আল জাযিরার রিপোর্ট মোতাবেক, ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে আফগান সেনাদের হতাহতের পরিমাণ ৩৫% বৃদ্ধি পেয়েছিল। আমেরিকার কাছ থেকে বিলিয়ন ডলার অর্থ সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও আফগান সেনাবাহিনী নিজেদের ন্যূনতম আত্মরক্ষা করার যোগ্যতাও অর্জন করতে পারেনি। আফগান বাহিনীতে নতুন সদস্য ভর্তিকে অত্যন্ত সহজ করে দেওয়া হয়েছিল। ৪০ বছর বয়সিরাও চাইলে ভর্তি হতে পারত। তা সত্ত্বেও আফগান সেনাদের সংখ্যা দিনদিন আশঙ্কাজনক হারে কমতে শুরু করেছিল। প্রতি বছর এক তৃতীয়াংশ সেনা হ্রাস পেতে থাকে। এদের বেশিরভাগ তালেবানের হাতে মারা পড়ত; কিছু সংখ্যক নিয়মতান্ত্রিক বা স্বেচ্ছা অবসরে যেত। কেউ কেউ পালিয়ে যেত। অনেকে অস্ত্র নিয়ে তালেবানে যোগ দিত। আফগান সেনাদের প্রয়োজনীয় পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৯৫ হাজার। এই সংখ্যা খুব কম সময়ই পূর্ণ থাকত। সবসময় ২৫-৩০ হাজার ঘাটতি থাকত।

আফগান সেনাবাহিনীর এহেন ঘাটতির পেছনে দুর্নীতি বহুলাংশে দায়ী ছিল। সেনাকর্তারা বেশিরভাগ সময় সেনাদের মোট সংখ্যা বলার ক্ষেত্রে প্রকৃত সংখ্যার চেয়ে বাড়িয়ে চড়িয়ে বলত। এমন সেনাদেরকে ঘোস্ট সোলজার বলা হতো। তাদের উপস্থিতি স্রেফ কাগজে-কলমে ছিল, বাস্তবে ছিল না। ঘোস্ট সোলজারদের মাসোহারা ও উর্ধ্বতন কর্তারা প্রতি মাসে উসুল করে নিজেরা ভাগাভাগি করে নিত। এই সমস্যার কথা আফগান সরকার জানত। এর সমাধানকল্পে ইলেক্ট্রনিক পেমেন্ট সিস্টেম চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এই ব্যবস্থায় শুধু তালিকাভুক্ত ব্যক্তিই ফিঙ্গারপ্রিন্ট ও অন্যান্য মাধ্যম ব্যবহার করে টাকা তুলতে পারবে। দুর্নীতিবাজ সেনা অফিসারদের কারণে আফগান সরকার এই ব্যবস্থা চালু করতে পারেনি। তালেবানবিরোধী লড়াইয়ে নিহত সেনাদের প্রকৃত সংখ্যাও আফগান সরকার প্রকাশ করত না। বিপুল পরিমাণে নিহত সতীর্থের সংখ্যা জানতে পারলে অবশিষ্ট সেনারা পালিয়ে যাওয়ার সমূহ আশঙ্কা ছিল।

২০১৯ সালে আফগান প্রেসিডেন্ট আশরাফ ঘানি স্বীকার করেছিল, ২০১৪ সালে প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেকে এই পর্যন্ত ৪৫ হাজার আফগান সেনা

তালেবানের হাতে নিহত হয়েছে। এদের মধ্যে পুলিশও ছিল। ৫ বছরে প্রতি মওসুমে ৯ হাজার করে সেনা মারা পড়েছিল। ২০১৪ সালের পর থেকে বিদেশি হানাদার সেনাদের নিহত হওয়ার সংখ্যা বহুলাংশে হ্রাস পেয়ে আসছিল। কারণ তখন বিদেশি সেনারা নিজেদের ক্যাম্পের বাইরে খুব একটা বেরোত না বললেই চলে। ২০১৪ সালে ৫৫ জন মার্কিন সেনা হালাক হয়েছিল। এরপর থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ২৪ জন বিদেশি সেনা হালাক হয়েছে। প্রতি বছর গড়ে ৫ জনের মতো বিদেশি সেনা হালাক হতো।

২০১৭ সালে ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর আফগানিস্তানের যুদ্ধকে উসকে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। ট্রাম্প চাচ্ছিল, আমেরিকাকে শক্তিশালীরূপে দেখাতে। ততদিনে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল, আফগানিস্তানে কখনোই আমেরিকা তাদের কাঙ্ক্ষিত জয় অর্জন করতে পারবে না। ট্রাম্প অনেক চেষ্টা করেছিল যুদ্ধ অব্যাহত রাখতে। ট্রাম্প অতিরিক্ত ৩০০০ সেনা মোতায়েন করেছিল আফগানিস্তানে। ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে আফগানে থাকা মার্কিন সেনাদের মোট সংখ্যা ছিল ১৪ হাজার। ট্রাম্প এসে ইসলামিক স্টেটের বিরুদ্ধেও জোরদার অভিযান চালিয়েছিল। ২০১৭ সালের ১৩ এপ্রিল নাঙ্গারহার প্রদেশে ইসলামিক স্টেটের অবস্থান লক্ষ্য করে আমেরিকা মাদার অব অল বম্ব নিক্ষেপ করেছিল। এটা আমেরিকার সবচেয়ে বড় অ-পারমাণবিক বোমা। এই বোমা ব্যবহার করা আন্তর্জাতিক আইনে নিষিদ্ধ। এই বোমার ওজন ১১ টন। এই হামলায় ইসলামিক স্টেটের ৯০ জনেরও বেশি সদস্য মারা গিয়েছিল।

২০১৭ সালের আগস্টে ট্রাম্প ঘোষণা দিয়েছিল, আফগানিস্তানে যুদ্ধ চলবে। কিছুদিন পর ট্রাম্প তার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য হয়েছিল। তালেবান ও আমেরিকার মধ্যে আলোচনা আবার শুরু হয়েছিল। ২০১৯ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে বিশ্বমিডিয়াতে প্রকাশ পেল, তালেবান ও আমেরিকা চুক্তির একটি খসড়ার ওপর একমত হয়েছে। আলোচনা এগিয়ে চলল। ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ সালে চুক্তির ধারাগুলো চূড়ান্ত হলো। দুই পক্ষ চুক্তি সম্পর্কে যৌথ ঘোষণা দিয়েছিল। আমেরিকার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটেও চুক্তির ধারাগুলো প্রকাশ করা হলো। চুক্তিটিতে ৪টি ধারাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে :

১. কোনো আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী সংগঠন বা সন্ত্রাসী আফগানিস্তানের মাটিতে বসে আমেরিকা ও তার মিত্রদের বিরুদ্ধে তাদের কার্যক্রম চালাতে পারবে না। তালেবানকে এই গ্যারান্টি দিতে হবে।

২. এই চুক্তি সম্পাদনের পর আমেরিকা ও ন্যাটো জোটের সমস্ত সেনা আফগানিস্তান থেকে বেরিয়ে যাবে।

৩. তালেবান ও কাবুল সরকারের মাঝে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।

৪. স্থায়ী ও পরিপূর্ণ যুদ্ধবিরতি হবে।

এ ছাড়া চুক্তিতে এ কথাও বলা ছিল, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে আবেদন করা হবে, তালেবান নেতাদের ওপর থেকে যেন নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। ঘোষণামতো তালেবানকে সন্ত্রাসী দলের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, কিছু নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখা হয়েছে। এছাড়া এই চুক্তিতে আমেরিকা ও বিদেশি সেনারা আফগান ছাড়ার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার ১৪ মাসের মধ্যে মার্কিনজোট আফগানিস্তান থেকে বেরিয়ে যাবে। চুক্তির এই ধারা তালেবানের জন্য সুস্পষ্ট বিজয়ের ঘোষণা। কাবুল সরকার অল্প কদিনের মেহমানমাত্র। চুক্তির তৃতীয় ধারা দেখলে যে কারো মনে হবে, কাবুল সরকারকেও এই চুক্তিতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে ধরা হয়েছে। বাস্তবে কাবুল সরকারের চার পয়সারও মূল্য ছিল না। কাবুল সরকার চুক্তিতে স্বাক্ষরকারীও ছিল না, পুরো আলোচনায়ও শরিক ছিল না। চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর আমেরিকা যখন পর্যায়ক্রমে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের আলোচনা শুরু করেছিল, তখন আশরাফ ঘানি আমেরিকার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করতে শুরু করেছিল। চুক্তি মোতাবেক তালেবান বন্দিদের মুক্তির প্রসঙ্গ এলে আশরাফ ঘানি বেঁকে বসল। বন্দি তালেবানকে মুক্তি দিতে সাফ অস্বীকার করল। পরে আশরাফ ঘানিকে বাধ্য করা হয়েছে।

তালেবান-আমেরিকা চুক্তি শুধু কাবুল সরকারেরই অপছন্দ ছিল তাই নয়, ভারত-পাকিস্তান ও ইরানেরও অপছন্দ ছিল।

০৮.

কাতারের রাজধানী দোহার সাগর তীরে একটি আকাশচুম্বী শিশমহল আছে। দেখতে অনেকটা সিলিন্ডারের মতো। দিনের বেলা সূর্যের প্রখর তাপে সেই আয়নাঘরের কাঁচগুলো ঝিকঝিক করতে থাকে। দেখলে মনে হবে, মরুসূর্যের তীব্র উত্তাপে ভেতরটা গনগনে চুল্লির মতো হয়ে আছে। বাস্তবে ঘটে উল্টো। নির্মাণপ্রযুক্তির কারণে ভেতরের অধিবাসীরা গরমের সামান্যতম আঁচও অনুভব করে না। ২০১৯ সালের ২২ জানুয়ারিতে এই ভবনের এক কক্ষে মুখোমুখি

বসেছিলেন জালমেই খলিলযাদ ও শের মুহাম্মাদ আব্বাস স্ট্যানিকযাই। জালমেই খলিলযাদ মার্কিন প্রতিনিধি প্রধান। তিনি পশতু বুঝতেন। তার মাতৃভাষা পশতু। মার্কিন প্রতিনিধি দলের বাকি সবাই পশতু বুঝতে পারত না। সাথে একজন দোভাষী রাখা হয়েছিল। শের মোহাম্মাদ তালেবান প্রতিনিধিপ্রধান ছিলেন। এই আলোচনাই চূড়ান্ত ছিল। বর্তমানে যে চুক্তির কথা প্রায়ই মিডিয়াতে আসছে। প্রতিনিধিরা স্থির হয়ে বসতেই শের আব্বাস বলে উঠলেন, যুদ্ধ অনেক দীর্ঘ হয়ে গেছে। লাখো গ্যালন রক্ত অযথা প্রবাহিত হয়েছে। আমরা আর যুদ্ধ চাই না। আমরা শান্তি চাই। মার্কিন পক্ষের দোভাষীও একজন আফগান নাগরিক ছিলেন। আবদুল্লাহ আমিনী। এই দোভাষীও অনেক বছর ধরে আমেরিকার পক্ষ হয়ে কাজ করছিল। তারও অনেক নিকটাত্মীয় এই দীর্ঘ যুদ্ধে মারা গিয়েছে। শের মোহাম্মদের বক্তব্য ইংরেজিতে অনুবাদ করতে গিয়ে আবদুল্লাহ আমিনী কান্নায় বাকরুদ্ধ হয়ে গেল। বৈঠকে উপস্থিত উভয়পক্ষের প্রতিনিধিরা আবেগপ্রবণ হয়ে গেল। জালমেই খলিলযাদ আলোচনার জন্য পাঁচটি ধারা পেশ করলেন। এর একটি আরেকটির সাথে যুক্ত ছিল। একটি ধারাকে না মানা বাকি চার ধারাকে না মানার শামিল। হয় সবগুলো ধারা মানতে হবে নইলে সবগুলোকে অস্বীকার করতে হবে। আলোচনার শুরুতে উভয়পক্ষ মিঠিমিঠি কথাবার্তা বলত লাগল। মার্কিনপক্ষ বলল, আমরা ২০১৯ সালের এপ্রিলের মধ্যে আফগানিস্তান থেকে অর্ধেক সেনা প্রত্যাহার করে নেব। জবাবে তালেবান পক্ষ বলল, আমরা কোনো অবস্থাতেই আফগানিস্তানের মাটিতে আল কায়েদা বা ইসলামিক স্টেটকে পা জমাতে দিব না। আমাদের মাটি কোনো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কখনোই ব্যবহৃত হবে না। এসব আলোচনা করতে করতে উভয়পক্ষই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উপনীত হলো। এই বিষয়েই উভয়পক্ষের মতভেদ ছিল। খলিলযাদ বলল, আলোচনা ফলপ্রসূ করার জন্য তালেবানকে পুরো আফগানিস্তানে যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে। এ কথা তালেবানপক্ষ মানতে প্রস্তুত ছিল, তবে আমেরিকা যেভাবে চায়, সেভাবে মানতে প্রস্তুত ছিল না। শের মোহাম্মদ বললেন, এই বিষয়টা আমরা আগামী বৈঠকের জন্য তোলা রাখতে চাই। আশরাফ ঘানি সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই থামানো সম্ভব নয়। সেটা হবে তালেবানের জন্য আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। তালেবান যেকোনো মূল্যে আফগানিস্তানে 'ইসলামি ইমারত' প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর ছিল। এই প্রশ্নে আলোচনায় সাময়িক অচলাবস্থা তৈরি হলো। অনেক চেষ্টাসাধনার পর এই

আলোচনা শুরু করা গেছে। এটাকে যেকোনো মূল্যে জারি রাখা ভীষণ জরুরি—এ কথা উভয়পক্ষই বুঝতে পারছিল না। এই আলোচনাকে পূর্ণতায় পৌছানোর জন্য আরো কয়েকবার বসতে হবে।

জালমেই খলিলযাদ এই পর্যায়ে তার কূটনৈতিক দক্ষতা কাজে লাগাল। খলিলযাদ আরো কয়েক সপ্তাহ আগে পাকিস্তানের সহযোগিতায় একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। খলিলযাদের আশা ছিল, তার নেওয়া পদক্ষেপের কারণে আলোচনা একটি সিদ্ধান্তমূলক অবস্থানে পৌছবে। ২০১৮ সালের শেষদিকে খলিলযাদ পাকিস্তান সফরে গিয়েছিল। তখন পাক সেনাপ্রধান কামার জাভেদ বাজওয়ার সাথে সাক্ষাৎ করেছিল। তখন বলেছিল, তালেবানের সাথে ফলপ্রসূ আলোচনার সুবিধার্থে মোল্লা আবদুল গনি বেরাদরকে মুক্তি দেওয়া জরুরি। মোল্লা বেরাদর তালেবানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নেতা হিসেবে বিবেচিত হতেন। আমেরিকার চাহিদামতো ২০১৮ সালের অক্টোবরে পাক সরকার মোল্লা বেরাদরকে মুক্তি দিয়েছিল। মোল্লা বেরাদর পাকিস্তান থেকে সরাসরি দোহায় পৌছলেন। পাঁচতারকা মানের হোটেল প্রিন্স কার্লটনে তার থাকার জায়গা হলো। এই হোটেল একটা গ্রামের আদলে গড়ে তোলা হয়েছিল। পাহাড়ে বেড়ে ওঠা তালেবান নেতা যাতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন, তাই এই ব্যবস্থা। ফেব্রুয়ারির শেষদিন দোহায় মোল্লা বেরাদর ও খলিলযাদ মুখোমুখি হলো। খলিলযাদ বলল, আমি আপনাকে নিয়ে অনেক স্টাডি করেছি। আমি যতদূর বুঝেছি, আপনি একজন শান্তিপ্রিয় মানুষ। মোল্লা বেরাদর উত্তরে বললেন, এর ব্যতিক্রম হলে আমি এখন আপনার সামনে বসা থাকতাম না। খলিলযাদ ও মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পের ভাষ্যমতে, মোল্লা বেরাদর সবচেয়ে সপিসটিকেটিড প্লেয়ার। তাদের মতে, তালেবানের সবচেয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন মোল্লা বেরাদর। এই প্রশংসা তাদের কোনো কৌশলের অংশও হতে পারে। কারো কারো মতে, মার্কিনপক্ষ মোল্লা বেরাদরকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে চেয়েছিল। তারা প্রায় সফলও হয়েছিল বলা চলে। মোল্লা বেরাদর নিঃসন্দেহে যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তালেবানের সহপ্রতিষ্ঠাতা। অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তি। মিডিয়ার বদৌলতে মোল্লা বেরাদর তালেবানের এক নাম্বার নেতায় পরিণত হয়ে গিয়েছিলেন। কাগজে-কলমে মোল্লা হাইবাতুল্লাহই তালেবানের প্রধান ছিলেন। মিডিয়ার তুমুল প্রচারণায় অনেকে ভেবেছিল, মোল্লা বেরাদর নবগঠিত তালেবান সরকার প্রধান হবেন; বাস্তবে তা হয়নি।

খলিলযাদ মাঝেমধ্যে হাঁটতে হাঁটতে মোল্লা বেরাদরের হোটেলে চলে যেতেন। দুজন একসাথে বসে চা-কফি পান করতেন। একদিন খলিলযাদ বেড়াতে গেল। মোল্লা বেরাদরের কামরায় গেল। পায়চারি করতে করতে কামরার জানালা খুলে দেখল, নিচে সুইমিং পুলে বিকিনিপরা মেয়েরা সাঁতার কাটছে। খলিলযাদ দুষ্টুমি করে বলল, আপনি তো রীতিমতো জান্নাতে আছেন দেখছি। মোল্লা বেরাদর এই দুষ্টুমি স্বাভাবিকভাবে নিলেন না। উঠে গিয়ে সশব্দে জানলা বন্ধ করে দিলেন। ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত দুই পক্ষের আলোচনা অব্যাহত থাকল।

এই দীর্ঘ আলোচনায় তালেবানের প্রধানতম চাওয়া ছিল, আমেরিকা কখন সম্পূর্ণরূপে আফগানিস্তান ছেড়ে চলে যাবে—তার সুনির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করা। আফগান সরকার তালেবানের ৫ হাজার বন্দি মুক্তি দিবে। বিনিময়ে তালেবান বিদায়ী মার্কিন সেনাদের ওপর হামলা করবে না; আল কায়েদাকে সাহায্য-সমর্থন করবে না আর আফগান সরকারের ১ হাজার কয়েদি মুক্তি দিবে। তবে তালেবান কোনো অবস্থাতেই আফগান সেনাদের বিরুদ্ধে চলমান হামলা বন্ধ করতে রাজি ছিল না। এর মধ্যে বিস্ময়কর বিষয় ছিল, মার্কিন প্রতিনিধিদল একটি বিষয় চুপচাপ মেনে নিয়েছিল যে, আমেরিকা আর তালেবানের ওপর হামলা চালাবে না। তালেবানের অবস্থানস্থল জানতে পারলে, তালেবানকে হামলা পরিকল্পনা করতে দেখলে অথবা তালেবানের গোপন ঠিকানা জানতে পারা সত্ত্বেও আমেরিকা তালেবানের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করবে না। আমেরিকা শুধু তখনই তালেবানের ওপর হামলা করবে, তালেবান যখন আফগান সেনাদের ওপর হামলা করতে শুরু করবে আর আফগান সেনারা আমেরিকার কাছে সাহায্য চাইবে। এটা ছিল আফগান সরকারের সাথে আমেরিকার সঙ্গিন গাদ্দারি।

চুক্তির এই ধারা নিয়ে মার্কিনপক্ষের কয়েকজন দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। তাদের বক্তব্য ছিল, এই ধারাটা মৌখিক থাকুক, লেখাপড়ায় না আসুক। সবমিলিয়ে আগস্ট নাগাদ আলোচনা চূড়ান্ত ধাপে উপনীত হলো। পুরো আলোচনায় আশরাফ ঘানি সরকার কাগজে-কলমে শরিক থাকলেও আশরাফ ঘানির ভাষায়, এই দীর্ঘ আলোচনায় জালমেই খলিলযাদ আমার সাথে কয়েক মিনিটের বেশি কথা বলেনি। আলোচনার খসড়া কপি আশরাফ ঘানির কাছেও পৌঁছল। ঘানি পুরো চুক্তিনামা আগাগোড়া ভালো করে পড়ল। কয়েকটা জায়গায় দাগ দিলো। সংশোধনী ও প্রস্তাবনা যোগ করল। মার্কিন প্রতিনিধিরা আশরাফ ঘানির

সংশোধনী বা প্রস্তাবনাকে কানাকড়ি মূল্যও দিলো না। আশরাফ ঘানির টীকা-টিপ্পনীসহই চুক্তিনামার মূলকপি হোয়াইট হাউজে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

হোয়াইট হাউজে এক মজাদার দৃশ্যের অবতারণা হলো। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প চুক্তিনামা হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখল। কৌতুকের ভঙ্গিতে কিছুটা পড়েও দেখল। কাগজে আশরাফ ঘানির টীকা দেখে ট্রাম্প এক অদ্ভুত প্রশ্ন করল, তোমরা এই নির্বোধের কাছে গিয়ে সময় কেন নষ্ট করছ? এরপর ট্রাম্প প্রতিনিধি দলের কোনো কথা শোনার আগেই বলে উঠল, তালেবানকে বলে দাও, আমাদের কাছে তাদের কোনো সাহায্য চাওয়ার থাকলে তারা বলুক। আমরা সাহায্য করতে প্রস্তুত। খলিলযাদ আর মাইক পম্পেই বলল, মিস্টার প্রেসিডেন্ট আপনার কথা বুঝতে পারিনি। ট্রাম্প বলল, তালেবান যদি কিছু টাকা-পয়সা চায়, তাদেরকে আমরা দিতে প্রস্তুত।

-মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আমরা তাদেরকে অর্থসাহায্য করতে পারি না। কারণ তারা এখনো সন্ত্রাসী তালিকাভুক্ত।

ট্রাম্প হয়তো সরকারিভাবে তালেবানকে অর্থসাহায্য দেওয়ার কথা বলেছিল। নইলে বেসরকারিভাবে টাকা দিতে চাইলে কোনো সমস্যা ছিল না। মোটকথা, ট্রাম্পের সাথে প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎটা অসম্পূর্ণ অবস্থায় শেষ হলো। খসড়াচুক্তিকে পরিপূর্ণভাবে লেখা হলো। মার্কিন প্রতিনিধি ২৫ আগস্ট ফের দোহায় হাজির হলো। তালেবানকে জানিয়ে দেওয়া হলো, চুক্তি মোতাবেক আমেরিকা চলে যাবে। চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর মার্কিনজোটের একজন সেনাও যদি মারা যায়, তাহলে চুক্তি বাতিল। আমেরিকা চাচ্ছিল আফগানিস্তানের ৩৪ জেলার মধ্য থেকে ৫টিতে প্রাথমিকভাবে সম্পূর্ণ যুদ্ধবিরতি হবে। কেউ কারো ওপর হামলা করতে পারবে না। বলাবাহুল্য, আফগান সেনাদের ওপর হামলা না করার শর্ত অন্তর্ভুক্ত ছিল না; বরং উল্টোটা ছিল। আমেরিকা কখনোই আফগান সেনাদের সাথে মিলে তালেবান ঘাঁটিতে হামলা করবে না। তালেবান আমেরিকাকে বলেছে, আমাদের ওপর হামলা করা যাবে না, তবে ইসলামিক স্টেটের ওপর অবশ্যই হামলা করতে হবে। আমেরিকা এমন করলে তালেবান আমেরিকার গলায় ফুলের মালা পরাবে। তালেবান প্রতিনিধির বক্তব্য অনেকটা এমন ছিল, আপনার যত ইচ্ছা ইসলামিক স্টেটের সদস্য হত্যা করুন, আমাদের কোনো আপত্তি থাকবে না। আমেরিকা তালেবানের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিল, তালেবান এরপর

কাবুলসহ বড় কোনো শহরে হামলা করবে না। বিদেশি দূতাবাসে হামলা করবে না।

চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে হতে আগস্ট শেষ হয়ে সেপ্টেম্বর এসে গেল। আফগান ও মার্কিন মিডিয়া খলিলযাদের কাছে প্রশ্ন করতে শুরু করল, আলোচনা কীভাবে হচ্ছে, চুক্তিতে কী কী ধারা থাকছে? চুক্তির পরিণতি কেমন হবে? সেপ্টেম্বরের ২ তারিখ খলিলযাদ কাবুলে গ্রিনজোনের সুরক্ষিত এক ভবনে অবস্থান করছিল। এক আফগান টিভি চ্যানেলের পক্ষ থেকে খলিলযাদের কাছে একই প্রশ্ন করা হলো। খলিলযাদ উত্তর দিলো, আমরা নীতিগতভাবে একটি চুক্তি স্বাক্ষরের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছি। এ কথা বলতে না বলতেই ভয়ংকর এক বিস্ফোরণে কাবুল শহর কেঁপে উঠল। তালেবান এই হামলার দায় স্বীকার করেছিল। গ্রিনজোনে অবস্থিত দওলতজাইয়ের ঘরে এই হামলা হয়েছিল। বাড়ির ছাদ উড়ে গিয়েছিল। সর্বমোট ১২ জন মারা গিয়েছিল। কাবুলের সাধারণ নাগরিকরা আমেরিকা ও বিদেশিদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল বের করল। তাদের উপস্থিতির কারণেই বারবার বোমা হামলা হচ্ছে। মিছিলে বলা হলো, আমেরিকা যেন অতিশীঘ্র আফগানিস্তান ছেড়ে চলে যায়। আমেরিকার কারণেই আফগানের জনগণ সারাক্ষণ নিরাপত্তা ঝুঁকিতে থাকে।

আলোচনা চলাকালে এটাই প্রথম হামলা ছিল না। ২০১৯ সালের ২৫ আগস্ট যখন এই চুক্তি মোটামুটি চূড়ান্ত রূপে উপনীত হয়েছিল, তার ঠিক পরপরই পুরো আফগান জুড়ে ধারাবাহিক হামলার ধারা জারি হয়ে গিয়েছিল। সামরিক ট্রাক, সামরিক স্থাপনা, আফগান সেনাদের ওপর ইস্তেশহাদি হামলা, মার্কিন স্থাপনার ওপর হামলার তীব্রতা বেড়ে গিয়েছিল। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল, তালেবানদের মধ্যে হয় ঐক্য নেই নয়তো কেন্দ্রীয় শুরার আদেশ সময়মতো তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে না। অথবা এক বা একাধিক শক্তিশালী দল এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হোক—সেটা চায় না। আমেরিকা যা আশঙ্কা করছিল, তালেবানকে বারবার সতর্ক করছিল, সেটাই হলো। এসব হামলায় জেরেমি নামক এক মার্কিন হালাক হলো। আগেই বলা হয়েছিল, একজন মার্কিন সেনা মারা গেলেও চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। মার্কিন সেনা নিহত হওয়ার সংবাদ শোনার সাথে সাথেই ট্রাম্প টুইট করল, তালেবান এত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলাকালেই যদি যুদ্ধবিরতি বজায় রাখতে না পারে, তার অর্থ এই যে, তালেবান এই আলোচনার উপযুক্ত নয়। আমাদের এক মহান সেনা সদস্য মারা গেছে। আমি এই মুহূর্তেই আলোচনা বাতিল ঘোষণা করছি, ২০১৯

সালের ৭ সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য আলোচনা বাতিল। মাইক পম্পেও ফোন করে খলিলযাদকে বলল, সব শেষ হয়ে গেল। চলুন বাড়ি যাই।

এটা ছিল ট্রাম্প শাসনের শেষদিকের কথা। আফগান ও আমেরিকায় যারা এই চুক্তি চাচ্ছিল না, তারা বেজায় খুশি হলো। এর ঠিক দুই মাস পর তালেবান প্রতিনিধি ও খলিলযাদ এক ব্রেক থ্রু আনতে সক্ষম হলো। আফগান জেল থেকে সিরাজুদ্দিন হক্কানীর ছোট ভাই ২৬ বছর বয়সি আনাস হক্কানীকে মুক্তি দেওয়া হলো। তিনি বর্তমান তালেবান সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। জবাবে তালেবানও ২০১৬ সাল থেকে বন্দি থাকা দুই প্রফেসরকে মুক্তি দিয়েছিল। একজন আমেরিকান, আরেকজন অস্ট্রেলীয়। আবার আলোচনা শুরু হলো। ৭ ডিসেম্বর মোল্লা বেরাদর ও খলিলযাদের দল মুখোমুখি হলো। মোল্লা বেরাদর বললেন, আমরা চুক্তি স্বাক্ষর করতে প্রস্তুত। শুধু আপনারা কবে আফগান ছাড়ছেন, তারিখটি বলুন। এটাই আমাদের প্রধানতম চাওয়া।

২০২০ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি দোহার শেরাটন হোটেলে চুক্তি স্বাক্ষরের মঞ্চ প্রস্তুত করা হলো। বিখ্যাত ছবিতে আমরা দেখেছি, মোল্লা বেরাদর ও খলিলযাদ একে অপরের দিকে তাকিয়ে হাসছেন। খলিলযাদ হাসছিলেন কারণ, আমেরিকার ইতিহাসের সবচেয়ে দীর্ঘ যুদ্ধ বন্ধে তিনি মৌলিক ভূমিকা পালন করেছেন। মোল্লা বেরাদর হাসছিলেন কারণ, তারা অবশেষে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছেন। এজন্য তালেবানকে ২০ বছরে ৫১ হাজার সদস্য হারাতে হয়েছে। চুক্তিতে আমেরিকা লিখেছে, ২০২১ সালের মে নাগাদ আফগানিস্তানের মাটি থেকে সমস্ত সেনা প্রত্যাহার করে নিবে। তালেবানও প্রতিশ্রুতি দিলো, তারাও পুরোদমে শান্তি আলোচনা শুরু করবে। আফগানিস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠায় জোরদার প্রয়াস চালাবে।

চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর মোল্লা হাইবাতুল্লাহ বিবৃতি দিলেন। এই চুক্তিকে পুরো মুসলিম বিশ্ব ও মুজাহিদিনে কেরামের বিজয় আখ্যায়িত করলেন। আফগান প্রেসিডেন্ট আশরাফ ঘানিও এই চুক্তিমতো কাজ করতে সম্মত হলো। পাশাপাশি এ কথাও জানিয়ে দিলো, এই চুক্তির সব ধারার সাথে সে একমত নয়। চুক্তি স্বাক্ষরের পরপরই ট্রাম্প ফোন করে আশরাফ ঘানিকে বলল, এমন এক চুক্তি করেছি, দোস্ত তো বটেই; দুশমনও প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছে। এই চুক্তি বাস্তবায়নের পরবর্তী ধাপ আপনার হাতে। আশরাফ ঘানি উত্তর দিলো, আমি তো আলোচনার জন্য প্রতিনিধি দোহায় পাঠাব; কিন্তু

তালেবান তাদের ওয়াদা রক্ষা করবে কি না, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারছি না। তারা যুদ্ধবিরতি মেনে চলবে কি না, বুঝতে পারছি না। আলোচনার জন্য প্রতিনিধিদল দোহায় পাঠানো হচ্ছে শুনে ট্রাম্প খুশিতে ডগমগ হয়ে বলল, আপনি কিছু দরকার হলে জানাবেন। এই বলে ফোন রেখে দিলো।

এর দুইদিন পর ট্রাম্প এবার ফোন করল মোল্লা বেরাদরকে। কথার শুরুতেই ট্রাম্প নিজস্ব ভঙ্গিতে বলল, আপনারা অনেক দক্ষ আর সাহসী যোদ্ধা। আপনার কিছু লাগলে বলুন, আমি পূরণ করার ব্যবস্থা করব। মোল্লা বেরাদর বললেন, আফগান সরকারের সাথে আলোচনায় বসার আগে জরুরি হলো, আমাদের ৫ হাজার কয়েদি মুক্তি দেওয়া। আমার মনে হয় না, ঘানি এ ব্যাপারে সাহায্য করবে। ট্রাম্প সাথে সাথে উত্তর দিলো, মোল্লা, আপনি এ নিয়ে পেরেশান হবেন না। আমি মাইক পম্পেওকে বলে দিব। সে আশরাফ ঘানিকে সামলে নিবে। আপনার আর কিছু চাই? মোল্লা বেরাদর কিছু চাইলেন না। ট্রাম্প ফোন রেখে দিলো।

ট্রাম্প পরের মাসে মাইক পম্পেওকে আফগানিস্তানে পাঠাল। পম্পেও এসে আশরাফ ঘানিকে বলল, তালেবানের ৫ হাজার কয়েদি মুক্ত না হলে আলোচনা শুরু করা যাবে না। ঘানিকে আশ্বাস দেওয়া হলো, পরিপূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠা হওয়ার আগ পর্যন্ত আমেরিকা ঘানিকে ছেড়ে যাবে না। ঘানি আশ্বস্ত হলো। তালেবানের সাথে ক্ষমতার ভাগাভাগির ব্যাপারে আশাবাদী হয়ে তালেবানের কাছে প্রার্থিত কয়েদিদের তালিকা চাইল। তালেবান যথাসময়ে তালিকা হস্তান্তর করল। তালেবান এও লিখে দিলো, দ্বিপাক্ষিক আলোচনার আগেই বন্দিদের মুক্তি দিতে হবে। তালেবানের পাঠানো তালিকা দেখে কাবুল-ওয়াশিংটন দুই জায়গাই অবাক। তালিকায় এমন বন্দির নামও ছিল, যারা আফগান সেনাদলে ভর্তি প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার পর তাদের বিদেশি প্রশিক্ষককে হত্যা করে অস্ত্রসহ পালিয়ে গিয়েছিল।

একটা সময় এমন ছিল, তালেবান সদস্যরা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে আফগান সেনাদলে ভর্তি হতে আসত। পরে সুযোগ বুঝে বিদেশি সেনাদের হত্যা করে শাঁথ অস্ত্র নিয়ে গা ঢাকা দিত। এমন কিছু তালেবানও পরবর্তীতে বন্দি হয়। এদের কারো কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তারা কিছু বিদেশি সেনাকে অফ-ডিউটিতে থাকাবস্থায় হত্যা করেছিল। বিদেশি সেনারা তখন ছুটি কাটাচ্ছিল; গেমস খেলছিল। আমেরিকার পক্ষ থেকে এসব কয়েদির মুক্তির

ব্যাপারে আপত্তি জানানো হলো। ঘানি সরকারের পক্ষ থেকেও বহু কয়েদির ব্যাপারে আপত্তি জানানো হলো। অমুক আন্তর্জাতিক মাদক ব্যবসায়ী, অমুক ধর্ষণকারী, অমুক খুনি, অমুক যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত। আমরা এমন কয়েদিকে মুক্তি দিতে পারি না। যাদের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ নেই, এমন হাজারখানেক বন্দিকে ঘানি সরকার মুক্তি দিয়ে দিলো। জবাবে তালেবান বলল, আমাদের পাঠানো তালিকায় থাকা প্রতিটি বন্দিকে মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত আমরা আলোচনা শুরু করতে রাজি নই। আশরাফ ঘানি তালেবানের এই দাবি মানতে রাজি ছিল না। ট্রাম্প তখন ঘানিকে চাপ দিয়ে বলল, এসব ছোটখাটো বিষয় নিয়ে পড়ে না থেকে বড় বিষয়গুলো নিয়ে ভাবা উচিত। জনাব ঘানি, আপনি যদি দাবি না মানেন, তাহলে আমরা আপনার সাথে সম্পর্ক বদলে ফেলব। ট্রাম্প মূলত ঘানিকে ঘুরিয়ে ধমকি দিয়েছিল। মানে ভালোয় ভালোয় তালেবানদের মুক্তি দিয়ে দাও, নইলে...। এমনকি যেসব কয়েদির ব্যাপারে আমেরিকার আপত্তি ছিল, তাদেরকেও মুক্তি দিয়ে দিতে বলেছিল। আমেরিকা সিদ্ধান্ত নিয়েই রেখেছিল, তারা তালেবানের ব্যাপারে আর কোনো চিন্তাই করবে না। তারা চলে যাওয়ার পর তালেবান কী করল না করল—এটা তাদের ভাবনার বিষয় নয়। শুধু মুখরক্ষার জন্য তালেবানকে আফগান সরকারের সাথে আলোচনার কথা বলেছিল। আলোচনার ফলাফল নিয়েও আমেরিকার ভাবনা ছিল না। আমেরিকা বলতে পারবে, আমরা তো যুদ্ধবিরতি দিয়ে দুইপক্ষকে শান্তি প্রতিষ্ঠার সুযোগ দিয়ে এসেছিলাম। তারা ব্যর্থ হলে আমরা কী করব? যারা নিজেরা শান্তিতে থাকতে চায় না, তাদেরকে অন্যরা কীভাবে শান্তি দিবে?

তালেবানও বুঝতে পেরেছিল, আমেরিকা কোনোরকমে মুখরক্ষা করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আফগানের মাটি ছাড়তে পারলে বাঁচে। তালেবান দুই দশক ধৈর্য ধরেছে। সময় নিয়ে তালেবানের কোনো সমস্যা ছিল না। এজন্য তালেবান তাদের কোনো দাবিতেই বিন্দুমাত্র ছাড় দিতে রাজি ছিল না। তাদের জানা হয়ে গিয়েছিল, তাদের যেকোনো দাবি প্রতিপক্ষ মেনে নিবেই। হ্যাঁ, তাদেরকে একটু মুখরক্ষার সুযোগ দিতে হবে। চুক্তি মোতাবেক তালেবান বিদেশি সেনাদের ওপর হামলা বন্ধ করে দিয়েছিল প্রায়। চুক্তির ধারা অনুযায়ী আফগানিস্তানের বড় শহরগুলোতেও হামলা করেনি তালেবান; দখলও করেনি। হ্যাঁ, আফগান সেনাদের ওপর মরণকামড় দেওয়া অব্যাহত রেখেছিল তালেবান। ধীরে ধীরে আমেরিকা চলে যাওয়ার সময় ঘনিয়ে

আসতে লাগল। যুদ্ধ বন্ধ করার কৃতিত্ব নেওয়ার জন্য ট্রাম্প মুখিয়ে ছিল। সত্যিকার যুদ্ধবিরতির জন্য তালেবান-কাবুল সরকারের আলোচনা জরুরি ছিল। আলোচনা শুরু করানোর জন্য ২০২০ সালের জুলাই মাসে খলিলযাদ ও কমান্ডার মিলারকে আফগানিস্তানে পাঠানো হলো। উভয়ে আশরাফ ঘানির কাছে মোল্লা বেরাদরের একটি পয়গাম পৌছাল। তালিকাভুক্ত কয়েদিদের মুক্তি দিলে তালেবান শুধু হামলার পরিমাণই কমাবে না, দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় বসার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। আশরাফ ঘানি দুই মার্কিন প্রতিনিধিকে বলল, আমরা যদি এসব মাদক ব্যবসায়ী, খুনি ও ডাকাতদের মুক্তি দিই, এর ভয়াবহ পরিণতির দায়িত্ব আপনাদেরই নিতে হবে। এর ভুক্তভোগী আপনারাই হবেন।

আশরাফ ঘানি লয়া জিরগা আহ্বান করল। 'লয়া জিরগা' মানে পুরো আফগানিস্তানের গোত্রনেতাদের বৈঠক। আশরাফ ঘানি সবার সামনে তালেবানের দাবি-দাওয়া উত্থাপন করল। লয়া জিরগা একবাক্যে তালেবানের দাবি মেনে নিতে বলল। আশরাফ ঘানি সবাইকে মুক্তি দিয়ে দিলো। হঠাৎ আমেরিকার টনক নড়ল। মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দিদের মধ্যে অনেকে আমেরিকার তালিকাভুক্ত ছিল। এই ব্যক্তিরা মার্কিন নাগরিক হত্যায় অভিযুক্ত ছিল। আফগান সরকারের কাছে আবেদন জানানো হলো, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পুনরায় গ্রেফতার করে আমেরিকার হাতে তুলে দেওয়া হোক। আশরাফ ঘানি ইরানের দিকে ইশারা করে বলল, মুক্তিপ্রাপ্ত বেশিরভাগ কয়েদি এতদিনে ইরানে পালিয়ে গেছে। আমি তো আপনাদেরকে আগেই বলেছিলাম। আপনারা আমার কথা শোনেননি। আফগান সরকার ও আমেরিকার মুষ্টি থেকে বালুপানির মতো সময় হু হু করে বেরিয়ে যেতে লাগল। যে আলোচনা মার্চে শুরু হওয়ার কথা ছিল, সেপ্টেম্বরেও শুরু করা গেল না।

২০২০ সালের ১২ সেপ্টেম্বরে আশরাফ ঘানির পাঠানো ২১ সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধি দল দোহা পৌছল। তারা দোহার পাঁচ তারকাবিশিষ্ট হোটেল শার্ক রিসোর্টে অবস্থান করল। দোহায় আসার আগে প্রতিনিধিদল কয়েক সপ্তাহ ধরে জার্মান বিশেষজ্ঞদের কাছে নিবিড় প্রশিক্ষণ নিয়েছিল। কীভাবে আলোচনা করা যায়, কীভাবে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা যায়, কীভাবে প্রতিপক্ষের চাল বোঝা যায় ইত্যাদি বিষয়ে। এই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দল যখন দোহায় গেল, বাস্তব পরিস্থিতি দেখে তারা টের পেল, তালেবানের সাথে আলোচনা তাদের ধারণার চেয়েও হাজারগুণ কঠিন। কারণ, তালেবান

আফগান সরকারকে মামুলি গুরুত্ব দিতেও প্রস্তুত ছিল না। আফগান সরকারের প্রতিনিধি দল হোটেলে বসে বসে তালেবান প্রতিনিধিদলের অপেক্ষায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকত। তালেবান কখনো দয়া করে আসত, কখনো আসত না। তালেবান প্রতিনিধিদের বেশিরভাগই দীর্ঘদিন ধরে দোহায় বসবাস করে আসছে। তারা সেখানে সপরিবারে থাকত। নিজেদের কাজ-কারবারও শুরু করেছিল। কেউ ব্যবসা করত; কেউ টাকা-পয়সা খাটাত। মোটকথা, তারা ব্যস্ত জীবন কাটাত। আমেরিকার সাথে আলোচনা চলাকালে সবাই খুবই গুরুত্ব দিয়ে সময় বের করত। আফগান সরকারের সাথে আলোচনাকে তারা থোড়াই কেয়ার করত। আলোচনা হলেই-বা কী আর না হলেই-বা কী। আজ না হয় কাল, পুরো আফগানিস্তান তাদের দখলে আসবেই আসবে। এখন এসব ঠুনকো আলোচনা খেলার মানে নেই। চুক্তিনামায় লিখিত ছিল, তাই নামকাওয়াস্তে মাঝেমধ্যে আসতে হয়। আফগান সরকারের প্রতিনিধি দলের মহিলা সদস্যা হাবিবা সেরাবী বলেছে, তালেবান যখন আলোচনা করতে আসত, তখন তাদের শারীরিক ভাষাভঙ্গি বলে দিত, তারা বিজয়ী দল। একেকজন যেন বিশ্বজয়ী সামরিক জেনারেল। তাদের কথায় অহংকার চুইয়ে চুইয়ে পড়ত, তারা বিশ্ব পরাশক্তি আমেরিকাকে পরাজিত করেছে।

নামকাওয়াস্তে আলোচনা চলাকালেই তালেবান সেনারা হেলমান্দ ও কুন্দুজের ওপর ভরপুর হামলা শুরু করে দিলো। এই হামলা আলোচনার চেতনাবিরোধী ছিল। আলোচনার পরিবেশকে আড়ষ্ট করে তুলেছিল। আশরাফ ঘানিকে দেওয়া মোল্লা বেরাদরের প্রতিশ্রুতিরও বরখেলাপ ছিল। তালেবান অভিযোগ থেকে দায়মুক্তির জন্য কাবুল সরকারের বিরুদ্ধে দেড় হাজারের বেশি অভিযোগের ফিরিস্তি সংবলিত একটা ফাইল খলিলযাদের কাছে হস্তান্তর করল। তালেবানের অভিযোগ ছিল, তাদের ওপর আগে হামলা করা হয়েছে। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তালেবানও হামলা করেছে। আফগান সরকারই আগে চুক্তিবিরোধী কাজ করেছে। ঘটনা যাই হোক, তালেবান পুরো আফগান জুড়ে তুমুল হামলা শুরু করে দিলো। ২০২০ সালের নভেম্বরে আমেরিকায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বাইডেন জয়ী হওয়ার ঘটনায় নতুন মোড় সৃষ্টি হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হলো। নতুন প্রেসিডেন্ট দোহা চুক্তি বহাল রাখবে কি রাখবে না—এ নিয়েও ধোঁয়াশা তৈরি হলো। এক উপলক্ষে জো বাইডেন ও আশরাফ ঘানির সাক্ষাৎ হলো। বাইডেন পকেট থেকে একটা কাগজ বের

করল। এই কাগজে কী ছিল? তালেবান মাত্র ১০ দিনেই কীভাবে কাবুল পৌঁছে গেল? তালেবান কী এমন স্ট্র্যাটেজি অবলম্বন করেছিল, যার বদৌলতে ১০ দিনেই গোটা আফগান দখল করে নিল? আশরাফ ঘানি কীভাবে পালাতে সক্ষম হলো?

০৯.

আমেরিকা ভিয়েতনামেও দশ বছর মেয়াদি যুদ্ধে জড়িয়েছিল। আমেরিকার শোচনীয় পরাজয় ঘটেছিল সেই দশসালা যুদ্ধে। যুদ্ধের শেষদিকে মার্কিন সেনাদের মনোবল দিনদিন তলানির দিকে চলে যাচ্ছিল। তখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ছিল রিচার্ড নিক্সন। যুদ্ধ পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে দেখে নিক্সন তার উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জারের কাছে জানতে চেয়েছিল, মার্কিন সেনারা চলে আসার পর আমাদের মিত্র দক্ষিণ ভিয়েতনাম কতদিন টিকে থাকতে পারবে? হেনরি কিসিঞ্জার জবাব দিয়েছিল, তারা টিকে থাকার সম্ভাবনা খুবই কম। মার্কিন সেনা প্রত্যাহার করার প্রায় সাথে সাথেই উত্তর ভিয়েতনামের কমিউনিস্টরা দক্ষিণ ভিয়েতনাম দখল করে নিবে। সায়গন ছিল মার্কিন মিত্র দক্ষিণ ভিয়েতনামের গণতন্ত্রকামীদের রাজধানী। বাস্তবে হয়েছিলও তাই। মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের পরপরই কমিউনিস্টদের হাতে সায়গনের পতন হয়েছিল। কিসিঞ্জারের জবাব শুনে নিক্সন বলেছিল, যারা নিজেরা টিকে থাকতে পারে না, তাদের পতন হওয়াই উচিত। এটা ১৯৭২ সালের কথা। এর পরের বছর আমেরিকা এমন এক চুক্তি করে ভিয়েতনাম ত্যাগ করেছিল, যার কোনো গুরুত্বই ছিল না। মুখরক্ষামূলক চুক্তি। মার্কিন সেনাদের উপস্থিতিতেই উত্তর ভিয়েতনামের কমিউনিস্টরা দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাজধানী কবজা করে নিয়েছিল। অবশিষ্ট মার্কিন সেনাদেরকে মার্কিন দূতাবাসের ছোট্ট ছাদ থেকে হেলিকপ্টারে করে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে হয়েছিল।

আফগানিস্তান সম্পর্কে ঠিক এমনি চিন্তা ছিল জো বাইডেনের। ঝানু রাজনীতিবিদের মতো বাইডেন তার চিন্তা খোলামেলা প্রকাশ করেনি। তবে কাজের বেলায় নিক্সনের মতোই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আশরাফ ঘানি ও তার উপদেষ্টা হামদুল্লাহ মুহিব জেনে গিয়েছিল, বাইডেন কোনো অবস্থাতেই আফগান যুদ্ধে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের বোঝা আর বহন করতে রাজি নয়। যেকোনো সময় মুখরক্ষামূলক কোনো কৌশল অবলম্বন করে কাবুল ত্যাগ

করবে। আফগান-তালেবান ডায়লগ বা দ্বিপাক্ষিক আলোচনার ঘোষণা ছিল নিছক মুখরক্ষার জন্য একটা কিছু করা। এটা যে ঠুনকো এক ব্যবস্থা—সেটা আমেরিকা যেমন জানত, তালেবানও জানত। কাবুল সরকারও ধীরে ধীরে বুঝতে পেরেছিল, তালেবান বিজয় মিছিলের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছে। আশরাফ ঘানি বারবার পাকিস্তানকে অভিযুক্ত করছিল। পাকিস্তানের গোপন সহযোগিতার কারণেই তালেবান এত দ্রুতগতিতে অঞ্চলের পর অঞ্চল জয় করতে সক্ষম হচ্ছিল।

২০২০ সালের ঘটনা। সদ্য নির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আফগানের ঘটনাকে অন্যভাবে দেখছিল। বাইডেন তখনো শপথ গ্রহণ করেনি। আশরাফ ঘানি বাইডেনের আফগান বিষয়ক চিন্তাভাবনার ধরন সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিল। ওবামা প্রশাসনে বাইডেন ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিল। তখন আশরাফ ঘানি আফগানিস্তানের অর্থমন্ত্রী ছিল। বাইডেন সে সময় আফগানিস্তান সফরে এসেছিল। সফরকালে আফগান প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাইর সাথে সাক্ষাৎ করেছে। দুই প্রেসিডেন্টের সাক্ষাৎ সম্পর্কে আশরাফ ঘানি ভালো করে জানত। সে সাক্ষাতে হামিদ কারজাই আবেদন জানিয়েছিল, আপনারা পাকিস্তানের ওপর আরো বেশি চাপ সৃষ্টি করুন, তারা যেন তালেবানকে সাহায্য করা বন্ধ করে দেয়। এর জবাবে বাইডেন বলেছিল, মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আমেরিকার কাছে আফগানিস্তানের চেয়ে পাকিস্তানের গুরুত্ব ৫০ গুণ বেশি। আমরা পাকিস্তানের ওপর প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করতে পারি না। এ ছাড়া এর আগে ওয়াশিংটনে বাইডেনের সাথে আশরাফ ঘানিরও একবার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তখনো বাইডেন আফগান যুদ্ধকে এক অন্তহীন ও অর্থহীন যুদ্ধ হিসেবে আখ্যায়িত করেছিল। এই যুদ্ধ কখনোই যৌক্তিক পরিণতিতে পৌঁছবে না। এই দুটি স্মৃতির কারণে আশরাফ ঘানি বুঝতে পারছিল, আফগানিস্তানের পরিণতি কোন দিকে গড়াচ্ছে। বাইডেন কোনো অবস্থাতেই আফগান সরকারকে টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিবে না। তারপরও খড়কুটো আঁকড়ে ধরার মতো আশরাফ ঘানি ও তার উপদেষ্টা চেষ্টা করল, বাইডেন শপথ গ্রহণ করার পরপরই একবার সাক্ষাৎ করে আফগানের ব্যাপারে আবেদন জানানোর। হোয়াইট হাউজে ফোন করে বাইডেনের সাথে সাক্ষাতের সময় চাওয়া হলো। কাজ হলো না। বাইডেনের সাথে সাক্ষাৎ তো দূরের কথা, ফোনে কথা বলার সুযোগও দেওয়া হলো না। হোয়াইট হাউজ থেকে বলা হলো, আফগান

কর্তৃপক্ষ যেন বাইডেনের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভানের সাথে কথা বলে। সাক্ষাৎকালে জ্যাক সুলিভান বেশ গালভরা কথাবার্তা বলল। সুলিভান বলল, আমেরিকার নতুন প্রশাসন আফগানিস্তানের মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের ব্যাপারে কোনো সমঝোতা করবে না। তালেবান যদি আফগান সরকারের সাথে আলোচনায় না বসে, এর পরিণতি তালেবানকে ভোগ করতে হবে। সুলিভানের এমন বাগাড়ম্বর শুনে আফগান সরকার বেশ আশাবাদী হয়ে উঠেছিল। পরে দেখা গেছে, হোয়াইট হাউজের এমন বক্তব্য স্রেফ ফাঁকা বুলি। বাইডেন আফগান যুদ্ধকে একদিনও টেনে নিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতি ছিল না।

দোহা চুক্তি অনুসারে ২০২১ সালের ১ মে নাগাদ আফগানিস্তান ছেড়ে আসার সময় নির্ধারিত ছিল। ১ মে আসার আগেই বাইডেন আফগানিস্তানে মার্কিন সেনাদের সংখ্যা ২৫০০-তে নামিয়ে এনেছিল। মার্কিন জেনারেলরা বাইডেনকে বোঝানোর চেষ্টা করছিল, তালেবান-কাবুল আলোচনা সফল হওয়া পর্যন্ত মার্কিন সেনাদের প্রত্যাহার করা উচিত হবে না। বাইডেন পাল্টা প্রশ্ন করত, তালেবান-আফগান আলোচনা কখন শেষ হবে, তার আশায় আমেরিকা অন্তহীন সময় পর্যন্ত বসে থাকবে? নির্ধারিত সময়ের পরও আফগানে মার্কিন সেনার উপস্থিতি দোহাচুক্তিবিরোধী কাজ হবে। পেন্টাগন এই পরামর্শও দিয়েছিল, বাইডেন যেন অন্তত একবছর পর্যন্ত আফগানে মার্কিন সেনার উপস্থিতি নিশ্চিত করেন। তাহলে তালেবানের ওপর চাপ থাকবে। তালেবান আলোচনা করতে বাধ্য হবে। বাইডেন এসব পরামর্শকে পাশে সরিয়ে শুধু একটা বিষয়ে কথা বলতে আগ্রহী ছিল, দোহায় তালেবান-আফগান আলোচনা কোনদিকে যাচ্ছে? উত্তরে বলা হতো, আলোচনা সফল হওয়ার কোনো আলামতই দেখা যাচ্ছে না। বাইডেনও চাচ্ছিল, মে মাসের আগে তালেবান-আফগান আলোচনা মোটামুটি একটা পরিণতিতে পৌছুক। আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দুইপক্ষ এমন একটা চুক্তিতে উপনীত হোক, যাতে উভয়পক্ষের ক্ষমতা ভাগাভাগির সিদ্ধান্ত থাকে। তাহলে আমেরিকার কোনোরকম মুখরক্ষা হবে। এই উদ্দেশ্যেই ট্রাম্পের নিয়োগ করা খালিলজাদকে স্বপদে বহাল রেখেছিল বাইডেন। বাইডেনের কথামতো খলিলজাদ আরেকবার দোহায় তালেবানের সাথে সাক্ষাৎ করে, বাইডেনের পয়গাম পৌছে দিয়েছিল: তালেবান যদি ক্ষমতায় আসার পর আমেরিকা ও পশ্চিমাদের সাহায্য পেতে চায়, জাতিসংঘের অনুমোদন পেতে চায়, তাহলে

মার্কিন সেনাদেরকে আরো কিছুদিন আফগানিস্তানে থাকার অনুমতি দিতে হবে। তালেবান এই প্রস্তাব শোনার পর নরম ভাষায় আমেরিকাকে ধমকি দিয়ে বলেছিল, আমেরিকা চুক্তিবিরোধী কোনো কাজ করলে তালেবানও তার উপযুক্ত প্রতিদান দিতে পিছপা হবে না।

এপ্রিল মাস শুরু হয়েছে। মার্কিন সেনা আফগান ত্যাগ করার এক মাস বাকি। আমেরিকার সহকারী নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন ফাইনার ১৫ এপ্রিল আশরাফ ঘানির নিরাপত্তা উপদেষ্টা হামদুল্লাহ মুহিবের সাথে সাক্ষাৎ করল। জন ফাইনার হুকুমের ভঙ্গিতে বলল, আপনাদের সরকারের উচিত তালেবানকে সাহায্য করা। তালেবানকে সাহায্য করলেই কেবল আফগানে শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে। তালেবান-আফগান আলোচনা সফল করার দায়িত্ব আশরাফ ঘানির। আমরা আমাদের কাজ করে দিয়েছি।

আশরাফ ঘানি সরকারের খাহেশ ছিল, মার্কিন সেনারা শীতকাল শুরু হওয়া পর্যন্ত আফগানে থেকে যাক। শীতকালে আফগানে যুদ্ধ থেমে যায়। মে মাসে যদি মার্কিন সেনারা চলে যায়, তাহলে মে থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গরমের মৌসুমে তালেবানকে সামাল দেওয়া আফগান সেনাদের জন্য মুশকিল হয়ে যাবে। জো বাইডেন এই প্রস্তাব মেনে নিয়েছিল। ৯ দিন পর বাইডেন বলল, তালেবানের সাথে ট্রাম্প যে চুক্তি করে গেছে, আমরা নীতিগতভাবে সেটার সাথে একমত নই। তবুও আমরা এই চুক্তি পালন করব। শুধু একটু ব্যতিক্রম হবে, আমরা ১ মের পরিবর্তে ১১ সেপ্টেম্বর আফগানিস্তান ত্যাগ করব। পরিবর্তিত তারিখের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল। এই দিনই টুইন টাওয়ার হামলা হয়েছিল। যার জেরে আমেরিকা আফগানিস্তানে হামলা করেছিল। সেদিনই বিজয়ীর বেশে আমেরিকা ফিরে যাবে। নতুন ঘোষিত তারিখের আওতায় জুলাইয়ের শুরুতেই আফগানিস্তানে আমেরিকার সবচেয়ে বড় সেনাঘাঁটি বাগরাম এয়ারবেস খালি করে দিয়েছে। দিনরাত একটানা কাজ করে এই ঘাঁটি খালি করা হয়েছে। মার্কিন সেনারা চলে যাওয়ার পর আফগান সেনারা এর দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার কথা ছিল। মার্কিন সেনারা চলে যাওয়ার সংবাদ আফগান সেনাদের জানানো হয়নি। আফগান সেনারা দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার আগেই সাধারণ জনগণ লরির পর লরি বোঝাই করে পরিত্যক্ত ঘাঁটির বিপুল সরঞ্জাম সরিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। হঠাৎ করে আমেরিকা অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে আফগান ত্যাগের তোড়জোড় শুরু করে দেয়।

৮ জুলাই নতুন ঘোষণায় বাইডেন বলল, ১১ সেপ্টেম্বরের বদলে ৩১ আগস্ট মার্কিন সেনাদের আফগান ত্যাগের ডেডলাইন। ১১ দিন এগিয়ে আনা হয়েছে। নতুন ঘোষণায় তালেবান ভীষণ উজ্জীবিত হয়ে উঠল। তালেবান ঘোষণা দিলো, তারা সরকারের সাথে আলোচনা বয়কট করেছে। তালেবানের এই ঘোষণা ছিল আমেরিকা ও আফগানের মুখে প্রচণ্ড চপেটাঘাত। বাইডেন যখন ঘোষণা করেছিল, মার্কিন সেনারা ১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আফগানে থাকবে, তখন আশরাফ ঘানি খুশিতে বাকবাকুম করে উঠেছিল। বাইডেনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে টুইট করেছিল। বাস্তব অবস্থা যে ভিন্ন, সেটা আশরাফ ঘানির উপদেষ্টা হামদুল্লাহ মুহিব কয়েকদিন আগেই ঘানিকে বলেছিল। হামদুল্লাহ বলেছিল, মিস্টার প্রেসিডেন্ট! আফগানিস্তানে আমেরিকান যুগ শেষ। এসব ঘটনা যখন ঘটছিল, তখন আফগানিস্তানের কাছে ১৮০টি এয়ারক্রাফট, ৮ হাজার বিমানবাহিনী ছিল। আমেরিকা চলে যাওয়ার পর তালেবানের মোকাবেলায় এদেরকেই লড়াই করতে হতো। আগে যেমন মার্কিন সেনারা আকাশ থেকে আফগানের স্থল সেনাদেরকে সহযোগিতা করত। তালেবানের কাছে বিমান হামলা রোধ করার মতো কোনো শক্তি ছিল না। কোনো হেলিকপ্টার খুব নিচ দিয়ে উড়ে গেলে সেটাকে ভূপাতিত করতে পারত তালেবান। বিমানবাহিনীর সাহায্যবিহীন আফগান স্থলবাহিনীর মোকাবেলা করা তালেবানের জন্য খুবই সহজ ছিল। তালেবানের সামনে শুধু আফগান এয়ারফোর্সই শক্ত বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারত। এই পর্যায়ে এক মজার ঘটনা ঘটল।

বাইডেনের ঘোষণামতো জেনারেল মিলার মার্কিন সেনাদের আফগান থেকে স্থানান্তর শুরু করে দিয়েছিল। আফগান ছেড়ে যাওয়া প্রথম মার্কিন সেনাবহরে বিমান মেরামতকারী কারিগরি দলও চলে গিয়েছিল। আফগান সরকার যখন জানতে পারল, বিমান তো আছে, প্রকৌশলীরা চলে গেছে। এখন বিমান বিকল হলে মেরামত কে করবে? মার্কিন কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চাওয়া হলো, বিমান মেরামতকারীরা চলে গেলেন যে? আমাদের বিমানগুলো উড্ডয়নের জন্য কে প্রস্তুত করে দিবে? মার্কিন কর্তৃপক্ষ তখন বিমান মেরামতের দায়িত্বে থাকা কোম্পানির কাছে জানতে চাইল। কোম্পানি উত্তর দিলো, মার্কিন নিরাপত্তা ছাড়া বিমান প্রকৌশলীদের কেউ আফগানে থাকতে সম্মত নয়। কোম্পানি এটুকু করতে সম্মত হলো, আফগান সরকারের কোনো

সাহায্যের দরকার হলে ভিডিও কলের মাধ্যমে কোম্পানির বিশেষজ্ঞরা সমাধান বলে দিবে।

আফগান প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও সেনাপ্রধান জেনারেল ইয়াসিন জিয়া বলল, মে মাসের শেষ দিকে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল, কোম্পানির একজন প্রকৌশলী কাতার থেকে জুম ভিডিওর মাধ্যমে সমস্যার সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করত। এভাবে একটা বিমানবাহিনী চলতে পারে না। এতগুলো বিমান থাকা সত্ত্বেও আফগান এয়ারফোর্স বলতে গেলে পঙ্গুই ছিল। আফগান সরকার পাকিস্তানের কাছ থেকেও সাহায্য নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। পাকিস্তান দুয়েকবার প্রাথমিক সহায়তা করেছিল। নিজেরা একেবারে শূন্যের কোঠায় থাকলে কতক্ষণ অন্যের সাহায্য নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে টিকে থাকা যায়? এরচেয়েও বিপর্যয়কর অবস্থা সৃষ্টি হলো, যখন বিমানবাহিনীর সদস্যরা একে একে চাকরি ছেড়ে পালাতে শুরু করেছিল। যারা চাকুরিতে বহাল ছিল, তারাও ঠিকমতো কর্মক্ষেত্রে হাজির থাকত না। একদিন হাজির হলে দুদিন গায়েব থাকত। ভাইস প্রেসিডেন্ট আবদুল্লাহ সালেহের মতে, প্রতিদিন গড়ে সাত শ'র বেশি আফগান সেনা চাকুরি ছেড়ে পালাচ্ছিল। সারাদেশের শক্তিশালী সেনাঘাঁটিগুলো তালেবানের ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে যাচ্ছিল। অবরুদ্ধ আফগান সেনারা সারাদিন কাবুলে কল করত, মেসেজ পাঠাত। এদিক থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যেত না। আফগান সরকার তাদের সেনাঘাঁটিগুলোতে সাহায্য পাঠাতে অপারগ হয়ে পড়েছিল। অবরুদ্ধ সেনারা আত্মরক্ষার্থে নিজেদের মতো করে তালেবানের সাথে সমঝোতা করে অস্ত্রসমর্পণ করে ফেলত। বেশিরভাগ জায়গায় আত্মসমর্পণকারীদের শান্তিপূর্ণভাবে বিদায় করে দিত। তাদের কাছ থেকে অস্ত্র জমা নেওয়ার পর লিখিত মুচলেকা নিয়ে ছেড়ে দিত। ভবিষ্যতে কখনো তালেবানের বিরুদ্ধে হাতিয়ার উঠাবে না—এই মর্মে প্রতিজ্ঞা করে যে যার বাড়ি চলে যেত। পরবর্তীতে তালেবান সরকার গঠিত হলে তাদেরকে ধরপাকড় করা হবে না—এ আশ্বাস দেওয়া হতো।

এসব ঘটনা ঘটার কিছুদিন আগে ২৫ জুন আশরাফ ঘানির সামনে সুযোগ এসেছিল মার্কিন প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলার। ওভাল অফিসে বিকেলে দুই প্রেসিডেন্ট মুখোমুখি হয়েছিল। সাথে হামদুল্লাহ মুহিবও ছিল। চেয়ারে বসার পর বাইডেন পকেট থেকে একতাড়া কাগজ বের করল। তাতে লেখা ছিল, কখন কীভাবে মার্কিন সেনারা আফগান ত্যাগ করবে। এ ছাড়া আফগান ও ইরাকে মারা যাওয়া মার্কিন সেনাদের সংখ্যাও লেখা ছিল। বাইডেন কাগজটা

আশরাফ ঘানিকে দেখাল। কাগজটা দেখে আশরাফ ঘানি দুঃখ প্রকাশ করল। মার্কিন সেনাদের জন্য মৌখিকভাবে শোক প্রকাশ করল। পাশাপাশি বলল, আমাদের আমেরিকার বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা দরকার। তাহলে আমরা দেশটাকে স্থিতিশীল করতে পারব। জবাবে বাইডেন অনেক মিষ্টি মিষ্টি কথা বলল। কথাগুলো শুনতে ভালো হলেও কাজের কাজ কিছুই হওয়ার আশা ছিল না। যেকোনো মূল্যে মার্কিন সেনারা আফগান ত্যাগ করবে, মিষ্টি কথার আড়ালে বাইডেন আগের অবস্থানেই থাকল।

আশরাফ ঘানি যখন আমেরিকা সফরে গিয়েছিল, তখন ৪০০টি জেলার মধ্যে মাত্র ৮০টি জেলা তালেবানের নিয়ন্ত্রণে ছিল। আমেরিকা থেকে ফিরে আসার পর জুলাইয়ের শুরুতেই তালেবান অর্ধেক আফগানিস্তান দখল করে নিতে সক্ষম হয়েছিল। অর্থাৎ ৪০০-এর মধ্যে ২০০ জেলা তখন তালেবানের নিয়ন্ত্রণে এসে গিয়েছিল। মার্কিন সেনারা চলে চাওয়ার চূড়ান্ত সময় নির্ধারিত ও ঘোষিত হওয়ার পর থেকেই তালেবানের অগ্রযাত্রা অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিল। আফগান সরকার বুঝে উঠতে পারছিল না, এই দুর্দমনীয় অগ্রযাত্রাকে কিভাবে রুখে দেওয়া যায়? আদৌ রোখা যাবে কি না—এই নিয়েও সন্দিহান হয়ে পড়ল।

এই পর্যায়ে আশরাফ ঘানি ইরান যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। ইরানের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ইবরাহিম রাইসীকে বুঝিয়ে শুনিয়ে আর্থিক ও সামরিক অনুদান পাওয়া যায় কি না, সেটা যাচাই করে দেখার জন্য। ইরান থেকে সাহায্য গ্রহণ করার সহজ অর্থ হলো আমেরিকাকে নারাজ করা। আশরাফ ঘানি ইরান যাওয়ার সিদ্ধান্ত পাকা করার আগেই তালেবান দ্রুতগতিতে ইরান ও পাক সীমান্ত নিজেদের কবজায় নিয়ে নিল। এখন থেকে দুই দেশের সীমান্ত দিয়ে আমদানি-রপ্তানির যাবতীয় আয় তালেবানের কাছেই জমা হবে। কাবুল সরকার আরো বেশি ঝুঁকিতে পড়ে গেল। তাদের আমদানি আরো কমে গেল। আশরাফ ঘানি মরিয়া হয়ে অবশিষ্ট সেনাঘাঁটিগুলো পরিদর্শনে গেল। আফগান সেনাদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দিলো, আমেরিকা আমাদের সাথে আছে। আমরা ৬ মাস টানা লড়াই করার মতো পুরোপুরি প্রস্তুত। আপনারা কোনো চিন্তা করবেন না, ভেঙে পড়বেন না, সাহস হারাবেন না। এই সময় পুরো আফগান জুড়ে বড় বড় প্রজেক্ট-প্রকল্পের ঘোষণা দিয়েছিল। কুন্দুজে নতুন প্রকল্পের কথা নিজের ফেসবুক প্রোফাইলে ঘোষণা করেছিল। মজার বিষয় হলো, আশরাফ ঘানি যখন কুন্দুজে অবকাঠামোগত ব্যাপক উন্নয়নের পরিকল্পনা

প্রকাশ করছিল, তার কয়েকদিন আগেই কুন্দুজ তালেবানের দখলে চলে গিয়েছিল।

বাইডেন আফগান ত্যাগের ঘোষণা দেওয়ার পর থেকেই আফগান নাগরিকদের দেশত্যাগের স্রোত শুরু হয়ে গিয়েছিল। সমস্ত ব্রিটিশ ফৌজ চলে গিয়েছে। যাওয়ার সময় তাদের সাথে কাজ করা স্থানীয় চর-অনুচরদেরও নিয়ে গিয়েছিল। স্থানীয় চরদের মধ্যে তালেবানের বিরুদ্ধে সরাসরি সক্রিয়ভাবে কাজ করা ব্যক্তিরা ছিল। এদের অনেকেই সারাদিন বসে বসে তালেবানের ফোন কল ও অবস্থান নির্ণয়ের কাজ করত। এটা ছিল মধ্য আগস্টের কথা। সেপ্টেম্বর আসতে আর মাত্র দুই সপ্তাহ বাকি। কাবুলের সবচেয়ে কাছের প্রদেশ, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গজনিও তালেবানের দখলে চলে গেল। কয়েকদিনের মধ্যে তালেবান কাবুলকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলল। এতদিন আমেরিকার হয়ে কাজ করা বহু আফগানসহ অনেক বিদেশি কাবুলে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল। যেকোনো মুহূর্তে তালেবান কাবুল দখল করে নিতে পারে। তালেবানের সেই ক্ষমতা ছিল। বাইডেন অতিদ্রুত আরো তিন হাজার মার্কিন সেনা আফগানে পাঠাল, যাতে আটকে পড়া ব্যক্তিদের উদ্ধার করে আনা যায়। এদের কাজ ছিল, কাবুল বিমানবন্দরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এই সেনারা প্রয়োজনীয় লোকদেরকে স্থানান্তর করার দায়িত্বও পালন করেছে। বিস্ময়কর বিষয় হলো, এই জরুরি লোকদের তালিকায় প্রেসিডেন্ট আশরাফ ঘানির নাম ছিল না। তালেবান উত্তর আফগানে হেরাত, কুন্দুজসহ একের পর এক প্রদেশ দখল করে নিচ্ছিল। কাবুলের প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে দেশের বিভিন্ন সেনাক্যাম্পে ফোন করে বলা হতো, তোমরা ক্যাম্পের দখল তালেবানের হাতে ছেড়ে দাও। এই ফোনটা কে করেছিল, সেটা আজ পর্যন্ত কেউ বের করতে পারেনি। যে ব্যক্তিই এই ফোন করে থাকুক, সে একদিক দিয়ে তালেবানের সহযোগী ছিল। আমেরিকাকেও সাহায্য করছিল। আশরাফ ঘানি সরকারের শোচনীয় পরিণতিও নিশ্চিত করছিল। এই সঙ্গিন পরিস্থিতিতে আশরাফ ঘানি চারিদিকে অন্ধকার দেখছিল। আশরাফ ঘানির এই চরম বিপদে তার পরীক্ষিত ভরসাস্থল জেনারেল আবদুর রশিদ দোস্তাম ও আতা মুহাম্মাদ নুর ইত্যাদি কমান্ডারও ইতিমধ্যে উজবেকিস্তান পালিয়ে গিয়েছে।

এমন চরম উত্তেজনা ও অনিশ্চিত মুহূর্তে আশরাফ ঘানির নিরাপত্তা উপদেষ্টা হামদুল্লাহ মুহিব জানতে পারল, তাদের অধীনস্থ এক কর্মচারীর নামও মার্কিন তালিকায় আছে, যাকে আমেরিকায় নিয়ে যাওয়া হবে। হামদুল্লাহ এই বিষয়ে

ঘানির সাথে আলোচনা করল। আশরাফ ঘানি বলল, আপনি মার্কিন দূতাবাসে একটু ফোন করে জানার চেষ্টা করুন, মার্কিন তালিকায় আমাদের নামও আছি কি না? হামদুল্লাহ কাবুলের মার্কিন দূতাবাসে ফোন করল। প্রাথমিক কুশল বিনিময়ের পর আসল কথা বলল : আফগান প্রেসিডেন্ট ও আমি কি আমেরিকার ইভাকুয়েশন লিস্টে আছি? দূতাবাস থেকে জবাবে বলা হলো, আপনি লিখিতভাবে এই প্রশ্ন করুন। হামদুল্লাহ মেসেজ টাইপ করে আফগান প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে মার্কিন দূতাবাসে পাঠিয়ে দিলো। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও কোনো উত্তর এল না। নীরবতাকে হামদুল্লাহ মার্কিনিদের অস্বীকৃতি ধরে নিল। এদিক থেকে নিরাশ হয়ে ব্যক্তিগত সূত্র কাজে লাগিয়ে আরব আমিরাতের সাথে যোগাযোগ করল। আমিরাতের এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জবাব দিলো, আপনি চিন্তা করবেন না, আমরা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রেসিডেন্ট ও তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে আসব। আমরা একটা জেট বিমান কাবুলে পাঠিয়ে দিব। আপনাদের কাছে থাকা চার এমআই-১৭ হেলিকপ্টার পুরোপুরি প্রস্তুত করে রাখুন। জরুরি পরিস্থিতিতে যেকোনো মুভের জন্য প্রস্তুত থাকুন। ১৫ আগস্টের যেকোনো সময় আমাদের জেটবিমান কাবুলে অবতরণ করবে। সংবাদ পাওয়ামাত্রই আপনাদেরকে খুব দ্রুত বিমানবন্দরে পৌঁছতে হবে।

হামদুল্লাহ সব ঠিকঠাক করে আশরাফ ঘানিকে জানাল। এটা ছিল ২০২১ সালের ১৪ আগস্টের কথা। পরদিনই তারা আফগানিস্তান ত্যাগ করার কথা ছিল। হাজার হাজার তালেবান সেনা কাবুলে ঢুকে পড়েছিল। বিশ্বমিডিয়াতে এসব প্রচারিত হচ্ছিল। তখন পর্যন্ত আফগান সেনা ও সরকারি কর্মকর্তারা ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেনি, আশরাফ ঘানি ভেগে যাওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। একদিন আগেও আশরাফ ঘানি বক্তব্য দিয়েছে, তালেবানের বিরুদ্ধে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়ে যাবে। আফগান সংসদের হেফাজত করবে। নিজদেশ ছেড়ে কোথাও যাবে না। এসব মিথ্যা বুলি হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে আশরাফ ঘানি নিজেই উড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। ১৫ আগস্ট তালেবান নানগরহার প্রদেশও দখল করে নিল। গত টানা নয়দিন ধরে তালেবান ঝড়ের মতো চারিদিক দখল করে নিয়েছিল। সিরাজুদ্দিন হক্কানী হাজারো সেনা নিয়ে কাবুলের দরজায় অপেক্ষমাণ ছিল। আরব আমিরাত থেকে যখন জেটবিমান উড়াল দিয়েছিল, তখন কাবুলের সবচেয়ে সুরক্ষিত এলাকা গ্রিনজোন সম্পূর্ণ

অরক্ষিত ছিল। সেখানো কোনো নিরাপত্তারক্ষী ছিল না। এখানকার সবাই কাবুল এয়ারপোর্টে চলে গিয়েছিল। গ্রিনজোনের এই সংবাদ কাবুলের বাইরে অপেক্ষমাণ তালেবান কমান্ডারদের কাছে ছিল না। এই সংবাদ যদি হক্কানী, মোল্লা ফসিহুদ্দিন, আল কায়েদা বা ইসলামিক স্টেটের জানা থাকত, তাহলে আশরাফ ঘানি আর কখনো আফগানিস্তানের বাইরে পা দিতে পারত না। গ্রিনজোনের এই অবস্থার কথা আশরাফ ঘানি ও তার কর্মকর্তাদেরও জানা ছিল না।

১৫ আগস্ট হামদুল্লাহ মুহিব গ্রিনজোন পাড়ি দিয়ে পায়ে হেঁটে আশরাফ ঘানির কাছে এলো। দুপুর ১টায় আরব আমিরাতের এক কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাৎ করল। আগত জেটবিমান ও আফগানিস্তান থেকে বের হওয়ার ব্যাপারে বিস্তারিত কথা বলল। যখন এই আলোচনা চলছিল, তখন হামদুল্লাহ মুহিবের কাছে একটা মেসেজ এলো। হক্কানী নেটওয়ার্কের কমান্ডার খলিল হক্কানী এই মেসেজ পাঠিয়েছিল। খলিল হক্কানী মেসেজে শুধু একটা শব্দ লিখেছিলেন, সারেন্ডার। জবাবে মুহিব লিখল, আগে কথাবার্তা হোক, তারপর করণীয় ঠিক করা যাবে। খলিল হক্কানী ফিরতি মেসেজে লিখলেন, আগে তোমরা প্রকাশ্যে বিবৃতি দাও যে, তোমরা আত্মসমর্পণ করছ। এই মেসেজ দেখার পর মুহিব বিষয়টা ঝালমেই খলিলযাদকে জানাল। তার কাছে মনে হয়েছিল, এটা হক্কানীদের পক্ষ থেকে একটা চাল।

দুপুর ২টা বাজে রোদের প্রখর তাপে কাবুল উত্তপ্ত। আফগান প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের সামনে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। সেটাতে আশরাফ ঘানির পরিবারসহ আরো কিছু লোক বসা ছিল। গাড়ির গন্তব্য ছিল অপেক্ষমাণ হেলিকপ্টার। আশরাফ ঘানি মহলের দরজায় দাঁড়ানো ছিল। সবাইকে বসিয়ে আবার উপরতলায় যাবে পাসপোর্ট ও জরুরি কাগজপত্র নেওয়ার জন্য। হামদুল্লাহ মুহিব এগিয়ে আশরাফ ঘানির হাত হাত ধরে টেনে গাড়িতে বসিয়ে দিলো। গাড়িকে হেলিকপ্টারের দিকে চালানোর নির্দেশ দিলো। হেলিপ্যাডে তিনটি কপ্টার দাঁড়ানো ছিল। আশরাফ ঘানির কর্মকর্তা ও প্রাসাদের কর্মচারীরা একে অপরের সাথে ধাক্কাধাক্কি করছিল, কে কার আগে কোন হেলিকপ্টারে উঠবে—এটা নিয়ে। কপ্টার চালক ধমক দিয়ে বলল, ৬ জনের বেশি উঠলে কপ্টার উড়তে পারবে না। একটা কপ্টারে আশরাফ ঘানি, তার পরিবার ও দুয়েকজন ঘনিষ্ঠ সাথিসহ উঠে বসল।

আশরাফ ঘানি যখন কপ্টারে করে পরিবারসহ পালাচ্ছিল, তখনো অনেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানতে পারেনি, প্রেসিডেন্ট পালাচ্ছে। আশরাফ ঘানির অনেক কাছের সাথি ও গুরুত্বপূর্ণ উপদেষ্টা আবদুস সালাম রহিমী তখনো প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে বসে ঝালমেই খলিলযাদের সাথে আলোচনায় লিপ্ত ছিল। কীভাবে তালেবানকে এক সপ্তাহের যুদ্ধবিরতির জন্য সম্মত করা যায়, এটাই ছিল প্রধান আলোচ্যবিষয়। তখন ঝালমেই খলিলযাদ দোহায় মোল্লা বেরাদরের সামনে বসা ছিল।

১৫ আগস্টের দুপুর আড়াইটা বাজে, যখন আরব আমিরাতের বিমান আফগান সীমান্তবর্তী আমুদরিয়া পার হলো। এর মাধ্যমে আফগানিস্তানে আমেরিকার ২০ সালা বন্দোবস্তের সর্বশেষ চিহ্ন বিলুপ্ত হয়ে গেল। তালেবান যখন কাবুলে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে বসে ছবি তুলছিল, তখন আশরাফ ঘানির হেলিকপ্টার উজবেকিস্তানে অবতরণ করেছে। আফগানিস্তান তালেবানের দখলে চলে এলো। কাবুলে নিজেদের সরকার গঠন করল। ১৯ বছর ১০ মাস ২৫ দিন পর আমেরিকার সবচেয়ে দীর্ঘতম লড়াই এর মাধ্যমে সমাপ্ত হয়েছিল। আমেরিকার ২ হাজার বিলিয়ন ডলার এমন কাজে ব্যয় হলো, কোনো ডলার খরচ করা ছাড়াই যা প্রথম দিনই অর্জিত হতে পারত। অর্থাৎ তালেবানের সাথে চুক্তি করা যে, তালেবান কোনো সন্ত্রাসী সংগঠনকে সাহায্য করবে না। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী সংগঠনের সাথে সম্পর্ক রাখবে না। এই যুদ্ধ কী ফল বয়ে এনেছে? ২ লক্ষ ৪০ হাজারেরও বেশি সাধারণ আফগান মারা পড়েছে। এসবের মধ্যে ৮০ হাজারের বেশি নিতান্তই নিরীহ মানুষ ছিল। যুদ্ধের সাথে তাদের কোনো লেনাদেনা ছিল না। এদের মধ্যে ৩৩ হাজার শিশুও ছিল। যারা তখন পর্যন্ত জানত না, যুদ্ধ ও শান্তির মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়? ২০ বছরে প্রতি ৫ ঘণ্টায় একজন মানুষ মারা গিয়েছিল। আর যেসব বাচ্চার পিতা অন্য কারো আদেশে আফগানে লড়তে এসে মারা গিয়েছিল, সেসব মার্কিন শিশুর কষ্টের কথাও কে মনে রাখবে? একটি শিশু তো নিজের মর্জিতে পৃথিবীর নির্দিষ্ট কোনো ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করে না। সাহির লুধিয়ানবীর একটা শের মনে পড়ছে :

খুন আপনা হো ইয়া পরায় হো
নসলে আদম কা খুন হ্যায় আখের
জঙ্গ মাশরিক মে হো কে মাগরিব মে
আমনে আলম কা খুন হ্যায় আখের।

বম ঘরুঁ পর ঘেরে কে সরহদ পর,
রুহে তামীর যখম খাতি হ্যায়[১]।

সারাংশ : রক্ত আপন ব্যক্তির হোক বা পরের, মানুষের রক্তই তো। যুদ্ধ পূর্বে হোক বা পশ্চিমে, জগৎশান্তির খুনই তো প্রবাহিত হচ্ছে। বোমা ঘরে পড়ুক বা সীমান্তে, মানবাত্মাই তো আহত হচ্ছে।

আফগানি গাড়ি

পৃথিবীতে বহু আন্দোলন, বিপ্লব হয়েছে। বর্তমানে আমাদের চোখের সামনে প্রতিনিয়ত যে বিপ্লব ঘটে চলছে, সেটা হলো 'প্রযুক্তি বিপ্লব' (Technological Revolution)। এই বিপ্লবের অন্যতম আলোচিত ও আকর্ষণীয় বিষয়ের নাম বৈদ্যুতিক গাড়ি (Electric vehicles); সংক্ষেপে ইভি (EV) বলা হয়। যেমন আমরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial intelligence)-কে সংক্ষেপে এআই (AI) হিসেবে জানি। কিছু নামের সংক্ষিপ্তরূপ আন্তর্জাতিকভাবে এতবেশি পরিচিত, সেগুলোকে আলাদা করে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হয় না। যেমন কেএফসি (KFC) মানে (Kentucky Fried Chicken)। পিসি (PC) মানে (Personal Computer)। দুনিয়াজুড়ে ইভির চাহিদা দিনদিন ব্যাপকহারে বেড়েই চলছে। ২০২৩ সালের শেষ নাগাদ পৃথিবীর মোট গাড়ির ১৪% শেয়ার ইভির দখলে চলে গিয়েছে। ২০২২ সালে বিশ্বজুড়ে মোট ১০ মিলিয়ন (এক কোটি) ইভি বিক্রি হয়েছে। বিক্রির পরিমাণ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। ইভির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার অনেক কারণ আছে। ইভি চলাচলে কোনো ধরনের শব্দ হয় না। তেলচালিত গাড়িতে আওয়াজ হয়। ইভির শব্দহীনতার কারণে নতুন করে আওয়াজ উঠেছে, কৃত্রিমভাবে হলেও শব্দ সৃষ্টি করা দরকার। তাহলে পথচারি সতর্ক হতে পারবে। ইভিতে শব্দ কেন হয় না? ইভিতে মুভিং পার্টস বা ঘূর্ণায়মান যন্ত্রপাতি খুব বেশি থাকে না। ইভিতে ইঞ্জিন থাকে না, ই-মটর থাকে। মটরের

---

[১] ক্ষেত আপনি জ্বলে কে আওর্ঁ কে, জীস্ত ফাকুঁ সে তিলমিলাতি হ্যায়। ট্যাংক আগে বড়হে কে পীছে হটে, কোক ধরতি কি বাঁজ হোতি হ্যায়। ফাতাহ তা জশন হো কে হার কা সোগ, জিন্দেগী মাইয়েতুঁ পে রোতী হ্যায়। জঙ্গ তো খোদ হি এক মাসালা হ্যায়, জঙ্গ কেয়া মাসালুঁ কা হলো দেগী। আগ আওর খুন আজ বখশেগী, ভুখ আওর এহতিয়াজ কাল দেগী। এসি লিয়ে আয় শরিফ ইনসানোঁ, জঙ্গ টলতি রাহে তো বেহতর হ্যায়। আফ আওর হাম সভি কে আঙ্গন মে, শামা জ্বলতি রাহে তো বেহতর হ্যায়।

সাহায্যে ইলেকট্রিকাল এনার্জিকে মেকানিকাল এনার্জিতে রূপান্তর করা হয়। এই এনার্জি দিয়ে চাকা ঘোরে। প্রথাগত ইঞ্জিনচালিত গাড়িতে ইঞ্জিন, বেল্ট, গিয়ারসহ প্রায় ২ হাজারের মতো ঘূর্ণায়মান পার্টস থাকে। ইভিতে মুভিং পার্টস সাকুল্যে ২০টির মতো থাকে। প্রচলিত গাড়ি নিয়মিত সারাইয়ের প্রয়োজন পড়ে। কিছু হলেই মেকানিকের কাছে দৌড়াতে হয়। প্রতিবারের সার্ভিসিং-এ একগাদা টাকা গচ্ছা দিতে হয়। তেল-মবিলের নিত্যব্যয় তো আছেই। মুভিং পার্টস ঘর্ষণের কারণে কিছুদিন পর ক্ষয়ে যায়, কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তখন পার্টস বদলাতে হয়। ইভিতে এ ধরনের কোনো ঝঞ্ঝাট নেই বললেই চলে। ইভিতে খুব বেশি ঘর্ষণ (friction) না থাকায় যন্ত্রপাতি নষ্ট হওয়া বা ক্ষয়ে যাওয়ার হারও নিতান্তই কম। ইভিতে তেল না থাকায় আগুন লাগার ভয় থাকে না। ইভি পরিবেশবান্ধব। একবার টাকা খরচ করে একটা ইভি কিনে নিতে পারলে দীর্ঘদিনের জন্য নিশ্চিন্তে থাকা যায়। প্রচলিত গাড়ি কিনে নিশ্চিন্ত থাকার উপায় নেই। কখন কোন পার্টস যায়—এ নিয়ে হরদম তটস্থ থাকতে হয়।

দিনদিন ইভির চাহিদা বেড়েই চলছে। ভবিষ্যতে এই গাড়ি বাজারে রাজত্ব করবে। যারা ইভি উৎপাদন করবে, তাদের হাতেই থাকবে বাজারের লাগাম। চীন এই ব্যবসায় সবার চেয়ে এগিয়ে। ২০২২ সালে চীন একাই বিক্রি করেছে ৩.৫ মিলিয়ন (৩৫ লক্ষ) ইভি। ইভি বিক্রিতে চীনের ধারেকাছেও কেউ নেই। জার্মানি ৭ লাখ ও আমেরিকা ৬ লাখের মতো ইভি বিক্রি করেছে। ২০২২ সালে ইভি বিক্রির হার ৫৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। ইভি বিক্রিতে চীন ১৩৪ বিলিয়ন ডলার ব্যবসা করেছে ২০২২ সালে। জার্মানি ৪৭ ও আমেরিকা ৩৯ বিলিয়ন ডলার ব্যবসা করেছে। বিশ্ব ইভি মার্কেটে চীনের শেয়ার ছিল ৫৩.৬%। অর্থাৎ গোটা দুনিয়ার চেয়ে বেশি চীনের ইভি শেয়ার।

ইভি মার্কেটে শীর্ষস্থান ধরে রাখতে চীন মরিয়া হয়ে দৌড়ঝাঁপ করছে। এজন্যই চীন আফগানিস্তানের দ্বারস্থ হয়েছে। আফগানের অনুর্বর, রুক্ষ-শুষ্ক পাথুরে পাহাড়ে চীন সমাধান খুঁজে পেয়েছে। আফগানিস্তানের বিভিন্ন পাহাড়ে সুপ্ত আছে বিপুল পরিমাণ লিথিয়াম। লিথিয়ামই হলো ইভির জীবনধমনি। ইভি চলাচল করে লিথিয়াম আয়ন (lithium-ion) ব্যাটারির শক্তিতে। এই ব্যাটারিতে একবার চার্জ দিলে ইভি গাড়ি টানা ৩০০ কিমি পথ পাড়ি দিতে পারে। লিথিয়াম ব্যাটারি রিচার্জেবল। বারবার চার্জ দিলেও লিথিয়াম ব্যাটারির কর্মক্ষমতা কমে যায় না। পুরোনো লিড-এসিড, জিঙ্ক-কার্বন বা নিকেল

ব্যাটারির তুলনায় লিথিয়াম ব্যাটারি আকারেও অনেক ছোট। গাড়িতে ব্যবহৃত ব্যাটারিগুলোর আকার বড়সড় বাক্সের মতো। সাইজে ছোট হওয়ার কারণে লিথিয়াম ব্যাটারি বহন ও সরবরাহ করাও সহজ। যে দেশের কাছে ইভিতে ব্যবহৃত ব্যাটারির জন্য লিথিয়ামের টেকসই ও পর্যাপ্ত কাঁচামাল মজুদ থাকবে, তারাই সবচেয়ে বেশি ব্যাটারি তৈরি করতে পারবে। ইভির মার্কেটেও তাদের সবচেয়ে বেশি শেয়ার থাকবে। হ্যাঁ, ইভি ব্যাটারি বানাতে নিকেল ও কোবাল্টও প্রয়োজন আছে। তবে, লিথিয়ামের প্রয়োজনই বেশি। তাই যেখানেই লিথিয়াম, সেখানেই ইভি নির্মাতাদের মধ্যে শীতলযুদ্ধ হবে।

সারাবিশ্বে লিথিয়াম কোথায় কোথায় আছে? এখন পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া লিথিয়ামের বৃহত্তম রপ্তানিকারক দেশ। বাজারের প্রায় ৪৭% শেয়ার অস্ট্রেলিয়ার কবজায়। এরপর আছে দক্ষিণ আমেরিকার দেশ চিলি। বাজারের ৩০% শেয়ার তাদের। তৃতীয় স্থানে চীন। ১৪ থেকে ১৫ শতাংশ শেয়ার চীনের হাতে। বর্তমানে বিশ্বের মাত্র ১৪% গাড়ি হলো ইভি। বৈশ্বিক উষ্ণতা (Global warming) এড়াতে ১০০% যানবাহন ইভি হওয়া জরুরি। এটা নিয়ে পরিকল্পনাও চলছে। আচ্ছা, বিশ্বের ৫০% গাড়ি ইভি হলে কী হবে? কত লিথিয়ামের প্রয়োজন হবে? লিথিয়ামের দাম ও চাহিদা কতটা বাড়বে? গরিব দেশগুলোতে লিথিয়ামের দাম ডলারের মতো করে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। আফগানিস্তানের রুক্ষ-শুষ্ক পাহাড়ে এত বেশি লিথিয়ামের মজুদ আছে, মার্কিন (Geologist) ভূতাত্ত্বিকরা এই দেশটিকে লিথিয়ামের সৌদি আরব বলেছে। রাশিয়া কয়েক দশক আগে থেকেই আফগানিস্তানে লিথিয়াম থাকার কথা জানত। আফগানিস্তানে কী পরিমাণ লিথিয়াম আছে? ২০১০ সালে পেন্টাগন ভূতাত্ত্বিক জরিপ (Geological survey) চালিয়েছিল। সে জরিপে আফগানিস্তানের গজনি প্রদেশ, পশ্চিম আফগানিস্তানের পাহাড়ে লিথিয়ামের মজুদ আবিষ্কৃত হয়েছিল। প্রাথমিক হিসাবে অনুমান করা হয়েছিল, শুধু গজনিতেই বলিভিয়ার চেয়ে বেশি লিথিয়ামের মজুদ আছে। বলা হয়, বলিভিয়াতেই বিশ্বের বৃহত্তম লিথিয়ামের মজুদ আছে। লিথিয়ামের মজুদ আবিষ্কার করা এক জিনিস আর উত্তোলন, পরিশোধন, নিষ্কাশন, পরিমার্জিত এবং রপ্তানির উপযোগী করে তোলা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। আমেরিকান ভূতাত্ত্বিকদের মতে ২০১০ সালে আফগানিস্তানে এক ট্রিলিয়ন ডলার মূল্যের খনিজ আবিষ্কৃত হয়েছিল। তখন এসব খনিজদ্রব্য উত্তোলন করা গেলে দীর্ঘদিনের জন্য আফগানিস্তানের অর্থনীতি চাঙা হয়ে যেত।

মার্কিন গবেষকরা খনিজপদার্থ বলতে লিথিয়ামই বুঝিয়েছিল। আমেরিকা ভেবেছিল, খনিজপদার্থ ও লিথিয়াম বিক্রি করে তালেবান-পরবর্তী আফগান সরকার শক্তিশালী হবে। কারণ দক্ষিণ কোরিয়ার এলজি ও স্যামসাং কোম্পানি, জাপানের প্যানাসোনিক, সনি ও নিশান, চীনের 'BYD' এবং 'NIO' সবাই আফগানিস্তানের স্থায়ী গ্রাহক হতে পারে। এ ছাড়া আরো যেসব কোম্পানি ব্যাটারি বানাতে চায়, তারাও আফগানিস্তানে অফিস খুলবে। খনি এলাকায় উত্তোলিত খনিজদ্রব্য প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটও স্থাপন করা হবে। দেশের অবস্থা স্থিতিশীল থাকলে কোবাল্ট মিক্সিং ইউনিট, ব্যাটারি অ্যাসেম্বলিং ও উৎপাদন কারখানাও খনির আশেপাশে কোথাও স্থাপন করা হবে। এসব বিভাগ কাছাকাছি থাকলে নির্মাণ খরচ অনেক কমে যাবে। হামিদ কারজাই ও আশরাফ ঘানি সরকার আমেরিকার সর্বাত্মক সহযোগিতা সত্ত্বেও এসব করতে পারেনি। বর্তমান তালেবান সরকারের স্বপ্ন, তারা আফগানের খনিজপদার্থের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করবে।

পাকিস্তানের পাশে চিত্রাল এলাকার ওপাশেই আফগানিস্তানের কুনার ও নুরিস্তান প্রদেশ। দুটি প্রদেশেই আমেরিকা লিথিয়াম আবিষ্কার করেছিল। উত্তোলন করার সুযোগ পায়নি। আমেরিকা চলে যাওয়ার পর চীন মঞ্চে দাখিল হয়েছে। বিশেষ করে কুনার প্রদেশের 'চাপাদারা' জেলায়। এখানকার একজন তালেবান কমান্ডার ওয়াশিংটন পোস্টকে বলেছেন, চীনারা প্রথম প্রথম অদ্ভুত আচরণ করত। তারা এখানে এসে ধবলশুভ্র একটি পদার্থ খুঁজতে শুরু করে। বিভিন্ন পাহাড় থেকে তারা শুভ্র পদার্থ সংগ্রহ করত। সাদা পদার্থগুলো দেখে তাদের চোখমুখ উত্তেজনায় চকচক করত। চীনারা আমাদের কিছু বুঝতে দিত না। তাদের সন্দেহজনক গতিবিধি থেকেই আমরা লিথিয়াম সম্পর্কে তথ্য আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি। চীনারা নিজেদের মধ্যে চ্যাং চুং করে কথা বলার সময় 'লিথিয়াম' শব্দটা বারবার উচ্চারণ করছিল। এটা ছিল ২০২১ সালের শীতকালের কথা। এই বছরই আমেরিকা আফগান ত্যাগ করেছিল। এরপর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ ও নারীশিক্ষা স্থগিত করার দায়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় দেশগুলো আফগানিস্তানের ওপর বহু নিষেধাজ্ঞা আরোপ করল। এ কারণে আমেরিকান ও ইউরোপীয় কোম্পানিগুলো তালেবানদের সঙ্গে কোনো চুক্তি করতে পারছিল না। চীন বলতে গেলে ফাঁকা মাঠেই গোল দিচ্ছে। চীনা উদ্যোক্তা ও সরকারি কর্মকর্তারা গত বছর থেকে আফগানিস্তানের কুনার, নুরিস্তান ও গজনি অঞ্চলে রীতিমতো গাঁটছড়া বেঁধে

বসে গেছে। ঘটনা অনেকটা আমেরিকান 'গোল্ডরাশ'-এর মতো। ১৮৪০ এর দশকের শেষের দিকে আমেরিকায় স্বর্ণ অনুসন্ধানীদের দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়েছিল। ১৯৫০ এর দশক পর্যন্ত আমেরিকা জুড়ে স্বর্ণসন্ধান অব্যাহত ছিল। ঠিক তেমনিভাবে কাবুলের হোটেল-প্লাজাগুলো বুভুক্ষ চীনা লিথিয়াম শিকারিতে গিজগিজ করছিল। কে কার চেয়ে বেশি লিথিয়াম সংগ্রহ করতে পারে—এ নিয়ে রীতিমতো কামড়াকামড়ি শুরু হয়ে গিয়েছিল। বাধ্য হয়ে তালেবান সরকার চীনাদের বিরুদ্ধে সাঁড়াশি অভিযানও পরিচালনা করেছিল। অনেক চীনা লাইসেন্স পাওয়ার আগেই লিথিয়াম সন্ধানে নেমে পড়েছিল। তাদের যেন আর তর সইছিল না। এক চায়নিজকে গ্রেফতারও করা হয়েছিল। ওই ব্যাটা ১,০০০ টন লিথিয়ামের উপাদান সাদা তরল চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল। চায়নিজ চোর কুনার থেকে পাকিস্তান হয়ে চীনে যেতে চেয়েছিল।

এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমাবিশ্ব খুবই উদ্বিগ্ন। তাদের ধারণা, আফগানিস্তান হয়তো চীনের সাথে গোপন চুক্তি সেরে ফেলেছে। চুক্তি মোতাবেক চীনই আফগানিস্তানের সমস্ত লিথিয়াম ও খনিজ পদার্থ উত্তোলন ও বিক্রি করবে। আফগানিস্তান থেকে চীনে কিছু নিয়ে যাওয়া খুবই সহজ। পথ খরচও কম। দুই দেশের মধ্যে ৯২ কিমির যৌথসীমান্ত থাকায় স্থলপথেই মালামাল স্থানান্তর করা যাবে। সীমান্তটা পাকিস্তানের উত্তরে ওরখান করিডোরের কাছে। তাজিকিস্তান ও পাকিস্তানের মাঝে ৩৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ সরু একটি করিডোর সংকুচিত হতে হতে চীনসীমান্তে গিয়ে ঠেকেছে। উভয় দেশের জন্য এই করিডোর চমৎকার এক ব্যবসায়িক লাইন হয়ে উঠতে পারে। আফগানিস্তান থেকে যেকোনো খনিজ পদার্থ বের করে চীনে নিয়ে যাওয়ার খরচ, অন্য দেশের তুলনায় অনেক কম হবে। এসব দেখে পশ্চিমারা হিংসা ও ঈর্ষায় জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে।

আফগানিস্তানের জন্য দুঃসংবাদও আছে। আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা ডিঙিয়ে কোনো দেশ আফগানিস্তানের সাথে চুক্তি করার সাহস পাবে না। চীনের সে ভয় নেই। চীন আমেরিকাকে থোরাই পরোয়া করে। চীনের সাথে চুক্তি হয়ে গেছে—এই সংবাদ চাউর হয়ে গেলে আর কেউ চুক্তির জন্য আসবে না। চীন যা দেয়, সেটা নিয়েই তালেবানকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। সেক্ষেত্রে তালেবান চীনাদের কাছে ঠকে যাওয়ার আশঙ্কা থাকবে। তালেবান বিষয়টা বুঝতে পেরেছিল। এক ঊর্ধ্বতন তালেবান বলেছিলেন, আমরা চীনের কাছে লিথিয়াম বিক্রির ব্যাপারে তাড়াহুড়া করছি না। তার মানে তখনো চুক্তি হয়নি।

আমেরিকা ও ইউরোপ আফগানিস্তানকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। জরুরি মানবিক সাহায্যও পুরো চাহিদা মাফিক দিচ্ছে না। তারা তালেবানকে মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। এমন পরিস্থিতিতে তালেবানের সামনে চীন ছাড়া আর কোন বিকল্প আছে? এমন কোনো দেশ আছে, যে বিশ্বের কোনো পরোয়া না করে আফগানিস্তানের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার মতো সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি রাখে? আফগানে হাত খুলে বিনিয়োগ করতে পারে? চীন ও আমেরিকা ছাড়া আর কেউ নেই। আমেরিকা সবে আফগানিস্তান ত্যাগ করে গেছে, সে আর আসবে না। বাকি থাকে শুধু চীন। চীনের লিথিয়াম দরকার। এজন্য চীন যেকোনো ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত। অপরদিকে তালেবানের দরকার বিদেশি বিনিয়োগ। দুইপক্ষই কাঙ্ক্ষিত বস্তু পেতে মরিয়া।

দুই দেশের দোস্তির আরেকটি নমুনা দেখা যেতে পারে। চীন-তালেবান তেল উত্তোলন চুক্তি হয়েছে। তালেবান মনে করে, এই চুক্তির ফলে আগামী ২৫ বছর পর্যন্ত আফগান অর্থনীতির চাকা মোটামুটি সচল থাকবে। আফগানিস্তানে উত্তরের প্রদেশ, তুর্কমেনিস্তানের সীমান্তবর্তী সার-ই-পোল, জুরজান এবং ফারিয়াবে তেল ও গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গেছে। বিশেষ করে আমুদরিয়া অববাহিকায় বিপুল পরিমাণ তেল-গ্যাস মজুদ আছে। চুক্তি মোতাবেক সাড়ে চার বর্গকিলোমিটার এলাকায় চায়না ন্যাশনাল পেট্রোলিয়াম কোম্পানির একটি সহযোগী সংস্থা তেলের জন্য ড্রিল করবে। এই অঞ্চলে অনেক আগেই তেল আবিষ্কৃত হয়েছে। কয়েক দশক আগে তুর্কমেনিস্তান এবং উজানে আমু নদীর অববাহিকায় তেল ও গ্যাস আবিষ্কৃত হয়েছিল। তখনই অনুমান করা হয়েছিল, আফগানিস্তানও যেহেতু আমু দরিয়ার অববাহিকায় অবস্থিত, তাই এখানেও তেল-গ্যাস পাওয়া যাবে। যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানে সে সময় তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনের অবস্থায় ছিল না। মোল্লা ওমরের শাসনামলে উত্তরের বাদাখশান, পাঞ্জশির ও নুরিস্তান পুরোপুরি তার নিয়ন্ত্রণে ছিল না। এটাও একটা কারণ ছিল। পরে মার্কিন সমর্থিত সরকার ক্ষমতায় আসার পর চীনের সঙ্গে তেল উত্তোলনের চুক্তি করেছিল। দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার কারণে সে চুক্তি বাস্তবায়িত হয়নি। এখন তেল উত্তোলনে আর কোনো বাধা নেই। তালেবান শাসন পুরো আফগানে প্রতিষ্ঠিত। তালেবান মুখপাত্র মোল্লা আবিহুল্লাহ টুইটে লিখেছেন, প্রতিদিন ১০০০ ব্যারেল তেল উত্তোলন করা হবে। ধীরে ধীরে পরিমাণকে ২০ হাজার ব্যারেলে উন্নীত করা হবে। চুক্তি

অনুযায়ী চীনা কোম্পানি তিন হাজার আফগানকেও চাকরি দেবে। চীন প্রথম বছরে পনেরো মিলিয়ন ডলার, পরের তিন বছরে চার মিলিয়ন ডলার আফগানে বিনিয়োগ করবে। তালেবান শুরুতে প্রকল্পের ২০ শতাংশ অংশ পাবে। ধীরে ধীরে শেয়ার ৭৫% পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে।

২০০৮ ও ২০১১ সালেও চায়নিজ কর্তৃপক্ষ কারজাই সরকারের সাথে তেলচুক্তি করেছিল। তখন চুক্তি বাস্তবায়িত হয়নি। বর্তমানে হবে—এর নিশ্চয়তা কোথায়? তখন ব্যর্থ হওয়ার প্রধান কারণ ছিল দুর্নীতি। বর্তমানে আফগানিস্তান দুর্নীতিমুক্ত। চুক্তি সফল হতে কোনো বাধা নেই। তাছাড়া আফগানিস্তানে চীনের স্বার্থটা শুধু অর্থনৈতিক নয়, নিরাপত্তার বিষয়ও আছে। উইঘুর স্বাধীনতাকামীদের সংগঠন 'পূর্ব তুর্কিস্তান ইসলামিক মুভমেন্ট' (ইটিআইএম)-কে চীন তার নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করে। চীন এই সংগঠনকে টিটিপি, আল-কায়েদা, আইএসের মতোই বিপজ্জনক বিবেচনা করে। আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চল 'পূর্ব তুর্কিস্তান ইসলামিক মুভমেন্ট'-এর সদস্য সংগ্রহের উর্বরক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত। এই অঞ্চলে বেকারত্বের হার অনেক বেশি। চীন ও পাশ্চাত্য গবেষকরা মনে মনে করে, বেকার অঞ্চল থেকেই জিহাদি সংগঠনগুলো বেশি সদস্য সংগ্রহ করতে পারে। এই অঞ্চলে চায়নিজ প্রকল্প শুরু হলে অনেক বেকার যুবক চাকরি পাবে। প্রকল্পের নিরাপত্তার স্বার্থে চায়নিজ ও তালেবান নিরাপত্তারক্ষীরা এই অঞ্চলে নজরদারি বাড়াবে। ফলে চীনাবিরোধী সংগঠনের তৎপরতা বাধাগ্রস্ত হবে।

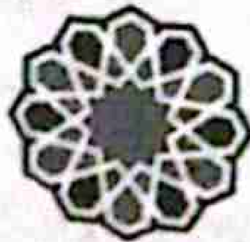
জিনজিয়াং চীনের পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত। মুসলিম অধ্যুষিত এই প্রদেশকে চীনের সবচেয়ে বড় জাতিগত অঞ্চল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই প্রদেশ কাগজে-কলমে বিশেষ ধরনের স্বায়ত্তশাসনের অধিকারী। তবে চীনা সরকার এখানকার মুসলিমের সাথে দাসসুলভ আচরণ করে থাকে। জিনজিয়াং পাকিস্তানের দ্বিগুণের চেয়েও বড়। জিনজিয়াংয়ের সাথে ৮টি স্বাধীন দেশের সীমান্ত আছে। জিনজিয়াং-এর আয়তন ১.৬ মিলিয়ন বর্গমাইল। চীনের সরকারি ভাষায় এই প্রদেশকে জিনজিয়াং বলা হলেও ঐতিহাসিকভাবে এই অঞ্চল 'পূর্ব তুর্কিস্তান' হিসেবে পরিচিত। এখানে ২ কোটিরও বেশি মুসলিমের বাস। এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে এই অঞ্চল স্বাধীনতার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৪৪ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এখানকার মুসলমানরা 'তুর্কিস্তান প্রজাতন্ত্র' নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রও প্রতিষ্ঠা করেছিল। রাষ্ট্রভাষা ছিল উইঘুর। বর্ণমালা ছিল 'আরবি', যা দেখতে অনেকটা উর্দুর মতো। ১৯৪৯

সালে মাও সে-তুং ছোট্ট তুর্কি রাষ্ট্রটিকে চীনের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল। 'তুর্কিস্তান প্রজাতন্ত্র' আয়তনে খুব বড় ছিল না। মাত্র তিনটি জেলা নিয়ে গঠিত হয়েছিল। এই স্বাধীন তুর্কি রাষ্ট্রের সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট আহমাদ তিজান কাসেমী ও বিশিষ্ট নেতা মাসুদ, এর শেষ সভাপতি এহতেশাম কাসেমী এবং অন্যান্য নেতা মাসুদ সাবরী প্রমুখকে গ্রেফতার করে ফায়ারিং স্কোয়াডে ঝাঁজরা করে দেওয়া হয়েছিল। কিছু নেতা উড়োজাহাজে করে দেশ ত্যাগের সময় বিমান ভূপাতিত করে সবাইকে হত্যা করা হয়েছিল। এভাবে এক এক করে স্বাধীন তুর্কিস্তানের নেতাদের মেরে ফেলা হয়েছিল। নির্যাতনের স্টিম রোলার চালিয়েও স্বাধীনতার স্বপ্ন-সাধকে চায়নিজরা হত্যা করতে পারেনি।

পূর্ব তুর্কিস্তানের স্বাধীনতাকামীরা তাদের স্বাধিকার আন্দোলনকে একটি পবিত্র কাজ বলে বিশ্বাস করে। চীন এই আন্দোলনকে সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রম মনে করে। জাতিসংঘ ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নও 'ইটিআইএম'-কে সন্ত্রাসী সংগঠন ঘোষণা করেছে। বলাবাহুল্য, চীনের চাপেই এই সিদ্ধান্ত। আমেরিকাও একই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ২০২০ সালের দিকে চীন যখন জিনজিয়াং-এ ভয়াবহতম নির্যাতন চালাতে শুরু করেছিল, তখন আমেরিকা 'ইটিআইএম'-কে সন্ত্রাসী সংগঠনের তালিকা থেকে বাদ দিয়েছে। বিশ শতকের শুরুতে উইঘুর মুসলিমদের স্বাধিকার আন্দোলনকে তুরস্কও সমর্থন করত। জাতিগত মিল থাকার কারণেই এমনটা হয়েছিল। চীন যখন উইঘুর মুসলিমদের ওপর বর্বরতম হামলা শুরু করেছিল, তখন উইঘুর নেতা মুহাম্মদ আমিন বুঘরা ও ঈসা ইউসুফের মতো বেশ কয়েকজন বিপ্লবী নেতা তুরস্কে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তারা আমৃত্যু তুরস্কেই ছিলেন।

উইঘুরদের প্রশ্নে চীন জিরো টলারেন্স নীতি অবলম্বন করে। কারণ, আল কায়েদা, আইএস বা তালেবানের মতো দল যদি পূর্ব তুর্কিস্তান আন্দোলনে যোগদান করে, চীনের জন্য সেটা এক মহাসমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। একবার এমনটা হয়েও ছিল। আল কায়েদা আগে চেষ্টা করেছিল; এখনো পরোক্ষভাবে করে থাকে। আইএসও করে। চীন আগাগোড়া ব্যবসায়ী রাষ্ট্র। ব্যবসা ছাড়া অন্য কিছু বোঝে না। ব্যবসার জন্য বাধা হতে পারে, এমন সবকিছুকেই চীন দলিত-মথিত করে দিতে দ্বিধা করে না। নিজের স্বার্থেই চীন একটি স্থিতিশীল আফগানিস্তান চায়। চীন কোনোভাবেই চায় না, নতুন আফগানিস্তান উইঘুরদের অভয়ারণ্যে পরিণত হোক। চীন যেকোনো মূল্যে আফগানিস্তানের সাথে তেল-গ্যাস ও লিথিয়াম চুক্তি টিকিয়ে রাখবেই। প্রশ্ন হলো, তাহলে কি

চীন আফগানিস্তানকে ইভি নির্মাণকারী দেশের কাতারে শামিল করে দিবে? হতে পারে। ইভি নির্মাণের কিছু কাজ চীনের ব্যবস্থাপনায় আফগানের মাটিতে সম্পন্ন হতে পারে। তবে সেটা ইভি নির্মাণের গুরুত্বপূর্ণ কোনো অংশ হবে না। খুবসম্ভব খনি সম্পর্কিত কাজকর্ম হবে। চীন এখনো ব্যাপকভাবে লিথিয়াম উত্তোলনের কাজে নামেনি। ২০২২ সালে কাবুলে চীনাদের ওপর আইএস হামলা করেছিল। চীন এখনো বোধহয় নিরাপত্তাজনিত শঙ্কা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। চীন মনে করে, আইএসের সাথে পূর্ব তুর্কিস্তান আন্দোলনের একটি অংশের যোগসাজশ আছে। চীনকে চুক্তিতে ধরে রাখতে হলে তালেবানকে খনিজ এলাকায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। বর্তমান তালেবান সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ২০২১ সালের ১৫ আগস্ট। তালেবান ধীরে ধীরে পুরো দেশকে স্থিতিশীল করার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। প্রায় সফল হয়ে গেছে বলা চলে। ইভি নির্মাণশিল্পে আফগানিস্তান নিজেকে কতটা জড়াতে পারে, ভবিষ্যৎই বলে দিবে।



অপারেশন সানরাইজ

০১.

লাল মসজিদ অপারেশন' পাকিস্তানের ইতিহাসে এক বাঁক সৃষ্টিকারী ঘটনা। ১৯৪৭ ও ১৯৭১ সাল যেমন পাকিস্তানের ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনা, ২০০৭ সালের জুলাই মাসও পাকিস্তানের জন্য এক ভয়ংকর বাঁক। এই ঘটনার পর থেকে পাকিস্তান নতুন এক যুগে প্রবেশ করেছিল। এই অভিযানকে অপারেশন সানরাইজ নাম দেওয়া হয়েছিল। অপারেশন সাইলেন্সও বলা হয় এই অভিযানকে।

পাক-আফগান সীমান্ত অঞ্চল, বিশেষ করে ওয়াজিরিস্তানের বিভিন্ন এলাকা ২০০১ সালের পর আল কায়েদা ও তার সহযোগীদের নিরাপদ দুর্গে পরিণত হয়েছিল। ২০০৩ ও ২০০৪-এর মাঝামাঝি শায়খ লাদেন ও তার নায়েব শায়খ জাওয়াহিরীও এই অঞ্চলেই আত্মগোপনে ছিলেন। তখন একিউর বিরুদ্ধে পাক আর্মি অভিযান শুরু করেছিল। এর ফলে একে একে একিউর বিভিন্ন ঘাঁটির পতন ঘটছিল। এর প্রতিক্রিয়ায় আল কায়দা এক মহা পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিল। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হলো শায়খ ঈসা মিশরীকে। তিনি মিশরি প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের হত্যার ষড়যন্ত্রে অংশ নেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিলেন। শায়খ ঈসা সোভিয়েতবিরোধী লড়াইয়ে শায়খ লাদেনের সাথি ছিলেন। তারপর ১৯৯০ সালের দিকে ইয়েমেনে দীন শেখানোর দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি শায়খ লাদেনের কাছের লোক ছিলেন। একিউর শুরার রোকনও ছিলেন। ২০০৩ সালে একিউ ঠিক করল, শায়খ ঈসাকে তাদের মাস্টারপ্ল্যান বাস্তবায়নের দায়িত্ব দিবে।

ফয়সাল মসজিদ প্রতিষ্ঠার ২০ বছর আগে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের নির্দেশে ইসলামাবাদের ঠিক মাঝামাঝিতে একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। তখন পাকিস্তানের রাজধানী করাচি থেকে ইসলামাবাদে স্থানান্তরিত হচ্ছিল। এজন্য ইসলামাবাদ শহরের মাস্টারপ্ল্যান নিয়ে কাজ হচ্ছিল। তখন পার্লামেন্ট ভবন ও লাল মসজিদের মাঝে অন্য কোনো ভবন ছিল না। মসজিদ নির্মিত হলো।

জেনারেল আইয়ুব খান ইমাম নিয়োগের জন্য করাচির বিখ্যাত কওমি মাদরাসা বানুরি টাউনের সাথে যোগাযোগ করলেন। এই মাদরাসার প্রধান আল্লামা ইউসুফ বানুরী রহ.-এর কাছে এ ব্যাপারে সাহায্য চাইলেন। আল্লামা ইউসুফ প্রেসিডেন্টের ডাকে সাড়া দিয়ে পাঞ্জাবের রাজেন্দ্রপুর এলাকার মাওলানা আবদুল্লাহ গাজিকে ইমাম নির্বাচিত করলেন। মাওলানা আবদুল্লাহ গাজি ছিলেন মাওলানা ফজলুর রহমানের পিতা মুফতি মাহমুদের খাস শাগরেদ।

১৯৬৫ সালে মাওলানা আবদুল্লাহ গাজিকে লাল মসজিদ কমপ্লেক্সের ইমাম ও দায়িত্বশীল নিয়োগ দেওয়া হলো। শুরুতে লাল মসজিদ আজকের তুলনায় ছোট পরিসরে ছিল। এই মসজিদ ছিল পাকিস্তানের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা সামরিক অফিসার, বিচারপতি ও মন্ত্রীদের নামায পড়ার জায়গা। বলতে গেলে ইসলামাবাদের সমস্ত রাজনৈতিক নেতা ও ক্ষমতাধররা এখানে নামায পড়তেন। হাই প্রোফাইল ব্যক্তিবর্গ এখানেই জুমা পড়তে আসতেন এবং নিজেদের সন্তানদেরও কুরআন শেখার জন্য পাঠাতেন। এখানে নামায পড়তে আসা এলিট শ্রেণির মুসল্লিদের সবার সাথেই একপ্রকার সখ্য গড়ে উঠেছিল মাওলানা গাজির। দিনদিন গাজি সাহেবের প্রতিপত্তি বেড়ে চলল।

লাল মসজিদ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার আরেকটি কারণ ছিল তার অবস্থান। লাল মসজিদ থেকে মাত্র দেড় কিমি দূরত্বে পাকিস্তানের সবচেয়ে শক্তিশালী সংস্থা আইএসআই-এর সদর দপ্তর অবস্থিত। তিন কিমির চেয়েও কম দূরত্বে পার্লামেন্ট; এর চেয়েও কম দূরত্বে পররাষ্ট্র দপ্তর। এই দপ্তরের কাছেই প্রায় সব বিদেশি দূতাবাস। ফয়সাল মসজিদ ১৯৮৬ সালে নির্মিত হয়েছিল। লাল মসজিদের ২০ বছর পর। আকারে-আয়তনে-সৌন্দর্যে ফয়সাল মসজিদ লাল মসজিদের চেয়ে এগিয়ে থাকলেও রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তিতে ফয়সাল মসজিদ আজও লাল মসজিদের ধারেকাছেও নেই। পাক প্রশাসন লাল মসজিদের এই প্রভাব প্রতিপত্তিকে বারবার কাজে লাগিয়ে ফায়দা হাসিল করেছে।

১৯৭৭ সালে প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর বিরুদ্ধে তুমুল বিক্ষোভ চলছিল। এই আন্দোলন পরবর্তীতে 'নেজামে মুস্তাফা' নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিল। এই আন্দোলনে লাল মসজিদ ও গাজি সাহেব শীর্ষ ভূমিকা পালন করেছিল। এই আন্দোলনের ফলে 'নেজামে মুস্তাফা' বা মুস্তাফার শাসন আসেনি সত্য,

তবে জেনারেল জিয়াউল হকের সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার পেছনে 'নেজামে মুস্তাফা' আন্দোলন শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেছিল। জেনারেল জিয়াউল হক ক্ষমতার মসনদে বসেই যাদেরকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে মাওলানা গাজি সাহেব ছিলেন শীর্ষে। লাল মসজিদের জন্য জেনারেল মুক্তহস্তে তহবিল বরাদ্দ করলেন, সার্বিক সহযোগিতা করলেন। আজকের লাল মসজিদ জেনারেলের বরাদ্দকৃত তহবিলেই সম্প্রসারিত হয়েছে, সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়েছে। মসজিদের সাথেই সত্তর দশকের মাঝামাঝিতে মেয়েদের জন্য মাদরাসা 'জামেয়া হাফসা' নির্মিত হয়। মসজিদ থেকে কয়েক কিমি দূরে ছেলেদের মাদরাসা জামেয়া ফরিদিয়া নির্মিত হয়। জেনারেল জিয়ার শাসনামলে মসজিদের পাশাপাশি এই দুই মাদরাসারও বিপুল উন্নতি সাধিত হয়।

জেনারেল জিয়ার হুকুমে মাওলানা গাজিকে 'চাঁদ দেখা কমিটি'-এর চেয়ারম্যান বানানো হয়েছিল। এই দায়িত্বকে পাকিস্তানে ধর্মীয় নেতৃত্বের পাশাপাশি রাজনৈতিক শক্তির বাহকও বিবেচনা করা হয়। পরবর্তীতে লাল মসজিদ আফগান জিহাদের লঞ্চিং প্যাড হিসেবে ভূমিকা পালন করেছিল। আফগান জিহাদে আমেরিকা ও সৌদি আরব প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছিল। আফগান জিহাদে সারা বিশ্ব থেকে মুসলিম তরুণরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়েছিলেন। বিভিন্ন দেশ থেকে আসা তরুণদেরকে আফগানে পাঠানোর আগে পেশাওয়ারের ইউনিভার্সিটি টাউনের মতো ইসলামাবাদের লাল মসজিদেও কিছুদিনের জন্য রাখা হতো। আফগান জিহাদের নয় বছরে সারাবিশ্ব থেকে আসা জিহাদি তরুণদের সূত্রে বিশ্বব্যাপী জিহাদি নেটওয়ার্কের সাথে লাল মসজিদের এক গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বিন লাদেন ও আইমান জাওয়াহিরী, আফগান মুজাহিদিন, পরবর্তীতে তালেবান নেতৃবৃন্দের লাল মসজিদে আসা-যাওয়া নিত্যকার ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

মাওলানা আবদুল্লাহ গাজি শুধু নামেই নয়, কামেও গাজি ছিলেন। তিনিও সশরীরে আফগান জিহাদে অংশ নিয়েছিলেন। বিন লাদেনের সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে সোভিয়েত বাহিনী আফগান থেকে পালিয়ে যাওয়ার পরও মাওলানা গাজি নিয়মিত আফগানে আসা-যাওয়া অব্যাহত রেখেছিলেন। ১৯৯৮ সালের অক্টোবরে এমন এক সফরে আফগানে গিয়েছিলেন। তিনি বেলুচিস্তানের লাগোয়া আফগান প্রদেশ কান্দাহারে গিয়েছিলেন। সাথে ছিল ছেলে আবদুর রশিদ গাজি। এই সফরে তিনি একিউ ও তালেবানের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। বিন লাদেনের সাথে

করে মাওলানা গাজি যখন উঠে আসছিলেন, তখন সাথে থাকা ছেলে মাওলানা আবদুর রশিদ বিন লাদেনের টেবিলের কাছে গেলেন। শায়খের সামনে থাকা অর্ধপূর্ণ গ্লাস তুলে অবশিষ্ট পানি পান করতে শুরু করলেন। বিন লাদেন বিস্মিত হয়ে জানতে চাইলেন :

-বেটা, আপনি এটা কী করছেন?

আবদুর রশিদ উত্তর দিলেন, আমি আপনার মতো মুজাহিদ হতে চাই।

বলা হয়ে থাকে, এই বৈঠকে শায়খ লাদেন মাওলানা আবদুল্লাহ গাজিকে এমন কোনো 'বার্তা' দিয়েছিলেন, যেটা পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ কারো কাছে পৌঁছানোর কথা ছিল। অথবা বার্তাটা লাল মসজিদের মুসল্লিদের কাছে জুমার খুতবার মাধ্যমে পৌঁছানোর কথা ছিল। একদিন মাওলানা আবদুল্লাহ গাজি জামেয়া ফরিদিয়া থেকে ঘরে ফিরছিলেন। দরজায় এক যুবক তার পথরোধ করে দাঁড়াল। যুবক সালাম-মুসাফাহা করে পকেট থেকে রিভলবার বের করে মাওলানা গাজির বুক বরাবর তাক করে গুলি চালাল। আততায়ী পুরো ম্যাগাজিন খালি করে দিয়েছিল। এই ঘটনা দেখেছিলেন তার পুত্রবধূ মাওলানা আবদুল আজিজের স্ত্রী উম্মে হাসান। দৃশ্যটা দেখার সাথে সাথে উম্মে হাসান দৌড়ে এসে আততায়ীকে ধাওয়া করলেন; কিন্তু তার আগেই আততায়ী একটা সাদা প্রাইভেট কারে উঠে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

উম্মে হাসানের বর্ণনা মতে, মাওলানা গাজিকে হত্যার কারণ হলো, তিনি শায়খ লাদেনের কাছ থেকে যে গোপন বার্তা নিয়ে এসেছিলেন, পাকিস্তানি গোয়েন্দা দপ্তর সে বার্তাকে গোপন রাখতে চাচ্ছিল। তাদের কথা না শুনে গাজি সাহেব লাল মসজিদের জুমার বয়ানে প্রকাশ্যে শায়খ লাদেনের বার্তা মুসল্লিদেরকে জানিয়ে দিচ্ছিলেন। মাওলানাকে হত্যার পর এফআইআরও করতে দেওয়া হয়নি। শুধু তাই নয়, বাবার মৃত্যুর পরপর ছেলে আবদুর রশিদকেও গোয়েন্দারা উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

ভিন্নমতও রয়েছে যে, মাওলানা আবদুল্লাহ গাজিকে শিয়ারা হত্যা করেছে। গাজি সাহেব জুমার বয়ানে শিয়াদের বিরুদ্ধে কঠোর বক্তব্য দিতেন। আশি ও নব্বুইয়ের দশকে পাকিস্তান হয়ে উঠেছিল সৌদি ও ইরানের প্রক্সিযুদ্ধের কেন্দ্রভূমি। শিয়া ও সুন্নির এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে একদিকে যেমন সৌদি মদদ যুগিয়ে যাচ্ছিল, অন্যদিকে ইরানও হাওয়া দিয়ে যাচ্ছিল। বাবার অসিয়ত মোতাবেক বড় ছেলে আবদুল আজিজ লাল মসজিদের খতিব হয়েছিলেন।

ছোট ছেলে আবদুর রশিদ এতদিন মসজিদ-মাদরাসার দায়িত্ব থেকে দূরে থাকতেন। তিনিও ইউনেস্কোর চাকুরি ছেড়ে দিয়ে বড় ভাইয়ের সাথে মাদরাসার দায়িত্বে যোগ দিলেন। দুই ভাই মিলে কাশ্মীরে জিহাদের জন্য লাল মসজিদ থেকে তরুণদের পাঠাতেন। তারপর নাইন ইলেভেন ঘটল। নাইন ইলেভেনের পর লাল মসজিদ ও প্রশাসনের মধ্যে বিরোধ দিনদিন তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগল। এখান থেকেই ঘটনা ভিন্ন দিকে মোড় নিতে শুরু করে।

২০০১ সালের ৭ অক্টোবর আফগানিস্তানের ওপর আমেরিকা হামলা শুরু করেছিল। এই হামলাকে 'এনডিউরেন্স ফ্রিডম' এবং এই যুদ্ধকে 'ওয়ার এগেনেইস্ট টেরর' নাম দেওয়া হয়েছিল। জেনারেল মোশাররফের নেতৃত্বে পাকিস্তান এই তথাকথিত ওয়ার অন টেররের সম্মুখ সারির কর্মী বনে গিয়েছিল। লাল মসজিদ কোনোভাবেই পাকিস্তানের এই পদক্ষেপ মেনে নিতে পারছিল না। যাদের বিরুদ্ধে পাক সেনারা আমেরিকার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ছে, তারা তো সবাই লাল মসজিদের মতাদর্শের লোক। গত ২০ বছর ধরে তারা কখনো লাল মসজিদের মেহমান বা মেজবান হয়েছে। লাল মসজিদ থেকেই তো নিয়মিত তাজাদম মুজাহিদ আফগানে যেত এবং সেটা আমেরিকার নাকের ডগা দিয়েই।

শুরুতে দুই ভাই 'তাহাফফুজে আফগানিস্তান' নামে এক আন্দোলন শুরু করেছিলেন। সমস্যাটা জটিল আকার ধারণ করেছিল, ওয়াজিরিস্তানের সবচেয়ে বড় এলাকা ওয়ানাতে ২০০৪ সালে অভিযান চালানোর পর। আফগানিস্তানে মার্কিন হামলা শুরু হওয়ার পর সেখান থেকে বহু একিউ ও তালেবান নেতা পাকিস্তানের কাবায়েলি এলাকায় এসে আশ্রয় নিয়েছিল। পাক সেনারা এই নেতাদেরকে ধরপাকড় শুরু করেছিল। এর প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তান জুড়ে বোমা হামলা শুরু হয়ে গিয়েছিল। জেনারেল মোশাররফের ওপরও দুইবার ইস্তেশহাদি হামলা হয়েছিল। জেনারেল না মরলেও এসব হামলায় বহু নিরপরাধ মানুষও মারা গিয়েছিল।

ওয়ানার অভিযান ছিল লাল মসজিদ ও পাকপ্রশাসনের চূড়ান্ত বিচ্ছেদক্ষণ। একিউ এই সময়টাকে তুরুপের তাস হিসেবে ব্যবহার করল। শায়খ লাদেন বিশেষ দূতের মাধ্যমে লাল মসজিদে মাওলানা আবদুল আজিজের কাছে এক গোপন বার্তা পাঠালেন। সেই পয়গাম কী ছিল? শায়খ লাদেনের মেসেজ ছিল,

মাওলানা আবদুল আজিজ যেন পাক ফৌজের ওয়াজিরিস্তান অভিযানের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করেন। মাওলানা আবদুল আজিজ ফতোয়া জারি করে দিলেন। তিনি ফতোয়াতে বলেছিলেন :

> 'একিউ ও তালেবানের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে নিহত পাক সেনাদেরকে মুসলমানদের কবরে যেন দাফন করা না হয়। এসব সেনার জানাযাও পড়া যাবে না। তাদেরকে শহীদ হওয়ার বদলে 'হালাক' বলতে হবে'।

এই ফতোয়া পুরো পাকিস্তানে ছড়িয়ে দেওয়া হলো। পাশাপাশি ৫০০ আলেমের দস্তখত নেওয়া হলো। এই ফতোয়া ছিল সরকারের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বিদ্রোহ। একিউ চেয়েছিল, এই ফতোয়ার মাধ্যমে পাক সেনাদের ধর্মীয় জযবা যতটা পারা যায়—ব্যবহার করতে। তাহলে সেনাকর্তারা পুরো শক্তিতে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতে পারবে না। একিউ যেমনটা আশা করেছিল, ফতোয়ার প্রতিক্রিয়া তেমনই হলো। নিচু পদের অনেক সেনা এই অভিযানে অংশ নিতে অস্বীকৃতি জানাল। কেউ কেউ সেনা চাকুরিতে ইস্তফা দিলো। অনেক সেনাকে কর্তৃপক্ষ তাদের মনোভাব আঁচ করে বদলি করে দিলো। অনেকের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হলো।

পাক সরকার এতদিন জিহাদিস্ট ও তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারছিল না। রাজনৈতিক অস্থিরতাই এর প্রধান কারণ ছিল। দেশের দুই প্রধান দল মুসলিম লীগ নুন ও পিপলস পার্টির ঊর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দ পরিস্থিতির কারণে দেশের বাইরে অবস্থান করছিলেন। জেনারেল মোশাররফের অধীনে নবগঠিত মুসলিম লীগ (কিউ)-এর নেতা চৌধুরি শুজাআত হুসাইনও অভিযান পরিচালনার ব্যাপারে দ্বিধান্বিত ছিলেন। তিনিও ধর্মীয় ভোট ব্যাংক হারানোর ভয় করছিলেন। জমিয়ত ও জামাআত উভয় দলও এই অভিযানবিরোধী ছিল। ইমরান খান ও তার সদ্যগঠিত দলও কাবায়েলি এলাকায় সেনা অভিযানের বিরুদ্ধে ছিল। এত বিরূপ পরিস্থিতির পরও জেনারেল মোশাররফকে এক তিক্ত ও ভয়ংকর সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। তিনি রাজনৈতিক মধ্যস্থতাকারীর সহায়তায় ওয়াজিরিস্তানের জিহাদিদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করেন। এই চুক্তির জামিন ছিলেন স্থানীয় গোত্রনেতা ও জিরগা। ৮ পৃষ্ঠার এই চুক্তি মিরানশাহ চুক্তি বা ওয়াজিরিস্তান চুক্তি হিসেবে পরিচিত। চার পৃষ্ঠায় ছিল চুক্তির শর্তাবলি, বাকি চার পৃষ্ঠায় সাক্ষীদের দস্তখত।

এই চুক্তিতে বলা হয়েছিল,

১. পুরো ওয়াজিরিস্তান থেকে বিদেশি জিহাদিদের বের করে দেওয়া হবে। কোনো সমস্যার কারণে কেউ এই স্থান ছেড়ে যেতে অপারগ হলে তার রেকর্ড রাখতে হবে।

২. অভিযান চলাকালে গ্রেফতারকৃত সবাইকে অস্ত্রসহ ছেড়ে দেওয়া হবে। মুক্তি প্রাপ্ত ব্যক্তিদেরকে আগের কোনো ঘটনার জন্য দ্বিতীয়বার ধরপাকড় করা যাবে না। পাক সেনারা ওয়াজিরিস্তানে অভিযান চালানো বন্ধ করে দিবে।

৩. ওয়াজিরিস্তানে সবধরনের সমস্যা স্থানীয় রীতি-ঐতিহ্য অনুসারে সমাধান করা হবে।

এই চুক্তি যখন স্বাক্ষরিত হচ্ছিল তখন উভয়পক্ষই জানত—এই চুক্তিটা সাময়িক। উভয়পক্ষই আসলে কিছু সময় চাচ্ছিল। এই চুক্তি বিদেশি জিহাদিদের জন্য অত্যন্ত উপকারী সাব্যস্ত হয়েছিল। চুক্তির ধারা মোতাবেক তারা ওয়াজিরিস্তান ছেড়ে তো যায়-ই-নি, উল্টো এই সময়টাতে তারা ব্যাপক সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল। একিউ ও তাহরিকে ইসলামি উজবেকিস্তান ব্যাপক হারে সদস্য ভর্তি শুরু করে দিয়েছিল। এই দুই দলের আহ্বানে পাকিস্তানের স্থানীয় বহু জিহাদি দলও ব্যাপকভাবে সাড়া দিয়েছিল। হরকতে জিহাদে ইসলামির নেতা ইলয়াস কাশ্মীরীও একিউর সাথে হাত মিলিয়েছিলেন। তিনি মূলত কাশ্মীরে কাজ করতেন। ২০০৭ সালের দিকে তিনি একিউর শুরাসদস্যও নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই তিন দল ওয়াজিরিস্তানে নিজেদের ট্রেনিং ক্যাম্প স্থাপন করে পুরোদস্তুর সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করেছিল। তারা নিজেদেরকে দীর্ঘ লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করছিলেন। বোমা থেকে আত্মরক্ষার জন্য পাহাড়ে গভীর টানেল নির্মাণ করে রেখেছিলেন। সেখানে বিপুল পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র সঞ্চিত করে রাখলেন। কথিত আছে, অতি উৎসাহী কেউ কেউ ইস্তেশহাদি কিশোর-তরুণদের আকৃষ্ট করার জন্য মনোহর দৃশ্য সংবলিত পোস্টার, সুন্দরী তরুণীদের ছবি দিয়ে সজ্জিত কামরা প্রস্তুত করে রাখা হতো। ছবির নারীরা মূলত ভারতীয় নায়িকা বা নর্তকী ছিল। জিহাদবিদ্বেষী পাক সেকুলার সাংবাদিক মহল এ ধরনের সংবাদ সত্যমিথ্যা যাচাই না করেই বেশ ফলাও করে প্রচার করত।

পাক গোয়েন্দা বিভাগ ও সিআইএ উভয় সংস্থাই বারবার জেনারেল পারভেজ

মোশাররফকে সতর্ক করছিল যে, পরিস্থিতি দিনদিন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। এখনই কিছু করা দরকার। দিনদিন জিহাদিদের সংখ্যা বেড়েই চলছিল। ২০০৭ সাল পর্যন্ত উত্তর ও দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে ৫০ হাজারেরও বেশি যোদ্ধা জমায়েত হয়েছিল। এই অঞ্চল কাগজে-কলমে পাকিস্তানের অংশ হলেও জিহাদিরাই মূলত এই অঞ্চল শাসন করছিল। তেহরিকে তালেবানের প্রতিষ্ঠাতা বাইতুল্লাহ মেহসুদ এই এলাকার নাম, ইমারাতে ইসলামি ওয়াজিরিস্তান' নির্ধারণ করে স্বাধীন ইসলামি রাষ্ট্র কয়েম করেছিলেন। কথিত আছে, একিউ এই কাজের জন্য টিটিপিকে কয়েক মিলিয়ন ডলার ঋণ দিয়েছিল। শায়খ লাদেন, শায়খ জাওয়াহিরী ও তেহরিকে ইসলামি উজবেকিস্তানের আমির কারী তাহেরও ওয়াজিরিস্তানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই অঞ্চলে আশ্রয় নেওয়া সমস্ত নেতৃবৃন্দের বিস্তারিত তথ্য সিআইএ ও আইএসআই পাক সরকারের হাতে তুলে দিয়েছিল। এই দুই সংগঠন চাচ্ছিল, অত্র অঞ্চলে খুব দ্রুত অভিযান পরিচালনা করা হোক। পাকিস্তানে থাকা একিউর সমস্ত 'সম্পত্তি'-র বিস্তারিত তথ্যও এই দুই সংস্থা পাক সরকারের হাতে সোপর্দ করেছিল।

১. এসব সম্পত্তি কী ছিল?

২. দুই গাজি ভাইয়ের কাছে, মিশরি শায়খ ঈসা কী দাবি করেছিলেন?

৩. একিউর রোকনরা জামাআত নেতা কাজি হোসাইন আহমাদ, ডা. এসরার আহমাদ ও হাফেয সাঈদের সাথে কেন সাক্ষাৎ করেছিলেন?

<u>০২.</u>

২০০৭ সালে আল কায়েদার পরিকল্পনা ছিল, ধর্মীয় আবেগ-জযবা কাজে লাগিয়ে পাকিস্তানজুড়ে একটা বিদ্রোহের পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে, যাতে ওয়াজিরিস্তানে তাদের বিরুদ্ধে চলমান অভিযান বন্ধ হয়ে যায়। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে একিউ নেতারা তাদের গুরুত্বপূর্ণ রোকন শায়খ ইসা মিশরীকে পাকিস্তানের উলামায়ে কেরামের কাছে আলোচনার জন্য পাঠিয়েছিলেন। শায়খ ঈসা পুরো পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাদের মধ্যে জামাআত নেতা কাজি হুসাইন আহমাদ, হাফেয সাঈদ, মাওলানা ফজলুর রহমান, ডা. এসরার আহমদ শামিল ছিলেন। তাদের কাছে শায়খ ঈসা আবেদন করেছিলেন, তারা যেন পাক সরকার, পাক নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করেন।

২০০৭ সালের শুরুতে সিআইএ ও পাক গোয়েন্দারা পাকিস্তানে থাকা একিউর যাবতীয় সহায়-সম্পত্তির বিস্তারিত তথ্য জেনারেল মোশাররফের হাতে তুলে দিয়েছিল। এসব তথ্যের মধ্যে সম্পত্তির পাশাপাশি একিউকে সাহায্যকারী ও একিউর প্রতি সহানুভূতিশীলদের নামধামও ছিল। এই তালিকার শীর্ষে লাল মসজিদের নাম ছিল। এ ছাড়া সোয়াত উপত্যকা ও সেখানকার মাওলানা ফজলুল্লাহর নাম ছিল; তেহরিকে নিফাজে শরিয়তে মোহাম্মদীর নেতা সুফি মুহাম্মাদের নাম ছিল, যিনি উত্তর ও দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের বাজোরের সশস্ত্র যোদ্ধাদের সাথে যুক্ত ছিলেন।

সেই তালিকায় লাল মসজিদের সাথে জামেয়া হাফসা ও জামেয়া ফরিদিয়া ছাড়াও লাল মসজিদের অধীনে গত ৪০ বছরে প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাও শামিল ছিল। এসব মাদরাসার অনেকগুলোই সরকারিভাবে বেআইনি (!) ছিল। অর্থাৎ, এগুলোর প্রতিষ্ঠার সময় সরকারের পক্ষ থেকে এনওসি নেওয়া হয়নি। প্রশাসনের পক্ষ থেকে এনওসি না নিয়ে মসজিদ-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করাকে উলামায়ে কেরাম বেআইনি মনে করতেন না। উলামায়ে কেরামের মতে, সরকারি জায়গার ওপর মসজিদ-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা দীনি দায়িত্ব। সরকার এই দায়িত্ব পালন না করলে উলামায়ে কেরাম ও সাধারণ মুসলমানের ওপর এই কাজ আঞ্জাম দেওয়া ফরজ।

লাল মসজিদের সরাসরি অধীনে ১০টির মতো মসজিদ-মাদরাসা ছিল। এসব মসজিদ-মাদরাসায় ৬ থেকে ৮ হাজার ছাত্রছাত্রী ছিল। এসব ছাত্রছাত্রীদের বেশিরভাগ মালাখন্ড ও সোয়াত থেকে আগত। এদের প্রায় সবারই কোনো না কোনো নিকটাত্মীয় রাশিয়ার বিরুদ্ধে আফগানে বা কাশ্মীরে জিহাদ করেছিল, কেউ না কেউ শহীদ হয়েছিল। দীনের সাথে আত্মিক সম্পর্ক, জিহাদের সুতীব্র বাসনা ও শাহাদাতের তামান্নার শিক্ষা এই বাচ্চারা ছোটবেলা থেকেই পেয়ে এসেছে। লাল মসজিদ ঘরানার মাদরাসাগুলো তাদের সেই শিক্ষাকে আরো বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে।

একিউর বিস্তারিত তথ্য পাক কর্তৃপক্ষের হাতে সোপর্দ করার পর একের পর এক মার্কিন-ব্রিটিশ কর্মকর্তারা পাকিস্তানে আসতে লাগল। তাদের একটাই দাবি ছিল, পাকিস্তান যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সশস্ত্র সংগ্রাম নির্মূল করার কার্যকর ও যৌথ ব্যবস্থা গ্রহণ করুক। যৌথ বলতে, পাক সেনাদের সাথে আফগানে অবস্থানরত ইঙ্গ-মার্কিন সেনারাও অভিযানে থাকবে। পাকিস্তানের ওপর

দিনদিন এই অভিযান পরিচালনার জন্য চাপ বেড়েই চলছিল। চাপের কাছে নতি স্বীকার করে ২০০৪ সালের জানুয়ারি থেকেই পাক সরকার অপারেশন শুরু করে দিয়েছিল। সরকারের কাছ থেকে এনওসি করা ছাড়া লাল মসজিদের ভাবাদর্শে প্রতিষ্ঠিত মসজিদ-মাদরাসাগুলোকে বেআইনি ঘোষণা করা হয়েছিল। এ ধরনের মসজিদ-মাদরাসার সংখ্যা ছিল প্রায় ৮০টি। এর প্রতিবাদে জামেয়া হাফসার ছাত্রীরা রাস্তায় নেমে এসেছিল। ৩ হাজারের মতো ছাত্রী চিলড্রেন লাইব্রেরির সামনে অবস্থান ধর্মঘট শুরু করে দিয়েছিল। তারা দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার লাগিয়ে দিয়েছিল। তাতে লেখা ছিল :

'শরিয়ত অথবা শাহাদাত'

বিক্ষোভরত মেয়েরা দাবি জানাচ্ছিল, বেআইনি ঘোষণা করে গুঁড়িয়ে দেওয়া মসজিদ-মাদরাসাগুলো পুনর্নির্মাণ করতে হবে। তারা আরো ৪টি মসজিদেরও পুনর্নির্মাণের দাবি জানাচ্ছিল, যেগুলো রাস্তাঘাট সম্প্রসারণের সময় ভেঙে ফেলা হয়েছে। তাদের এও দাবি ছিল, যেসব মসজিদ-মাদরাসাকে বেআইনি ঘোষণা করা হয়েছে, সেগুলোকেও বৈধ ঘোষণা করা হোক।

সরকারি তথ্যমতে, বিক্ষোভরত ছাত্রীদের প্রতিষ্ঠান 'জামেয়া হাফসা'-ও অবৈধ ছিল। ইসলামাবাদ ডেভেলপমেন্ট অথরিটির মতে, জামেয়া হাফসার জন্য যতটুকু জায়গা বরাদ্দ ছিল, মাদরাসা কর্তৃপক্ষ তার চেয়ে বেশি জায়গা দখল করে নিয়েছিলেন। ন্যাশনাল বুক ফাউন্ডেশন ও ওয়েডিং হলের জন্য বরাদ্দকৃত জায়গা জামেয়া হাফসার দখলে চলে গিয়েছিল। ছাত্রীদের বিক্ষোভ ও অবস্থান ধর্মঘট টানা ৩ সপ্তাহ ধরে অব্যাহত ছিল। পাক সরকার চাপে পড়ে এটুকু করতে সম্মত হয়েছিল যে, সম্প্রতি ভেঙে ফেলা একটি মসজিদ নতুন করে নির্মাণ করে দেওয়া হবে। লাল মসজিদ কর্তৃপক্ষ ও ছাত্রীদের দাবি ছিল, যেখানে মসজিদটি আগে ছিল, ঠিক সেখানেই নতুন করে নির্মাণ করে দিতে হবে। সরকার এই দাবি মানছিল না। ফলে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে নাজুক হতে শুরু করেছিল।

গাজী ভ্রাতৃদ্বয় তাদের মনোভাব আরো অনঢ় করে ফেললেন। তারা শুধু মসজিদ নির্মাণের দাবি করেই ক্ষান্ত হলেন না, পুরো দেশে ইসলামি শাসনব্যবস্থা কায়েম করার ব্যাপারেও আপসহীন অবস্থানে চলে গেলেন। অন্যদিকে সরকার দুই ভাইয়ের এই দাবির প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপই করছিল না। ২০০৭ সালের ৬ এপ্রিল জুমাবারে বয়ানে লাল মসজিদ থেকে ঘোষণা

দেওয়া হলো, যেখানে যেখানে লাল মসজিদের প্রভাব আছে, আমরা সেখানে ইসলামি শরিয়াহ বাস্তবায়নের ঘোষণা দিচ্ছি। রাজধানী শহরের প্রাণকেন্দ্র থেকে এমন ঘোষণা ছিল চাঞ্চল্যকর।

এই ঘোষণার পটভূমি কী ছিল? উপস্থিত মুসল্লিরা জানত না, মাওলানা আবদুল আজিজের মিশনটা কী, তার পেছনে কে আছে? মাওলানার এই ঘোষণা ছিল শায়খ ঈসা মিশরীর সাথে এক গোপন বৈঠকের ফলাফল। ৭০ বছর বয়েসি শায়খ ঈসা আরব হলেও দুই দশক ধরে পাক-আফগানে বাস করার কারণে উর্দু ও পশতু ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতেন। পাঞ্জাবি ও পশতুন ছাত্রদের কাছে তিনি ছিলেন হিরো। তার পুরো শরীর জুড়ে ছিল অসংখ্য শুকনো ক্ষতচিহ্ন। এর মধ্যে একটি তরতাজা যখমও ছিল। এটি ছিল ওয়াজিরিস্তানে অভিযান পরিচালনারত পাক সেনাদের বুলেটের আঘাত। তিনি ২০০৪ সাল থেকেই পাকিস্তানে বাস করে আসছিলেন। তিনি শুধু পাকিস্তানেই নন, আন্তর্জাতিকভাবেও মোস্ট ওয়ান্টেড ব্যক্তির তালিকার শীর্ষে ছিলেন। যেকোনো মুহূর্তে গ্রেফতার হওয়ার সমূহ আশঙ্কা নিয়েই শায়খ ঈসা পুরো পাকিস্তানের এমাথা-ওমাথা চষে ফিরতে লাগলেন। শায়খের একটি বই ছিল, আলওয়ালা ওয়ালা বারা। বইটির উর্দু ও পশতুন অনুবাদ পুরো পাকিস্তানে ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন। বইয়ের বক্তব্যের নির্যাস অনেকটা এমন ছিল, গণতন্ত্র একটি কুফরি মতবাদ, পাকিস্তান সরকার একটি কাফের সরকার। বইটিতে কুরআন ও সুন্নাহর পাশাপাশি ইমাম ইবনে তাইমিয়ার চিন্তা-ইজতিহাদকে ব্যাপকহারে ব্যবহার করা হয়েছিল।

কাবাঘর আক্রমণকারী জুহাইমান উতাইবী ও আবদুল্লাহ কাহতানী যেসব কথাবার্তা বলে তাদের অনুসারীদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, শায়খ ঈসার বইটিতেও হুবহু সে ধরনের কথাবার্তা ছিল। জুহাইমান ও তার সাথিরা ১৯৭৯ সালের ২০ নভেম্বর প্রায় দুই সপ্তাহের মতো কাবা শরিফকে কবজা করে রেখেছিল। জুহাইমানরা যেসব অভিযোগ সৌদি সরকারের বিরুদ্ধে উত্থাপন করেছিল, শায়খ ঈসাও তার বইয়ে পাক সরকারের বিরুদ্ধে হুবহু সেসব অভিযোগই উত্থাপন করেছিলেন। বইতে ফতোয়া দেওয়া হয়েছিল : সৌদির বিরুদ্ধে জিহাদ করা যেমন প্রতিটি মুসলমানের ওপর ফরজ, পাক সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ করাও প্রতিটি মুসলমানের ওপর ফরজ।

উল্লেখ্য, এই মাসআলায় মুসলিম উম্মাহর মূলধারার উলামায়ে কেরামের প্রথাগত ফতোয়া এতটা কঠোর নয়। একিউর কর্তাব্যক্তিদের এই বিশ্বাস

ছিল, তারা যদি পাকিস্তানের ধর্মীয় ঘরানাকে এই কথা বোঝাতে সক্ষম হন যে, পাকিস্তান আর ইসলামি রাষ্ট্র নেই; পাকিস্তান এখন আমেরিকার সহযোগী হয়ে গেছে, তাহলে পাকিস্তানে 'খুরুজ' করা মানে শাসকের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে নেমে পড়া সহজ হয়ে যাবে। অথবা সবাই যদি সরকারের বিরুদ্ধে বের নাও হয়, তারপরও এটুকু লাভ হবে যে, অভ্যন্তরীণ বিরোধিতার মুখে পাক সরকার আফগানিস্তানে আমেরিকাকে সাহায্য করা থেকে বিরত থাকবে। পাশাপাশি একিউর এই চিন্তাও ছিল, খুরুজ যদি সফল হয়ে যায়, তাহলে পাকিস্তান হয়ে উঠবে বিশ্বব্যাপী জিহাদের লঞ্চিং প্যাড। সূতিকাগার।

শায়খ ঈসা ডা. এসরার আহমাদের কাছে গেলেন। ডাক্তার সাহেব আগে থেকেই ইসলামি খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সোচ্চার ছিলেন। তবে তার কর্মসূচি ছিল সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। তিনি কখনো খিলাফাহর জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের ডাক দেননি। শায়খ ঈসা তারপর জামাআতের কাজি হুসাইন আহমাদ, লশকরে তাইয়েবার হাফেয সাঈদ ও মুফতি ফজলুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। প্রত্যেককে তিনি নিজের বইয়ের আলোকে একটা কথাই বোঝাতে চেয়েছেন, পাক সরকার অমুসলিম। এর সপক্ষে তিনি কুরআন-সুন্নাহ থেকে দলিল পেশ করেছেন। সবাই শায়খ ঈসার সাথে সর্বাত্মকভাবে না হলেও মৌলিকভাবে একমত হয়েছেন। তখন শায়খ সবাইকে প্রশ্ন করেছেন, আপনারা আমার কথার সাথে একমত হলে কাফের সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করছেন না কেন? লড়াইয়ের প্রশ্নে আলেমগণ শায়খ ঈসার সাথে একমত হননি। কাজি হুসাইন আহমাদ বলেছিলেন, আপনার কথার আমি নীতিগতভাবে একমত হলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকারের বিরুদ্ধে হাতিয়ার তুলে নেওয়ার অর্থ পাকিস্তানের শত্রু ভারত-আমেরিকাকে খুশি করা।

মোটকথা, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ একিউকে সাহায্য করতে অপারগতা জানালেন। শায়খ ঈসা নিরাশ না হয়ে লাল মসজিদে এলেন। দুই গাজি ভাইকে নিজের বই থেকে আপন বক্তব্য তুলে ধরলেন। শায়খ উসামার পক্ষ থেকে বার্তা পৌঁছালেন। আপনারা যদি আমাদের কথায় একমত হন, তাহলে পাক সরকারের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করুন। দুই ভাই এ কথা জানতেন, লাল মসজিদ শুরু থেকেই পাক প্রশাসনের সাথে গভীর সম্পর্কে জড়িত। তাদের পিতার আমল থেকেই এই ধারা চলে আসছে। পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই শুরু থেকেই লাল মসজিদকে কাশ্মীর ও আফগান জিহাদের

...হিসেবে ব্যবহার করে আসছিল। এখন পাক সেনাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া ...অর্থ, এতোদিনকার সুসম্পর্ক ছিন্ন করা।

...এই শায়খ ঈসার সাথে একমত হলেন। ফতোয়া জারি করলেন, একিউ ...জওয়ানের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনাকালে মারা যাওয়া পাক সেনাদেরকে শহীদ বলা যাবে না। তাদের জানাযাও পড়া যাবে না। মাওলানা আবদুল আজিজ গাজি এখনো (বর্তমানেও) এই ফতোয়াকে সঠিক মনে করেন। তবে পাশাপাশি এ কথাও বলেন, তারা কারো অনুরোধে এই ফতোয়া জারি করেননি; বরং নিজের ইজতিহাদের আলোকেই ফতোয়াটি জারি করেছিলেন। ৬ এপ্রিল ২০০৭ সালের জুমার বয়ানে মাওলানা আবদুল আজিজ, লাল মসজিদ ও জামেয়া হাফসার চৌহদ্দীতে শরিয়াহ বাস্তবায়নের ঘোষণা দিয়েছিলেন। তারা সরকারকে এক মাসের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন যে, এরমধ্যে ইসলামাবাদের ভিডিও দোকানগুলো বন্ধ করে দিতে হবে। লাল মসজিদে উলামায়ে কেরাম দ্বারা গঠিত একটি শরিয়াহ কোর্টও স্থাপন করেছিলেন। পতিতালয়গুলোতে হানা দিয়ে সেখানকার নারীদের উদ্ধার করে পুনর্বাসিত করার ঘোষণা দিলেন। সরকারকে আরো বলেছিলেন, পুরো দেশে ছড়িয়ে থাকা ৫ লাখ পতিতালয় ও শরাবখানা বন্ধ করে দেওয়া হোক। না হলে তারা নিজেরাই ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। লাল মসজিদ ও জামেয়া হাফসাতে নিয়মিত জিহাদি বয়ান জারি করা হলো। লাল মসজিদ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর গুদামে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ শুরু হলো। তখন এসব প্রতিষ্ঠানে ৬ থেকে ৮ হাজার ছাত্র ছিল। চিলড্রেন লাইব্রেরির সামনে ধরনা দিয়ে বসে থাকা জামেয়া হাফসার ছাত্রীরা লাইব্রেরি দখল করে নিল। মাওলানা আবদুল আজিজ সাক্ষাৎকারেও শিশু লাইব্রেরি দখল করার কথার স্বীকার করেন। ইসলামি শাসন চালু করার জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

৬ এপ্রিল জুমার পর জামেয়া হাফসার ছাত্রীরা লাঠি হাতে ইসলামাবাদের রাস্তায় নেমে এসেছিল। তাদের দাবি ছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত শরিয়াহ কায়েম হবে না, তারা শিশু পাঠাগার ছেড়ে যাবে না। এমকিউএমের নেতা আলতাফ হোসাইন লাল মসজিদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু করে দিলো। সে বলেছিল, সরকার যদি লাল মসজিদ ও জামেয়া হাফসার নিয়ন্ত্রণ না নেয়, তাহলে 'দমাদম মাস্ত কালান্দর' হয়ে যাবে। আমেরিকা মাত্র একদিন আগে বলেছিল, পাকিস্তান একিউ ও সংশ্লিষ্ট দলের বিরুদ্ধে কার্যক্রম শুরু করলে আমেরিকা

সাহায্য করবে। লাল মসজিদের বিরুদ্ধে হামলার আশঙ্কা দেখে মাওলানা আবদুল আজিজ বারবার হুমকি দিচ্ছিলেন, লাল মসজিদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা হলে তারা ইস্তেশহাদি হামলা শুরু করে দিবেন।

সেদিন সন্ধ্যা নাগাদ লাল মসজিদের ছাত্রছাত্রীরা ইসলামাবাদের শপিংমলগুলোতে থাকা ভিডিও-সিনেমার দোকানগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে শুরু করে দিয়েছিল। দোকানগুলো জোর করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। দোকানে থাকা সিনেমার ভিডিওগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। লাল মসজিদের সাহায্যে এগিয়ে আসা অসংখ্য ছাত্রীকে সরকার গ্রেফতার করল। মাওলানা আবদুল আজিজ আবারো সরকারকে সতর্ক করে দিলেন, আমাদের বিরুদ্ধে সরকারি শক্তি ব্যবহার করা হলে আমরা জিহাদ শুরু করে দিব। সরকার বারবার আহ্বান জানাচ্ছিল, শিশু পাঠাগার যেন মুক্ত করে দেওয়া হয়। লাল মসজিদের পক্ষ থেকে বলা হলো, শরিয়াহ আইন বাস্তবায়ন করা হোক। তারপর শুধু শিশু পাঠাগারই নয়, আমাদের সমস্ত মাদরাসা কবজায় নিয়ে নিলেও আমাদের আপত্তি থাকবে না।

মাওলানা আবদুল আজিজ ও মাওলানা আবদুর রশিদ এমন অনড় অবস্থান গ্রহণের পেছনে কারণ ছিল। এফিউর পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালিত হলে এফিউ ও সংশ্লিষ্ট দলগুলো লাল মসজিদের পক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়বে। গাজি ভাইদের এই বিশ্বাসও ছিল, তারা যদি শরিয়াহ আইন বাস্তবায়নে সফল হয়, তাহলে পুরো পাকিস্তানজুড়ে দেওবন্দি ও তালেবানি ঘরানার ১৩,৫০০ মাদরাসার ১৮ লাখ ছাত্রছাত্রী তাদের সাথে যোগ দিবে। তখন নিজেদের পরিকল্পনামতো সরকার পরিচালনা করা, ধর্মীয় মহলকে দিয়ে বিদ্রোহ করানো সহজ হয়ে যাবে। এতসব ঘটনা পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে ঘটছিল। এই সংকট থেকে উত্তরণ ও বৈশ্বিক চাপ সামলানোর জন্য পাক সরকার ধর্মমন্ত্রীকে তলব করল। ধর্মমন্ত্রী ছিলেন মোহাম্মাদ এজাজুল হক। তিনি জেনারেল জিয়াউল হকের ছেলে ছিলেন। গাজি ভ্রাতৃদ্বয়ের সাথে তার সম্পর্ক বহুত পুরোনো। সেই আফগান জিহাদের সময় থেকে। তিনি পুরোনো সম্পর্ক ব্যবহার করে দুই গাজিকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন। তিনি মাওলানা আবদুল আজিজের হাত-পা ধরে অনুরোধ করলেন। বললেন, আপনি যা করতে যাচ্ছেন, এর পরিণতিতে আমি এক আগুনের সমুদ্র দেখতে পাচ্ছি। মাওলানা সবকিছু শোনার পরও আপন সিদ্ধান্তে অটল রইলেন।

জেনারেল মোশাররফের ওপর বৈশ্বিক চাপ ক্রমাগত বেড়েই চলছিল। লাল মসজিদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার তাগিদ আসছিল। তখন চৌধুরি শুজাআত হোসাইন পরামর্শ দিলেন, মাওলানা আবদুল আজিজের উস্তাদ মুফতি তাকী উসমানীকে করাচি থেকে ইসলামাবাদে এনে শাগরেদকে বোঝানোর ব্যবস্থা করলে হয়তো কাজ হতে পারে। চৌধুরি সাহেবের পরামর্শ জেনারেল মোশাররফের মনে ধরল। মুফতি তাকী উসমানী শুধু মাওলানা আবদুল আজিজের রুহানি উস্তাদই ছিলেন না, তার পিতার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ মানুষ ছিলেন। মুফতি তাকী উসমানী সাহেব লাল মসজিদে এলেন। শাগরেদের কাছে জানতে চাইলেন, আপনার কী করতে চান?

মাওলানা আবদুল আজিজ জবাব দিলেন, আমরা পাকিস্তানে ইসলামি নেজামে হুকুমত কায়েম করতে চাই।

মুফতি তাকী সাহেব প্রশ্ন করলেন, আপনারা কোন ধরনের ইসলাম চান? ইসলামের নবীর ইসলাম নাকি আপনার নিজের?

মাওলানা উত্তর দিলেন, নবীয়ে পাক সা.-এর মডেলই আমাদের মডেল।

মুফতি সাহেব প্রশ্ন করলেন, বাচ্চাদের লাইব্রেরি দখল, সরকারি চাকুরে ও পুলিশ সদস্যদের যিম্মি করে মসজিদে এনে বন্দি করা, শহরের শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত করা নবীজির কোন হাদীস বা আমল দ্বারা প্রমাণিত? নবীজি খোদ এমন কিছু করেছিলেন? অথবা ইসলাম প্রচার বা প্রতিষ্ঠার জন্য পরবর্তীদের কেউ কি এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন?

এই প্রশ্নের পর লাল মসজিদের ইমাম কিছু না বলে মাথা নিচু করে ফেললেন। মুফতি সাহেব তাকিদ দিয়ে বললেন, আবদুল আজিজ উত্তর দিন। তখন মাওলানা আবদুল আজিজ বললেন, হযরত আপনি আমার রুহানি উস্তাদ ও পেশোয়া। আপনার সাথে এ বিষয়ে বাহাস করা সম্ভব নয়। তাকী সাহেব ভাবলেন, মাওলানা আবদুল আজিজ হয়তো তার কথা মেনে নিয়েছেন। তিনি নিশ্চিত হওয়ার জন্য জানতে চাইলেন, আপনার জবাব থেকে কি আমি এ কথা ধরে নেব, আপনি ভবিষ্যতে আর এমন কিছু করবেন না—এই মর্মে ওয়াদা করছেন? মাওলানা আবদুল আজিজ বললেন, আমি এখন যা করছি, ভবিষ্যতেও এমন করতে থাকব। কারণ আমি যা করছি, সেটাকে সঠিক মনে করি।

তাকী সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, আপনার কাছে কুরআন ও সুন্নাহ কোনো দলিল না থাকার পরও আপনি আপনার কর্মপন্থায় অটল থাকবেন? মাওলানা আবদুল আজিজ আবার চুপ হয়ে গেলেন। তাকী সাহেব কিছুটা রাগতস্বরে বললেন, আমি শুনেছি, আপনি লোকজনকে বলেন, আমি আপনার উস্তাদ। মনে রাখবেন, আজ থেকে আমাদের দুজনের উস্তাদ-শাগরেদের সম্পর্ক খতম। আজকের পর আপনি আর কাউকে বললেন না, আপনি আমার শাগরেদ। মুফতি সাহেব চলেন এলেন। মাওলানা আবদুল আজিজ উস্তাদকে বাধা দেওয়ার কোনো চেষ্টাই করলেন না। তিনি মাথা নিচু করে কাঁদতে লাগলেন। মাওলানা আবদুল আজিজ আজও মুফতি তাকী উসমানীকে নিজের উস্তাদ স্বীকার করেন। পাশাপাশি এ কথাও বলেন, আদব সহকারে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে উস্তাদের সাথে দ্বিমত পোষণ করা বৈধ। আমাদের উস্তাদ মনে করেন, সমাজে বিরাজমান মন্দকাজকে বাধা দেওয়া সরকারের কাজ। আমাদের কথা হচ্ছে, সরকার তো নিজেই মন্দকাজ জন্ম দিচ্ছে। তারা কীভাবে মন্দকাজ রোধ করবে?

মুফতি তাকী উসমানী সাহেবের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর পাক সরকার মরিয়া হয়ে কাবার ইমাম শায়খ আবদুর রহমান সুদাইসকে দাওয়াত দিলেন। ২৯ মে ২০০৭ সালে শায়খ পাকিস্তান এলেন। লাহোরের বাদশাহি মসজিদে লাখো মুসলমান তার পেছনে নামায আদায় করল। ইসলামাবাদে শাহ ফয়সাল মসজিদে জুমা পড়ালেন। বললেন, ইসলামের জন্য পাকিস্তানের খেদমত ভোলার মতো নয়। কোনো সংগঠনের নাম না নিয়েই বললেন, ইসলামে কঠোরপন্থার কোনো অবকাশ নেই। কট্টরপন্থা ছেড়ে দিয়ে আলাপ-আলোচনার পথ অবলম্বন করা উচিত। সেদিন জুমায় প্রায় ৪ লাখ মুসল্লি উপস্থিত ছিলেন। তিনি পাকিস্তানকে শান্তি ও নিরাপত্তার কেন্দ্র হওয়ার দোয়া করলেন। সন্ত্রাসের সমাধান আলোচনার মাধ্যমে হওয়া উচিত, দুশমনের হাতের ক্রীড়নক হওয়া উচিত নয়। তিনি লাল মসজিদ কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দিয়েছেন, মসজিদকে ফেতনার জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়। শায়খ সুদাইস এও বলেছেন, মসজিদকে আত্মরক্ষার ঢাল বানানো ভুল কর্মপন্থা। প্রধানমন্ত্রী ও জেনারেল মোশাররফের সাথেও সাক্ষাৎ করেছিলেন। তারপর তিনি সৌদি চলে গিয়েছিলেন।

মসজিদকে ফেতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করার বয়ানে লাল মসজিদ কর্তৃপক্ষ ভীষণ ক্ষুব্ধ হলেন। শায়খ সুদাইস পাকিস্তানে অবস্থানকালেই তার

এই ফতোয়ার বিরুদ্ধে দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার লাগানো হলো। জামেয়া হাফসায় অনুষ্ঠিত এক সভায় বলা হলো, সরকার কাবার ইমামকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করছে। কাবার ইমামকে অসম্পূর্ণ তথ্য দেওয়া হয়েছে। শায়খ পাকিস্তানে থাকাবস্থাতেই চরম উত্তেজনাকর পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছিল, যেকোনো মুহূর্তে লাল মসজিদে অভিযান পরিচালনা করা হবে। এজন্যই হয়তো সেদিনই দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তান থেকে তালেবানের মুখপাত্র হাজি ওমর বিবৃতি দিলেন, লাল মসজিদে অভিযান চালানো হলে তালেবান পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করবে। আমরা লাল মসজিদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছি।

তালেবান ও একিউর সাথে যোগাযোগের কারণেই হয়তো লাল মসজিদ কর্তৃপক্ষ এমন অনঢ় অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। লাল মসজিদ কর্তৃপক্ষ শরিয়াহ বাস্তবায়নের প্রশ্নে কোনো আপস করতে রাজি ছিলেন না। মিডিয়া ২৪ ঘণ্টা লাইভ কভারেজ করছিল। বিশ্বমিডিয়াতেও লাল মসজিদ প্রধান খবরে পরিণত হয়েছিল। পাক সরকার লাল মসজিদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর ব্যাপারে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল। রাজনৈতিক অস্থিরতা, দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থার নাজুক পরিস্থিতি, দেশের নেতৃবৃন্দের জোরদার তৎপরতার কারণে সরকার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন শুরু করার ব্যাপারে মনস্থির করে উঠতে পারছিল না যে, কখন কীভাবে অভিযান চালানো হবে।

এরমধ্যে লাল মসজিদ কর্তৃপক্ষ এমন এক কাজ করলেন, যা পাক সরকারের সমস্ত দ্বিধা দূর করে দিলো। কী ছিল সেই কাজ? জেনারেল মোশররফ বলেছিল, সে তার জীবনে কখনো এত বেশি লজ্জা পায়নি। লাল মসজিদের আন্ডারাউন্ডে কে ছিল? পাক ফৌজের এসএসজি কমান্ডো কর্নেল হারুনুল ইসলামকে কে গুলি মেরেছিল?

<u>০৩.</u>

২০০৭ সালের ২৪ জুন রোববার, পুরো শরীর কালো বোরকায় আবৃত ১০ নারী ও ২০ লাঠিধারী পুরুষ ইসলামাবাদের অভিজাত এলাকা এফ-৮ এ প্রবেশ করল। এরা সবাই লাল মসজিদের ছাত্রছাত্রী ছিল। তারা একটি চায়নিজ ম্যাসাজ পার্লারে হামলা করতে এসেছিল। তারা ম্যাসাজ সেন্টারের কাছাকাছি গেল। দরজায় দাঁড়ানো তিনজন পাক নিরাপত্তা রক্ষীকে নিরস্ত্র করে পার্লারের ভেতরে প্রবেশ করল। বোরকা পরিহিত নারীরা ভেতরে গিয়ে

সেখানে থাকা ৭ জন চীনা নারী ও দুজন পাকিস্তানি খদ্দেরকে চুপচাপ তাদের সাথে যাওয়ার আদেশ করল। তারা যেতে অস্বীকৃতি জানালে লাঠিয়াল বাহিনী ভয় দেখিয়ে জোর-জবরদস্তি করে তাদেরকে লাল মসজিদে নিয়ে এলো। কিছুক্ষণ পর লাল মসজিদের মুখপাত্র মিডিয়াকে জানাল, ম্যাসাজ সেন্টারটিকে পতিতালয় হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছিল। ম্যাসাজ সেন্টারের মালিকপক্ষকে বেশ কয়েকবার সতর্ক করা হয়েছে; কাজ হয়নি। প্রশাসনকেও জানানো হয়েছিল; কোনো প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এজন্য মসজিদ কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা নিতে হয়েছে।

৬ এপ্রিল ২০০৭ সালে শরিয়াহ আইন বাস্তবায়নের ঘোষণা দেওয়ার পর আজ পর্যন্ত চায়নিজ ম্যাসাজ সেন্টারে হামলা লাল মসজিদ কর্তৃপক্ষের সবচেয়ে জটিল বা বিপজ্জনক সিদ্ধান্ত বিবেচনা করা হয়। কীভাবে? ম্যাসাজ সেন্টারে হামলা করেছিল লাল মসজিদের 'আমর বিল মারুফ, নাহি আনিল মুনকার' স্কোয়াড। এই স্কোয়াড লাল মসজিদের শরিয়াহ বাস্তবায়ন পরিকল্পনার অধীনে গঠিত হয়েছিল। এই পরিকল্পনার অধীনে কয়েক সপ্তাহ আগে লাল মসজিদের লাঠিয়াল বাহিনী কয়েকজন পুলিশ অফিসারকে এক পতিতালয় থেকে উঠিয়ে নিয়ে এসেছিল; কিন্তু তারা ছিল দেশের লোক। এজন্য বিষয়টা বেশিদূর গড়ায়নি। বিদেশি চায়নিজ লোকদেরকে মারধর করা ও বন্দি করে নিয়ে আসাটা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ ছিল। ইসলামাবাদে যখন চীনা নাগরিকদের আটক করা হচ্ছিল, ওদিকে চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে অলিম্পিক ২০০৮ অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রস্তুতি চলছিল। চীনা কর্তৃপক্ষ এই অলিম্পিক টুর্নামেন্ট আয়োজনকে নিজের জন্য এক অবিস্মরণীয় কীর্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছিল। এই সময় চীন কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা, অব্যবস্থাপনা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও সন্ত্রাসী হামলা ঘটতে না দেওয়ার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর ছিল। চীন বরবারই অলিম্পিক টুর্নামেন্ট চলাকালে ব্যতিক্রম কিছু ঘটার ব্যাপারে আশঙ্কা করছিল। চীনে সরকারিভাবেই রাষ্ট্রীয় তত্ত্ব-তথ্য গোপন রাখা হয়। পরবর্তীতে চীনা কর্তৃপক্ষ স্বীকার করেছিল, অলিম্পিক চলাকালে তারা সবচেয়ে বেশি আশঙ্কা আল কায়েদার সাথে সম্পৃক্ত উইঘুর মুসলমানদের জিহাদি সংগঠনের দিক থেকে করেছিল। অলিম্পিক চলাকালেই চায়নিজ কর্তৃপক্ষের এই আশঙ্কা সত্যে পরিণত হয়েছিল। চীনের পশ্চিমাঞ্চলীয় এক শহরে বোমা হামলায় ৮জন নিরাপত্তারক্ষী নিহত হয়েছিল। অলিম্পিক চলাকালে এই সংবাদ গোপন রাখার জন্য চীন সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিল; কিন্তু সংবাদটি ফাঁস হয়ে গিয়েছিল।

অলিম্পিক টুর্নামেন্ট শুরু হওয়ার আগ থেকেই উইঘুর মুসলমানদের সংগঠন তুর্কিস্তান ইসলামিক পার্টির পক্ষ থেকে হামলার হুমকি সংবলিত ভিডিও প্রকাশিত হতে শুরু করেছিল। নিয়মিত বিবৃতিও দেওয়া হচ্ছিল। চায়নিজ গোয়েন্দা বিভাগের মতে, চীনে কাজ করা আল কায়েদার অঙ্গ সংগঠনের জন্য, বেইজিং অলিম্পিক নিজের অবস্থান জানান দেওয়ার সর্বোৎকৃষ্ট সুযোগ ছিল। এজন্য আল কায়েদা মরিয়া হয়ে কিছু করতে চাইবেই। এসব হামলা থেকে বাঁচার জন্য চায়নিজ কর্তৃপক্ষ উইঘুর হামলাকারীদের জন্য কোনো ক্ষমা নেই (এবসোলুটলি নো মার্সি) কৌশল নির্ধারণ করে রেখেছিল। পরবর্তীতে ফাঁস হওয়া ফাইল থেকে এই সংবাদ বের হয়। চীনের জিনজিয়াং প্রদেশটি পাকিস্তান বর্ডার লাগোয়া। এজন্য চীন সবসময় পাকিস্তানের সাথে এ বিষয়ে তথ্য আদান-প্রদান করে থাকে। জিনজিয়াং থেকেই জিহাদি সংগঠনটি তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। পাকিস্তান যাতে এই অলিম্পিকে ভালো ও ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে—এজন্য চীন নানাভাবে পাকিস্তানকে সাহায্য করছিল। সে সময় চীন ও পাকিস্তান উভয় দেশই কিছু বিষয়ে একে অপরের প্রতি ভীষণ নির্ভরশীল ছিল।

২০০৫ সালে ভারত ও আমেরিকার মাঝে পরমাণু চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি বিরোধিতার অংশ হিসেবে পাকিস্তানও চীনের সাথে একটি পরমাণু চুক্তি সম্পাদন করার তোড়জোর শুরু করেছিল। পাক-চীন পরমাণু চুক্তির আওতায় চায়নিজ বিশেষজ্ঞরা পাকিস্তানের 'চশমা নিউক্লিয়ার প্লান্ট' আপগ্রেড করার কাজ শুরু করেছিল। লাল মসজিদের ছাত্ররা যে সময় ৭ চায়নিজকে আটক করেছিল, ঠিক সে সময় চীনের সাথে দ্বিপাক্ষিক পরমাণু চুক্তি বিষয়ে আলোচনা চলছিল। চীন এই ঘটনাটিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে। চীনের সাধারণ জনগণের মধ্যেও চায়নিজ নাগরিক আটক নিয়ে তুমুল আলোচনা শুরু হয়। চীনে সরকারবিরোধী আন্দোলন ও সভা-সমিতি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। তারপরও কে বা কারা চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ক্যালসিয়াম ট্যাবলেটের প্যাকেট পাঠিয়েছিল। বোঝাতে চেয়েছিল, 'চায়নিজ কমিউনিস্ট পার্টি'র শক্তি ফুরিয়ে গেছে। ওষুধ খেয়ে যদি শরীরে তাকত ফিরে আসে।

এটা ছিল চায়নিজ কমিউনিস্ট পার্টির জন্য এক কঠিন পরীক্ষা। চায়নিজ কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে পাকিস্তানে নিযুক্ত চায়নিজ রাষ্ট্রদূত নিউজা হুই এই বিষয়ে অত্যন্ত তৎপর ভূমিকা পালন করেছিল। লাল মসজিদের অদূরেই

চায়নিজ দূতাবাস অবস্থিত। চায়নিজ রাষ্ট্রদূত পাক প্রধানমন্ত্রী শওকত আজিজের সাথে কথা বলে এবং মাওলানা ফজলুর রহমানের কাছে সাহায্য চেয়েছে। শেষে কাজে লেগেছে মুসলিম লীগ কিউর প্রধান, সাবেক প্রধানমন্ত্রী চৌধুরি শুজাআত হুসাইন। চৌধুরি সাহেব ব্যক্তিগতভাবে ওই চায়নিজ ক্লিনিক (ম্যাসাজ সেন্টার)-এর ভোক্তা ছিলেন। তিনি তৎপর হয়ে প্রধান নেগোশিয়েটরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। মাওলানা আবদুর রশিদের সাথে চীনা রাষ্ট্রদূতের টেলিফোন যোগাযোগ করিয়ে দিলেন। মাওলানা আবদুর রশিদ দৃঢ় আশ্বাস দিয়ে রাষ্ট্রদূতকে বললেন, চায়নিজ নারীদেরকে কিছুই বলা হবে না। অতি সত্বর তাদেরকে রেহাই দেওয়া হবে। আটককৃত নারীদের সাথে রাষ্ট্রদূতকে কথাও বলিয়ে দিলেন। মাওলানা আবদুর রশিদের দৃঢ় আশ্বাসের পরও ইসলামাবাদের পুলিশবিভাগ, প্রধানমন্ত্রী শওকত আজিজ এবং প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মোশাররফের ধারাবাহিক চেষ্টার সত্ত্বেও চায়নিজ নারীদের মুক্ত হতে ৫ ঘণ্টা সময় লেগেছিল। পুরো সময়টাতে চীনা প্রেসিডেন্ট হু জিন তাও বারবার প্রেসিডেন্ট মোশাররফের সাথে যোগাযোগ করেছে। চায়নিজ প্রেসিডেন্ট নিজের অফিস থেকেই পুরো বিষয়টির ওপর নজর রাখছিল। শেষপর্যন্ত লাল মসজিদ একটি প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে চায়নিজ নারীদের ছেড়ে দিয়েছিল। প্রেস কনফারেন্সে পঠিত বার্তা শুনে অভিজ্ঞরা বুঝতে পেরেছিলেন, লাল মসজিদে থাকা কোনো বোর্ড বা শুরা সেই বিবৃতির বক্তব্য সতর্কতা ও মুন্সিয়ানার সাথে লিখেছে। বিবৃতিতে ছিল, আমরা নারী-পুরুষ মিশ্র ম্যাসাজ সেন্টার বন্ধ করার আশ্বাসপ্রাপ্তি ও পাক-চীন সম্পর্কের দিকে লক্ষ্য রেখে চায়নিজ অধিবাসীদের ছেড়ে দিচ্ছি। বিবৃতিটি পড়েছিলেন খোদ মাওলানা আবদুর রশিদ গাজি সাহেব।

বিদেশি সাংবাদিকদের সাথে বাক্যালাপকালে গাজি সাহেব এও বলেছিলেন, ম্যাসাজ সেন্টারে নারীকর্মীরা পুরুষ গ্রাহকের ম্যাসাজ করে। এটা অনৈসলামিক কাজ। সাংবাদিক সম্মেলনের পর চায়নিজ নারীদেরকে বোরকা পরিয়ে মুক্তি দেওয়া হয়। সমস্যা এখানেই শেষ হলো না। সেদিন পাক পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে বেইজিংয়ে চায়নিজ জননিরাপত্তা মন্ত্রী ঝৌ ইয়ংকাংয়ের সাথে বৈঠক ছিল। এই বৈঠক ছিল পরের বছর অনুষ্ঠিতব্য বেইজিং অলিম্পিক সম্পর্কে। এই বৈঠকে চায়নিজ মন্ত্রী কিছু কঠিন দাবি উত্থাপন করেছিল। এই দাবিগুলো সম্পর্কে পাক মন্ত্রী মুখ না খুললেও ২৭ জুন চায়নিজ মন্ত্রী প্রকাশ্যে যেসব কথা বলেছে, তা অত্যন্ত কড়া ছিল। মন্ত্রী বলেছিল, আমাদের আশা, পাকিস্তান সেসব সন্ত্রাসী ও সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে,

যারা চীনা নাগরিকের সাথে অন্যায় আচরণ করেছে। চীন আশা রাখে, পাকিস্তান সেসব অপরাধীদেরকে কঠিন শাস্তি দিবে। শুধু তাই নয়, চীনা প্রেসিডেন্ট হু জিন তাও একই বার্তা ফোন করে প্রেসিডেন্ট মোশাররফকেও দিয়েছে। তারপর পিএলএ (পিপলস লিবারেশন আর্মি)-র ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাও জেনারেল মোশাররফকে ফোন করে একই বার্তা দিয়েছে। চীন কথাবার্তা দ্বারা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছিল, তারা মনে করে, পাকিস্তান চীনবিরোধী সন্ত্রাসীদেরকে শুধু প্রশ্রয়ই দিচ্ছে না, ম্যাসাজ সেন্টারে হামলাকারীদের মধ্যে চীনের মোস্ট ওয়ান্টেড উইঘুর সন্ত্রাসীরাও জড়িত ছিল। এরা সবাই লাল মসজিদে আশ্রয় নিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে জেনারেল মোশাররফ একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। হতে পারে সিদ্ধান্তটা চীনের চাপে নিয়েছে অথবা নিজ থেকে নিয়েই চীনের চাপকে অজুহাত বানিয়েছে।

লাল মসজিদ ঘটনার অনেকদিন পর যখন জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছিল, তখন এক বক্তব্যে এ কথাও বলেছিল, আমি চীনা নাগরিক অপহরণের জন্য ভীষণ লজ্জিত হয়েছিলাম। আমাকে ব্যক্তিগতভাবে চীনের নেতৃবৃন্দের কাছে ক্ষমা চাইতে হয়েছে। এত ভালো বন্ধুর সাথে আমাদের এখানে খুবই খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে।

কারণ যাই হোক, ২০০৭ সালের ৩ জুলাই জেনারেল মোশাররফ নিরাপত্তারক্ষীদেরকে লাল মসজিদ ঘেরাও করার হুকুম দিলো। পুলিশ ও সীমান্তরক্ষীরা লাল মসজিদ ও জামেয়া হাফসা ঘেরাও করে নিল। মাওলানা আবদুল আজিজের অধীনে ৩ থেকে ৫ হাজার ছাত্রছাত্রী ছিল। কিছু বিদেশি মুজাহিদিনও ছিলেন। অবরোধের আগেই মসজিদ ও মাদরাসার বিভিন্ন স্থানে মোর্চা গেড়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ওঁৎ পেতে বসে গিয়েছিল। বাইরের দিকে তাক করা ক্লাসিনকোভের নল প্রকাশ্যেই দেখা যাচ্ছিল। ভেতর থেকে ধমকি দেওয়া হচ্ছিল, তাদের ওপর হামলা করা হলে তারাও উপযুক্ত জবাব দিতে প্রস্তুত। সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হলো, দুই গাজি ভাই ভেতরে থাকা ছাত্রছাত্রী ও বিদেশিসহ সরকারের কাছে নিজেকে সোপর্দ করে দিলে তাদেরকে কিছুই বলা হবে না। সরকারের কাছে অভিযুক্ত ব্যক্তি ছাড়া বাকি সব ছাত্রছাত্রীদেরকে নিরাপদে ঘরে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে। লাল মসজিদ-মাদরাসাকে মাদরাসা বোর্ডের কাছে হস্তান্তর করা হবে। সরকার নিজের নিয়ন্ত্রণে নিবে না।

এসব প্রস্তাব চৌধুরি শুজাআত হুসাইনের মাধ্যমে গাজি ভাতৃদ্বয়ের কাছে পৌঁছানো হয়েছিল। চৌধুরি সাহেবের বক্তব্য অনুযায়ী, লাল মসজিদ কর্তৃপক্ষ সব কথা মেনে নিয়েছিল। শুধু একটি কথাই মানতে পারছিল না। বিদেশি সাথিদের সরকারের কাছে সোপর্দ করার বিষয়টি। মসজিদ কর্তৃপক্ষ দাবি জানাচ্ছিল, বিদেশিদের নিরাপদে সরে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হোক। সরকার এই দাবি কোনো অবস্থাতেই মানতে রাজি ছিল না। সরকার বিদেশিদেরকে যেকোনো অবস্থাতেই গ্রেফতার করতে চাচ্ছিল।

যখন আলোচনায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হলো, তখন ভেতরে অবস্থানরত ছাত্রছাত্রীদের উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা মাদরাসার সামনে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। তারা যেকোনো মূল্যে আপন সন্তানকে সাথে নিয়ে ঘরে ফিরতে চাচ্ছিল। সরকারের পক্ষ থেকে ছাত্রছাত্রীদেরকে বের হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। যারা যেতে চায়, তারা তল্লাশী করিয়ে নাম-ঠিকানা লিখিয়ে চলে যেতে পারবে। প্রথমদিন হাজারো ছাত্রছাত্রী নিয়মমতো বাড়ি ফিরে গেছে। যারা বাকি থেকে গিয়েছিল, তারা ভেতর থেকে আল জিহাদ, আল জিহাদ বলে অনবরত স্লোগান দিয়ে যাচ্ছিল। লাল মসজিদ কমপ্লেক্সকে রীতিমতো যুদ্ধের ময়দানে পরিণত করা হয়েছিল। ভেতরে খন্দক খনন করা হয়েছে, দিকে দিকে ক্লাসিনকোভ তাক করা হয়েছে, মাস্ক পরে কাঁদানে গ্যাস থেকে বাঁচার বন্দোবস্ত পুরোদমে করে রাখা হয়েছে। সবাই অবাক, একটি মসজিদে এত অস্ত্রশস্ত্র কোত্থেকে এলো? এত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যোদ্ধা কোত্থেকে এলো? বাইরে নিরাপত্তারক্ষীরাও পুরোপুরি যুদ্ধপ্রস্তুতি নিয়ে চারিদিকে বালুর বস্তা দিয়ে মোর্চা বানিয়ে অস্ত্র বাগিয়ে বসে গিয়েছিল। পাক সেনাবাহিনীর বিশেষ কমান্ডোবাহিনী লাল মসজিদের বাইরে এসে পজিশন নিয়েছিল।

৩ জুলাই ২০০৭ সালের রাতে 'অপারেশন সাইলেন্স' পুরোপুরি শুরু হয়ে গিয়েছিল। লাল মসজিদের চারপাশে কারফিউ জারি করা হয়েছিল। এমন উত্তেজনাকর মুহূর্তেও লাল মসজিদের ভেতর থেকে একদল লাঠিয়াল বাহিনী বের হয়ে পুলিশের কাছ থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে ভেতরে নিয়ে গিয়েছিল। ছাত্ররা লাল মসজিদের নিকটস্থ গার্লস স্কুল, বিচারালয়, সরকারি ভবনে পেট্রোল বোমা মেরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। মাওলানা আবদুল আজিজ লাউড স্পিকারে জিহাদি তারানা ও বয়ান আগের তুলনায় আরো বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এর মাধ্যমে ভেতরে থাকা ছাত্রছাত্রীদেরকে তিনি জোশ এনে দিচ্ছিলেন। জিহাদ ও শাহাদাতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তুলছিলেন। মাওলানার

বক্তব্য অনুযায়ী, ছাত্ররা ইস্তেশহাদি হামলাও শুরু করে দিয়েছিল। একটি ইস্তেশহাদি হামলা স্থানীয় সরকারি ভবনে করা হয়েছিল। এই হামলায় ৭ পুলিশ হালাক হয়েছিল। রাতভর ইসলামাবাদবাসী গুলি আর বোমার আওয়াজে ঘুমুতে পারেনি।

পরদিন সকালে ছাপা হওয়া সংবাদপত্রে নিহতের সংখ্যা ১২ থেকে ২০ পর্যন্ত দাবি করা হয়েছে আর আহত হয়েছে ৪০০ জন। মৃতদের মধ্যে ছাত্র ছাড়া দুজন সীমান্তরক্ষী, এক সাংবাদিক ও একজন ব্যবসায়ী ছিল। পরিস্থিতি ক্রমশ অবনতি ঘটতে থাকায় বিশেষ কমান্ডো বাহিনী তলব করা হলো। তারা ছিল এসএসজি কমান্ডো। এমন তুমুল লড়াইয়ের মধ্যেও ছাত্রদেরকে বের হয়ে আসার সুযাগ দেওয়া হচ্ছিল। বারবার বলা হচ্ছিল, অস্ত্র সমর্পণ করলে নিরাপদে চলে যেতে দেওয়া হবে। এই ঘোষণায় আরো হাজারখানেক ছাত্রছাত্রী বেরিয়ে এসেছিল। আহত ও শহীদগণকেও বের করে আনা হলো। এই পর্যায়ে মসজিদ-মাদরাসার পানি ও বিদ্যুৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো। যাতে বেশির চেয়ে বেশি লোক অতিষ্ঠ হয়ে বেরিয়ে আসে। হতাহতের সংখ্যা কমে আসে। শুধু সেসব মানুষই ভেতরে থেকে যায়, তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হচ্ছে।

সংঘর্ষ বন্ধ করার জন্য সরকার গোপনে আরো একবার চেষ্টা করল। লাল মসজিদ কর্তৃপক্ষের অতি কাছের মানুষ, নিষিদ্ধ হরকাতুল মুজাহিদিন নেতা মাওলানা ফজলুর রহমান খলিলকে ভেতরে পাঠানো হলো। মাওলানা খলিল ভেতরে গিয়ে দুই গাজি ভাইকে বললেন, আপনাদের কার্যক্রম লাল মসজিদকে আন্তর্জাতিক মিডিয়ার শিরোনামে পরিণত করেছে। পাক ফৌজ এজন্য অভিযান চালাতে বাধ্য হয়েছে। এখন সেনা অভিযান থেকে বাঁচার একটাই উপায়, নিরাপদে অস্ত্র সমর্পণ করা। আপনাদেরকে কয়েক মাস নিরাপদ জেলে রেখে সসম্মানে মুক্তি দিয়ে দেওয়া হবে। দুই ভাই তাদের পুরোনো সাথির কথা মেনে নিতে সম্মত হলো না। তারা কোনো অবস্থাতেই বিদেশি সাথিদেরকে সেনাদের হাতে সোপর্দ করতে সম্মত হলেন না। তারা বারবার শরিয়াহ বাস্তবায়ন ও বিদেশি সাথিদেরকে নিরাপদ রাস্তা দেওয়ার দাবি উত্থাপন করে যাচ্ছিলেন। এই অবস্থায় মসজিদের ভেতরে এক মাশওয়ারা বৈঠক হলো। সিদ্ধান্ত হলো, মাওলানা আবদুল আজিজ কোনোমতে মসজিদ থেকে জীবিত বের হয়ে যাবেন। নিরাপদ কোনো স্থান থেকে পাকিস্তানে শরিয়াহ বাস্তবায়নের জিহাদে নেতৃত্ব দিবেন। এই সিদ্ধান্তের পেছনে প্রধান

কারণ ছিল, আল কায়েদা নেতৃবৃন্দ মাওলানা আবদুল আজিজকে পাকিস্তানে শরিয়াহ বাস্তবায়ন আন্দোলনের মুখপাত্র বানাতে চাচ্ছিল। আল কায়েদার চিন্তা ছিল, মাওলানা আবদুল আজিজের সাথে হাজারো তালিবে ইলম আছে। পাকিস্তানজুড়ে অসংখ্য মাদরাসার সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। এই সম্পর্ক কাজে লাগিয়ে পাকিস্তান জুড়ে অস্থিতিশীল অবস্থা সৃষ্টি করা যাবে, পাকিস্তানের চেইন অব কমান্ড ভেঙে পড়বে। যা আল কায়েদার চূড়ান্ত লক্ষ্য শরিয়াহ বাস্তবায়নের জন্য সহায়ক হবে। অন্তত এই লাভ হবে, আল কায়েদার বিরুদ্ধে পাকিস্তানের কোনো বাহিনী অভিযান পরিচালনা করতে পারবে না।

নিরাপদ জায়গা থেকে শরিয়াহ আইন বাস্তবায়ন আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার লক্ষ্যে মাওলানা আবদুল আজিজ ছদ্মবেশ ধারণ করে লাল মসজিদ ছাড়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। ৪ জুলাই ২০০৭ রাতে বেশ কিছু ছাত্রী মাদরাসা ছেড়ে বাড়ি গিয়েছিল। ছাত্রীরা সারিবদ্ধ হয়ে বেরিয়ে আসছিল। তাদের মধ্যে এক বোরকা পরা ছাত্রীর চলন-বলন বাইরে অপেক্ষমাণ প্রহরীর দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক ঠেকল। দৈর্ঘ্যে প্রস্থেও অন্যদের চেয়ে ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছিল। প্রহরী পুলিশ সদস্যটির সন্দেহ হলো। নারী পুলিশের সাহায্যে সেই সন্দেহভাজন বোরকা পরিহিতাকে তল্লাশি করা হলে দেখা গেল, তিনি মাওলানা আবদুল আজিজ গাজি। পরদিন তাকে পিটিভিতে হাজির করা হয়েছিল। তিনি লাইভ অনুষ্ঠানে পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, ইসলামে ছদ্মবেশ ধারণ করে নিরাপদ স্থানে সরে পড়ার অনুমোদন আছে। তিনি যা কিছু করেছেন জিহাদ মনে করেই করেছেন। এজন্য তিনি লজ্জিত নন। তিনি এও স্বীকার করেছেন, মহিলা মাদরাসার প্রধান তার স্ত্রী সাধারণ ছাত্রীদেরকে বাইরে যেতে নিরুৎসাহিত করেছেন। ভেতরে থেকে যেতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি বলেছেন, এখন কুরবানির সময়, জিহাদের সময়। তোমরা যাবে না, থেকে যাও। কাউকে ভেতরে থেকে যাওয়ার জন্য কোনো প্রকার জোর-জবরদস্তি করা হয়নি।

আন্দোলনের নেতা মাওলানা আবদুল আজিজকে বোরকাপরা অবস্থায় গ্রেফতারি আল কায়েদা ও লাল মসজিদে থাকা ছাত্রছাত্রীদের মনোবল বেশ ধাক্কা খেয়েছিল। পাক সরকার শয়তানি করে মাওলানাকে বোরকা-নেকাব পরা অবস্থাতেই টিভিতে উপস্থাপন করেছে। তার সাক্ষাৎকার নিতে দিয়েছে এক আলেমবিদ্বেষী সেক্যু সাংবাদিককে। মাওলানা আবদুল আজিজ গ্রেফতার হওয়ার পর মাওলানা আবদুর রশিদ লাল মসজিদের নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করেছেন। পুরো দেশ থেকে উলামায়ে কেরাম তার কাছে অনুরোধ

জানাচ্ছিল, তিনি যেন নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করেন। তাকে কিছুই বলা হবে না। তাকে সরকারের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিবেন। এমন সময় ওয়াজিরিস্তান থেকে হারাকাতে ইসলামি উযবেকিস্তানের আমির কারী তাহের ফোন করেছিলেন। গাজি সাহেবের সহকারি মাওলানা আবদুল কাইয়ুম সাহেবের কাছেও ফোন করে বলেছেন, আপনারা শেষ বুলেট পর্যন্ত টিকে থাকবেন। আপনারা এই পর্যায়ে হাতিয়ার ফেলে দিলে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন অপূরণীয় ক্ষতির শিকার হবে। ভবিষ্যতে কখনো আন্দোলন দানা বাঁধবে না। আপনারা আত্মসমর্পণ না করলে আপনাদের আদর্শে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যুগ যুগ ধরে উদ্বুদ্ধ হবে। গাজি সাহেব এই পরামর্শ মোতাবেক আমল করার সিদ্ধান্ত নিলেন। দ্বিতীয় রাতে আবার অভিযান চালানো হলো। ২৭ জন ছাত্র শহীদ হলো। আরো কিছু ছাত্র নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করল। বাইরে অপেক্ষমাণ অভিভাবকরা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় মুষড়ে পড়ছিলেন। তারা কী করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। কেউ মাথায় হাত দিয়ে বসেছিলেন। কেউ অনবরত দোয়া-দুরুদ পড়ছিলেন। কেউ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিলেন। কোনো কোনো অভিভাবক বলছিল, তাদের সাথে সন্তানের কথা হয়েছে। তারা জানিয়েছে, তাদেরকে বের হতে দেওয়া হচ্ছে না। সামরিক অফিসার অভিভাবকদের জানাল, তারা ২০ জন লোককে ভেতরে পাঠিয়েছিল। ভেতরের দায়িত্বশীলরা কাউকে বেরোতে দিচ্ছে না। সত্য-মিথ্যা আল্লাহ মালুম। পাক সেনাদের কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

তৃতীয়দিনের মতো অভিযান চলল। গাজি আবদুর রশিদ তার অবশিষ্ট সাথিদের নিয়ে আন্ডারগ্রাউন্ডে আশ্রয় নিলেন। তিনি তখনো মিডিয়া ও ওয়াজিরিস্তানের সাথে যোগাযোগ রেখে চলছিলেন। গোলাগুলিতে এসএসজি কমান্ডার হারুনুল ইসলাম হালাক হয়েছিল। লাল মসজিদ অভিযানের উত্তাপ ইসলামাবাদ ছাড়িয়ে অন্য শহরেও ছড়িয়ে পড়ল। অনেকে বিশ্বাস করছিল, এই অভিযানের পেছনে চীনের হাত আছে। চীনের চাপেই লাল মসজিদ অপারেশন চালানো হয়েছে। এর প্রতিক্রিয়ায় অভিযানের পঞ্চম দিন পেশাওয়ারে ৪ জন চায়নিজ ইঞ্জিনিয়ারকে কতল করে দেওয়া হলো। ষষ্ঠ দিন চৌধুরি শুজাআত হোসাইন শেষ চেষ্টা চালালেন। তিনি লাল মসজিদে গিয়ে মাওলানা আবদুর রশিদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তাকে আত্মসমর্পণের কথা জানালেন। তখনো মাওলানা রশিদ তার বিদেশি সাথিদের জন্য নিরাপদ রাস্তা করে দেওয়ার দাবি তুলেছেন। পাক সরকার এই দাবি মানতে মোটেও প্রস্তুত

ছিল না। কারণ, সরকার এই বিদেশি ব্যক্তিদেরকেই চাচ্ছিল। চীনের চাওয়া এটাই ছিল।

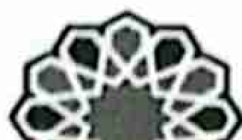
মাওলানা আবদুর রশিদের ভাষ্যমতে, সরকারের সাথে নিরাপদ রাস্তা দেওয়ার ব্যাপারেও ঐকমত্য হয়ে গিয়েছিল। মতানৈক্য হয়েছিল কীভাবে নিরাপদ পথ দেওয়া হবে—সেটা নিয়ে। হয়তো মাওলানাকে নিরাপদ রাস্তা দেওয়া হবে, সাথিদের দেওয়া হবে না—এটাকেই মাওলানা পদ্ধতিগত মতভেদ বলেছেন। এ সময় করাচি থেকে পাকিস্তানের সর্বজনমান্য ব্যক্তি আবদুস সাত্তার ঈদী, মুফতি রফী উসমানী লাল মসজিদের বাইরে এসে পৌঁছলেন। তারাও অনুরোধ জানিয়েছেন। উভয়পক্ষের কাছে শান্তি ও নিরাপত্তার আবেদন জানিয়েছেন। কোনো কাজে আসেনি। মাওলানা আবদুর রশিদ নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করতে রাজি হননি। সপ্তম দিনে পাক কমান্ডোরা মসজিদ ও মাদরাসার ভেতরে প্রবেশ করে। তারা ভেতরের শেষ ঘাঁটির দরজায় পৌঁছে গিয়েছিল। ভেতরে মাওলানা আবদুর রশিদ গাজি ও তার সাথিরা ছিলেন। তখনো তিনি মোবাইলের মাধ্যমে মিডিয়া ও ওয়াজিরিস্তানের সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি সে অবস্থাতেও অস্ত্র সমর্পণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। উভয় পক্ষে গুলি বিনিময় চলতে থাকল। ইস্তেশহাদি হামলাও হয়েছিল। বিকট বিস্ফোরণের মুহুর্মুহু আওয়াজে চারিদিক প্রকম্পিত হয়ে উঠছিল। সকাল নাগাদ ৭০ তালিবে ইলম শহীদ ও ৮জন পাক সেনা হালাক হয়েছিল। পরবর্তীতে শেষদিন মৃতের সংখ্যা ১১০ বলা হয়েছে। মাওলানা আবদুর রশিদ গাজিও শহীদানের কাতারে শামিল ছিলেন। শহীদানের কাতারে আফগান মুজাহিদিন ছাড়া বিদেশি নাগরিকও ছিলেন। তাদের মধ্যে ১২ জন উইঘুর ছিলেন। এরা সবাই আন্ডারগ্রাউন্ডে ছিলেন।

লাল মসজিদের ওপর পরিপূর্ণ কবজার পর সরকারের পক্ষ থেকে সাংবাদিকদের দেখানো হয়। সেখানে বিপুল পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র দেখা গেছে। যেমনটা সাধারণত মিডিয়াতে দেখানো হয়। কতটা সত্য, কতটা মিথ্যা—আল্লাহ মালুম। পাক সেনাদের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগও আছে, লাল মসজিদ ক্লিয়ার করার জন্য ফসফরাস বোমাও ব্যবহার করেছে। সরকার বারবার অভিযোগ করছিল, লাল মসজিদের অভ্যন্তরে মাইন ও বিস্ফোরক পেতে রাখা হয়েছিল। বহু যিম্মি বন্দি করে রাখা হয়েছিল। অভিযান শেষে এমন কিছুই ভেতরে পাওয়া যায়নি। এগুলো সব সরকারের মিথ্যা প্রপাগান্ডা ছিল। আল কায়েদা ও মাওলানা আবদুল আজিজ আশা করেছিলেন, লাল মসজিদে

হামলা হলে পুরো পাকিস্তানের মাদরাসার ছাত্ররা অস্ত্র হাতে নেমে পড়বে। এমন কিছুই ঘটেনি। ইসলামাবাদ ও রাওয়ালপিণ্ডিতে অবস্থিত লাল মসজিদ আদর্শের ১৮টি মাদরাসাও এই সময় চুপচাপ ছিল। শায়খ ঈসা ও মাওলানা আবদুল আজিজ এই মাদরাসাগুলোর ওপর ভরসা করেই আন্দোলন শুরু করেছিলেন। তখন পাকিস্তানের পরিস্থিতি অন্যরকম ছিল। আল কায়েদা একাই পাক সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছিল। ওসামা বিন লাদেন একিউ মুজাহিদিনকে হুকুম দিলেন, পাক সেনাদের ওপর হামলা করতে হবে। এরপর থেকে ইস্তেশহাদি হামলার এমন এক ধারা জারি হয়ে গিয়েছিল, যার ফলে পাকিস্তান পৃথিবীর সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতমে পরিণত হয়েছিল।

অনেকের অভিযোগ, এসব ইস্তেশহাদি হামলায় শিশুদেরও ব্যবহার করা হয়েছে। সে সময় পাকিস্তানে ফিলিস্তিন ও ইরাকের চেয়েও বেশি ইস্তেশহাদি হামলা হয়েছিল। ২০০৭ সালের জুলাইয়ে অপারেশন সাইলেন্সের আগে পুরো পাকিস্তানে মাত্র ৪২টি ইস্তেশহাদি হামলা হয়েছিল। লাল মসজিদ অপারেশনের পর ২০০৭ সালের শেষ পর্যন্ত ৪৭টি ইস্তেশহাদি হামলা হয়েছে। ১১৮৮ লোক মারা গিয়েছিল; ৩,২০৯ জন আহত হয়েছিল। এমনকি লাল মসজিদ হামলায় অংশ নেওয়া পাক ফৌজের এলিট এসএসজি কমান্ডো পর্যন্ত হামলা থেকে নিরাপদ থাকতে পারেনি। ২০০৭ সালের সেপ্টেম্বরে তারবেলা গাজির এসএসজি কমান্ডো ক্যাম্পে ইস্তেশহাদি হামলা চালানো হয়েছিল। ২০ জন কমান্ডো হালাক ও কয়েক ডজন গুরুতর আহত হয়েছিল। এটা ছিল লাল মসজিদ হামলার প্রতিশোধ। লাল মসজিদ হামলা ছিল পাকিস্তানের ইতিহাসে এক ভয়াবহ মোড়। এরপর থেকে পাকিস্তান সেই যে অশান্ত হয়েছে, আর থামেনি। লাল মসজিদ হামলার দুই বছরের মধ্যেই টিটিপি পাকিস্তানের সীমান্তে বিশাল এলাকা স্বাধীন করে সেখানে ইসলামি হুকুমত কায়েম করেছিল। টিটিপির প্রভাব এত বেশি বেড়ে গিয়েছিল যে, তারা অগ্রসর হতে হতে রাজধানী ইসলামাবাদের ৬০ মাইলের কাছাকাছি এসে গিয়েছিল। বিশ্বমিডিয়াতে শিরোনাম হতে শুরু করেছিল, 'পাকিস্তান তালেবানের দখলে যাওয়ার দ্বারপ্রান্তে।' লাল মসজিদের ঘটনা চীন ও পাকিস্তানের সম্পর্ককে নড়বড়ে করে দিয়েছিল। পাক-চীন বন্ধুত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নমুনা কারাকোরাম হাইওয়েও ঝুঁকির মুখে পড়ে গিয়েছিল। পাক সরকারকে বাধ্য হয়ে পাকবাহিনীর পুরো একটি কোরকে কারাকোরামের নিরাপত্তা বিধানের জন্য মোতায়েন রাখতে হয়েছে; যাতে পাক-চীন ব্যবসা বন্ধ হয়ে না পড়ে।

লাল মসজিদ অপারেশন জেনারেল মোশাররফের লৌহকঠিন শাসনকে নড়বড়ে করে দিয়েছিল। যখন লাল মসজিদে অবরোধ চলছিল, তখন অন্যদিকে পাকিস্তানের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় মানবাধিকার আন্দোলন চলছিল। সেটা ছিল পাকিস্তানের বিচারপতিদের আন্দোলন। লালমসজিদে অভিযান পরিচালনা করা নিঃসন্দেহে পাক সেনাদের চরম কলঙ্কজনক অধ্যায়। পাশাপাশি শতাধিক ছাত্রছাত্রী অকাতরে জীবন দেওয়ার পেছনে দায় কার—এ নিয়েও বিতর্ক চলে আসছে। পরিস্থিতি যত সঙ্গিনই হোক, ছাত্রছাত্রী ও কোনো মাদরাসাকে ঢাল বানিয়ে, তাদের জীবনকে হুমকির দিকে ঠেলে দিয়ে এভাবে একটি হিংস্র-সশস্ত্র বাহিনীর মুখোমুখি অবস্থান নেওয়াকে বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম সমর্থন করেননি। আমাদের দেশের কথাই কল্পনা করি। আল্লাহ না করুক, ঢাকার বুকে বড় কোনো মাদরাসা কর্তৃপক্ষ যদি এমন অবস্থান গ্রহণ করেন, দেশের বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম এটা সমর্থন করবেন? জ্বি না, করবেন না। দুয়েকজন ব্যতিক্রম থাকতে পারেন। প্রায় সব আলেমই এ ধরনের কাজে নিরুৎসাহিত করেন। এ ধরনের কাজে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি। আল্লাহু আলাম।



দ্য গ্রেট গেইম

ক্ষমতা কারো চিরদিনের জন্য নয়। ক্ষমতা বারবার পক্ষ বদল করে; ধর্ম বদল করে; জাতি বদল করে; স্থান বদল করে; দল বদল করে। ক্ষমতার পালাবদলে এখন বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী দেশ 'আমেরিকা'। ভবিষ্যতে বিশ্ব নেতৃত্বে আসতে হলে অতীত ও বর্তমান বিশ্বনেতৃত্ব সম্পর্কে জানা জরুরি।

এখন দুনিয়াতে এক মহাখেল (Great Game) চলছে। এই গেইমে মূলত তিনটি পক্ষ। প্রধান পক্ষ নিঃসন্দেহে যুক্তরাষ্ট্র। দীর্ঘদিন ধরে আমেরিকা এককভাবে পরাশক্তির সুবিধা ভোগ করে আসছে। আমেরিকার সুপার পাওয়ার আজ হুমকির সম্মুখীন। বর্তমানে আমেরিকার সামনে প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো, তার সুপার পাওয়ার স্ট্যাটাস রক্ষা করা। আমেরিকার মোকাবেলায় অপরদিকে আছে চীন ও রাশিয়া। চায়না-রাশিয়ার অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, তারা আজ উঠতে বসতে আমেরিকার পরাশক্তিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আসছে। দুই দেশের চ্যালেঞ্জ জানানোর ভঙ্গি ও পন্থা আলাদা হলেও উদ্দেশ্য এক। চায়না ও রাশিয়া মূলত আমেরিকার একটি 'ডকট্রিন' বা মতবাদকে চ্যালেঞ্জ করছে। ঘটনার শুরু অনেক আগে।

আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতাদের একজন হলেন জেমস মনরো (১৭৫৪-১৮৩১)। মনরো আমেরিকা প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট (১৮১৭-১৮২৫)। জেমস মনরোই সর্বপ্রথম আমেরিকাকে পরাশক্তি হওয়ার দৌড়ে নামিয়েছিল। মনরো ১৮২৩ সালে এক ডকট্রিন (Doctrine) পেশ করেছিল। সেই মনরোনীতি ছিল, পৃথিবীর শক্তিমান রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে এক ধমকি ও হুমকি। সেই মতবাদে আমেরিকা নিজেকে প্রকাশ্যে আঞ্চলিক পরাশক্তি হিসেবে ঘোষণা করেছিল। পরবর্তীতে মনরোনীতিকে আরো সম্প্রসারিত করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের ৩২তম প্রেসিডেন্ট থিউডোর রুজভেল্ট (১৮৮২-১৯৪৫)। তিনি ১৯০১ সালে প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন। তিনি চার মেয়াদে ১২ বছর ক্ষমতায় ছিলেন। তারা গৃহীত পররাষ্ট্র নীতির কারণে বিশ্বব্যাপী যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য আরো ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বর্তমানে সারা বিশ্বে

যুক্তরাষ্ট্রের যে প্রভাব-প্রতিপত্তি, তার জনক মনে করা হয় রুজভেল্ট-কেই। তার শাসনামলেই যুক্তরাষ্ট্র আঞ্চলিক শক্তি থেকে প্রধান বিশ্বশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। সেই আধিপত্য ১০০ বছরের বেশি সময় পরও বহাল আছে।

মনরো নীতির প্রধানতম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারা ছিল :

প্রথম ধারা : এখন থেকে নয়াদুনিয়া (New World)-এর উভয় মহাদেশে, অর্থাৎ উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার কোনো ভূখণ্ড, ইউরোপ থেকে কোনো দেশ এসে দখল করবে না; কলোনি বানাবে না।

এই নিষেধাজ্ঞা এজন্য, নয়াদুনিয়া (আমেরিকা মহাদেশ) আবিষ্কৃত হওয়ার পর এখানকার অমূল্য খনিজ সম্পদ লুঠ করার জন্য দলে দলে ইউরোপিয়ান শক্তিগুলো হানা দিচ্ছিল। যে যার মতো দেশ দখল করে অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ কবজা করে নিজ দেশে পাচার করছিল। আমেরিকার আবিষ্কারক ও নির্মাতারাও এখানকার আদি বাসিন্দাদের ওপর গণহত্যা চালিয়ে ইউরোপিয়ানদের মতোই লুণ্ঠনকর্ম চালিয়েছিল। নিজেরা যা করেছে, সে কাজ করতে আমেরিকা এখন অন্যদের বাধা দিচ্ছে।

ল্যাটিন আমেরিকা বলতে সাধারণত উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের যেসব অঞ্চলের জনগণ ল্যাটিন ভাষা থেকে উদ্ভূত স্প্যানিশ এবং পর্তুগিজ ভাষা ব্যবহার করে, তারা। ল্যাটিন আমেরিকার আওতায় দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের দশটি, মধ্য আমেরিকার ছয়টি, ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের তিনটি ও উত্তর আমেরিকা মহাদেশের একটি দেশ আছে।

দ্বিতীয় ধারা : মনরোনীতির দ্বিতীয় ধারা ছিল, এখন থেকে কোনো দেশ যদি ল্যাটিন আমেরিকায় এসে উপনিবেশ স্থাপন করতে চায়, সেটা হবে আমেরিকার উপর সরাসরি হামলার নামান্তর। অর্থাৎ, সেই রাষ্ট্রকে আমেরিকার সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে।

তৃতীয় ধারা : ইউরোপিয়ান দেশগুলোর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কোন্দলে নাক গলাবে না।

চতুর্থ ধারা : ল্যাটিন আমেরিকায় এখন যেসব ইউরোপিয়ান উপনিবেশ আছে, সেগুলোতেও আমেরিকা নাক গলাবে না; হস্তক্ষেপ করবে না। সেগুলোকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হবে।

চতুর্থ ধারাটি আমেরিকা শুরু থেকেই নিয়মিত অমান্য করে এসেছে। মনরোনীতি ঘোষণার ঠিক দুই বছর আগেই এমন ঘটনা ঘটেছিল। টেক্সাস রাজ্যটি ছিল স্পেনের কলোনি। আমেরিকা যোগসাজশ করে টেক্সাসকে স্বাধীন করিয়েছিল। মনরোনীতি ঘোষণার সময় ল্যাটিন আমেরিকার অধিকাংশ দেশ স্পেন ও পর্তুগালের নাগপাশ থেকে ইতিমধ্যে স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল, নয়তো স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে ছিল। ১৮০০ সালে আমেরিকার অধীনে মাত্র ১৩টি রাজ্য ছিল। তখন মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার প্রায় পুরোটাই ছিল স্পেন ও পর্তুগিজ উপনিবেশ। ১৮২২ সালের দিকে ল্যাটিন আমেরিকার চিত্র অনেকটাই বদলে গিয়েছিল। কিছু দেশ নতুন করে ফ্রান্সের কবজাতে চলে গিয়েছিল। বেশিরভাগ দেশ স্পেন ও পর্তুগাল থেকে স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল। এমন টালমাটাল সময়ে আমেরিকা মনরোনীতি ঘোষণা করে নিজের শিকারসীমা নির্ধারিত করে নিয়েছে। কুকুর বা শিকারি প্রাণীদের নিজস্ব একটা শিকারসীমা থাকে। সেখানে অন্য কাউকে ঘেঁষতে দেয় না। আমেরিকাও গায়ের জোরে তাই করেছে। রাজা হতে হলে নিজের একটা স্বাধীন ও সার্বভৌম এলাকা থাকা জরুরি। পরাশক্তি হতে চাইলে চারপাশের অঞ্চলগুলো পুরোপুরি নিজের প্রভাববলয়ে থাকতে হয়। রাতারাতি কেউ পরাশক্তি হয়ে যায় না। মনরোনীতি ঘোষণার মাধ্যমে আমেরিকা মূলত নিজ বলয়ে অবস্থান সংহত করে নিয়েছিল।

দ্বিতীয় খেলোয়াড়

হুবহু একই ঘটনা চায়না ও রাশিয়ার ক্ষেত্রেও ঘটে চলছে। প্রথমে চায়নার কথাই ধরা যাক। ইন্ডিয়া, নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ, বার্মা, থাইল্যান্ড, লাউস, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, সাউথ চায়না সি, তাইওয়ান, ইস্ট চায়না সির তীরবর্তী কোরিয়া আর মঙ্গোলিয়া। এসব অঞ্চলকে ভূ-রাজনৈতিকভাবে (Geo Politically) চায়নার প্রভাববলয়ের বলা যেতে পারে; ঠিক যেমন পুরো ল্যাটিন আমেরিকা ছিল যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবলয়াধীন। আমেরিকার মতো চায়নাও চায়, উক্ত অঞ্চলগুলোকে পুরোপুরি নিজের বাহুডোরে রাখতে, এসব দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও পররাষ্ট্রনীতি সম্পূর্ণ নিজের প্রভাবাধীনে রাখতে। এসব অঞ্চলকে ঘিরে চায়নারও একটা 'ডকট্রিন' আছে; কিন্তু আমেরিকা যতটা নির্বিঘ্নে পরাশক্তি হয়ে বসেছিল, চায়নার পথ অতটা কুসুমাস্তীর্ণ নয়। চায়নাকে এমন কিছু দেশ চারিদিক থেকে ঘিরে রেখেছে, যেগুলো আমেরিকারই প্রভাবাধীন। ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, ভিয়েতনাম, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া—

সবই বেশ আর কম আমেরিকার পকেটে থাকা দেশ। কিছু দেশ তো প্রায় শতভাগ আমেরিকার আশ্রয় ও প্রশ্রয়েই নিজেদের অস্তিত্ব সুরক্ষিত ও টিকিয়ে রেখেছে। এই তালিকায় তাইওয়ান ও ভিয়েতনামের নাম আসবে সবার আগে। তাছাড়া মার্কিন রণতরীগুলো সাউথ চায়না সি ও ইস্ট চায়না সি-তে নিয়মিত টহল দিয়ে বেড়ায় দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান ও ফিলিপাইনের প্রত্যক্ষ মদদে। মার্কিন রণতরীর দিকে চায়নিজ নেভাল কর্তৃপক্ষ রক্তচক্ষু নিয়ে তাকালেও বাধা দিতে পারে না। এই তো কিছুদিন আগে (জানুয়ারি ২০২২) প্যাসিফিক ওশনের যে অংশকে চায়না নিজের অংশ বলে দাবি করে, সেখানে দুটি মার্কিন বিমানবাহী রণতরী টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিল। চীনা কর্তৃপক্ষ হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিল, এই এলাকায় প্রবেশের আগে চীনের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে; কিন্তু মার্কিন রণতরী চীনের হুঁশিয়ারি থোরাই কেয়ার করেছে। তার ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়িয়েছে।

চায়নার মানচিত্রের দিকে তাকালে দেখতে পাব, আমেরিকা চারিদিক থেকে চীনকে পুরোপুরি ঘিরে ফেলেছে। চীন এই ঘেরাটোপ ভেঙে বেরিয়ে আসতে চায়। তার গলায় থাকা মার্কিন ফাঁস ছিঁড়ে ফেলতে চায়। শুধু তাই নয়, এসব অঞ্চলে চায়না নিজস্ব বিশ্বব্যবস্থা (World Order), নিজস্ব আঞ্চলিক প্রভাব (Regional Order) বলবৎ করতে চায়। প্রশ্ন হতে পারে, নিজের মতবাদ প্রচারে চায়নাকে কে বাধা দিচ্ছে? আসলে ডকট্রিন ঘোষণা করলেই হয় না, পাশাপাশি ছলে-বলে-কৌশলে বাস্তবায়নও করতে হয়। এখনো পর্যন্ত চীনের সেই শক্তি অর্জিত হয়নি। প্রেসিডেন্ট মনরোর মতো দ্ব্যর্থহীন ভঙ্গিতে চীন বলতে পারছে না, ইস্ট ও সাউথ চায়না সি একান্তই আমার। এখানে অন্য কেউ প্রভাব বিস্তার করার মানে, আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর। চায়না এমন কথা বলতে চায়; কিন্তু সামর্থ্যের অভাবে বলতে পারছে না। সামর্থ্য নেই বলে কি চায়না চুপ করে বসে আছে? উঁহু। চীন এক দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা (Long Term Strategy) অনুসারে হরদম কাজ করে যাচ্ছে। এটাই গ্রেট গেইমের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

আমেরিকাকে নিজের দোরগোড়া থেকে তাড়াতে চাইলে আগে সারাবিশ্বে আমেরিকার প্রভাব খর্ব করতে হবে। চীন শুরুতেই সরাসরি আমেরিকার সাথে সামরিক ঠোকাঠুকিতে যাবে না; যাওয়ার কথা ভাবেও না। চীন খেলছে তার নিজস্ব পদ্ধতিতে। বিশ্ব পরাশক্তি হওয়ার জন্য, আমেরিকাকে একক বিশ্ব পরাশক্তির আসন থেকে আছাড় দিয়ে ফেলার জন্য, চীন মনরো ডকট্রিন

থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক কৌশল নিয়ে খেলছে। চীনের অনুসৃত কৌশলের নাম দেওয়া যেতে পারে :

'যুদ্ধহীন জয় (Winning Without Fighting) কৌশল'।

এই কৌশলের প্রধানতম ধারা হলো 'নিরবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা' (Continuing Compitition)। প্রতিটি ময়দানে তীব্র, হাড্ডাহাড্ডি, নির্দয় ও নৃশংস লড়াই অব্যাহত রাখা। এই লড়াইয়ে কোনো মূলনীতি, নীতি-নৈতিকতা, নিয়মনীতি, কায়দাকানুন, মূল্যবোধ, আদব-আখলাক, শরম-হায়া, তাহযিব-তামিয বলে কিছু নেই। যেকোনো মূল্যে, যেকোনো উপায়ে যুদ্ধ জয়ই প্রথম ও শেষ কথা। এটা যে শুধু চীনের অনুসৃত কৌশল তা নয়, আমেরিকাও নিজ লক্ষ্য অর্জনে নির্দয় (Ruthless), নিরাবেগ। আমেরিকাকে শীর্ষস্থানচ্যুত করতে চীন কী করছে?

প্রথম পদক্ষেপ

আমেরিকার বিভিন্ন খাতে চীন বেশি বেশি বিনিয়োগ করছে। কোভিডের আগ পর্যন্ত চীন প্রতি বছর আমেরিকায় ৩৭ থেকে ৪৭ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত বিনিয়োগ করে এসেছে। এই বিনিয়োগের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমেরিকায় নির্মিত ও উদ্ভাবিত সর্বাধুনিক টেকনোলজি হাতিয়ে নেওয়া। এই খাতে চায়না আমেরিকার চেয়ে এখনো বহু পেছনে পড়ে আছে। এসব বিনিয়োগ চায়না সরকার সরাসরি করে না। আমেরিকা বা কানাডায় অবস্থানরত চায়নিজ নাগরিক বা চায়নিজ বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিককে দিয়ে অথবা আমেরিকা বা কানাডায় বড়ধরনের ব্যয়বহুল টেকনোলজি কোম্পানি চালু করে। এই কাজটা চায়নিজ নাগরিক একা করে না; সাথে এক বা একাধিক মার্কিন বা কানাডিয়ান নাগরিককে সম্পৃক্ত রাখে। অথবা প্রতিষ্ঠিত বড় কোনো মার্কিন কোম্পানিতে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ করে তাদের ব্যবসার অংশীদার হয়। সামরিক (Defence) বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence) নিয়ে কাজ করে এমন কোম্পানিগুলোই প্রধানত চায়নার পছন্দের তালিকায় শীর্ষে থাকে। এ ধরনের কোম্পানিগুলোতেই চায়না বিনিয়োগ করে। চায়নিজ প্রতিনিধি এসব কোম্পানির মালিক ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সামনে এত বিপুল অঙ্কের টাকার টোপ রাখে যে, এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব।

চায়নিজ প্রতিনিধি দেখতে-শুনতে চায়নিজ হলেও তিনি সাধারণত মার্কিন নাগরিকই হয়ে থাকেন। সুতরাং কারো মনে সন্দেহ জাগার অবকাশ থাকে না। এই চীনা-মার্কিন লোকগুলো মনেপ্রাণে মার্কিন হয় না। জন্ম আমেরিকায় হলেও মূল উৎস চীনের প্রতি তাদের একধরনের অকথিত ও অলিখিত আনুগত্য ও দুর্বলতা থাকে। চায়নিজ ইন্টেলিজেন্স এই সুযোগটাই কাজে লাগায়। প্রথম প্রথম মার্কিন কর্তৃপক্ষ চায়নিজ ব্যক্তির আসল অভিসন্ধি টের না পেলেও পরে বিভিন্ন উপসর্গ থেকে তাদের মনে সন্দেহ উদ্রেক হয়। মার্কিন কর্তৃপক্ষ দেখে, তারা দীর্ঘদিন ধরে বিলিয়ন-বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে অতি গোপন যে 'প্রডাক্ট' তৈরি করেছে, সেটা অল্প কিছুদিনের ব্যবধানে চায়নাতেও 'কপি' হয়ে গেছে। এ কী করে সম্ভব? নিশ্চয় কোথাও ঘাপলা আছে। মার্কিন গোয়েন্দারা ফাঁক খুঁজতে খুঁজতে চায়নিজ বংশোদ্ভূত ব্যক্তির দিকে সন্দেহের আঙুল তাক করে; কিন্তু বাহ্যিক কোনো প্রমাণ ছাড়া তাকে অভিযুক্ত করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। সন্দেহের ভিত্তিতে চায়নিজ ব্যক্তিকে পাকড়াও করতে গেলে দুটি সমস্যা সামনে আসে :

ক. চায়নিজ ব্যক্তিকে ধরলে, মার্কিন আইন কোম্পানির শরিক আমেরিকান নাগরিকদের ব্যাপারেও সমানভাবে তদন্তের নির্দেশ দিতে হবে। গোপন তথ্য পাচারে চায়নিজ ব্যক্তির সাথে তারাও জড়িত নেই তো? কোম্পানির তদন্ত করতে গেলে খবর মিডিয়াতে ফাঁস হয়ে যাবে। কোম্পানির এতদিনকার সমস্ত সম্মান ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। কোম্পানির প্রতি ক্রেতাদের আস্থা কমে যাবে। কোম্পানির শেয়ারদর পড়ে যাবে। এমনকি প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে যাওয়াও বিচিত্র কিছু নয়। দীর্ঘদিন হাজারো মানুষের মেহনতের পর বিলিয়ন-ট্রিলিয়ন ডলার ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিকে পথে বসিয়ে দেওয়ার ঝুঁকি থাকে।

খ. মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগের কাছে অকাট্য প্রমাণ থাকে না যে, চায়নিজ বিনিয়োগকারী এমএসএস (MSS)-এর এজেন্ট। এজন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না।

আবার কখনো এমনও হয়, যখন মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগ চায়নিজ বিনিয়োগকারী সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারে, ততক্ষণে এমএসএস এজেন্ট বেইজিংয়ে বিমান থেকে নেমে বাড়ির পথ ধরেছে।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ

চায়না সরকার মার্কিন ডলার জমা করে যাচ্ছে। চীন ও হংকংয়ের কাছে এই মুহূর্তে প্রায় ৩.৭ ট্রিলিয়ন ডলার মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চিত আছে। এই বিপুল পরিমাণ ডলার নড়াচড়া করে চীন চাইলে বিশ্ববাজারে ডলারের 'দর' পতন ঘটাতে সক্ষম। এই ডলার বাজারে লাগামহীনভাবে ছেড়ে দিয়ে মার্কিন অর্থনীতিকেও ক্ষতিগ্রস্ত করতে সক্ষম।

তৃতীয় পদক্ষেপ

চীন সাইবার আক্রমণ করে মার্কিন নিরাপত্তা সংস্থা, মহাকাশযান; বিশেষ করে ডিফেন্স কোম্পানিগুলোর ওপর হামলা করে। মার্কিন সংস্থাগুলোর নিয়মিত অভিযোগ, চায়নিজ হ্যাকাররা তাদের অতি গোপনীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতিয়ে নিচ্ছে। এই কাজ নিয়মিত হয়েই চলছে। মার্কিন সমরাস্ত্র নির্মাণকারী কোম্পানি লকহিড মার্টিন করপোরেশন (The Lockheed Martin Corporation)-এর এফ-৩৫ ও এফ-২৫ যুদ্ধবিমান, বোয়িং নির্মাণ বিষয়ক প্রায় ৬ লাখেরও বেশি ফাইল গোপনে কপি হয়ে চায়না স্থানান্তর হয়ে গেছে। এটা নিয়ে মিডিয়াতে বেশ শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। চায়নিজ কর্তৃপক্ষও বিষয়টা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। মার্কিন নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর কর্তারা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছিল। যে তথ্য তারা নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় রেখেছিল, সবই চায়নাতে চলে গেছে। তথ্যপ্রযুক্তির হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে ময়দানে টিকে থাকতে হলে নিজেকে 'হালনাগাদ' রাখা জরুরি। চায়না চোরের ওপর বাটপারি করেই ময়দানে টিকে থাকে। লড়াইয়ে যেকোনো মূল্যে টিকে থাকাটাই আসল; পদ্ধতি মুখ্য নয়।

তৃতীয় খেলোয়াড়

এই গ্রেট গেইমে রাশিয়া কী করছে? রাশিয়া কিছুদিন আগে, অর্থাৎ, মাত্র ৩৩ বছর আগেও আমেরিকার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিল। আমেরিকার চোখে চোখ রেখে কথা বলত। আমেরিকা কুস্তিতে রাশিয়াকে এমনভাবে আছাড় দিয়ে ফেলেছিল, দীর্ঘদিন রাশিয়া নড়াচড়াই করতে পারেনি। রাশিয়ার হাতে চায়নার মতো অত টাকাপয়সা নেই। আমেরিকাকে টেক্কা দেওয়ার মতো তথ্যপ্রযুক্তিগত সক্ষমতাও নেই। রাশিয়ার কাছেও অত্যাধুনিক ও শক্তিশালী

সমর প্রযুক্তি আছে, তবে সেটা আমেরিকার সাথে সমানতালে পাল্লা দেওয়ার মতো নয়। রাশিয়ার জন্য আরেকটি সমস্যা হলো, আগে চারপাশের যেসব অঞ্চল রাশিয়ার প্রভাববলয়ে ছিল, সেগুলোর প্রায় পুরোটাই মার্কিন প্রভাবাধীনে চলে গেছে। জার ও সোভিয়েত ইউনিয়ন আমলে পশ্চিমাঞ্চলের পুরোটাই রাশিয়ার কবজায় ছিল। পশ্চিমে ফিনল্যান্ড থেকে শুরু করে এস্তোনিয়া, লাটভিয়া, লিথুনিয়া, বেলারুশ, ইউক্রেন, মালদোভা, রোমানিয়া, বুলগেরিয়া ও তুরস্ক পর্যন্ত সবই রাশিয়ার পকেটে ছিল। দক্ষিণে জর্জিয়া, আজারবাইজান, তুর্কমেনিস্তান, আফগানিস্তান, তাজিকিস্তান, কিরগিজিস্তান, কাজাখাস্তান—সবই রাশিয়ার একপ্রকার উপনিবেশই ছিল বলা চলে। পূর্বে জাপান সাগর পর্যন্ত রাশিয়ার আঞ্চলিক প্রভাববলয়ে ছিল। এখন রাশিয়ার পশ্চিমে পূর্ব ইউরোপে বেলারুশ ছাড়া প্রায় সব দেশই আমেরিকার বলয়ে চলে এসেছে। এসব দেশ রাশিয়ার হাতে তাদের স্বাধীনতা খোয়া যাওয়ার আশঙ্কাতেই মূলত মার্কিন-ইউরোপীয় বলয়ে যোগ দিয়েছে, না হয় ন্যাটোর সদস্য হয়েছে বা সদস্য হওয়ার প্রক্রিয়ায় আছে।

আফগানিস্তান বা 'স্তান' দিয়ে শেষ হওয়া দেশগুলোর বেশিরভাগ থেকে নিয়ে জাপান সাগর পর্যন্ত বিস্তৃর্ণ ভূখণ্ডগুলোতে রাশিয়ার পরিপূর্ণ ইজারাদারি নেই। এমতাবস্থায় রাশিয়া তার চারপাশে আগেকার দিনের হারানো প্রভাব ফিরিয়ে আনার জন্য যেকোনো কিছু করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। রাশিয়া এখুনি যদি নিজের প্রভাববলয় পুনর্বহাল করতে না পারে, তাহলে আমেরিকা তো বটেই, কদিন পরে তাকে চায়নারও অধীন হয়ে চলতে হবে। ক্ষমতার লড়াইয়ে 'সাধু চরিত্রের' কোনো স্থান নেই। চায়না আজ রাশিয়ার যতই দোস্ত থাকুক, কাল এক নাম্বার পরাশক্তি হয়ে গেলে দুশমন হয়ে যাবে না—তার নিশ্চয়তা কোথায়? চায়না নিজের স্বার্থ ছাড়া অন্য কিছুই বোঝে না। বর্তমান বিশ্বে পরাশক্তি হতে হলে শুধু নিজের রাস্তাই দেখতে হয়।

প্রথম পদ্ধতি

নিজের ক্ষমতাবলয় ফিরে পাওয়ার জন্য আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারছে না। রাশিয়ার আপাতত সে ক্ষমতা নেই। অদূর ভবিষ্যতে হবে—তেমন কোনো লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। তাই আমেরিকার বিরুদ্ধে রাশিয়া নিজের সবচেয়ে শক্তিশালী ও ভয়ংকর অস্ত্র 'সাইবার অ্যাটাক' ব্যবহারে মনোযোগী হয়েছে। চায়নার মতো রাশিয়াও বেশ সফলভাবে

আমেরিকার বিরুদ্ধে সাইবার আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। সাইবার আক্রমণে সোশ্যাল মিডিয়ার 'প্রপাগান্ডা' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রপাগান্ডা যুদ্ধে রাশিয়া অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়ে চলেছে। আমেরিকার বিরুদ্ধে বৃহত্তর পরিসরে প্রথমবার প্রপাগান্ডা অস্ত্র ব্যবহার করে ২০১৬ সালে। হিলারি ক্লিনটনের বিরুদ্ধে ডোনাল্ড ট্রাম্পের স্বপক্ষে নির্বাচনী প্রচারণাকালে।

পৃথিবীতে বর্তমানে অস্ত্র, গোলাবারুদ-বোমা ছাড়া যে যুদ্ধ করা হয়, সেটাকে 'হাইব্রিড ওয়ার' বলা হয়। এই যুদ্ধে শক্তিশালী দেশগুলো মাঝেমধ্যে অত্যন্ত বেকুব, আহমক লোকদেরকে বেশি বেশি প্রচারের পাদপ্রদীপে নিয়ে আসে। সোশ্যাল মিডিয়ায় মিথ্যা সংবাদ, মিথ্যা প্রশংসা ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে প্রচার করে অতি অযোগ্য, অথর্ব লোককেও বিখ্যাত আর গ্রহণযোগ্য করে তোলে। এই অযোগ্য লোকদেরকে বিখ্যাত করে তুলে তাদের মাধ্যমে সমাজে বিভক্তি, দলাদলি, রায়ট ও হিংসা ছড়িয়ে দেয়। শত্রুরাষ্ট্রের জনগণকে বহুধাবিভক্ত করে ফেলে। পরস্পরের মধ্যে ঘৃণা ও অবিশ্বাস ছড়ায়। জনগণের মধ্যে তীব্র বিরোধ ছড়িয়ে দিতে পারলে সে দেশের জনগণ একাট্টা হয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। দেশটা ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়বে। হিংসা-হানাহানির কারণে একদল আরেকদলের বিরুদ্ধে সারাক্ষণ লেগে থাকে। কীভাবে আরেকদলকে ফাঁদে ফেলে ক্ষমতা দখল করা যায়—এই চিন্তায় বিভোর থাকে। এসব করতে গিয়ে দেশের অর্থনীতি, সমরনীতি ও কূটনীতি মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

রাশিয়া লাখো ফেইক আইডির মাধ্যমে ২০১৬ সালের নির্বাচনে ট্রাম্পকে জেতানোর জন্য অবিশ্বাস্য রকমের মদদ যুগিয়েছিল। প্রতিপক্ষ হিলারির ই-মেইল হ্যাক করে হিলারির বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডা চালিয়ে অদ্ভুত সব বদনাম ছড়িয়েছিল। এসব করে ট্রাম্প শিবিরের হাতে নির্বাচন জয়ের হাতিয়ার তুলে দিয়েছিল। হিলারির বিরুদ্ধে রাশিয়ান হ্যাকার দ্বারা প্রচারিত গুজবগুলোকে ট্রাম্পের সমর্থকরা রীতিমতো লুফে নিত। এসবের ওপর ভিত্তি করে ট্রাম্পের স্বপক্ষে আর হিলারির বিরুদ্ধে মিলিয়ন হ্যাশট্যাগ চালু করা হয়েছিল, লাখো ফেসবুক পেজ তৈরি হয়েছিল, লাখো পোস্ট হয়েছিল। এসব প্রপাগান্ডার ফলে ট্রাম্পের গ্রহণযোগ্যতা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। প্রতিদিন হু হু করে বাড়ছিল ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা। ট্রাম্পের পক্ষে রাশিয়ার সাইবার এটাকের সংবাদ যখন মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগ জানতে পেরেছে, ততদিনে রাশিয়ান প্রপাগান্ডা মেশিন নিজের কাজ শেষ করে ফেলেছে। নির্বাচন শেষ হয়ে ট্রাম্প জয়ী হয়ে

গেছে। এটাই ছিল দেশের বাইরে রাশিয়ান সাইবার আর্মির প্রথম সফল আক্রমণ। ভ্লাদিমির পুতিন এরপর এস্তোনিয়া, ক্রিমিয়া, ইউক্রেন ও পোল্যান্ডেও এই প্রপাগান্ডা মেশিন কাজে লাগিয়েছিল।

দ্বিতীয় পদ্ধতি

আমেরিকাকে দুর্বল করার জন্য রাশিয়ার ব্যবহৃত দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে :

রাসায়নিক হামলা : রাশিয়া যুদ্ধক্ষেত্র থেকে একটু পিছু হটে, একটু নিচে নেমে রাসায়নিক হামলা করে। যারা রাশিয়াকে, বিশেষ করে পুতিনকে চ্যালেঞ্জ করে তাদের উপরই সাধারণত এই হামলা হয়ে থাকে। ২০০৬ সালে রাশিয়ান গোয়েন্দা সংস্থা, রাশিয়ান ফেডারেল সিকিউরিটি সার্ভিস (এফএসবি)-এর সাবেক এক উচ্চপদস্থ অফিসার আলেকজান্ডার লিটিভেনকোকে লন্ডনের মিলেনিয়াম হোটেলে হত্যা করা হয়েছিল। এ কাজে রাশিয়ান ইন্টেলিজেন্ট 'ফ্লোমিন-২১০' ব্যবহার করেছিল। এটি একধরনের 'রেডিও একটিভ আইসোটোপ', আণবিক বোমা তৈরির কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এক ফোঁটার চেয়েও কম পরিমাণ ফ্লোমিন লিটিভেনকোর কাপে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

পুতিন মনে করতেন, লিটিভেনকো ডাবল এজেন্ট হয়ে গেছে। ১৯৯৯ সালে রাশিয়ার বিভিন্ন জায়গায় বোমা বিস্ফোরিত হয়েছিল। লিটিভেনকো এটা নিয়ে একটা বই *(Blowing up Russia)* লিখেছিল। এই বোমা হামলাগুলোর জেরেই ভ্লাদিমির পুতিন প্রথমবারের মতো রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট হয়েছিল। বোমা হামলাগুলোর দায় চেচেন মুজাহিদদের ওপর চাপিয়ে চেচনিয়া দখল করে নিয়েছিল। লিটিভেনকো বইটাতে তথ্যউপাত্ত দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন, পুতিনকে ভোটে জেতানোর জন্য এফএসবি বোমা হামলাগুলো করেছিল। প্রেসিডেন্ট হওয়ার কিছুদিন আগ পর্যন্ত পুতিন এফএসবির প্রধান ছিলেন। লিটিভেনকোকে লন্ডনের মাটিতে হত্যা করা এক ভয়ংকর ব্যাপার ছিল। এটা ছিল সুস্পষ্ট চ্যালেঞ্জ। আমেরিকা-ন্যাটোভুক্ত দেশের আশ্রয়ে থাকলেও রাশিয়ার হাত থেকে নিস্তার নেই—এমন এক প্রচ্ছন্ন হুমকিও ছিল।

গোয়েন্দা তদন্তে বের হলো, বিপুল পরিমাণ ফ্লোমিন রাশিয়া থেকে ব্রিটেনে আনা হয়েছে। তা দিয়ে হাজারো মানুষ হত্যা করা সম্ভব। তদন্তে আরো জানা গেল, সোভিয়েত আমলে যে ল্যাবরেটরিতে আণবিক বোমা তৈরি করা হতো,

সেখানেই ফ্লোমিন নামক ভয়ানক বিষ তৈরি করা হয়েছে। ফ্লোমিন পৃথিবীর সবচেয়ে দামি ও জটিল বিষ। সাধারণ পরীক্ষায় শরীরে এর উপস্থিতি শনাক্তই করা যায় না। বিষাক্রান্ত ব্যক্তিকে সাধারণ ডাক্তার পেট ব্যথার রোগী বলে মনে করে। লিটিভেনকোও পেট ব্যথার কারণেই ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল। যখন ব্যথা ক্রমান্বয়ে বাড়তে শুরু করল, ডাক্তারও ধরতে পারছিল না—সমস্যাটা কোথায়? তখন লিটিভেনকো আসল কথা বলে দিয়েছিল, তিনি একজন সাবেক রুশ এজেন্ট। তাকে বিষ দেওয়া হয়ে থাকতে পারে। এবার ব্রিটেনের আণবিক বিশেষজ্ঞরা ছুটে এলেন। বিপুলমাত্রায় অনুসন্ধান শুরু হলো। ব্রিটিশ গোয়েন্দারা রাতদিন এক করে রীতিমতো অসাধ্য সাধন করে বের করল, এই ভয়ানক বিষ কোন পথে, কার মাধ্যমে, কোন উপায়ে, ব্রিটেনের কোথায় এনে রাখা হয়েছে। এটা ছিল পশ্চিমের ওপর রাশিয়ার সরাসরি কেমিক্যাল অ্যাটাক। এই রহস্যের জট খুলতে ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের ১০ বছর লেগেছে।

২০১৮ সালে পুতিন আবারো লন্ডনে আরেক রাশিয়ান গোয়েন্দা সের্গেই স্ক্রইফল ও তার মেয়েকে হত্যার চেষ্টা চালিয়েছিল। রাশিয়া এবার ব্যবহার করেছিল এ-২৩৪ (Novichok) নামক এক ভয়ানক বিষ। এটা মানুষের স্নায়ুশক্তিকে ভেঙেচুরে দেয়। বাপবেটি কয়েক সপ্তাহ হাসাপাতালে যমে-মানুষে টানাটানির পর বেঁচে ফিরেছিল। রাশিয়ান আততায়ী বিষটা হোটেল পর্যন্ত এনেছিল একটা পারফিউমের শিশিতে করে। এক কৌতূহলী নারী টেবিলে পড়ে থাকা শিশিটা নিয়ে হাতে স্প্রে করে নাক দিয়ে শোঁকার পর মারা যায়। রাশিয়ান গোয়েন্দারা গুপ্তহত্যার কাজে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নোভিচোক ব্যবহার করে থাকে। এই বিশ শরীরে প্রবেশের একটু পর থেকেই ভয়ংকর খিঁচুনি শুরু হয়ে যায়। একপর্যায়ে ব্যথা এতবেশি বেড়ে যায় যে, রোগীর মুখ থেকে ফেনা বের হতে শুরু করে। তীব্র ব্যথায় মাটিতে গড়াতে গড়াতে তড়পাতে থাকে। অনবরত বমি আসতে থাকে।

সের্গেই স্ক্রাইফল বিষাক্রান্ত হওয়ার পর বেঞ্চের ওপর পড়ে ছিলেন। সাথে সাথে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। অতি দ্রুত উন্নত চিকিৎসা দেওয়ার কারণে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল। মার্কিন গোয়েন্দারাও এমন এক নার্ভ এজেন্ট (ভি-এক্স) ব্যবহার করে। এটাকেও কেমিক্যাল ওয়েপন বলা যায়। আধুনিক আন্তর্জাতিক যুদ্ধনীতি অনুসারে, এই বিষ প্রয়োগ মানবতাবিরোধী কাজ।

তৃতীয় পদ্ধতি

রাশিয়া নিজের পেশীশক্তি প্রদর্শন করে হালেই দুই-দুইবার আমেরিকাকে চমকে দিয়েছে। ২০১৪ সালে চুপিচুপি ইউক্রেনের দোনবাস অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করে বিশাল একটি অংশ ছিনিয়ে নিয়েছে। ক্রিমিয়া অঞ্চলও দখল করে নিয়েছে। আমেরিকা, ন্যাটো ও ইউরোপ রীতিমতো নির্বাক হয়ে গেছে। ২০২২ সালে মস্কো যখন ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, আমেরিকা ও ন্যাটো আগ থেকেই প্রস্তুত ছিল, রাশিয়া যেন ইউক্রেনের আর কোনো অঞ্চল দখল করতে না পারে। রাশিয়া এখন পর্যন্ত কিয়েভ দখলে আনতে না পারলেও, সবাইকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে ইউক্রেনের কয়েকটি শহর দখল করে ফেলেছে।

আমেরিকা নিজের পরাশক্তির মর্যাদা ধরে রাখতে রাশিয়া ও চায়নাকে চারিদিক থেকে একপ্রকার ঘিরেই রেখেছে। আমেরিকার আরেকটি কাজ হলো, স্কলারশিপ, বেশি বেতন, উচ্চতর সুযোগ-সুবিধা দিয়ে পুরো দুনিয়া থেকে সেরা মেধাগুলোকে নিজের দেশে ডেকে আনা। এজন্য নতুন আবিষ্কার ও নেতৃত্বে আমেরিকা অন্যদের চেয়ে এগিয়ে থাকে। কেউ তার মোকাবেলা করতে পারে না। এখন প্রশ্ন হলো, আমেরিকা এত অগ্রসর থাকার পরও রাশিয়া ও চায়না আমেরিকাকে চ্যালেঞ্জ করার পর্যায়ে চলে এলো কীভাবে? আমেরিকা কী ভুল করেছিল? রাশিয়া ও চায়না আমেরিকার চেয়েও কার্যকর কোন কৌশল অবলম্বন করেছিল?

১. এটা তো পরিষ্কার, চীনের জনগণ অনেক পরিশ্রমী। সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে চুপচাপ কাজ করে যেতে পারে।

২. সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর গত ৩০-৩২ বছর ধরে আমেরিকা এমন কিছু যুদ্ধে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছিল, যার ফলে চায়না ও রাশিয়া কী করছে না করছে—সেদিকে ভালো করে চোখ রাখতে পারেনি। সোভিয়েতবিরোধী লড়াইয়ে আমেরিকা এত বেশি নিমগ্ন ছিল যে, পাকিস্তান কোন ফাঁকে আণবিক বোমা বানিয়ে ফেলেছে—আমেরিকা টেরটিও পায়নি। আমেরিকা জেনেশুনে কখনো কোনো অবস্থাতেই পাক আণবিক প্রকল্প সফল হতে দিতো না।

২৩ আগস্ট ২০২১ সালে সর্বশেষ মার্কিন সেনা, মেজর জেনারেল ক্রিস ডোনাহু (Chris Donahue) আফগানিস্তানের মাটি ছেড়ে চলে গেছে।

অবশেষে আমেরিকার এই বোধোদয় ঘটেছে, ইরাক-আফগানে যেভাবে ওয়ার অন টেরর'-এ নিজেকে ফাঁসিয়ে রেখেছে, এভাবে একের পর এক যুদ্ধে জড়িয়ে থাকলে রাশিয়া ও চায়না তাকে পেছনে ফেলে এতবেশি এগিয়ে যাবে যে, ধরাছোঁয়াও কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। আমেরিকার পরাশক্তিগিরি ছুটিয়ে দেবে। নতুন বিশ্বব্যবস্থা বাস্তবায়নের এজেন্ডা শিকেয় তুলে রাখবে। এখনো ঘুরে দাঁড়ানোর সময় আছে। আমেরিকা নিজের ভুলগুলো বুঝতে পারছে। নিজের এক নাম্বার অবস্থান টিকিয়ে রাখতে দৌড়ঝাঁপ করতে শুরু করেছে। ডুবন্ত মানুষের মতো হাত-পা ছুঁড়ছে।

আমেরিকার বিরুদ্ধে চীন ও রাশিয়া লড়ছে মূলত হাইব্রিড ওয়ারের মাধ্যমে। উপরে চীন ও রাশিয়ার যে কৌশলগুলোর কথা বলা হয়েছে, সেগুলোই মূলত হাইব্রিড ওয়ার। এই যুদ্ধে শত্রু মূল যুদ্ধক্ষেত্র (গোলাবারুদের যুদ্ধ) থেকে একটু পিছু হটে বা নিচে নেমে ভিন্নভাবে, ভিন্ন স্থান থেকে আক্রমণ শানায়। এই যুদ্ধে শত্রু অত্যন্ত সতর্কতার সাথে লড়ে। কোনো অবস্থাতেই শত্রু সোজাসুজি গোলাবারুদ ছুড়ে যুদ্ধ করে না। সরাসরি যুদ্ধ সর্বাত্মকভাবে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে। বাস্তবে তুমুল যুদ্ধ চললেও বাহির থেকে বোঝা যায় না যে, যুদ্ধ চলছে।

জিয়াং কৌশল

দেড় হাজার বছর পুরোনো এক চায়নিজ কাহিনি আছে। একজন অত্যন্ত চৌকশ আর কুশলি যোদ্ধা জেনারেল ছিলেন জিন জং। তিনি শুধু ঢাল-তরবারি দিয়েই নয়, পনেরো-বিশ ইঞ্চি লম্বা একটি সরু মজবুত ছড়িদণ্ড জাতীয় বস্তু দিয়ে প্রতিপক্ষের মাথার খুলি উড়িয়ে দিতে পারতেন। ছড়িদণ্ডটির নাম ছিল 'জিয়াং' (jian)। এই বিশেষ যুদ্ধবিদ্যা তিনি পারিবারিক উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। ছড়িদণ্ডের নামানুসারে এই বিশেষ যুদ্ধকৌশলের নামও 'জিয়াং'। জিয়াং দিনদিন ভয়ংকর আর প্রাণঘাতি হয়ে উঠেছিল। ধারালো সূচালো মাথা বা ফলা না থাকায় পারদর্শী যোদ্ধারা জিয়াং-কে জামার আস্তিনে বা আলখেল্লার নিচে অনায়াসে লুকিয়ে রাখতে পারত। জিয়াংয়ের ওজনও খুব বেশি হতো না। সুযোগ বুঝে চোখের পলকে লুকানো স্থান থেকে শাঁই করে জিয়াং বের করে প্রতিপক্ষের খুপড়িতে আঘাত করে থেঁতলে দিত। জিয়াং হয়ে উঠেছিল মারণঘাতি অদৃশ্য অস্ত্রে। অভিজ্ঞ যোদ্ধার হাতে পড়লে জিয়াং তলোয়ারের চেয়েও বিপজ্জনক হয়ে উঠত।

চীনা জেনারেল (জিন জং) গোপনে নতুন আরো কৌশল উদ্ভাবন করে জিয়াং যুদ্ধশিল্পকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দিয়েছিলেন। গোপন কৌশল যোগ হওয়ার পর জিয়ানের নাম হয়ে গেল শাওজিয়াং (Shashou Jian)। জেনারেল জিয়াংয়ের নবআবিষ্কৃত একটি কৌশল ছিল, জিয়ানের মতো আপাত নিরীহদর্শন গোবেচারা ছড়িদণ্ড দিয়ে প্রতিপক্ষের কাছে থাকা যেকোনো অস্ত্রই ভেঙে দিতে বা হাতছাড়া করে দিতে পারত। প্রতিপক্ষ লৌহ-শিরস্ত্রাণ পরে এলেও নিস্তার ছিল না। প্রতিপক্ষ সুরক্ষিত বর্ম পরে এলেও শাওজিয়াংয়ের আঘাতে ভূপাতিত হয়ে লড়ার শক্তি খুইয়ে বসত। শাওজিয়াং অত্যন্ত লক্ষ্যভেদী যুদ্ধকৌশল হলেও পুরো শাস্ত্রটাই চরম গোপনীয়তার মোড়কে ঢাকা ছিল। জেনারেল জিন জং পরবর্তী প্রজন্মকে কৌশলগুলো শিখিয়ে যাননি। তিনি হয়তো মনে করেছিলেন, গোপন কৌশলগুলো অন্য কাউকে শিখিয়ে দিলে আপনজনেরা তার বিরুদ্ধেই যদি কৌশলগুলো প্রয়োগ করতে শুরু করে? কিছু কৌশল তো নিজের আস্তিনে লুকিয়ে রাখা দরকার। আত্মরক্ষার জন্য নিজের কাছে দুয়েকটা কৌশল এমন থাকা দরকার, যা শুধু আমিই জানব; আর কেউ জানবে না।

কালক্রমে শাওজিয়াং শব্দটির প্রায়োগিক ব্যবহার আরো ব্যাপক হয়েছে। যুদ্ধের গোপন কৌশল, চর্মচক্ষে যেটা প্রাণঘাতি যুদ্ধাস্ত্র নয়; দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত এমন কোনো বস্তুকে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করাকে শাওজিয়াং বলা হয়। বর্তমানে চীনের প্রতিরক্ষা কৌশলের নামও শাওজিয়াং রাখা হয়েছে। অর্থাৎ, এমন যুদ্ধপদ্ধতি যাতে প্রতিপক্ষের সাথে যুদ্ধ তো অনিবার্যভাবে করতেই হয়, তবে প্রতিপক্ষকে বুঝতে না দেওয়া যে, আমি যুদ্ধ করছি। প্রতিপক্ষ টেরই পাবে না যে, আমি তার বিরুদ্ধে অত্যন্ত বিপজ্জনক এক হাতিয়ার দিয়ে তুমুল লড়াই অব্যাহতভাবে জারি রেখেছি। প্রতিপক্ষ যখন এই যুদ্ধের কথা টের পাবে, ততদিনে আমি উদ্দেশ্য হাসিল করে ফেলেছি।

চীন শাওজিয়াং কৌশল অবলম্বন করে আমেরিকা ও তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে অনেক আগ থেকেই টার্গেট করে রেখেছে। চীন জানে, সরাসরি যুদ্ধে আমেরিকার সাথে পেরে উঠবে না, তাই এই বিকল্প ব্যবস্থা। চীন কীভাবে আমেরিকার বিরুদ্ধে শাওজিয়াং প্রয়োগ করছে?

১৯৯৯ সালে দুই চায়নিজ কর্নেল একটি ডকট্রিন (মতবাদ) পেশ করে। মতবাদটি মূলত চায়নিজ আর্মি 'পিপলস লিবারেশন আর্মি' (পিএলএ)-এর জন্য পেশ করা হয়েছিল। ডকট্রিনটির নাম ইংরেজিতে তরজমা করা হয়েছে

'অপরাজেয় যুদ্ধাস্ত্র' (Un-Restricted Warfare)। এই ডকট্রিন চীনের আধুনিক শাশুজিয়াং হাতিয়ার। এই মতবাদে ব্যাখ্যা করে বোঝানো হয়েছে, আজকের বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে কীভাবে যুদ্ধজয় করা যায়। এ বই বা মতবাদটিতে কীভাবে ভবিষ্যতের যুদ্ধে জয়ী হওয়া যাবে, ভবিষ্যৎ যুদ্ধাস্ত্র, আধুনিক যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বইয়ে আরো বলা হয়েছে, নিজের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী, তথ্যপ্রযুক্তিতে বহুগুণ বেশি দক্ষ পরাশক্তি আমেরিকার মোকাবেলা কীভাবে করতে হবে। আমেরিকার সাথে কখনো যুদ্ধ বেধে গেলে কীভাবে সেই যুদ্ধে জিততে হবে।

বইয়ের সারকথা হলো, আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধজয়ের সবচেয়ে কার্যকর কৌশল হলো, তার সাথে এখনই যুদ্ধ শুরু করে দেওয়া। এমন ময়দানে যুদ্ধ শুরু করতে হবে, যেখানে প্রতিরোধ করার জন্য মার্কিন সেনার উপস্থিতি নেই। সেটা কোন ক্ষেত্র? কোন ফ্রন্ট—যেখানে প্রতিরোধের জন্য মার্কিন সেনার অস্তিত্ব নেই? বিশেষজ্ঞদের মতে, মার্কিন সেনাদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো, পুরো যুদ্ধ ময়দানকে দেখতেই পাচ্ছে না। তথ্যপ্রযুক্তিতে চরম উৎকর্ষতা অর্জন ও অত্যাধুনিক উন্নততর যুদ্ধাস্ত্র আবিষ্কারকেই মার্কিনিরা নিজেদের সাফল্য মনে করছে। তারা মনে করছে, মনুষ্যবিহীন ড্রোন, রোবট যোদ্ধা, রাডারের ধরাছোঁয়ার বাইরের পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধবিমান ইত্যাদি বানিয়ে তারা তামাম দুনিয়ার সেনাবাহিনীর চেয়ে বহুদূর এগিয়ে গেছে। তাদের সামনে দাঁড়ানোর মতো কোনো সেনাবাহিনী বিশ্বের মাটিতে নেই। মার্কিনিদের বিশ্বাস, তারা ভবিষ্যৎযুদ্ধে জেতার জন্য পরিপূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করে ফেলেছে।

চায়নিজ ডকট্রিনের মতে, আমেরিকার এটাই বড় কমজোরি। আমেরিকা এমন যুদ্ধক্ষেত্রগুলো সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর হয়ে আছে, যেখানে মূল যুদ্ধের আগে যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধক্ষেত্রগুলো কী? আধুনিক চায়নিজ শাশুজিয়াং (Un-Restricted Warfare)-এর মতে সে যুদ্ধক্ষেত্রগুলো হলো :

ক. আইনযুদ্ধ (Lawfare)।
খ. অর্থনৈতিক যুদ্ধ (Economic Warfare)।
গ. সাইবার বা নেটওয়ার্ক যুদ্ধ (Ciber/Network Warfare)।

সাইবার যুদ্ধে চায়নিজ হ্যাকাররা অনবরত মার্কিনিদের হারিয়েই চলছে। কীভাবে? আমরা ১৭ এপ্রিল, ২০২১ সালে আফগানিস্তানের বিখ্যাত এক ছবি

দেখেছি। এক মার্কিন বিমানের পেটে গাদাগাদি করে ৬৪০ আফগান বসে আছে। বিমানটি ছিল মার্কিন বোয়িং কোম্পানির সি-১৭। এটি ছিল আমেরিকার শীর্ষস্থানীয় অত্যাধুনিক সামরিক বিমান। এই বিমান কতটা কাজের সেটা সহজ ভাষায় বলতে গেলে, এই বিমান হাজারো মানুষকে তাদের মালসামানাসহ উঠিয়ে সাত সমুদ্র তেরো নদী পাড়ি দিতে পারে। এই বিমান মার্কিন আর্মির এত বেশি কাজে আসে যে, একবারের উড়ানে পুরো একটি ব্যাটালিয়ান বা কয়েকটি কোম্পানিকে ট্যাংক, কামান, সাঁজোয়া যান, জিপ, হ্যামার ও অস্ত্রশস্ত্রসহ বহন করে দূরদূরান্তের গন্তব্যে নিয়ে যেতে পারে। এটি আমেরিকার সবচেয়ে দামি সামরিক (কার্গো) বিমান। এর চেয়ে ব্যয়বহুল বিমান আমেরিকার ইতিহাসে আর নির্মিত হয়নি। ১৯৮০ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত এক দশক জুড়ে নির্মাণকাজ চলা এই দৈত্যাকার বিমান তৈরিতে আমেরিকার ব্যয় হয়েছে ৩১ বিলিয়ন ডলার। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিদেশ সফরে গেলে এই বিমানে করেই বুলেটপ্রুফ গাড়ি ও বিলাসবহুল লিমুজিন কার নিয়ে যাওয়া হয়।

চীন ও রাশিয়াসহ বেশ কটি দেশ এমন একটি স্বপ্নের বিমান বানানোর খাহেশ রাখত। রাতদিন এক করেও তারা এই বিমান বানানোর কারিগরি দক্ষতা অর্জন করে উঠতে পারছিল না। আমেরিকা এই বিমানের নির্মাণকৌশল এমভাবে গোপন রাখত, যেভাবে আগের যুগে চীনা সম্রাট রেশম বানানোর কৌশল গোপন রাখত। রেশম বানানোর গোপন রহস্য ইংরেজরা চীনাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিল। চীনারা এই দুর্লভ বিমান বানানোর পেছনে আমেরিকার মতো ৩১ বিলিয়ন ডলার খরচ করার বদলে হ্যাকারদের পেছনে মাত্র ১ মিলিয়ন ডলার খরচ করে বিমান বানানোর প্রযুক্তি হাতিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে। সেটা কীভাবে?

স্টিফেন সু। একজন চীনা ব্যবসায়ী। তার আসল নাম স বিন। চীনা গোয়েন্দাদের মদদে পেন্টাগনের সাথে কাজ করা দুই মার্কিন কোম্পানি লকহিড মার্টিন ও বোয়িংকে টার্গেট করেছিল। লকহিড মার্টিন পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম বিমান নির্মাতা কোম্পানি। লকহিড মার্টিন কোম্পানিই এফ-১৬ যুদ্ধবিমান, এফ-২২, এফ-৩৫ এর মতো অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান বানায়। এসব বিমান প্রতিপক্ষের রাডার সিস্টেমকে ধোঁকা দিতে সক্ষম। আর বোয়িং কোম্পানি পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম বিমান নির্মাতা সংস্থা। পৃথিবীর এক নাম্বার বিমান নির্মাণ কোম্পানির নাম এয়ারবাস। বোয়িং ৭৪৭, বোয়িং ৭৭৭-এর

মতো বিশাল বিশাল উড়োজাহাজ এই কোম্পানির হাতে নির্মিত হয়েছে। এই দুটি কোম্পানি পেন্টাগনের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমেরিকা প্রতি বছর আরো উন্নততর গবেষণার জন্য এই কোম্পানির পেছনে মিলিয়ন-মিলিয়ন ডলার খরচ করে। পেন্টাগনের উচ্চাভিলাসী পরিকল্পনায় এই দুই কোম্পানি মূল ভূমিকা পালন করে। এজন্য দুই কোম্পানির নিরাপত্তাবিধান করা আমেরিকার জন্য মহা গুরুত্বপূর্ণ। আমেরিকা আজ পুরো বিশ্বের সমস্ত সেনাবাহিনীর চেয়ে এগিয়ে যাওয়ার পেছনে এই দুই কোম্পানির কৃতিত্বই বেশি। এই দুই কোম্পানি নিত্যনতুন অত্যাধুনিক আবিষ্কার করছে বলেই তো আমেরিকা অন্যদের ওপর ছড়ি ঘুরিয়ে দাদাগিরি করার সুযোগ পাচ্ছে। লকহিড ও বোয়িং প্রতিনিয়ত পেন্টাগনকে এমন সমরাস্ত্র সরবরাহ করে চলছে, যা বিশ্বের অন্য কোনো সেনাবাহিনীর কাছে থাকে না।

স্টিফেন সুর কর্মকৌশল

১. স্টিফেন সু কানাডায় দুই মিলিয়ন ডলার মূল্যের নিজস্ব বিলাসবহুল প্রাসাদোপম বাড়িতে থাকত। তার সন্তান সুইজারল্যান্ডের ব্যয়বহুল বোর্ডিং স্কুলে পড়ত। স্টিফেন কানাডায় মাঝারি মানের একটি কোম্পানি (ওয়্যারটেক) প্রতিষ্ঠা করেছিল। এটার কাজ ছিল বিমান নির্মাতা (এরোস্পেস) কোম্পানিকে তার সরবরাহ করা। স্টিফেন সু এই ব্যবসাকে কেন্দ্র করে (২০০৯-২০১৪) পাঁচ বছরে কানাডা-আমেরিকার বহু মানুষের সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। বিশেষ করে যারা কানাডা ও আমেরিকার প্রতিরক্ষা বিভাগগুলোতে কাজ করে, বেছে বেছে তাদের সাথেই বেশি সম্পর্ক পাতিয়েছিল। নতুন তথ্যপ্রযুক্তি আবিষ্কারকারী কোম্পানিতে চাকুরি করা ব্যক্তিদের ঘনিষ্ঠজনের সাথেও স্টিফেন সম্পর্ক গড়ত। তাদেরকে অতি উন্নতমানের হোটেলে খাবার খাওয়াত। এভাবে একজন থেকে আরেকজনের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে করতে একসময় এমন ব্যক্তির নাগালে পৌঁছে যেত, যিনি অতি গুরুত্বপূর্ণ গোপন কোনো প্রজেক্টের সাথে যুক্ত আছেন। চীন দীর্ঘদিন ধরেই ওই প্রজেক্টের তথ্য পাওয়ার জন্য ওঁৎ পেতে ছিল।

স্টিফেন সুর সাথে ওঠাবসা করা ব্যক্তিরা জানিয়েছে, সে ছিল অত্যন্ত রসিক মানুষ। মজার-মজার গল্প করত। দামি রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ-ডিনার করাতো। কথায় কথায় হো হো করে হাসতে পারত। অর্থাৎ, স্টিফেন ছিল একটি ফুল-প্যাকেজ মশলাদার বোম্বাই ছবি। জটিল-কঠিন গবেষণার কাজে নিয়োজিত

নিঃসঙ্গ মানুষগুলোর কাছে স্টিফেন মুক্তির জানালা হয়ে ধরা দিত। তার উচ্ছল সঙ্গ পেয়ে বিজ্ঞানীরা চাঙা হয়ে উঠত। স্টিফেন সু সবসময় চেষ্টা করত, লকহিড মার্টিন, বোয়িং বা এ ধরনের কোম্পানিতে বা কোম্পানির জন্য কাজ করা ব্যক্তিদের সাথে পরিচিত হতে। সম্পর্ক একটু গাঢ় হলে পরিচিত ব্যক্তিদেরকে ব্যবসার অফার দিতে শুরু করত। কিছুদিন পর স্টিফেন বলত, আমি এ কথা বলছি না যে, আপনি আমাকে আমেরিকার এফ-৩৫ জেট ফাইটার এনে আমার গ্যারেজে দাঁড় করিয়ে দিন। আপনি শুধু আমাকে এই বিমান নির্মাণের ছোটখাটো কোনো সিস্টেম এনে দিলে আমি এটাকে অনেক চড়া দরে মার্কেটে বিক্রি করতে পারব। লাভের মোটা একটি অংশ আপনার পকেটেও যাবে। স্টিফেন শুরুতে যে সিস্টেম চুরি করে এনে দিতে বলত, সেটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ বা স্পর্শকাতর কিছু হতো না। মুনাফার লোভে, সম্পর্কের খাতিরে বা ক্ষতিকর নয় ভেবে কেউ কেউ চুক্তি করে বসত।

২. মার্কিন নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম নির্মাণকারী কোম্পানিতে চাকরিরত ব্যক্তিদের সাথে গল্পের ফাঁকে ফাঁকে স্টিফেন সু তাদের পদপদবি জেনে নিত। গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নাম, ফোন নাম্বার গোপনে চীনে পাঠিয়ে দিত। চীনে দুজন ব্যক্তি সবসময় স্টিফেন সুর ই-মেইল পাওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকত। স্টিফেন ধীরে ধীরে নির্দিষ্ট ব্যক্তির বাড়ির ঠিকানা, অফিসের ঠিকানা, তার ই-মেইল এড্রেস, তার স্বভাব-চরিত্র, আত্মীয়স্বজন, পড়াশোনা ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য চীনে বসে থাকা হ্যাকারদের কাছে পাঠাত। স্টিফেন এসব তথ্য উন্মুক্ত মেইলে পাঠাত না। জিপ ফাইল করে পাঠাত। এসব ফাইলে পাসওয়ার্ড দেওয়া থাকত। পাসওয়ার্ড হতো খুবই সহজ। যেমন একটা ফাইলের নাম ছিল 'আমার ফোন নাম্বার'। বাস্তবে সে জিপ ফাইল খোলার পাসওয়ার্ডও ছিল স্টিফেনের ফোন নাম্বার। হ্যাকাররা এসব তথ্যের সূত্র ধরেই হ্যাকিং শুরু করত।

৩. চায়নিজ হ্যাকাররা বড় কোনো কর্মকর্তাকে টার্গেট করত। কর্মকর্তার সহকর্মীর ই-মেইল হ্যাক করে তার ই-মেইল থেকে বড়কর্তার কাছে ই-মেইল পাঠাত। মেইলে গুরুত্বপূর্ণ কোনো ফাইল বা নকশা দেওয়ার কথা থাকত। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক কিছু নয়, একই অফিসে কর্মরত একজন আরেকজনের কাছে এমনটা চেয়েই থাকে। হ্যাকারদের পাঠানো ই-মেইলের শেষে কোনো লিংক থাকত। বড়কর্তা সরলমনে সে লিংকে ক্লিক করার সাথে সাথেই ই-

মেইল তো বটেই, তার কম্পিউটার পর্যন্ত চায়নিজ হ্যাকারদের দখলে চলে যেত। হ্যাকাররা বড়কর্তার কম্পিউটার থেকে ইচ্ছেমতো ডাটা-তথ্য হাতিয়ে নিত। চোরাইকৃত লাখো ফাইল থেকে কোনটা দরকারি কোনটা বেদরকারি—সেটা বোঝার জন্য হ্যাকাররা প্রাপ্ত ফাইলগুলোর তালিকা স্টিফেনকে দেখিয়ে বলত, দরকারি ফাইলগুলো চিহ্নিত করে দিন। স্টিফেন একই সাথে স্পাইং, নেটওয়ার্কিং, হ্যাকিং, টেকনোলজি ও বিজনেসের মতো বিষয়কে খুবই ভালোভাবে বুঝত। এ কথা স্বীকার করতেই হবে, তার মতো লোক পৃথিবীতে হাতেগোনা দুয়েকজনের বেশি হবে না। স্টিফেন চায়নিজ (ম্যান্ডারিন) ভাষার পাশাপাশি ভালো ইংরেজি তো জানতই, পাশাপাশি কোম্পানিগুলোর টেকনিক্যাল টার্মসগুলোর খটমটে (মার্কিন ও চায়নিজ) নামও জানত। এজন্য লাখো ফাইলের ভিড় থেকে প্রয়োজনীয় ফাইল খুঁজে নিতে খুব একটা বেগ পেতে হতো না। শুধু তাই নয়, দরকারি ফাইলগুলো চীনা ভাষায় অনুবাদও করে দিত। দীর্ঘ বিরক্তিকর ও ক্লান্তিকর কাজ—সন্দেহ নেই। স্টিফেন এসব ফাইল পাঠাত হংকং বা ম্যাকাওয়েতে। এ দুটি এলাকা চীনের স্বায়ত্তশাসিত এলাকা। এখানেই স্টিফেনের সহযোগী টিম কাজ করত। এখানে পাঠানোর কারণ হলো, ভবিষ্যতে এই তথ্যপাচার ধরা পড়ার পর আন্তর্জাতিক চাপ এলে চীন বলতে পারবে, এই হ্যাকিংয়ের সাথে মূল ভূখণ্ডের কোনো সম্পর্ক নেই। পরে এসব তথ্য প্রিন্ট করে বা পেনড্রাইভে করে অফলাইনে মূলচীনে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। এসব গোপন তথ্য সরাসরি অনলাইন হয়ে চীনে আসত না। ভবিষ্যতে কখনো তদন্ত হলেও চীনের ভয় পাওয়ার কিছু ছিল না। এসব তথ্য চীন পর্যন্ত আসার কোনো অনলাইন ট্রেইল নেই। চীনা এক্সপার্টরা জরুরি তথ্যগুলো চায়নিজ বিজ্ঞানীদের কাছে পৌঁছে দিত। ২০০৯ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত চার বছরে চায়নিজ হ্যাকাররা লকহিড মার্টিন ও বোয়িং কোম্পানির রগরেশা পর্যন্ত হাতিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিল। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল, উক্ত দুই কোম্পানির কর্তা ব্যক্তিদের চেয়েও চায়নিজ হ্যাকাররা দুই কোম্পানির গোপন তথ্য সম্পর্কে অনেক বেশি জানত। মাত্র তিন বছরে চীনা হ্যাকাররা শুধু বোয়িং সি-১৭ সম্পর্কে যে তথ্য কপি করেছিল, তার পরিমাণ ছিল ৬৫ জিবি। এখানে অডিও-ভিডিও ছিল না; ছিল শুধুই ডকুমেন্টস। এখানে ফাইলের পরিমাণ ছিল ৬,৩০,০০০ (ছয় লক্ষ ত্রিশ হাজার)-এরও বেশি। লকহিড মার্টিনের এফ-১৬ ও এফ-৩৫ সম্পর্কিত ফাইল এর চেয়ে আরো বহুগুণ বেশি ছিল।

এই ঘটনা ২০১৪ সালের নভেম্বরে চূড়ান্ত মাত্রা (ক্লাইমেক্স) পেয়েছিল। চীনে একটা আন্তর্জাতিক মানের এয়ার শো হয়। এখানে দুনিয়ার সেরা বিমাননির্মাতা কোম্পানিগুলো তাদের বিমান প্রদর্শনীর জন্য নিয়ে এসেছিল। প্রদর্শনীর যেখানে মার্কিন সি-১৭ দাঁড় করানো ছিল, চায়নিজ কর্তৃপক্ষ তার পাশে কিছু জায়গা খালি রেখেছিল। তখনো মার্কিনিরা জানত, তাদের সি-১৭ এর মতো বিমান বিশ্বের আর কারো কাছে নেই। একটু পরেই সেই খালি জায়গায় মার্কিন সি-১৭-এর মতো হুবহু আরেকটি চায়নিজ সামরিক কার্গো বিমান এসে থামল। এটা ছিল চায়নিজ চিয়াং কোম্পানির বানানো চার ইঞ্জিনবিশিষ্ট ওয়াই-২০ কার্গো বিমান। এটা দেখে সবার দুচোখ ছানাবড়া। চায়নিজ বিজ্ঞানীরা তাদের বানানো বিমানের নকশায় কিছুটা রদবদল করে ভেতরে জায়গা আরো বাড়িয়ে নিয়েছিল। এতে চীনের সবচেয়ে বড় ট্যাংক টি-৯০ অনায়াসে উঠিয়ে নেওয়া যায়।

লকহিড মার্টিনের এফ-৩৫-এর হুবহু নকল করে চায়নিজ বিজ্ঞানীরা জে-৩১ বানিয়েছে। দুই বিমানের মধ্যে পার্থক্য শুধু ইঞ্জিনের। মার্কিন বিমানে সিঙ্গেল ইঞ্জিন, চীনা বিমানে ডাবল ইঞ্জিন। মার্কিন এফ-৩৫ যুদ্ধবিমানের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, রাডার ফাঁকি দিতে পারা। এই প্রযুক্তি আবিষ্কার করতে আমেরিকার ব্যয় হয়েছিল ১১ বিলিয়ন ডলার। সেই বহুমূল্য ডাটা চুরি বা হ্যাক করে ঘরে তুলতে চীনের খরচ হয়েছে মাত্র কয়েক লাখ ডলার। এটাই হচ্ছে শাশুজিয়াং টেকনিক (Shashou Jian Technic)।

চায়নিজ হ্যাকাররা শুধু লকহিড-বোয়িংয়ের ডাটা হ্যাক করেনি; আরো অসংখ্য মার্কিন কোম্পানির ডাটাও তারা দীর্ঘদিন ধরে হ্যাক করে এসেছে। চীন যে এখন আমেরিকার চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারছে, সেটা এই হ্যাকিংয়ের জোরেই। ময়দানে দুইপক্ষ বরাবর দাঁড়িয়ে থাকার রহস্যও এটা।

সোবিন মানে স্টিফেন সুর দল মার্কিন আর্মির ৩২টি গোপন প্রজেক্টের বিস্তারিত তথ্যও হাতিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিল। যুদ্ধবিমান নির্মাণকারী অন্য কোম্পানিগুলোর প্রায় সব পাসওয়ার্ড হ্যাক করেছে। শুধু তাই নয়, রাশিয়া ও ইন্ডিয়ার মিসাইল ডেভেলপ সিস্টেমও তারা হ্যাক করতে সক্ষম হয়েছিল। তাইওয়ান থেকে শুরু করে তিব্বত পর্যন্ত সমস্ত সরকারি গোপন তথ্য হ্যাকারদল হাতিয়ে নিতে পেরেছিল।

হ্যাকেররা এসব তথ্য যোগাড় করেছিল জন্মভূমি চীনের জন্য। পাশাপাশি ব্ল্যাক মার্কেটে এসব তথ্য বিকিয়ে বিপুল অর্থও কামিয়ে নিয়েছিল। ইন্টারনেটের ডার্কওয়েব অর্থাৎ, অনলাইন চোরাই বাজারেও তারা তথ্যগুলো বিক্রি করেছিল। তবে চায়নিজ হ্যাকাররা বেশিদিন এফবিআইয়ের চোখ এড়াতে পারেনি। সেই ২০০১ সালেই এফবিআই প্রতিদিন ২ কোটি ফোন কল ও ই-মেইল ইন্টারসেপ্ট করত। আজ বাইশ বছর পর সেটার পরিমাণ কত বেশি হতে পারে? অর্থাৎ, আমেরিকার মাটি থেকে যত ফোন কল বা ই-মেইল বাইরে যায়, সেগুলোকে মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগের স্ক্যানার পার হয়েই যেতে হয়। স্ক্যানারকে কিছু শব্দ বলে দেওয়া থাকে। কথোপকথন, ডাটা বা ই-মেইলে সন্দেহজক কোনো শব্দ থাকলে স্ক্যানার চিহ্নিত করে দেয়। এবার এক্সপার্টরা উক্ত ফাইল খুলে দেখে।

বর্তমানে প্রতিদিন গড়ে কমপক্ষে ৫ বিলিয়নের বেশি অনলাইনে সার্চ হয়। প্রতিদিন ৩০০ বিলিয়নেরও বেশি ই-মেইল লেনদেন হয়। প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৩.৫ মিলিয়ন মানে ৩৫ লাখ ই-মেইল আদান-প্রদান হয়। এই বিপুল তথ্য স্ক্যান করা পৃথিবীর যেকোনো গোয়েন্দা সংস্থার পক্ষেই অসম্ভব। বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো ফ্রিল্যান্সার ও হ্যাকারদের সাহায্য নিতে শুরু করে। হ্যাকারদের সাথে ধরাবাঁধা বেতনের চুক্তি থাকত না। প্রয়োজনীয় তথ্য দিতে পারলে এজেন্সিগুলো টাকা দিয়ে কিনে নিত। এমনই একটি তথ্য সংবলিত ই-মেইল ২০১৪ সালে এফবিআইয়ের লসএঞ্জেলস অফিসে এসেছিল। ই-মেইল প্রেরণকারী চায়নিজ ভাষায় লিখিত একটি সন্দেহজনক ই-মেইলের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ওই চায়নিজ ই-মেইলে বিশেষ কিছু ছিল না, সবকিছু স্বাভাবিক ছিল; শুধু একটা বিষয় অস্বাভাবিক ছিল। ই-মেইলটি পাঠানো হয়েছিল সাংকেতিক ভাষায়। হ্যাকার একটি ভুল করেছিল। যার কারণে সেই চায়নিজ ই-মেইল প্রেরণকারী সন্দেহের তালিকায় এসে গিয়েছিল। হ্যাকার ই-মেইলের সাথে পাঠানো একটি এটাচমেন্ট ফাইলের নাম পরিবর্তন করতে ভুলে গেছিল। সেই ফাইলের নাম ছিল :

C17 Project
Reconnaissance summary

এই শব্দ থেকে এফবিআইয়ের সন্দেহ হলো। এফবিআই তদন্ত শুরু করল। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরোতে শুরু করে। ই-মেইলে পাওয়া ছবির সূত্র ধরে কানাডায় বাস করা স্টিফেন সু-এর পরিচয়ও বেরিয়ে পড়ল। চীনে

অবস্থান করা চায়নিজ ইন্টেলিজেন্সের সদস্য দুই ব্যক্তির সন্ধানও এফবিআই বের করে ফেলল। এফবিআই কানাডার সাথে যোগাযোগ করল। জানা গেল, স্টিফেন যেকোনো মুহূর্তে চীনে চলে যাবে। এফবিআই যেকোনো মূল্যে স্টিফেনকে গ্রেফতার করতে চাচ্ছিল। সে একবার চীনে চলে গেলে তাকে ফিরিয়ে আনা অসম্ভব। পরের বছর চীনা প্রেসিডেন্ট আমেরিকা সফরে আসবেন। স্টিফেনকে গ্রেফতার করতে পারলে তার কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলো উপযুক্ত প্রমাণসহ বারাক ওবামা চায়নিজ প্রেসিডেন্টের কাছে তুলে ধরতে পারবেন। দৃশ্যমান কোনো প্রমাণ ছাড়া কানাডা স্টিফেনকে গ্রেফতার করতে প্রস্তুত ছিল না। সে সময় কানাডাও এক কঠিন সমস্যায় ছিল। চায়নিজ ও রাশিয়ান হ্যাকাররা অনবরত কানাডিয়ান সিকিউরিটি সিস্টেমের ওপর আক্রমণ করে যাচ্ছিল। এই সমস্যা থেকে বাঁচার জন্য কানাডা স্টিফেনকে গ্রেফতার করে ফেলল।

কানাডা স্টিফেনকে আমেরিকার হাতে সোপর্দ করার আগে ঘটনায় নতুন একটি বাঁক এলো। চায়নিজ কর্তৃপক্ষ চীনে অবস্থানরত কয়েকজন কানাডিয়ানকে একসাথে গ্রেফতার করল। চায়নিজ কর্তৃপক্ষ পরবর্তী কয়েক মাসে একে একে প্রায় ২০০ কানাডিয়ানকে গ্রেফতার করল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল, কেভিন-জুলিয়া দম্পতি। তারা দীর্ঘদিন ধরে চীনে অবস্থান করে আসছিলেন। তাদেরকে গ্রেফতার করার পর চায়নিজ কর্তৃপক্ষ বেইজিংয়ের কানাডা হাইকমিশনে বার্তা পাঠাল, আপনাদের নাগরিক আমাদের হেফাজতে আছে। আপনারা চাইলে তাদের জন্য উকিল নিয়োগ করতে পারেন। এটা ছিল চীনের পক্ষ থেকে কানাডার প্রতি গুপ্ত হুমকি : আপনারা আমাদের নাগরিককে আমেরিকার কাছে সোপর্দ করার আগে কয়েকবার আবার ভাবুন, আপনাদের নাগরিকও আমাদের হাতে আছে। কানাডা দুই পরাশক্তির শাঁখের করাতের মাঝে পড়ে গেছে। কানাডা স্টিফেনকে আমেরিকার কাছে সোপর্দ করার বদলে তাকে দীর্ঘস্থায়ী বিচার প্রক্রিয়ার দিকে ঠেলে দিলো। ওদিকে চীনও কেভিন দম্পতির ওপর গোয়েন্দাবৃত্তির অভিযোগ দায়ের করল। এই দম্পতি ১৯৮৪ সাল থেকেই চীনে বাস করে আসছিল। তারা চলনবলনে পুরোপুরি চায়নিজের মতোই হয়ে গিয়েছিল। চীনা ভাষায় কথা বলত, চীনা খাবার খেতো। তাদের কফি বিক্রির ব্যবসা ছিল। চীন অভিযোগ করল, কেভিন দম্পতি গোপনে চীনের সামরিক স্থাপনাগুলোর ছবি তুলে কানাডিয়ান ইন্টেলিজেন্সের কাছে পাঠায়; এ ছাড়া

...রো অভিযোগও ছিল। চীন আরো নানাভাবে কানাডার ওপর চাপ সৃষ্টি করে ...ছিল। কানাডা যেন কোনো অবস্থাতেই স্টিফেনকে যুক্তরাষ্ট্রের হাতে তুলে ...না দেয়।

...এই পর্যায়ে ঘটনায় আরেকটি মোড় (টুইস্ট) সৃষ্টি হলো। দুই বছর পর্যন্ত ...চীনের টানা-হ্যাঁচড়ার পরও আমেরিকা স্টিফেনকে নিজের হেফাজতে নিতে ...পারল না। এবার স্টিফেন নিজেই আমেরিকা গিয়ে সরাসরি মামলা লড়ার ...ফয়সালা করল। স্টিফেনের উকিলের বক্তব্য ছিল এমন, আমেরিকা ...স্টিফেনকে নিয়ে যেতে যত সময় লাগবে, মার্কিন আদালতে আত্মসমর্পণ ...করলে তার কৃত অপরাধের জন্য এর চেয়েও কম সাজা মিলবে। এ ছাড়া ...আমেরিকা-কানাডা ও চীনের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে একপ্রকার বোঝাপড়া হয়ে ...গিয়েছিল।

সুবিনের নতুন চাল

...তিন দেশের সমঝোতার ভিত্তিতে মার্কিন নিরাপত্তাকর্মীরা সুবিন (Su Bin) ...তথা স্টিফেনকে বিশেষ বিমানে করে আমেরিকায় উড়িয়ে নিয়ে এলো। ...যাবার সময় বিমানে তাকে মাঝের আসনে বসিয়ে দুই পাশে তাগড়া বপুধারী ...দুই মার্কিন সুমো পাহলোয়ান বসল। দুই পাহাড়ের চাপে সুবিন চিড়ে চ্যাপ্টা ...হওয়ার যোগাড়। যাত্রাপথে নিরাপত্তারক্ষীরা সুবিনকে নানা প্রশ্নবাণে জর্জরিত ...করতে থাকল। এক পর্যায়ে জানতে চাইল, আপনার পছন্দের এয়ারক্রাফট ...কোনটা? সুবিন এমনিতেই হাঁসফাঁস করছিল। বিরক্ত আর অতিষ্ঠ স্বরে উত্তর ...দিলো, বোয়িং সি-১৭ ছাড়া আর কোনো বিমান আমার মনেই ধরে না।

...মার্কিন আদালত সুবিনকে ৪০ মাসের কারাদণ্ড দিয়েছিল। অক্টোবর ২০১৭ ...সালে কারাবাসের মেয়াদ শেষ হয়েছে। মুক্তির পর সুবিন চীনে চলে এসেছে। ...অন্যদিকে আরো এক বছর আগে ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বরে ২০ হাজার ডলার ...জরিমানা ও দুই বছর সাজা ভোগ করে কানাডিয়ান পরিবারটি মুক্তি পেয়ে ...বাড়ি ফিরে গেছে।

...বিচার চলাকালে সুবিন ৩৫ পৃষ্ঠার এক স্বীকারোক্তিনামা আদালতে জমা ...দিয়েছিল। সেখানে বিস্তারিত সব তথ্য ছিল। সেখানে বলেছে, কীভাবে ...সে ... মার্কিনের গোপন তথ্য পাচার করেছে। এডওয়ার্ড স্নোডেন তার ফাঁস ...করা তথ্যে জানিয়েছিল, কীভাবে মার্কিন গোয়েন্দারা চীনা প্রেসিডেন্ট ও

অন্যান্য নেতৃবৃন্দের টেলিফোন কথোপকথন আড়ি পেতে শোনে। চীনের নিজস্ব মোবাইল অপারেটিং সিস্টেম 'হুয়াই'-এর সিস্টেমে অনুপ্রবেশ করেই সিআইএ চরবৃত্তি করে থাকে। সিআইএ গোপনে হুয়াইয়ের সিস্টেমের মধ্যেই নিজস্ব স্পাইং প্রোগ্রাম ইনস্টল করে দেয়। কর্তৃপক্ষ টের পাওয়ার আগেই গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্য হাতিয়ে নিয়ে যায়। সিআইএর স্পাইং প্রোগ্রাম ইনস্টলড থাকার কারণে হুয়াইএর যেকোনো ফোনের ক্যামেরা ও মেমরিকে দূর থেকে ইচ্ছামতো নিয়ন্ত্রণ করা যায়; তথ্য সংগ্রহ করা যায়। অবশ্য যতদিন ধরা না পড়ে ততদিন আরকি।

সুবিনের গ্রেফতারি ও স্বীকারোক্তিনামা দাখিল করার পর ২০১৫ সালে চীনা প্রেসিডেন্ট আমেরিকা সফরে গিয়েছেন। বারাক ওবামার সাথে বৈঠকে সাইবার ওয়ারফেয়ার ছিল আলোচনার প্রধানতম এজেন্ডা। শি জিনপিং ও ওবামার সেই বৈঠকে একমত হয়েছিলেন, উভয় দেশ মিলে সাইবার ক্রাইম তথা এক দেশের তথ্য আরেক দেশ যেন চুরি করতে না পারে—এ ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। তথ্যপাচারকারী হ্যাকার পাকড়াও করতে পরস্পরকে সাহায্য করবে। এটাই হলো কূটনীতি। এসব হ্যাকার নিজ দেশের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদদেই হ্যাকিং করে; কিন্তু চুক্তির ভাষা ও ভঙ্গি দেখলে মনে হবে, হ্যাকারদের সম্পর্কে তারা আজই প্রথম জানল। উভয় দেশই জানে, এসব হলো লোক দেখানো। নইলে উভয়েই একে অপরের পিঠে ছুরি মারতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। শক্তির লড়াইয়ে কোনো দয়া-মায়া, আখলাক-স্বভাবের কোনো মূল্য নেই।

চুক্তির পরও হ্যাকিং কিন্তু থেমে নেই। নতুন পদ্ধতিতে, নতুন কৌশলে উভয়দেশের হ্যাকাররা তাদের মিশন চালিয়ে যাচ্ছে। এফবিআইয়ের মতে, হাজার নয়, লাখো চীনা হ্যাকার অনবরত দেশের পক্ষে কাজ করে যাচ্ছে। এদের সবাইকে যে চায়নিজ সরকার নিয়োগ দিয়েছে—এমন নয়। এদের বেশিরভাগই ফ্রি-ল্যান্সার। নিজের মতো কাজ করে। গুরুত্বপূর্ণ কিছু পেলে সরকারের কাছে বিক্রি করে। এতে দেশসেবা আর পেটসেবা উভয়টাই হয়।

পরিবর্তিত কৌশলে চীনারা এখন আর শত্রুদেশে চর নিয়োগ করে না। তারা এমন প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছে, সেটা ব্যবহার করে শত্রুদেশের যেকোনো কম্পিউটারে অনুপ্রবেশ করে তাতে রক্ষিত যাবতীয় তথ্য-উপাত্ত হ্যাক করতে পারে। ইসরায়েলের পেগাসাস কোম্পানিরও এমন প্রযুক্তি আছে।

এফবিআই অসহায়ের মতো স্বীকারোক্তি দিয়েছে, চায়নিজ হ্যাকাররা আমাদের কতগুলো দপ্তরের কম্পিউটারে অনুপ্রবেশ করেছে—এ বিষয়ে আমাদের কাছে ১০% তথ্যও নেই। সুবিন যেভাবে চুরি করেছিল আরকি। হ্যাকাররা সংখ্যায় এত বেশি আর তাদের কাজকর্ম এতই দ্রুতগতির যে, তাদেরকে পাকড়াও করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। আমেরিকা নিজেকে হ্যাকিং থেকে বাঁচানোর জন্য মরিয়ার মতো হাত-পা ছুড়ে মারে; কিন্তু বাঁচাতে পারে না।

কালেভদ্রে মার্কিন গোয়েন্দারা তাদের কোনো কম্পিউটার সিস্টেমে অবাঞ্ছিত চায়নিজ অনুপ্রবেশ টের পেলেও নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে শনাক্ত করার আগেই কীভাবে যেন হ্যাকার টের পেয়ে যায়। সময় থাকতেই চীনা হ্যাকাররা পেছনে কোনো সূত্র না রেখেই গা ঢাকা দেয়। পরেরবার আরো বেশি সতর্ক আর নিখুঁত হয়ে নতুন নামে, নতুন কৌশলে ময়দানে আসে। চীন এসবকে অপরাধ বলেই মনে করে না। চীন এসবকে যুদ্ধকৌশল হিসেবেই বিবেচনা করে। তাদের চিন্তা হলো, এখন বা আজ আমেরিকার সাথে আমাদের যুদ্ধ বাধেনি সত্য, তাই বলে ভবিষ্যতে কখনো বাঁধবে না—তার কোনো গ্যারান্টি আছে? যুদ্ধ বেধে গেলে তখন বসে বসে আঙুল না চুষে সময় থাকতে প্রস্তুতি নিতে শুরু করাই ভালো। প্রতিপক্ষের সাথে সেয়ানে সেয়ানে লড়াই করতে না পারলে নিজের অস্তিত্বই বিলীন হয়ে যাবে। চীনের নীতি হলো, যুদ্ধে সবই বৈধ।

এটা ছিল সাইবার ওয়ারফেয়ারে চীনের হাজারো না-জানা কৌশলের একটি। এ ছাড়া চীনের আরো দুটি কৌশল আছে :

ক. ল ফেয়ার (Lawfare)
খ. ইকোনোমিক ওয়ারফেয়ার।

এতক্ষণ আমরা চীনের অতি প্রাচীন যুদ্ধকৌশল 'শাশুজিয়াং' সম্পর্কে কথা বলেছি। এই কৌশলের আওতায় চীন গোপনে ধীরে ধীরে ভেতর থেকেই আমেরিকাকে পরাজিত করার মহাপরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। এবার আমরা শুধু থিউরি নয়, বাস্তব ঘটনাও তুলে ধরার চেষ্টা করব। চীন চারিদিক থেকে মার্কিন অর্থনীতিকে ঘিরে ফেলছে। আমেরিকা দেখে-শুনে-জেনেও এর বিরুদ্ধে পাল্টা কোনো পদক্ষেপই নিতে পারছে না। আমেরিকা অসহায়ের মতো শুধু চীনের কীর্তি দেখেই যাচ্ছে। পাশাপাশি আমরা রাশিয়ার সাইবার ওয়ারফেয়ারও দেখব।

সাবেক মার্কিন সেনা কর্মকর্তা জেনারেল রবার্ট স্করড্রিং। তিনি চীনে মার্কিন দূতাবাসে মিলিটারি এটাশে ছিলেন। একটা মার্কিন থিং ট্যাংকেও কাজ করেছেন। মিলিটারি এটাশের পদটা যেকোনো দূতাবাসেই থাকে। দূতাবাস ও রাষ্ট্রদূতের নিরাপত্তার দিক দেখার জন্য একজন অবসরপ্রাপ্ত বা বর্তমানে কর্মরত সেনা কর্মকর্তা থাকে। চায়নাতে যে কাউকে মিলিটারি এটাশে নিয়োগ দেওয়া হবে না বলাইবাহুল্য। এটা থেকেই রবার্ট স্করডিংয়ের গুরুত্ব বোঝা সম্ভব। তিনি একটি বই লিখেছিলেন, স্টীলথ ওয়ার (STEALTH WAR)। তার বইটা পড়ে মার্কিন বুদ্ধিজীবী মহল ও সচেতন নাগরিকরা বেশ উদ্বিগ্ন। বইটাতে তিনি আমেরিকার বিরুদ্ধে চীনের গোপন যুদ্ধ সম্পর্কে অনেক চাঞ্চল্যকর কথা লিখেছেন। তিনি লিখেছেন, ২০১৬-২০১৭ সালের দিকে আমেরিকার একটি বিষয়ে গবেষণা করানোর অনেক চেষ্টা করেছি। গবেষণার বিষয় ছিল, মার্কিন অর্থনীতির ওপর চায়নিজ কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব কেমন?

চীনে একদলীয় শাসন চলে। সেখানে বহুদলীয় রাজনীতি চলে না। সরকারি দল ছাড়া অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব সেখানে নেই। রিসার্চের জন্য রবার্ট স্করডিং কয়েকটি প্রশ্ন নির্ধারণ করেছিলেন। প্রথম প্রশ্ন ছিল :

ক. চীনা কূটনীতি, বিনিয়োগকারী ও ব্যবসায়ীরা কীভাবে মার্কিন ব্যবসায়ীদেরকে 'ম্যানিপুলেট' করে?

খ. কীভাবে মার্কিন বিজনেস টাইকুনদেরকে চীনারা শিকারে পরিণত করে?

গ. কতগুলো মাল্টি বিলিয়ন ডলারের মালিক মার্কিন কোম্পানিগুলোর বোর্ড ডিরেক্টরের সাথে চীনের সম্পর্ক আছে? এই কোম্পানিগুলোর বোর্ড মিটিংয়ে চীনারা কতটুকু ইন্টারফেয়ার করে?

ঘ. চীনারা কোন ধরনের মার্কিন ব্যবসা খাতে বিনিয়োগে বেশি আগ্রহী?

ঙ. চীনারা কৌশলে আমেরিকায় কী পরিমাণ বেকারত্ব সৃষ্টি করেছে?

চ. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, আমেরিকায় চীনের বিনিয়োগের ধরনটা কেমন? এমন নয় তো, তাদের মার্কিন প্রজেক্টে চীনারাই শুধু চাকুরি পায়? চীনে নির্মিত বস্তুই শুধু ব্যবহৃত হয়? এ কারণে কি মার্কিনিরা প্রতিনিয়ত বেকারত্বের শিকার হচ্ছে?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর জানা জরুরি ছিল। তাহলে জেনারেল রবার্ট বুঝতে পারবেন, মার্কিন অর্থনীতির ওপর চীনারা কতটা থাবা বিস্তার করেছে। মার্কিন

অর্থনীতিকে চীনারা কতটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে? জেনারেল রবার্ট এসব প্রশ্ন নিয়ে আমেরিকার এক বিখ্যাত থিংক ট্যাংকের কাছে গিয়েছিলেন। সেটা ছিল আমেরিকার পাঁচটি বড় থিংক ট্যাংকের অন্যতম। এসব প্রতিষ্ঠানে রণকৌশল উন্নয়ন, রাজনীতি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত ছিল। সবকিছু ঠিকঠাক ছিল। উক্ত থিংক ট্যাংক প্রস্তাবিত বিষয়ে রিসার্চ করার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত ছিল। জেনারেল রবার্ট নিজের চেষ্টায় প্রয়োজনীয় তহবিলও সংগ্রহ করেছিলেন। থিংক ট্যাংক এই রিসার্চ নিয়ে খুবই উৎসাহী ছিল। তারা এই প্রজেক্টকে তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে আখ্যা দিয়েছিল। থিংক ট্যাংকের মতে, এই রিসার্চের ফলাফল প্রকাশ পেলে পুরো মার্কিন বিজনেস সেক্টর থ হয়ে যাবে।

এই পর্যায়ে ঘটনায় অবিশ্বাস্য এক বাঁক এলো। গবেষণা শুরুর আগে, আরো ঠিক করে বলতে গেলে, মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে থিংক ট্যাংকের প্রধান নির্বাহী একটা মিটিং ডাকলেন। সবাইকে কোনো কারণ জানানো ছাড়াই বললেন, এই গবেষণা হবে না। এই গবেষণার কোনো প্রয়োজন নেই। থিংক ট্যাংকের এই সিদ্ধান্তে জেনারেল ভীষণ অবাক হলেন। বুঝে উঠতে পারছিলেন না, সবকিছু ঠিকঠাক মতোই এগুচ্ছিল। হঠাৎ কী এমন হয়ে গেল যে, এতদিনের সমস্ত পরিকল্পনা বন্ধ করে দিতে হলো? জেনারেল ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিষয়টা খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নিলেন। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে রীতিমতো আজদাহা বেরিয়ে এলো। সর্ষের ভেতরেই ভূত। ওই থিংক ট্যাংকের দাতাদের মধ্যে এমন কয়েকজন ছিলেন, যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে চীনের সাথে লেনদেনে জড়িত। এই গবেষণা সঠিক পথে এগুলে ওই দাতাগোষ্ঠীও ফেঁসে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা ছিল।

এরপর জেনারেল হোয়াইট হাউজের সাথে যোগাযোগ করলেন। সেখানকার বিভিন্ন সংস্থাকে দিয়েও এই গবেষণা করাতে চাইলেন। অদৃশ্য কারণে এখানেও সম্ভব হলো না। সংস্থার কর্তাব্যক্তিরা জেনারেলকে বলেছে, আপনার কথা পুরোপুরি সত্য। তবে আমরা আপনার কোনো কাজে আসতে পারছি না, দুঃখিত। কয়েকজন কর্তা তো সরাসরি বলেই দিয়েছে, আমরা আমাদের ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীদের অসন্তুষ্ট করতে পারি না। তাহলে আমাদের ব্যবসা মুখ থুবড়ে পড়বে।

এই ঘটনা থেকে কিছুটা হলেও আঁচ করা যায়, সিসিপি (চায়নিজ কমিউনিস্ট পার্টি) কীভাবে আমেরিকার অর্থনীতি, কূটনীতি ও সমরনীতি নিয়ে বেপরোয়াভাবে খেলছে। চীনের এই শাগুজিয়ানের বিরুদ্ধে আমেরিকা লড়বে কী, এখনো শাগুজিয়াং বিষয়টা যে কী—সেটাই বুঝে উঠতে পেরেছে বলে মনে হয় না।

চীন শুধু মার্কিন অর্থনীতি নিয়েই খেলছে না; বরং রাজনীতি নিয়েও সমানতালে খেলছে। আমেরিকার প্রভাবশালী রাজনীতিবিদদেরও চীন নানা কৌশলে হাতে রাখে। বর্তমানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের কথাই ধরা যাক। তার ছেলে ব্যাংক অব চায়নার বিশেষ ব্যবসার শরিকদার। এই যৌথ ব্যবসার অধীনে ৩.৮ বিলিয়ন ডলারের কোবাল্ট কেনার কথা ছিল। ইলেকট্রিক মেশিনারি, বিদ্যুৎচালিত গাড়ির ব্যাটারিতে কোবাল্ট ব্যবহৃত হয়। এই চুক্তিতে হান্টার বাইডেনের ছিল ৩০% শেয়ার। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার সময় জো বাইডেন বারাক ওবামার ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। অত্যন্ত শক্তিশালী পদ। তখন প্রশ্ন উঠেছিল, আমেরিকার জানি দুশমনের সাথে শাসক পরিবারের একজন হয়ে এতবড় ব্যবসা কীভাবে করতে পারে? হান্টার বাইডেন উত্তরে বলেছিল, এখানে সমস্যার কী আছে? আমেরিকার দরকার কোবাল্ট। সেটা আছে আফ্রিকার কঙ্গোতে। শেয়ার আছে মার্কিন কোম্পানি ওয়াইও হারভেস্ট-এর হাতে। উপকার যা হওয়ার সেটা আমেরিকারই হবে।

এভাবেই চীন মার্কিন ব্যবসায়ীদেরকে হাতে রাখে। গুটিকয়েক মার্কিনি মজাসে চুটিয়ে ব্যবসা করে যাচ্ছে। ওদিকে চীনও আরামসে তাদের কাঁধে বন্দুক রেখে শিকার করে চলেছে। চীন তার 'মার্কিনবধ কৌশলে' বলা যেতে পারে শতভাগ সফল। তারা নেপথ্যে থেকে আমেরিকায় বিপুল অঙ্কের বিনিয়োগ করে, ক্ষমতার শীর্ষে থাকা ব্যক্তিদেরকে লোভের ফাঁদে ফেলে হাতে রাখে।

আমরা জানি, চীনে পরিপূর্ণ ব্যক্তি মালিকানাধীন কোনো কোম্পানি হতে পারে না। সিসিপি বড় বড় ব্যবসাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। সিসিপির অন্যতম এজেন্ডা হচ্ছে, তারা 'লফেয়ার, ইকোনোমিক ওয়ারফেয়ার ও সাইবার ওয়ারফেয়ারের মাধ্যমেই আমেরিকার সাথে যুদ্ধ করবে। এই তিন পদ্ধতিতে যুদ্ধ করেই আমেরিকাকে পরাজিত করবে। সেটা কীভাবে? একটু খতিয়ে দেখা যাক। চীন ব্যবসায়িক চুক্তিগুলো এমনভাবে করে, ছোটখাটো ব্যবসায়িক চুক্তিও

অনেক মার্কিনির চাকরি নষ্ট করে দেয়। বাহ্যিকভাবে দেখা যায়, চুক্তির ফলে মোটা টাকা আমেরিকায় আসছে। বাস্তবে এই টাকা গুটিকয়েক মানুষের হাতেই জমা হয়। বাকি বিপুল জনগোষ্ঠী এসব ব্যবসায়িক চুক্তির ফলভোগ থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত থাকে।

যে পণ্য আমদানির চুক্তি করা হয়, সেগুলো আমদানি করা হয় চীন থেকে। পণ্যের নির্মাণ থেকে শুরু করে বিপণন পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়ায় হাতেগোনা কয়েকজন আমেরিকান জড়িত থাকে। বাকি সবাই চায়নিজ। সাধারণ আমেরিকান এসব প্রকল্পে খুব কমই চাকুরি পেয়ে থাকে।

২০০১ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত ১৬ বছরে ৩৪ লাখ চাকুরি নাই হয়ে গেছে। এসব চাকরি কোন খাত থেকে লোপাট হয়েছে? নির্মাণশিল্প থেকে। ওয়ালস্ট্রিটে বহু বড় বড় কোম্পানি আছে, যেগুলো মূলত চায়নিজ বিনিয়োগের সাহায্যেই বেঁচেবর্তে আছে। এসব কোম্পানির সিইও প্রতি মাসে লক্ষ লক্ষ ডলার চীনের বদৌলতেই আয় করতে পারে। শীর্ষ পদে থাকা এসব কর্তারা ভালো করেই জানে, তাদের রুজি-রুটির বন্দোবস্ত বেইজিং থেকেই হচ্ছে। সুতরাং চীনের ক্ষতি হওয়া মানে নিজের পেটেই লাথি পড়া। চীন এসব তার বিখ্যাত (!) রণনীতি শাওজিয়ানের আলোকেই করছে। এই কৌশলে আড়াল থেকে দুশমনকে ধীরে ধীরে এমনভাবে দুর্বল করার ধারাবাহিক প্রক্রিয়া চলতে থাকে। একসময় অবস্থা এমন দাঁড়ায়, প্রতিপক্ষের লড়ার মতো শক্তি থাকে না। প্রতিপক্ষকে নিরস্ত্র ও দন্তনখরহীন করে দেওয়াই শাওজিয়ানের অন্যতম কৌশল। এই কৌশলে প্রতিপক্ষকে জানে মারা হয় না, তবে ভাতে মারা হয়। অস্ত্রের জোরে প্রতিপক্ষকে নিজের করায়ত্ত করার নামই শুধু যুদ্ধ নয়; বরং শক্তিপ্রয়োগে বা শক্তিপ্রয়োগ ছাড়া, সেনার মাধ্যমে বা সেনা ছাড়া, লড়াই করে বা মেকি ভালোবেসে অথবা কোনোভাবে দুশমনকে নিজের কথা মানতে বাধ্য করাই যুদ্ধের নয়া মূলনীতি।

কৌশলটা নতুন নয়, প্রায়োগিক দিকটা নতুন। চীনা দার্শনিক সানজু আড়াই হাজার বছর আগেই এই কৌশলের কথা বলে গেছেন। এ তো গেল চীনের কথা। চীন যেভাবে নানা কৌশলে আমেরিকাকে সারাক্ষণ দৌড়ের ওপর রেখেছে, ওদিকে রাশিয়াও বসে নেই। আমেরিকার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য ও রণমিত্র ইউরোপ আর ন্যাটোকে প্রতিনিয়ত উত্যক্ত করে চলেছে রাশিয়া। সাইবার ক্ষেত্রে আমেরিকার ওপর চীনের চেয়েও বহুগুণ বেশি তেজালো হামলা

শানায় রাশিয়া। রাশিয়া এই পথেই আমেরিকার কাছ থেকে স্বার্থ উদ্ধার করে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ২০০৭ সালে রাশিয়া এস্তোনিয়া (ESTONIA)-র ওপর সাঁড়াশি সাইবার হামলা করেছিল। এই হামলার মাধ্যমে রাশিয়া প্রমাণ করেছিল, সেনা না পাঠিয়েও একটা দেশকে ওলটপালট করে দেওয়া যায়। সরাসরি যুদ্ধে না জড়িয়েও আমেরিকার যেকোনো মিত্রকে রাশিয়া চাইলে হাত-পা বেঁধে রাখতে পারে। এস্তোনিয়া ইউরোপের সবচেয়ে টেক-ফ্রেন্ডলি দেশ। এখানকার শিশুরাও টেকসচেতন; মানে আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। দুনিয়ার অন্যসব দেশে যেভাবে হাত ধোয়ার কথা, সাফসুতরো থাকার শিক্ষা দেওয়া হয়, এস্তোনিয়াতেও এসব শিক্ষার পাশাপাশি সাইবার হাইজিনের শিক্ষাও সমান গুরুত্বের সাথে দেওয়া হয়। স্কুল থেকেই বাচ্চাদেরকে শেখানো হয়, কীভাবে নিজের মোবাইল-কম্পিউটারকে সাইবার অ্যাটাক বা হ্যাকারদের হামলা থেকে সুরক্ষিত রাখা যাবে।

এই অতি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রটি অল্প কিছুদিন আগে ১৯৯১ সালে বৃহৎ দৈত্য রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্বাধীনতা লাভ করেছিল। পাশের দেশ লাটভিয়া ও লিথুনিয়াও এর কাছাকাছি সময়ে স্বাধীন হয়েছিল। এসব দেশের একটা কমন সমস্যা হলো, প্রতিটি দেশেই বিপুল পরিমাণে রাশিয়ান বংশোদ্ভূত মানুষ বাস করে। এদের কিছু অংশ প্রাচীনকাল থেকে এখানে ছিল আর কিছু অংশ সোভিয়েত যুগে এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছে। বর্তমানে এস্তোনিয়ার ২৪% লোক রাশিয়ান। এস্তোনিয়ার মোট জনসংখ্যা ১৩,২৮,০০০ (তেরো লক্ষ আঠাশ হাজার) জনসংখ্যার মধ্যে ৩,২০,০০০ (তিন লাখ বিশ হাজার)-এর মতো মানুষ রাশিয়ান। এই রাশিয়ানরা বেশিরভাগই শহুরে এলাকার বাসিন্দা। অর্থাৎ, এরা অত্যন্ত শক্তিশালী রাজনৈতিক শক্তি। আধুনিক বিশ্বের জনমত গঠনে শহরের নাগরিকরাই মূলত আসল ভূমিকা পালন করে। এস্তোনিয়াতে কোনো সিদ্ধান্ত রাশিয়ানদের বাদ দিয়ে গ্রহণ করা অসম্ভব। এস্তোনিয়া ও রাশিয়ার অবস্থা কিছুটা ভারত-পাকিস্তানের মতো। এস্তোনিয়ায় বাস করা রাশিয়ানদের মাথায় সবসময় এই চিন্তা ঘুরপাক খায়, আমাদেরকে এমন এক জনগোষ্ঠী শাসন করছে, যাদেরকে একসময় আমরা শাসন করেছিলাম। আমাদের এক শক্তিমান ও গৌরবময় অতীত আছে। আজ আমরা শাসক থেকে শাসিতে পরিণত হয়েছি। এসব কারণে রাশিয়ানরা খুবই অধিকার সচেতন থাকে।

অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ এস্তোনিয়ানরাও সবসময় তটস্থ থাকে, না জানি কোন কারণে রাশিয়ানরা আমাদের প্রতি রুষ্ট হয়ে পড়ে। রাশিয়ানরা ক্ষেপে গেলে বড়সড় সমস্যা দেখা দেয়। স্থানীয় রাশিয়ানদের বাঁচানোর নাম করে রাশিয়া হস্তক্ষেপ করে বসে। এস্তোনিয়া স্বাধীন হওয়ার সময় থেকেই ক্রেমলিন (রাশিয়ার সংসদ) এস্তোনিয়ার প্রতি মহাখাপ্পা হয়ে আছে। সবসময় ছুতো খোঁজার তালে থাকে। এস্তোনিয়া নিজেকে ফ্রি ওয়ার্ল্ড-এর সাথে দেখতে চায়। রাশিয়ার নাগপাশ থেকে পুরোপুরি মুক্তি চায়। রাশিয়া চায় এস্তোনিয়াসহ আরো দেশগুলোকে নিজের বলয়ে বেঁধে রাখতে। রাশিয়া যেকোনো মূল্যে দেশগুলোকে আমেরিকা, ন্যাটো ও ইউরোপের মোহ থেকে দূরে রাখতে চায়। রাশিয়ার শত চাপ সত্ত্বেও এস্তোনিয়া ন্যাটোর সদস্যপদ লাভ করেছে। আমেরিকার সাথেও দোস্তি পাতিয়েছে।

এখন এস্তোনিয়ায় বসবাসরত রাশিয়ানরাই হলো রাশিয়ার প্রধান অস্ত্র। ক্রিমিয়া ও ইউক্রেনে থাকা রাশিয়ানদের জীবন বিপন্ন—রাশিয়া এই ছুতো ধরেই ক্রিমিয়া ও ইউক্রেনে হামলা চালিয়েছে। লাটভিয়া, এস্তোনিয়া ও লিথুনিয়ার ব্যাপারেও ক্রেমলিনে অনেকটা এমনই ভাবনা বিরাজ করে। ক্রেমলিনের মনোভাব যাই হোক, এস্তোনিয়াতে বসবাসরত রাশিয়া ও এস্তোনিয়ান বেশির ভাগই নির্বিরোধী আর শান্তিবাদী। শুধু তাই নয়, পুরো ইউরোপ জুড়ে এস্তোনিয়ানদের সম্পর্কে এ কথা চাউর হয়ে আছে—তারা বেশ অলস আর বিরক্তিকর। তাদের নিয়ে নানা চুটকি ও কৌতুক ইউরোপ জুড়ে মুখে মুখে ফেরে। একটা কৌতুক এমন, একজন ইউরোপিয়ান বেড়াতে গেছে এস্তোনিয়াতে। এক স্থানীয় বাসিন্দা ঘরের কাজ করছে। পর্যটক জানতে চাইল :

এস্তোনিয়ান ভাই কী করছ?
দেখছ না ঘর বানাচ্ছি।

তা ঘরে কয়টা কক্ষ থাকবে?
কেন, একটা?

স্রেফ এক কামরা? কী বলছ তুমি?
কেন ভাই, এক কামরার চেয়েও কম বানানো সম্ভব?

এস্তোনিয়ানরা এমনি সহজ-সরল। তারা অসামাজিক, অমিশুক, আবেগশূন্য ও বিরক্তিকর রোবোটিক। এরা কাজ ছাড়া আর কিছু বোঝে না। এ কারণেই

তারা টেক-ফ্রেন্ডলি হতে পেরেছে। ২৬ এপ্রিল, ২০০৭ সালে রাতের বেলা এস্তোনিয়ার রাজধানী তাল্লিন আচানক বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছিল। হাজার হাজার তরুণ রাস্তায় নেমে এসে ভাঙচুর শুরু করে দিয়েছিল। চারিদিকে জ্বালাও-পোড়াও আর লুঠতরাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। অনেকে নিজ দেশের পতাকা জ্বালিয়ে দিচ্ছিল। পুলিশ চেষ্টা করেও দাঙ্গা-হাঙ্গামা থামাতে পারছিল না। টানা তিন দিন চলল এই নৈরাজ্য। প্রায় ১০০০ বিক্ষোভকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। একজন মারা গিয়েছে, কয়েক ডজন আহত হয়েছে। সবার মুখে একটাই স্লোগান ছিল : রুশিয়া! রুশিয়া! রুশিয়া!

এই বিক্ষোভকারীরা ছিল এস্তোনিয়ায় বাস করা রাশিয়ান। এস্তোনিয়ার পরিস্থিতি এমন অশান্ত ও উত্তাল হয়ে ওঠা ইউরোপ তো বটেই, বাকি বিশ্বের জন্যও বিস্ময়ের ছিল। রাশিয়ানদের উত্তেজিত হওয়ার একটা কারণ ছিল। রাজধানী তাল্লিনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার একটি ভাস্কর্য ছিল। এই ভাস্কর্যকে ব্রোঞ্জ সোলজার বলা হতো। এই মূর্তিটি স্থাপন করেছিল রাশিয়ানরা, যখন এস্তোনিয়া তাদের দখলে ছিল। জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধজয়ের স্মৃতিস্মারক হিসেবে এই মূর্তি স্থাপিত হয়েছিল।

এস্তোনিয়ায় বাস করা রাশিয়ানদের কাছে এই মূর্তি ছিল শক্তি, শৌর্য, দাপট আর প্রভুত্বের প্রতীক। তারা এই ভাস্কর্যের পাদদেশে নিয়মিত ফুল দিত, এটাকে মালা পরাত। অন্যদিকে এস্তোনিয়ানরা এই মূর্তিকে তাদের অবমাননাকর অতীতের নিকৃষ্ট নিদর্শন গণ্য করে এটার প্রতি চরম ঘৃণা পোষণ করত। দীর্ঘদিন আগে থেকে রাশিয়ানদের প্রতি এস্তোনিয়ানদের মনে সুপ্ত ঘৃণা ছিল। রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট পুতিন একবার গোটা ইউরোপ জুড়ে বসবাসরত রাশিয়ানদের অধিকার নিয়ে জোরদার কার্যক্রম শুরু করেছিল। পুতিনের দৌড়ঝাঁপের কারণে বিভিন্ন দেশের স্থানীয় বাসিন্দারা ফুঁসে উঠেছিল। স্থানীয় এস্তোনিয়ানরাও বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। ব্রোঞ্জ সোলজারের মূর্তিকে নানাভাবে লাঞ্ছিত করতে শুরু করেছিল। মূর্তির সামনে এস্তোনিয়ানরা বিক্ষোভ করতে শুরু করেছিল। তাদের দাবি মতে, রাশিয়ানরা মিথ্যা বিজয়ের ওপর ভিত্তি করে এই মূর্তি বসিয়েছে। এখানে রাশিয়ানরা জার্মানদের ওপর কোনো বিজয়ই হাসিল করেনি; বরং সত্য হলো, রাশিয়ানরা এই এলাকায় আসার আগেই জার্মানরা এই এলাকা ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

এস্তোনিয়ানদের এমন বিক্ষোভের প্রতিবাদে স্থানীয় রাশিয়ানরাও পাল্টা বিক্ষোভ শুরু করে দিয়েছিল। ব্রোঞ্জ মূর্তিকে তারা আরো বেশি সম্মান জানাতে

ফুলেল। আগের চেয়েও বেশি ফুলের মালা চড়াতে থাকল। রাশিয়ার পক্ষে শ্লোগান ও বক্তৃতা দিতে থাকল। রাশিয়ান আর্মির উর্দি পরে রাস্তায় ঘোরাফেরা করতে লাগল। মূর্তির সামনে ধরনা দিতে থাকল। উভয়পক্ষই চরমপন্থায় চলে গিয়েছিল। ছোট্ট দেশ এস্তোনিয়ার এমন উত্তাল অবস্থায় ক্রেমলিন নেপথ্য থেকে জোরেশোরে হাওয়া দিতে শুরু করল। দিনদিন অবস্থা এমন আকার ধারণ করায় আশঙ্কা দেখা দিলো যে, যেকোনো সময় উভয়পক্ষ মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়বে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আগেই এস্তোনিয়ান কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করল। মূর্তি আর সমাধিস্থ রুশ সেনাদের অস্থিগুলো সংরক্ষিত সামরিক সমাধিতে স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা নিল। এই ব্যবস্থা নিয়ে রাশিয়ানদের মধ্যে প্রথম প্রথম কোনো আপত্তি ছিল না। সমস্যা বাধিয়েছে এক ভুয়া সংবাদ। রাশিয়া বা যেকোনো দেশই যখন অন্য কোনো দেশের নাগরিকদের মধ্যে চরম বিভাজন সৃষ্টি করতে চায়, তখন মিথ্যা প্রপাগান্ডা চালাতে শুরু করে; সেই দেশের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়াতে শুরু করে। আমরা জানি ঘৃণা হলো আগুনের মতো। বিদ্যুৎ গতিতে ছড়িয়ে পড়ে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের এই কৌশল বেশ কাজ দেয়। রাশিয়ান কর্তৃপক্ষ মূর্তি ও অস্থি সরানোর সিদ্ধান্তকে বিকৃত করে জোরেশোরে প্রচার করল, এস্তোনিয়ার কর্তৃপক্ষ মূর্তিটাকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে; অথচ এই সংবাদ ছিল শতভাগ মিথ্যা। মিথ্যা সংবাদ ছড়ানোর উদ্দেশ্যই থাকে তাৎক্ষণিক ফায়েদা হাসিল করা। মিথ্যা সংবাদের সত্যতা প্রকাশ পেতে পেতে অনেক সময় দেরি হয়ে যায়। আর সত্য প্রকাশ পাওয়ার আগে আগেই আরেক নতুন মিথ্যা হাজির করে ফেলা হয়। চলতে থাকে মিথ্যার ধারা। মিথ্যা প্রচারের মাধ্যমে প্রাথমিক অবস্থায় কুচক্রীদের কোনো না কোনো ফায়েদা হাসিল হয়েই যায়।

এটা অনেক পুরোনো কৌশল। এক ঐতিহাসিক সত্য হলো, মিথ্যা প্রপাগান্ডা যত শক্তিশালীই হোক, সেটা এক প্রজন্মের বেশি টিকে থাকতে পারে না। রাশিয়ান লোকেরা সোশ্যাল মিডিয়াতে এস্তোনিয়ার বিরুদ্ধে এত বেশি মিথ্যা সংবাদ ছড়াল যে, প্রতিক্রিয়ায় স্থানীয় রাশিয়ান যুবকদের মধ্যে এস্তোনিয়ান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্রোধের দাবানল জ্বলে উঠল। রাশিয়ান যুবকদের বোঝানো হলো, যেসব সেনারা জীবনবাজি রেখে তাদেরকে বাঁচিয়েছে, তাদেরকে অসম্মান করা হচ্ছে। এজন্য এস্তোনিয়ার কর্তৃপক্ষ গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। রাশিয়ান যুবকরা সোশ্যাল মিডিয়াতে বিভিন্ন গ্রুপ তৈরি করল, তুমুল

প্রতিবাদ বিক্ষোভের পরিকল্পনা হলো, অস্ত্র-বোমার ব্যবস্থাও করা হলো। অত্যন্ত সুশৃঙ্খল কায়দায় ২৬ এপ্রিল রাতে হাজারো রাশিয়ান বংশোদ্ভূত যুবকরা গোটা তাল্লিনকে কুরুক্ষেত্র বানিয়ে ফেলল। টানা তিন দিন চলল এই নৈরাজ্য।

ঘটনা এখানেই থামল না। রাশিয়ান তরুণদের এই বিক্ষোভ তাৎক্ষণিকভাবে দানা বাঁধা স্বতঃস্ফূর্ত কোনো আন্দোলন ছিল না। এটা ছিল রাশিয়ার পক্ষ থেকে 'ফুলপ্লেজ হাইব্রিড ওয়ার'। শুধু তাল্লিনের রাস্তাঘাটই নয়, রাশিয়ান সাইবার গোয়েন্দারাও এস্তোনিয়ার নেটওয়ার্ক সিস্টেমকে হ্যাক করে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। উদাহরণত বলা যায়, এস্তোনিয়ার সংবাদ মাধ্যমগুলোর কমেন্ট বক্সে যেখানে দশ মিনিটে পঞ্চাশ থেকে একশ'টার মতো কমেন্ট আসত, সেখানে এখন দশ মিনিটে দশ হাজারেরও বেশি কমেন্ট আসতে লাগল। একই অবস্থা সরকারের বিভিন্ন ওয়েবসাইটেরও ছিল। ব্যাংকগুলোতে লেনদেন কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কারণ, ব্যাংকের ওয়েবসাইটগুলোতেও অনলাইন সেবা নেওয়ার জন্য আচানক এত বেশি ফেইক গ্রাহক এসে উপস্থিত হলো যে, ব্যাংকের নেটওয়ার্কে জ্যাম লেগে গেল। কারণ, একসাথে এত গ্রাহক সামলানোর ক্যাপাসিটি ওয়েবসাইটগুলোর ছিল না।

এখন এসব বিষয় সহজ মনে হলেও ২০০৭ সালে এ ধরনের সমস্যা সম্পূর্ণই নতুন ছিল। অন্য কোনো দেশ হলে দেশের সমস্ত ব্যাংকের একাউন্ট খালি হয়ে যেত; কিন্তু এস্তোনিয়াতে এমনটা ঘটার সুযোগ পেল না। এস্তোনিয়া ছিল টেকফ্রেন্ডলি (প্রযুক্তিবান্ধব) জাতি। কর্তৃপক্ষ বিষয়টা দ্রুত ধরে ফেলল। তারা বুঝতে পারল, খারাপ আবহাওয়ার কারণে নেটওয়ার্ক সিস্টেম জ্যাম হয়নি; এই সমস্যা মনুষ্যসৃষ্ট। এর প্রমাণ হলো, বিভিন্ন ওয়েবসাইটের কমেন্ট সেকশনে যেসব কমেন্ট পোস্ট করা হচ্ছিল, সেগুলো ঘুরেফিরে বিশ থেকে ত্রিশটা। এগুলোই বারবার কপি পেস্ট হচ্ছিল। এস্তোনিয়ান আইটি বিশেষজ্ঞরা অল্প সময়ের মধ্যেই ধরে ফেলল, এসব কমেন্ট কোনো মানুষ করছে না; প্রোগ্রামের সাহায্যে করে সাইটগুলোকে স্লো ডাউন করা হচ্ছে। রাশিয়ানদের উদ্দেশ্য ছিল, এস্তোনিয়ান ওয়েবসাইটগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে থাকলে কর্তৃপক্ষ রাশিয়ানদের মিথ্যা প্রচারণার জবাব জনগণের সামনে তুলে ধরতে পারবে না। বস্তুনিষ্ঠ তথ্য উপস্থাপন করতে পারবে না। রাশিয়ানদের জারিজুরি ফাঁস করতে পারবে না। রাশিয়ানরা মনের আনন্দে মিথ্যাচার করে এস্তোনীয় জাতিকে বিভ্রান্ত করতে পারবে।

পৃথিবীতে সবার আগে ইলেক্ট্রনিক ভোটিং সিস্টেম এস্তোনিয়ায় চালু হয়েছিল। স্কাইপে-ও এস্তোনিয়ান কোম্পানি। সবচেয়ে বেশি ইন্টারনেট লিংকড জাতিও এস্তোনিয়ানরা। এমন প্রযুক্তিবান্ধব জাতিও রাশিয়ান হামলার সামনে বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারল না; সবকিছু ভেঙে পড়ল। এস্তোনিয়ার সবকিছুই অনলাইননির্ভর ছিল। শপিং থেকে শুরু করে পড়াশোনা—সবই। যখন অনলাইন শপিং কাকে বলে—সেটা দুনিয়ার অনেক উন্নত দেশের নাগরিকও বুঝে উঠতে পারেনি, তখনো এস্তোনিয়ার পুরো বেচাকেনা অনলাইননির্ভর ছিল। খুব কম বিষয়ই অনলাইনের বাইরে ছিল। এস্তোনিয়া স্মরণকালের ভয়াবহ সাইবার অ্যাটাকের সামনে রীতিমতো অসহায়ের মতো হয়ে গেল। এটাকে দুনিয়ার সবচেয়ে ভয়াবহ সাইবার অ্যাটাকও বলা যেতে পারে। এটাকে 'ডিস্ট্রিবিউটেড ডিনাইয়াল অব সার্ভিস' সংক্ষেপে ডিডিওএস (DDOS) অ্যাটাক আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

রাশিয়ান হ্যাকাররা করেছিল কী? গোটা দুনিয়ার হাজারো কম্পিউটার হ্যাক করে সবগুলোর কর্মগতি একসাথে এস্তোনিয়ার দিকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। কম্পিউটারগুলো এস্তোনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ওয়েবসাইটগুলোকে একসাথে হিট করে যাচ্ছিল। বড় দোকানগুলোতে বা বড় ব্যাংকগুলোর ওয়েবসাইটে একসাথে আবেদন সাবমিট করছিল। এসব ওয়েবসাইট একসাথে বড়জোড় এক-দেড় শ কাস্টমার সামলাতে পারে; কিন্তু একসাথে পঞ্চাশ হাজার আবেদন জমা পড়লে কী অবস্থা দাঁড়াবে? একটা চিত্র কল্পনা করে দেখি। এক দোকানে ক্রেতাদের ভিড় গিজগিজ করছে। দোকানদার বাধ্য হয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। ভেতরে থাকা ক্রেতারা কাজ সেরে বের হলে নতুন ক্রেতা ঢুকতে দিবেন। সমস্যা হলো, ভেতরের ক্রেতারাও বেরোচ্ছে না ওদিকে বাইরে অপেক্ষমাণ বিপুল ক্রেতারাও দরজায় ক্রমাগত দমাদম কিল-ঘুষি মেরে যাচ্ছিল। এমন পরিস্থিতিতে দোকানদারের অবস্থা কেমন দাঁড়াবে? দোকানের নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা ভেঙে পড়বে না? বেচাকেনা বন্ধ হয়ে যাবে না?

ডিডিওএস অ্যাটাকে এমনকিছুই ঘটে থাকে। এই হামলায় কো-অর্ডিনেটেড প্রসেসের মাধ্যমে সবকিছুকে জ্যাম করে দেওয়া হয়। হামলাকারীদের কোনো পরিচয় ছিল না। তারা কোনো ইউনিফর্ম পরা ছিল না। তারা কোনো ট্যাংকের ওপরও ছিল না। প্রতিটি এস্তোনিয়ান হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিল, তাদেরকে বাকি দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে। তাদেরকে মূলত অবরুদ্ধ করে ফেলা হয়েছে। এটা ছিল আধুনিক অবরোধ। দুনিয়ার সবচেয়ে প্রযুক্তিদক্ষ জাতিকে কার্যত অচল করে দেওয়া হয়েছে। এস্তোনিয়ার প্রতিরক্ষা

মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানতোড় মেহনত চালিয়ে যাচ্ছিল এই অচলাবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য। তারা বুঝতে পারছিল না, ঠিক কী করতে হবে। তবে তারা ততক্ষণে বুঝে গিয়েছে, তাদের ওপর এই হামলা তাদের সবচেয়ে কাছের দেশ রাশিয়াই করেছে। সাইবার ফুটপ্রিন্টস এবং হ্যাকারদের রেখে যাওয়া আলামত যাচাই করে তারা এই সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছিল। রাশিয়ান হ্যাকারদের কিছু কমন বৈশিষ্ট্য ছিল, সেটাই তারা খুঁজে পেয়েছিল।

এস্তোনিয়ানরা এও বুঝতে পারছিল, তাদের যা করার খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে করতে হবে। নইলে তাদেরকে এভাবে সাইবার অন্ধ করে রেখে রাশিয়ানরা অকল্পনীয় কোনো জায়গায় হামলা করে আরো বেশি ক্ষতিসাধন করবে। কারণ, সাইবার অ্যাটাকে সাধারণত কোনো দেশের অনলাইন ট্রাফিক জ্যাম করে এমন কিছু করা হয়, যা একটিভ অনলাইন সিকিউরিটির মধ্যে সম্ভব হয় না। এস্তোনিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, সাইবার সিকিউরিটি টিম এক এক করে লো টেক, হাই ইমপেক্ট, হাই এক্সিকিউশন অ্যাটাককে রিপেল করতে শুরু করে দিয়েছিল। রাশিয়ান সাইবার হামলাগুলোকে পেছনের দিকে ঠেলাধাক্কা দিতে শুরু করল। এস্তোনিয়া সবার আগে ন্যাটোর সাথে যোগাযোগ করে সার্বিক পরিস্থিতি জানাল। এস্তোনিয়া ন্যাটোর সদস্য ছিল। ন্যাটো (নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অরগানাইজেশন) হলো ইউরোপের সম্মিলিত বাহিনী। আমেরিকার সাহায্য ও সমর্থনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে ন্যাটোর প্রধান লক্ষ্য, ইউরোপিয়ান দেশগুলোকে সম্ভাব্য রাশিয়ান হামলা থেকে সুরক্ষা দেওয়া।

এস্তোনিয়া ন্যাটোকে আরো জানাল, এখুনি কার্যকর ব্যবস্থা না নিলে অন্য দেশের ওপরও সাইবার অ্যাটাক হতে পারে। ন্যাটোর সাথে যোগাযোগ করার পর রাশিয়ান হামলা প্রতিরোধে এস্তোনিয়া কয়েকটা কাজ করল :

১. নিজেদেরকে বাকি দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিল। ইন্টারনেট বন্ধ করে দিলো। রাশিয়ান হ্যাকাররাও সম্ভবত এটাই চাচ্ছিল। যাতে এই নেটবিচ্ছিন্ন অন্ধকার পরিস্থিতিতে তারা তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারে।

মাঝেমধ্যে আমরা দেখি, যখন কোনো ওয়েবসাইটে প্রবেশ করতে গেলে জানতে চাওয়া হয়, আর ইউ হিউম্যান? (আপনি কি মানুষ?) এই প্রশ্নটা এজন্য করা হয় না যে, আমার উত্তর শুনে কম্পিউটার নিশ্চিত হয়ে যাবে—আমি মানুষ। প্রশ্নটা এজন্য করা হয়, কম্পিউটার চালনাকারী যদি মানুষ হয়

অথবা উত্তর দেওয়ার জন্য হয় কম্পিউটার টাচ করবে বা মাউস নাড়াচাড়া করবে কিংবা কিবোর্ডের মাধ্যমে জবাব দিবে।

কম্পিউটারটা যদি কোনো ভাইরাস বা প্রোগ্রাম কর্তৃক চালিত হয়, তাহলে জবাব দিবে ডিভাইসের ভেতর থেকে বা রেকর্ডের মাধ্যমে। এমন কিছু ঘটলে ওয়েবসাইট বুঝে যাবে, উত্তরদাতা কোনো মানুষ নয়। এর ফলে উত্তরদাতা সেই ওয়েবসাইট বা নেটওয়ার্কের ভেতরে প্রবেশ করতে পারবে না।

২. প্রতিটি আইপির জন্য কমেন্ট করার একটা সীমা, পরিমাণ ও সময় নির্ধারণ করে দিয়েছিল। এরপর থেকে একটি আইডি ইচ্ছামতো কমেন্ট করতে পারছিল না।

৩. সাইবার হামলাকারীরা সবাই রাশিয়ান ছিল। স্থানীয় এস্তোনিয়ান ভাষা তাদের জানা ছিল না। এস্তোনিয়ান কর্তৃপক্ষ প্রতিটি ওয়েবসাইটে কিছু পরীক্ষা দিয়ে রেখেছিল। ওয়েবসাইটের ড্যাশবোর্ডে কিছু ছবি যুক্ত করে দিয়েছিল। একটা বই বা গাড়ি অথবা উড়োজাহাজ কিংবা গাছের ছবি। নিচে এস্তোনিয়ান ভাষায় লিখে দেওয়া হয়েছে, উপরের ছবি থেকে গাড়িতে ক্লিক করুন। এস্তোনিয়ান ভাষা জানা না থাকলে কী ক্লিক করতে বলা হয়েছে—সেটা বোঝার কথা নয়। ২০০৭ সালের দিকে প্রযুক্তি এতটা উন্নত হয়নি যে, যেকোনো ভাষা মুহূর্তেই অনুবাদ করে ফেলা যায়।

এমনই কয়েকটা অতি সাধারণ কৌশল অবলম্বন করে এস্তোনিয়া রাশিয়ানদের ঠেকিয়ে দিয়েছিল।

দ্বিতীয় ধাপে এস্তোনিয়া তুমুল হৈচৈ করে সারাবিশ্বকে জানাতে শুরু করেছিল, তাদেরকে নাজেহাল করার পেছনে রাশিয়া দায়ী। রাশিয়া সরাসরি এই সাইবার অ্যাটাক করেছে। এস্তোনিয়া যখন রাশিয়ান সাইবার অ্যাটাক ঠেকাতে ব্যতিব্যস্ত তখন মস্কোতে এস্তোনিয়ান দূতাবাসকে রাশিয়ান বিক্ষোভকারীরা ঘেরাও করে রেখেছিল। রাশিয়ানরা বলছিল, তাল্লিনে রাশিয়ান সেনামূর্তিটাকে ধ্বংস করা হচ্ছে। এটা মানি না মানব না। রাশিয়ান পার্লামেন্টেও কয়েকদিন ধরে এস্তোনিয়া নিয়ে লাগাতার আলোচনা চলছিল। দাবি উঠছিল, এস্তোনিয়ার সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। অবরোধ আরোপ করতে হবে। এস্তোনিয়ান পণ্য বয়কট করতে হবে। এ ছাড়া রাশিয়ান হ্যাকাররা ক্রমাগত এস্তোনিয়ায় থাকা রাশিয়ান বংশোদ্ভূতদের উসকানি দিয়ে যাচ্ছিল।

ভবিষ্যতে যাতে এমন কোনো হামলার শিকার হতে না হয়, এজন্য এস্তোনিয়া আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিল। সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ডাটার ব্যাকআপ আলাদা একটি সার্ভারে রাখতে শুরু করেছিল। এই সার্ভার ছিল দেশের বাইরে। এস্তোনিয়া বন্ধুপ্রতীম দেশগুলোতে সাইবার এম্বেসি ও অনলাইন এম্বেসি বানিয়েছিল। সেখানেই ডাটাগুলো রাখা হয়েছিল।

এখন বাইরের কোনো দেশ যত শক্তিশালী সাইবার অ্যাটাকই করুক, এস্তোনিয়াকে কাবু করতে পারবে না। মূল সার্ভার আক্রান্ত হলে এস্তোনিয়া সেটা বন্ধ করে ব্যাকআপ সার্ভার চালু করে দিবে। ২০১৭ ও ২০১৮ সালে বিশ্বব্যাপী স্মরণকালের ভয়াবহ সাইবার অ্যাটাক হয়েছিল। এই হামলায় আমেরিকা ও ইউরোপ ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছিল; কিন্তু এস্তোনিয়ার গায়ে আঁচড়টিও লাগেনি। এস্তোনিয়া তার ছেলে-বুড়ো সবাইকে একটা সবক শিখিয়ে দিয়েছে, 'সাইবার হাইজিন।' এস্তোনিয়ার সবাই সাইবার হাইজিন সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। তাদের কথা হলো, কোনো সিস্টেমই আমাদেরকে শতভাগ সাইবার অ্যাটাক থেকে বাঁচাতে পারবে না। আমরা সবাই আত্মরক্ষা শিখে গেলে সুরক্ষিত থাকতে পারব।

সিপাহির মূর্তিটাকে সামরিক কবরস্তানে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। রাশিয়ানরা এখন সেখানে গিয়ে ফুলেল শ্রদ্ধা জানায়। মূর্তিটা সার্বক্ষণিক পুলিশি প্রহরায় থাকে।

১. প্রশান্ত মহাসাগরে চীনের সাথে আমেরিকার কী দ্বন্দ্ব?
২. এদিক দিয়ে মার্কিন রণতরী যাওয়ার সময় চায়নিজ নেভি কেন হুমকি দেয়?
৩. প্রশান্ত মহাসাগরকে ঘিরে বিশ্বের পরাশক্তিগুলো দিনদিন যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কেন?

প্যাসিফিক ওশন

প্যাসিফিক ওশন তথা প্রশান্ত মহাসাগর। দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ও সুন্দর মহাসাগর। এই সাগর দুনিয়াতে চলমান গ্রেট গেইমের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। বর্তমান বিশ্বের দুই পরাশক্তি চীন ও আমেরিকা এই মহাসাগরের ইজারাদারির জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। এই মহাসাগরের দখল নিয়ে যেকোনো মুহূর্তে

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ লেগে যেতে পারে। প্যাসিফিক ওশনে যুদ্ধ জয়ের জন্য আমেরিকার হাতে এমন এক অস্ত্র আছে, যা এই মুহূর্তে চীনের কাছে নেই। এ কারণে আমেরিকা চীনের চেয়ে কয়েক ইঞ্চি এগিয়ে আছে। চীনও সেই অস্ত্র বানানোর কাছাকাছি চলে গেছে। সেই অস্ত্রের নাম ব্লু-ওয়াটার নেভি।

যারা নদনদী ও সাগর যুদ্ধে দক্ষ, জলযুদ্ধে ব্যবহৃত অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র চালনায় দক্ষ, সেসব সেনাকে ব্রাউন ওয়াটার নেভি বলা হয়। যেসব সেনা সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে থেকে লড়াই করে দেশের নিরাপত্তা বিধান করে, তাদেরকে গ্রিন ওয়াটার নেভি বলা হয়। বিভিন্ন দেশের নৌবাহিনীও মূলত গ্রিন ওয়াটার নেভি। ব্রাউন ও গ্রিন ওয়াটার নেভির চেয়ে বহুগুণ বেশি শক্তিশালী, জটিল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত, বহুমুখী যোগ্যতার অধিকারী সেনাদলকে ব্লু ওয়াটার নেভি বলা হয়। যারা নিজ দেশের সমুদ্রসীমার বাইরে, এরাউন্ড দ্যা গ্লোব তথা বিশ্বজুড়ে যেকোনো জায়গায়, যেকোনো ধরনের সামরিক অভিযান পরিচালনায় অবিশ্বাস্য দক্ষতা রাখে। যেকোনো রাষ্ট্রই নিজের নৌবহরকে আন্তর্জাতিক পানিসীমা থেকে যেকোনো জায়গায় নিয়ে যেতে পারে; কিন্তু বিশ্বের যেকোনো স্থানে অতি দ্রুত সময়ে অভিযান পরিচালনা করতে হলে, শত্রুদেশের ওপর প্রতি আক্রমণ করতে হলে ব্লু-ওয়াটার নেভির বিকল্প নেই। শুধু তাই নয়, বিশ্বব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যপথে ও কৌশলগত অবস্থানগুলোতে সদাপ্রস্তুত হাজারো সেনা ও নৌবহর মোতায়েন রাখতে হয়। অর্থাৎ, বিশ্বের নানা প্রান্তে মিলিটারি বেস (সেনা ঘাঁটি) বানাতে হয়। এসব বেসের জন্য প্রয়োজন এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ও বিপুল অর্থকড়ি। যেখানে সেনাঘাঁটি হচ্ছে, তার মালিক দেশ বা পার্শ্ববর্তী দেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক রাখতে হয়, তাদের সাথে সামরিক চুক্তি করতে হয়। জমি লিজ নিতে হয়। নিয়মিত সামরিক ঘাঁটিকে 'আপগ্রেড' তথা উন্নত করতে হয়। এসবের জন্য বিপুল অঙ্কের বাজেট দরকার। দেশের অর্থনীতিও ভীষণ তাগড়া হতে হবে। রপ্তানি বাণিজ্যে প্রবল শক্তিধর হতে হবে। দেশের উৎপাদন শিল্পেও বহু বৈচিত্র্য থাকতে হয়। এ সবকিছু এখন পর্যন্ত একমাত্র আমেরিকার কাছেই আছে। ব্লু-ওয়াটার নেভি পোষার মতো এত বিপুল ব্যয় বহন করার শক্তি এখন পর্যন্ত শুধু আমেরিকারই আছে। চীন, ইন্ডিয়া, ইউকে, রাশিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি, সৌদি আরব, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া—এই ৯টি দেশের সম্মিলিত প্রতিরক্ষা বাজেটের চেয়ে আমেরিকার একার প্রতিরক্ষা বাজেট বেশি। ২০২২ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই দেশগুলোর সম্মিলিত বাজেট ছিল ৭৭৭

বিলিয়ন ডলার আর আমেরিকার একার বাজেট ছিল ৮০১ বিলিয়ন ডলার। তাও করোনার কারণে এই বাজেট কিছুটা সংকুচিত করা হয়েছিল। এই বাজেটের বিরাট একটি অংশ ব্লু-ওয়াটার নেভির পেছনে ব্যয় হয়। আমেরিকা এই নেভির বড় অংশকে চীন সমুদ্র উপকূলের কিছু দূরে মোতায়েন করে রেখেছে। চীনের চারিদিকে অসংখ্য মিলিটারি বেস স্থাপন করে রেখেছে। এসব বেসে ৮০ হাজারের মতো সেনা মোতায়েন করা হয়েছে। এমনকি ইরান ও উত্তর কোরিয়ার জলসীমার কিছু দূরেও মার্কিন সেনা মোতায়েন আছে। বর্তমানে বিশ্বের ৮০টি দেশে আমেরিকার ৭৫০টি মিলিটারি বেস আছে। এসব দেশে আমেরিকার অর্ধেকেরও বেশি সেনা মোতায়েন আছে। সবচেয়ে বেশি সেনা চীনের চারপাশে প্রশান্ত মহাসাগরে মোতায়েন আছে। এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যপথ বা সামরিক কৌশলগত গুরুত্বাবহ স্থান নেই, যেখানে মার্কিন সেনার উপস্থিতি নেই। বিশ্বের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গাতে হয় সরাসরি মার্কিন সেনার উপস্থিতি আছে, নয়তো কোনো না-কোনোভাবে মার্কিন সেনাদের নাগালে আছে। বিশ্বের ১৫৯টি দেশে প্রায় ১,৭৩,০০০ মার্কিন সেনা মোতায়েন আছে।

জাপানে ১২০ বেসে ৫৩,৭১৩ সেনা মোতায়েন আছে। দক্ষিণ কোরিয়াতে ৭৩ বেসে ২৬,৪১৪ সেনা মোতায়েন আছে। অস্ট্রেলিয়াতে ৭ বেসে ১,০৮৫ সেনা মোতায়েন আছে। কুয়েতে ১০ বেসে ২,১৬৯ সেনা, সৌদিতে ১০ বেসে ৩৮১ সেনা মোতায়েন আছে। এভাবে বিশ্বের সব প্রান্তে আরো বহু দেশে মার্কিন সেনা মোতায়েন আছে। চীনের আশেপাশের কোনো কোনো দেশ আমেরিকার মূল ভূখণ্ড থেকে ১০ হাজার কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এসব দেশে সেনা উপস্থিতির কারণে আমেরিকা এখনো ব্লু-ওয়াটার নেভিতে বেতাজ বাদশাহ হিসেবেই ছিল, আছে।

এখন অবস্থা খুবই দ্রুতগতিতে বদলাচ্ছে। চীনও পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় বিভিন্ন স্থানে নিজস্ব বেস স্থাপন করতে শুরু করে দিয়েছে। চীন এই কাজ শুরু করেছে প্যাসিফিক ওশন থেকে। বিশেষ করে সাউথ চায়না সি-তে। জায়গাটা কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন, ব্রুনাই ও মালয়েশিয়ার মধ্যস্থিত বৃত্তাকার জায়গাতে। সাগরের এই জায়গা বিশ্ব আইন হিসেবে আন্তর্জাতিক জলসীমার অন্তর্ভুক্ত। এসব জায়গা কোনো দেশের নিজস্ব অংশ হয় না। নির্দিষ্ট কোনো দেশের এক্সক্লুসিভ ইকোনোমিক জোন (ইইজেড) হয় না।

এক্সক্লুসিভ ইকোনোমিক জোন মানে হলো, জাতিসংঘের সমুদ্র আইন মোতাবেক, কোনো দেশের মূল ভূখণ্ড থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল (প্রায় ৩৭০ কিমি) পর্যন্ত সে দেশের নিজস্ব এলাকা বলে বিবেচিত হয়। সেই দেশ এই এলাকায় নিজের ইচ্ছামতো মাছ ধরতে পারে, তেল-গ্যাস উত্তোলন করতে পারে। এখানে সেই দেশের আইন চলে। অন্য কোনো দেশের জাহাজ এ স্থান পাড়ি দিতে গেলে এই দেশের অনুমতি নিয়ে যেতে হবে। এক দেশের জেলেদের ধরে আরেক দেশ যে নিয়ে যায়, সেটা মূলত এই আইনের আওতায় করে থাকে।

২০০ নটিক্যাল মাইলের পর থেকে আন্তর্জাতিক পানিসীমা শুরু হয়ে যায়। এখানে চলে আন্তর্জাতিক আইন। সাউথ চায়না সি-তেও একই আইন চলবে, এটাই স্বতঃসিদ্ধ কথা। এই জায়গা দিয়ে মার্কিন এয়ারফোর্সের বিমান অতিক্রম করে আর নিচে থেকে ধমকি শুনতে হয়। এই সতর্কবার্তা আসে চায়নিজ সিকিউরিটির পক্ষ থেকে। চায়নিজ কর্তৃপক্ষ বলে : এখান থেকে এক্ষুনি চলে যাও। এই এলাকা থেকে দূরে থাকো। এটা সুবি রিফ। এটা চীনের স্বাধীন সার্বভৌম অঞ্চল। কোনো ভুল বোঝাবুঝি যাতে না হয়, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকো। আমেরিকার মতো প্রবল পরাক্রান্ত দেশের বিমান যদি এমন হুমকি-ধমকির সম্মুখীন হয়, ফিলিপাইনের মতো দেশগুলোর কী অবস্থা হবে? ফিলিপাইনের মতো দেশের জাহাজ দেখলে চায়নিজদের গলার স্বর আরো রূঢ় ও কর্কশ হয়ে যায়। এটা অনেকটা এমন, বড়লোকের গাড়ি দেখলে ট্রাফিক পুলিশ নরম-সরম ভাষায় কথা বলে আর গরিব বাইকওয়ালা দেখলে তার গলার স্বর আর মুখের ভাষা—দুটোই পুরোপুরি বদলে যায়।

চীনের চারপাশে অবস্থিত মার্কিন এয়ার বেসের কাজই তো চীনের ওপর নজর রাখা। নিয়মিতই তাদেরকে এই জায়গা অতিক্রম করতে হয়। এখান দিয়ে যাওয়া-আসা করতে হয়। চায়নিজদের এমন গা জোয়ারি হুমকি-ধমকিকে মার্কিন এয়ারক্রাফটগুলো থোরাই কেয়ার করে। চায়নিজদের ফাঁকা বুলির জবাব দেওয়ার জন্য মার্কিন পাইলটদের কাছেও একটি লিখিত শিট থাকে। সেটাতে প্রতিটি চায়নিজ হুমকির জবাব ধাপে ধাপে লিখিত থাকে। চীনের প্রথম বাক্যের জবাবে মার্কিন পাইলট তার কাছে থাকা শিটের প্রথম জবাব পড়ে। প্রথম জবাবে মার্কিন পাইলট বলে, এটা স্বাধীন, সার্বভৌম মার্কিন নেভাল এয়ারক্রাফট। আইনসঙ্গত সামরিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এই বিমান কোনো দেশের আকাশসীমা ব্যবহার করছে না। চায়নিজ কর্তৃপক্ষ এই

জবাব সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে দ্বিতীয়বার আগের চেয়েও কঠোর স্বরে সতর্কবার্তা উচ্চারণ করে। এর জবাবে মার্কিন পাইলট গৎবাঁধা দ্বিতীয় জবাব পড়ে শুনিয়ে দেয়। এভাবে চলতে থাকে।

এই সাউথ চায়না সি দুনিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। এখান দিয়ে প্রতি বছর ৫ট্রিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য হয়। ফারইস্ট এশিয়ার জন্য এই পথটা প্রায় জীবন-মৃত্যুর সমতুল্য। ভিয়েতনামের ৮৬%, ইন্দোনেশিয়ার ৮৫%, থাইল্যান্ডের ৭৪%, সিঙ্গাপুরের ৬৬%, মালয়েশিয়ার ৫৮%, দক্ষিণ কোরিয়ার ৪৭% ও চীনের ৪০% বাণিজ্য সাউথ চায়না সি দিয়ে হয়ে থাকে। দেখতে-শুনতে চীনের বাণিজ্য অন্য দেশের তুলনায় কম দেখালেও চীন এই রাস্তা দিয়ে যে লেনদেন করে, সেটা ডলারের হিসাবে বাকি দশ দেশের সম্মিলিত অঙ্কের চেয়েও পরিমাণে বেশি। সন-তারিখ দিয়ে নিশ্চিত করে বলতে গেলে ২০১৬ সালে এই পথ দিয়ে চীনের ১৪৭০ বিলিয়ন ডলারের পণ্য অতিক্রম করে গেছে। এখন বাণিজ্যের পরিমাণ আরো বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে আমেরিকা ২০১৬ সালে এই পথ দিয়ে মাত্র ২০৮ বিলিয়ন ডলার মূল্যের নিজস্ব পণ্য রপ্তানি করেছে। এই সাউথ চায়না সি দিয়ে পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ (৩৩%) বাণিজ্যিক জাহাজ আসা-যাওয়া করে।

সাউথ চায়না সিতে প্রায় ১৯০ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফুট প্রাকৃতিক গ্যাস এবং ১১ বিলিয়ন ব্যারেল তেল মজুদ আছে। এই সাগর দুনিয়ার সবচেয়ে লোভনীয় মাছ ধরার জায়গা। বিশ্বের ১২% মাছ সাউথ চায়না সি থেকে আহরিত হয়। যার হাতে সাউথ চায়না সির যতবেশি নিয়ন্ত্রণ থাকবে, তার কাছেই ফিশিং ইন্ডাস্ট্রির নেতৃত্ব থাকবে। সে-ই তেল-গ্যাস উত্তোলন করবে। দুনিয়ার সবচেয়ে ব্যস্ততম বাণিজ্য পথের নিয়ন্ত্রণও তার কাছে থাকবে। এসব কারণে সাউথ চায়না সি-কে একই সাথে গুরুত্বপূর্ণ ও বিপজ্জনক করে তুলেছে। যে জিনিস যত আকর্ষণীয় হয়, সে জিনিস ততটাই বিপজ্জনকও হয়। চীন করেছে কি, সমস্ত ঝুঁকির তোয়াক্কা না করেই সাউথ চায়না সি-কে এক্সক্লুসিভ ইকোনোমিক জোনই নয়, সরাসরি নিজের ভূখণ্ড ঘোষণা দিয়ে বসে আছে। এজন্য চীন তার ঐতিহাসিক ম্যাপের সাহায্যে সাউথ চায়না সির ম্যাপে ৯টা ড্যাশ চিহ্ন বসিয়েছে। এটাকে কূটনৈতিক ভাষায় 'নাইন চায়নিজ ড্যাশলাইন' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সাউথ চায়না সি দখল করার জন্য চীন এমনভাবে ৯টা সীমান্ত ড্যাশলাইন বসিয়েছে, এতে করে তাইওয়ান, ফিলিপাইন, ব্রুনাই, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও ভিয়েতনামের ইইজেডও বাকি থাকেনি। সাউথ

...পূর্ব দিকে ছোট ছোট অনেক দ্বীপ আছে। সেগুলোর নাম যথাক্রমে ...কুইল্যান্ডস, শোলস, স্যান্ডবারস ইত্যাদি। এ ধরনের দ্বীপের সংখ্যা হাজারের ...কাছি। এগুলোর কোনোটা এতটাই ছোট যে, কোনোরকমে শুধু একটা ...লোক দাঁড়াতে পারে।

...বোঝার সুবিধার্থে আমরা দ্বীপগুলোকে তিন ভাগে বিভক্ত করতে ...। স্প্যার্টলি দ্বীপপুঞ্জ, পার্সেল দ্বীপপুঞ্জ ও স্কারবোর্গ শোল দ্বীপপুঞ্জ। এসব ...দ্বীপপুঞ্জকে নিজস্ব অঞ্চল আখ্যা দেওয়ার মাধ্যমে চীন এসব দ্বীপপুঞ্জের ...পাশে ২০০ নটিক্যাল মাইলের এক্সক্লুসিভ ইকোনোমিক জোনের মালিক-...ক্তার বনে গিয়েছে। এর মাধ্যমে চীনের বর্তমান সীমান্ত সম্প্রসারিত হয়ে ...রো ১৭০০ থেকে ১৮০০ কিমি বৃদ্ধি পেয়েছে। চীনের এই দাবিকে ...আশপাশের দেশ, আমেরিকা ও জাতিসংঘ মানে না। গায়ের জোরে করা ...দাবি কি কখনো মেনে নেয়? জোর করে মানাতে হয়। চীন এই দাবি সবাইকে ...মানতে বাধ্য করার জন্য এক চতুর চাল চেলেছে। চীন এসব দ্বীপপুঞ্জকে ...সামরিক ঘাঁটিতে রূপান্তরিত করেছে; পুরো দুনিয়ার সামনে প্রকাশ্য ...দিবালোকে।

চীন করেছে কী, সাগরের অগভীর অংশ, যেখানে ডেডরিফ ছিল বা বালু ছিল, সেসব স্থানের অদূরে বড় বড় জাহাজ নোঙ্গর করেছে। জাহাজগুলো দিয়ে মূলত খননের কাজ করা হয়। পাইপের মাধ্যমে সাগরের গভীর অংশ থেকে ড্রিল করে কাদা, মাটি, বালু, পাথর, প্রবাল এনে ফেলা হয় সাগরের অগভীর অংশে। এভাবে ফেলতে ফেলতে একসময় জায়গাটা ভরাট হয়ে আসে। ২০১৪ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত চীনের হাজারো জাহাজ একটানা এই কাজ করে গেছে। ২০১৫ সালের মে নাগাদ সাউথ চায়না সির গুরুত্বপূর্ণ অংশ স্প্র্যাটলি দ্বীপপুঞ্জে বেশ কিছু কৃত্রিম দ্বীপ সৃষ্টি করেছে। এসব কৃত্রিম দ্বীপপুঞ্জে স্থাপিত সামরিক ঘাঁটিগুলো মার্কিন ঘাঁটিগুলোর চেয়ে বহুগুণ মজবুত আর টেকসই। এসব কৃত্রিম দ্বীপ অনেকটা স্থলভূমির মতো হয়ে গেছে। মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলো মূলত নৌবহরের মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়। এগুলোকে বোমা হামলার মাধ্যমে ধ্বংস করে ফেলা সম্ভব; কিন্তু চায়নিজ ঘাঁটিগুলো তো ভাসমান নৌবহর নয়, সরাসরি স্থলভূমিতে স্থাপিত ঘাঁটি। এগুলোকে ডুবিয়ে দেওয়া প্রায় অসম্ভব। চীন প্রথমে সাগরের অগভীর অংশে মাটি-কাদা-বালু-পাথর ফেলে পা জমানোর জায়গা করে নেয়। দাঁড়ানোর জায়গা করার পর সেই কৃত্রিম দ্বীপকে ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত করতে থাকে। অনেক ছোট দ্বীপ

আজ বড় দ্বীপে পরিণত হয়েছে। আগে যেখানে দশজন মানুষ দাঁড়াতে পারত, এখন সেখানে অনায়াসে একদল সেনা অবস্থান করতে পারে। দ্বীপগুলো তৈরির প্রক্রিয়া এভাবে, চীন প্রথমে সাগরের একটি বৃত্তাকার বা লম্বালম্বি জায়গা চিহ্নিত করে। মধ্যখানে সাগর রেখে চার দিকে কাদা ফেলতে শুরু করে। বৃত্তের মাঝে অসংখ্য জাহাজ দিনরাত খনন করে চারিদিকে কাদাপাথর ফেলতে থাকে। একসময় দেখা যায়, মধ্যখানে গভীর সাগর, চারিদিকে দেয়াল উঠে গেছে। আপাতত নামকাওয়াস্তে দ্বীপ হয়ে গেছে। পরে মধ্যের অংশেও কাদামাটি ফেলে ভরাট করে ফেলা হয়। এসব কৃত্রিম দ্বীপে সবধরনের সামরিক সুবিধা ও স্থাপনা থাকে। যুদ্ধবিমান ওড়ার মতো রানওয়েসহ আরো বহু সুবিধা থাকে। এখানে রাডার, বিমানবিধ্বংসী ও জাহাজবিধ্বংসী মিসাইল মোতায়েন করা থাকে।

স্পার্টলি দ্বীপপুঞ্জ ফিলিপাইনের কাছেই অবস্থিত। এই দ্বীপপুঞ্জে চীনের উপস্থিতি ফিলিপাইনের জন্য ভীষণ ক্ষতিকর। আমেরিকা ফিলিপাইন ঘনিষ্ঠতম মিত্র হওয়া সত্ত্বেও চীনের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারেনি। চীন এমন কৌশলে কাজ করেছে যে, সেখানে আসলে কারো কিছু করার ছিল না। চীন বাহ্যত আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন না করেই এসব তৎপরতা চালিয়ে গিয়েছে। আমেরিকা বসে বসে আঙুল চুষেছে শুধু। স্পার্টলি আইল্যান্ডের ফিয়েরি ক্রস রিফেও চীন এমন দ্বীপ সৃষ্টি করেছে। ২০১৪ সালে এই রিফ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল। ২০১৭ সালে এসে সেই রিফ পুরোদস্তুর দুর্ভেদ্য চায়নিজ সমরঘাঁটিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

তেমনি আরেকটি জায়গার নাম মিসচিপ রিফ। এই জায়গাটাও ফিলিপাইনের সন্নিকটে। এই রিফকেও চীন ধীরে ধীরে দ্বীপে পরিণত করেছে। এভাবে স্পার্টলি আইল্যান্ড, পার্সেল ও স্কারবোর্গ দ্বীপপুঞ্জের বহু স্থানে কৃত্রিম দ্বীপ বানিয়ে নিয়েছে। এসব কৃত্রিম দ্বীপপুঞ্জ বানানো শেষ হওয়ার পর ২০১৫ সালে চীন ঘোষণা করে দিয়েছে, এই অঞ্চল দিয়ে কোনো জাহাজ বা বিমান অতিক্রম করার আগে চীনের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে।

চীন যা কিছু করছে—এর পরিকল্পনা বহু পুরোনো। চীন সবসময় দীর্ঘমেয়াদি খেলা খেলে। চীন যা করে—ধারাবাহিকভাবে তা করে যায়। ২০১৮ সালে চায়নিজ কমিউনিস্ট পার্টির ১৮তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তখন বিদায়ী প্রেসিডেন্ট হু জিন তাও অবসর নিচ্ছিলেন, বর্তমান প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং

ক্ষমতা গ্রহণ করছিলেন। বিদায়ী প্রেসিডেন্ট শেষ ভাষণে নিজের স্বপ্নের কথা বলেছিলেন, চীনকে গ্রেট মেরিটাইম পাওয়ার হতে হবে। সমুদ্রে পরাশক্তি হতে হবে। বর্তমান প্রেসিডেন্টও গ্রেট মেরিটাইম পাওয়ার হতে পারাকে নিজের স্বপ্ন বলে দাবি করে থাকেন। আমেরিকান পরিভাষা 'ব্লু-ওয়াটার নেভি' আর গ্রেট মেরিটাইম পাওয়ার একই জিনিস। চীন ঘোষণা দিয়েই সেদিকে অগ্রসর হচ্ছে। চায়নিজ ওয়ার্ল্ড অর্ডার বাস্তবায়নের জন্য ব্লু-ওয়াটার নেভির প্রয়োজন। এর মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে চীনের ভৌগলিক, ভূ-রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক স্বার্থ রক্ষিত হবে। বিশ্বের নানা প্রান্তে চীনের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।

ব্লু-ওয়াটার নেভির জন্য চীন কী কী করেছে—সেটা দেখা যাক। চীন দীর্ঘদিন ধরে জাপানের নিকটবর্তী সেনকাকু দ্বীপের মালিকানার দাবি উত্থাপন করে আসছে। সেখানে (ইস্ট চায়না সিতে) চীন নিজের শক্তি বৃদ্ধি করে চলছে। চীন অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এখানে শক্তির সমাহার ঘটাচ্ছে। ২০১৮ সালে মার্কিন এডমিরাল ফিলিপ সিনেটকে সতর্ক করে বলেছিল, চায়নিজ এয়ারফোর্স অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে শক্তিমান হয়ে উঠছে। তারা এই অঞ্চলে দিনদিন সম্মিলিত মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে ভীষণ হুমকি হয়ে উঠছে। এডমিরাল ফিলিপ পরবর্তীতে ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলের কমান্ডার নিযুক্ত হয়েছিলেন। এডমিরালের মতে, চায়নিজ বিমানগুলো প্রশিক্ষণমূলক উড্ডয়নের সময় ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় মার্কিন সামরিক ঘাঁটির একদম নাগের ডগায় এসে পড়ত। চায়নিজ বিমানগুলো যেন ধমকি দিয়ে বলছে, আমরা তোমাদের চেয়ে কম শক্তিধর নই।

মার্কিন জেনারেলরা সিনেটের ডিফেন্স কমিটির কাছে বারবার চিঠি লিখে সতর্ক করেছে, চীন সাউথ চায়না সির স্পার্টলি আইল্যান্ডে বিভিন্ন ধরনের অত্যাধুনিক রাডার সিস্টেমসহ উন্নতমানের সব নজরদারির যন্ত্রপাতি বসিয়েছে। সাইবার অ্যাটাক ও নিজেকে সুরক্ষিত রাখার পুরোপুরি বন্দোবস্ত করে রেখেছে। স্পার্টলি আইল্যান্ডে চীন এতটাই অগ্রসর হয়ে গেছে যে, এখন আমেরিকা কখনো সাউথ চায়না সিতে কোনো অভিযান পরিচালনা করতে চাইলে চীন তার নিজস্ব প্রযুক্তির সহায়তায় আগেভাগেই আমেরিকার সমস্ত পরিকল্পনার তথ্য জেনে ফেলবে। এমনকি চীনারা আমেরিকার যুদ্ধযানগুলোকে অকেজো করে দেওয়ার ক্ষমতাও অর্জন করে ফেলেছে।

চীনের এই কার্যক্রমকে এটু/এডি (A2/AD) বলা হয়। এর বিস্তারিত রূপ এন্টি একসেস এরিয়া ডিনায়াল। এর সারমর্ম হলো, আমেরিকা বা অন্য কোনো শক্তি যুদ্ধ করার জন্য চীনের কাছে আসার চেষ্টা করলে তাকে জানমালের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। সাউথ চায়না সি ও ইস্ট চায়না সি এই দুটি সাগরে চীন তার নিজস্ব গ্লোবাল অর্ডার বাস্তবায়নের জন্য যাবতীয় অবকাঠামো নির্মাণ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন করে ফেলেছে।

নিচে আছে ভারত মহাসাগর। বার্মা, শ্রীলঙ্কা পেরিয়ে পাকিস্তানের গোয়াদর বন্দর পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। এসব দেশে চীনের অত্যন্ত শক্তিশালী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ অবকাঠামো আছে। এগুলোকে চীন যখন-যেভাবে ইচ্ছা নেভাল বেস হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে। সংশ্লিষ্ট দেশের সাথে সেভাবেই কথাবার্তা বলে রেখেছে। পূর্ব আফ্রিকার ছোট্ট দেশ জিবুতিতেও চীন নেভাল বেস বানিয়েছে। জিবুতির অবস্থান সোমালিয়া ও ইরিত্রিয়ার মাঝে। অত্যন্ত ব্যস্ত বাণিজ্যপথ রেডসির একদম মুখেই এই নেভাল বেস। ২০১৭ সালে জিবুতিতে চায়নিজ সেনারা প্যারেড করে তাদের উপস্থিতির জানান দিয়েছে।

আফ্রিকার সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে পশ্চিম পাশেও নেভাল বেস স্থাপনের কাজ এগিয়ে নিয়েছে। তেলসমৃদ্ধ ছোট্ট দেশ ইকোটোরিয়াল গিনিতে চীন প্রবেশ করেছে। আমেরিকা-ইউরোপের পত্রপত্রিকা হাউমাউ করে এই সংবাদ ফলাও করে প্রচার করেছে। আমেরিকা এই সংবাদে ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়েছে। আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা বারবার আফ্রিকা সফরে যেতে শুরু করেছে। স্থানীয় শাসকদেরকে প্রকাশ্যেই চীনের সাথে সম্পর্ক গড়তে নিষেধ করছে। আমেরিকা মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে, আফ্রিকার দেশগুলো যেন কোনো অবস্থাতেই চীনের বাণিজ্য ফাঁদে পা না দেয়। মার্কিন ডেপুটি সিকিউরিটি এডভাইজার জন ফাইনার ছুটে গিয়েছিল ইকোটোরিয়াল গিনি ও অন্যান্য আফ্রিকান দেশগুলোর উদ্দেশ্যে। আমেরিকা নানা কৌশলে আফ্রিকান দেশগুলোকে নিরস্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। শুধু পরামর্শই নয়, হুমকিও দিয়েছে। পরিষ্কার করে বলেছে, চীনের সাথে অতিরিক্ত মাখামাখি আমেরিকার নিরাপত্তার জন্য হুমকি। এ কথা আফ্রিকাকে মনে রাখতে হবে। আমেরিকার এমন হুমকি সত্ত্বেও দিনদিন চীনের প্রভাব-প্রতিপত্তি গোটা আফ্রিকা জুড়ে বেড়েই চলছে।

সুদান, ইরিত্রিয়া, জিবুতি, কেনিয়া, তানজানিয়া, মাদাগাস্কার, মোজাম্বিক, দক্ষিণ আফ্রিকা, উত্তর আফ্রিকার নামিবিয়া, এঙ্গোলা, কঙ্গো, গ্যাবন,

ক্যামেরুন, নাইজেরিয়া, ট্যাঙ্গো, ঘানা, ইকোটোরিয়াল গিনি, আইভরি কোস্ট, সিয়েরা লিওন, কেপ ভার্দে ও মৌরিতানিয়া পর্যন্ত চীনের থাবা বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। চীন ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক গ্রেট গেইম জেতার পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। এটা অনেকটা কচ্ছপ ও খরগোশের গল্পের মতো।

এখানেই শেষ নয়। আফ্রিকা দখল শেষ করে চীন এখন আমেরিকার নাকের ডগায় ক্যারিবিয়ান দেশগুলোতেও নিজের সফট পাওয়ার দেখাতে শুরু করেছে। আমেরিকা যেভাবে চীনের প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে নানা চুক্তি করেছে, চীনও সেভাবে আমেরিকার বিভিন্ন প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথেও বাণিজ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক চুক্তি করতে শুরু করেছে। চীন এসব দেশে নিজস্ব অস্ত্র সরবরাহের মাধ্যমে চাঁদা দিচ্ছে। কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের নামে সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন করছে। চীন এরই মধ্যে ক্যারিবিয়ান দ্বীপদেশ জ্যামাইকাকে এই পর্যন্ত ২.১ বিলিয়ন ডলার ঋণ দিয়েছে। এই টাকা জ্যামাইকাতে অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজে ব্যবহৃত হবে। সড়ক, সেতু, সম্মেলন কেন্দ্র, হাউজিং, শিশু হাসপাতাল, পাবলিক অফিস, পররাষ্ট্র দপ্তর ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া চীনা কোম্পানি অতিরিক্ত আরো ৩ বিলিয়ন ডলার ঋণ জ্যামাইকাকে দিয়েছে। এই টাকা খনিজ সম্পদ উত্তোলন ও চিনি উৎপাদনের পেছনে ব্যয় করা হবে। ২০১৯ সালে জ্যামাইকার প্রধানমন্ত্রী চীন সফরে এসেছিলেন। বেইজিং তাকে অত্যন্ত শানদার সংবর্ধনা দিয়েছিল। মার্কিন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা জ্যামাইকাকে চীনের নাগপাশ থেকে দূরে রাখতে মরিয়া চেষ্টা চালিয়েছে। নানা দৌড়ঝাঁপ করেও আমেরিকা তেমন সাফল্যের মুখ দেখেনি। ২০১০ সালে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী মাইক পম্পেও জ্যামাইকাতে ধরনা দিয়েছিল। মিস্টার মাইক ইনিয়েবিনিয়ে জ্যামাইকাকে সতর্ক করার চেষ্টা করেছে যে, চীনের সহজ লোনের ফাঁদে পা দেওয়া ঠিক হচ্ছে না। আমেরিকার গায়ে পড়ে নাক গলানো চীনের মোটেও পছন্দ হয়নি। জ্যামাইকাতে অবস্থিত চীনা দূতাবাস কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছিল।

চীন এই পর্যন্ত সারাবিশ্বের ৬৩টি দেশের সমুদ্রবন্দরে বিনিয়োগ করেছে। মজার বিষয় হলো এর মধ্যে ২টি আমেরিকার বন্দরও শামিল আছে। এই দুটি বন্দর হয়তো সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারবে না, তবে গোয়েন্দা তৎপরতা তো চালাতে পারবে। চীন এভাবেই পুরো বিশ্বে তার জাল বিস্তার করে চলছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, আমেরিকা যদি বৃত্তের বাইরে গিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী কোনো কৌশল ফাঁদতে না পারে, তাহলে অচিরেই আমেরিকা



মাকড়সার জালে আটকা পড়া পোকার মতো চীনের অসহায় শিকারে পরিণত হবে। চীন এই পর্যন্ত যা করেছে, তাতে তার হারার কোনো সুদূরতম সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। চীন প্যাসিফিক ওশনে তার প্রতিবেশী দেশগুলোকে সতর্ক করতে শুরু করেছে, তারা যেন আমেরিকান গ্রেট গেইমে আমেরিকার গুটিতে পরিণত না হয়। চীনও এখন প্রকাশ্যে পেশীশক্তি দেখাতে শুরু করেছে।

আমেরিকা যখন ইরাক-আফগানিস্তানে ট্রিলিয়ন-ট্রিলিয়ন ডলার নষ্ট করছিল, চীন তখন নীরবে শাওজিয়াং (Shashou Jian) কৌশল খেলে চলছিল। এখন আমেরিকা সংবিৎ ফিরে পেয়েছে। প্যাসিফিক ওশনে চীনকে প্রতিরোধ করার জন্য আমেরিকা কোমর বেঁধে নেমেছে। আমেরিকা তার মিত্রদেরকে এটম বোমার চেয়েও শক্তিধর অস্ত্র সরবরাহ করতে শুরু করেছে। এই পর্যন্ত ৮টি দেশ আণবিক বোমার মালিক হয়েছে। এটম বোমা তো কোনো কোনো দেশে হাজারেরও বেশি আছে; কিন্তু ৫টি দেশ সম্পূর্ণ ভিন্ন এক অস্ত্রের মালিক। এই অস্ত্র প্রত্যেকের কাছে হাতেগোনা কয়েকটা করে আছে। সেটা কোন অস্ত্র? বর্তমানে গ্রেট গেইমের গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ স্থলে বা জলে নয়, মহাকাশে চলছে। স্পেস তথা মহাশূন্যে। সেখানে চীন-রুশ-আমেরিকা কীভাবে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়ছে, কীভাবে এক দেশ আরেক দেশকে কাবু করছে? বর্তমানে চলমান গ্রেট গেইম বুঝতে পারলে পুরো বিশ্বের রাজনৈতিক হাল-হাকিকত পরিষ্কারভাবে ধরা পড়বে।

স্পেসওয়ার–মহাকাশ যুদ্ধ

বর্তমানে চীন ও রুশ মহাশূন্যে আমেরিকার সুপার পাওয়ার অথরিটি শেষ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই দুই রাষ্ট্রের মোকাবেলায় আমেরিকা মহাশূন্য (স্পেস)-কে নিত্যনতুন অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে ভর্তি করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। ৫০-৬০ বছর আগে মহাশূন্যে আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বী শুধু রাশিয়াই ছিল। চীন কখনো এই ময়দানে অবতীর্ণ হবে বা হতে পারবে—এর দূরতম কল্পনাও ছিল না। তখন সোভিয়েত ইউনিয়নকে হেয় করার জন্য আমেরিকা ১৯৬২ সালের ৯ জুলাই ৪৫০ কিমি উপরে গোপনে আণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। এটাকে হাই অল্টিচিউড নিউক্লিয়ার এক্সপ্লোশন (High altitude nuclear explosion) বলা হতো। এটি ছিল আমেরিকার ধারাবাহিক

মহাকাশ কার্যক্রমের অংশ। এটাকে অপারেশন ফিশবৌল বলা হতো। সে কার্যক্রমে মহাকাশে ৫টি পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটানোর পরিকল্পনা ছিল। এই বিস্ফোরণের নাম দেওয়া হয়েছিল স্টারফিশ প্রাইম। এসব বিস্ফোরণের মাধ্যমে আমেরিকা নিজের আণবিক শক্তি যাচাই করতে চাচ্ছিল। ভবিষ্যতে সম্ভাব্য মহাকাশ যুদ্ধে হাতে থাকা সবচেয়ে বিপজ্জনক অস্ত্র আণবিক বোমা ব্যবহার যেতে পারে কি না—আমেরিকা এটা বুঝতে চাইছিল। আমেরিকা এটাও পরীক্ষা করতে চাচ্ছিল, তার স্যাটেলাইট বা স্পেস মিশনকে কখনো সোভিয়েত রাশিয়া কোনো আণবিক অস্ত্র ব্যবহার করে আক্রমণ করলে ক্ষয়ক্ষতি কেমন হবে, সে আক্রমণ কীভাবে প্রতিহত করা হবে। এসব উদ্দেশ্য সামনে রেখে প্যাসিফিক ওশানের প্রায় মাঝামাঝিতে অবস্থিত জনস্টন নামক ছোট্ট এক দ্বীপ থেকে ১৯৬২ সালে আমেরিকা অপারেশনটির সূচনা করেছিল। জনস্টন আইল্যান্ডটি আমেরিকার হাওয়াই দ্বীপ থেকে ১,৫১৩ কিমি দূরে অবস্থিত। এতদূর হওয়া সত্ত্বেও সেই আণবিক বিস্ফোরণ হাওয়াই দ্বীপের সমস্ত ইলেকট্রিক গ্রিড উড়িয়ে দিয়েছিল। অগণিত ইলেকট্রিক মেশিন জ্বলেপুড়ে গিয়েছিল। ওই পরীক্ষামূলক আণবিক বিস্ফোরণে আরেকটি অকল্পনীয় ক্ষতি হয়েছিল। এমন ক্ষতি যে হতে পারে—কারো কল্পনাতেও ছিল না। বিস্ফোরণের কারণে আমাদের পৃথিবীর চারপাশে এক রেডিয়েশন বেল্ট (তেজস্ক্রিয়তা বিকিরণ) সৃষ্টি হয়েছে। এই রেডিয়েশন বেল্ট বেশ কয়েকটি স্যাটেলাইট অকেজো করে দিয়েছিল। এগুলোর মধ্যে পৃথিবীর প্রথম টেলিকম স্যাটেলাইট ও একটি ব্রিটিশ সামরিক স্যাটেলাইটও ছিল। এই রেডিয়েশন বেল্ট দশকের পর দশক ধরে নানা সমস্যা সৃষ্টি গেছে। আজ থেকে ৬০ বছর আগে পৃথিবীতে আজকের মতো এত বেশি স্যাটেলাইটের অস্তিত্ব ছিল না। এজন্য তার ক্ষয়ক্ষতিও বেশি অনুভব করা যায়নি। স্পেসওয়ারের নোংরা অধ্যায় ৬২ বছর আগে আমেরিকাই শুরু করেছিল।

রাশিয়া পিছিয়ে থাকবে কেন। রাশিয়াও মহাশূন্যে একের পর এক আণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। আমেরিকাকে নিজের ক্ষমতা দেখিয়েছে। দুটি রাষ্ট্র একে অপরকে পেশিশক্তি দেখানোর জন্য আমাদের প্রিয় বিশ্বটাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, দেশ দুটির বিলিয়ন ডলার মূল্যের স্যাটেলাইট এবং স্পেস মিশনও এসব বিস্ফোরণের কারণে হুমকির সম্মুখীন ছিল। দেশ দুটি বেশি দেরি হওয়ার আগে সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন বোধ করল। তারা নিজেদের পাগলামো আচরণে লাগাম পরানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করল। বাস্তবিকই তারা এই কাজকে পাগলামো-ই বলেছিল। ডোনাল্ড ব্রেনান নামক এক আমেরিকান নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ এটাকে 'মিউচুয়াল এশিওরড ডেস্ট্রাকশন (MAD) নাম দিয়েছিল। আণবিক যুদ্ধ লেগে গেলে কেউ নিশ্চয়তা দিতে পারে না—কোন পক্ষ এই ধ্বংসাত্মক যুদ্ধে জিতবে। এ ব্যাপারে তো কোনো সন্দেহ নেই যে, এই যুদ্ধে সবারই ধ্বংস অনিবার্য। এটাকেই 'ম্যাড' বা সবার সম্মিলিত ধ্বংস নাম দেওয়া হয়েছিল। আমেরিকা ও রাশিয়া চুক্তি করার চেষ্টা করেছিল যে, তারা মহাশূন্যে বড় কোনো বিস্ফোরণ ঘটাবে না। আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো চুক্তি না হলেও অঘোষিতভাবে উভয়দেশই মহাশূন্যে আণবিক বিস্ফোরণ বন্ধ করে দিয়েছে। বিস্ফোরণ তো বন্ধ হয়েছে; কিন্তু দু দেশের কেউ কারো ওপর ভরসা করেনি। উভয় দেশই নিজেকে পরমাণু হামলা থেকে বাঁচাতে মাটির গভীরে বাংকার (নিউক্লিয়ার প্রুফ আন্ডারগ্রাউন্ড বাংকার) বানানো অব্যাহত রেখেছে। এসব বাংকারে একে অপরের ওপর আণবিক হামলা করা ও আণবিক হামলা থেকে বাঁচার যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা রাখা হয়েছে।

আমেরিকার নেব্রাস্কাতে অফোট (Offutt) এয়ারফোর্স বেস আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে লিটল বয় ও ফ্যাটম্যান নামক দুটি এটমবোমা নিক্ষেপকারী বিমান এই এয়ারবেসে নির্মিত হয়েছিল। এই বেসে মাটির নিচে তিনতলাবিশিষ্ট বিশাল স্থাপনা আছে। আমেরিকার ওপর আণবিক হামলা হলে মাটির নিচের এই বাংকার সুরক্ষিত থাকবে। এই বেসটি অনেক আগে বানানো হয়েছে। নতুন আণবিক বোমাগুলোর হামলা হয়তো এই স্থাপনা সামাল দিতে পারবে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই এই বাংকারটি বানানো হয়েছিল। বর্তমানে এখানেই আমেরিকার স্ট্র্যাটেজিক কমান্ড। এই কমান্ডের দায়িত্ব হলো, স্পেসওয়ার (মহাকাশ যুদ্ধ) লড়াই এবং মহাকাশে থাকা আমেরিকার স্পেস এসেট (মহাকাশ সম্পদ) রক্ষা করা।

পেন্টাগন আমেরিকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সদর দপ্তর। পেন্টাগনের মূলশক্তি বা প্রাণ হলো নেব্রাস্কায় অবস্থিত স্পেস সেন্টার। রুশ ও চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বেধে গেলে সেটা এই নেব্রাস্কা থেকেই সেটা পরিচালিত হবে। আমেরিকার যাবতীয় আণবিক অস্ত্রের নিয়ন্ত্রণকাঠি নেব্রাস্কাতেই স্থাপন করা আছে। ৯/১১ ঘটার পর একটি ছবিতে দেখা গেছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ আরো তিনজন ব্যক্তির সাথে একটা টেবিলে বসে সামনে রাখা মনিটরের দিকে হা করে তাকিয়ে আছে। স্ক্রিনে টুইন টাওয়ারসহ অন্যান্য স্থানে হামলার লাইভ

ভিডিও দেখা যাচ্ছিল। হামলার পরপরই মার্কিন প্রেসিডেন্টকে এখানে (নেব্রাস্কায়) মাটির নিচে সুরক্ষিত বাংকারে নিয়ে আসা হয়েছিল। এটাই আমেরিকার স্ট্র্যাটেজিক কমান্ড সেন্টার। এখানেই আমেরিকার অত্যাধুনিক সেনাবাহিনী তথা স্পেস আর্মির সদর দপ্তর। এই স্পেস আর্মি মূলত আমেরিকার এয়ারফোর্সের অংশ। তাদেরকে মহাকাশে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। এদেরকে ইউএস এয়ারফোর্সের স্পেস কমান্ড বলা হয়। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০১৮ সালে এই বাহিনীর অনুমোদন দিয়েছিল। এর আগে এই বাহিনী সরকারিভাবে অনুমোদিত ছিল না। অনুমোদন ছাড়াই এই বাহিনী মার্কিন আর্মির অংশ হিসেবে বিশ্বজুড়ে কাজ করে যাচ্ছিল। বিশ্বজুড়ে ৩০ হাজারেরও বেশি সদস্য বা কর্মচারী আছে। ৯ বিলিয়ন ডলারেরও অধিক তাদের বার্ষিক বাজেট ছিল। পুরো দুনিয়াতে এই বাহিনীর ৬টি বেসক্যাম্প আছে। ১৩৪টি গোপন স্থাপনা আছে। ট্রাম্প অনুমোদন দেওয়ার পর এই বাহিনী নিয়মিত আর্মির মতো হয়ে গিয়েছে। এতদিন কাগজে-কলমে এই বাহিনীর অস্তিত্ব ছিল না, শুধু কাজেকর্মে ছিল। এখনো এই বাহিনীর কার্যক্রম গোপনেই হয়ে থাকে। চীনের পত্রপত্রিকায় এই বাহিনী সম্পর্কে কিছু ছাপা হলে তখনই বিশ্ববাসী জানতে পারে। আমেরিকার পত্রপত্রিকায় চীনের গোপন সংবাদ ছাপা হলে যেভাবে বিশ্বাবাসী নতুন কিছু জানতে পারে।

আমেরিকা এখন আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়মিত বাহিনীর মতো স্পেস আর্মিকেও অস্ত্রসজ্জিত করে চলেছে। রাশিয়াও তার স্পেস আর্মিকে ঢেলে সাজাচ্ছে। রাশিয়ান স্পেস আর্মির সূচনা ২০১৫ সালের ১ আগস্টে হয়েছিল। বর্তমানে যেকোনো বড় এয়ারফোর্সেরই সাইবার ও স্পেস শাখা থাকে। চীনও তার সেনাবাহিনীর আধুনিকায়নের জন্য বিরাট এক প্রকল্প হাতে নিয়েছে। ২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর চায়নাও 'পিপলস লিবারেশন আর্মি স্ট্র্যাটেজিক সাপোর্ট' নামে স্পেস আর্মি গঠন করেছে। এই বাহিনীর কাজ হলো, বিভিন্ন আর্থ অরবিটে প্রদক্ষিণরত মহাকাশযান পরিচালনা করা, স্যাটেলাইট সুরক্ষিত রাখা, শত্রুর স্থাপনার ওপর নজর রাখা, হামলা প্রতিরোধ করা এবং পাল্টা হামলা করা।

প্রশ্ন হলো, এই তিন পরাশক্তিকে প্রতিপক্ষের কোন কোন ইনস্টলেশনের ওপর নজরদারি করতে হয়? এই প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য আমাদেরকে মহাশূন্যে যেতে হবে :

১. আমাদের ওপরে ১৬০ থেকে ২০০ কিমি পর্যন্ত স্পেসকে লো আর্থ অরবিট বলা হয়। সাধারণত এখানেই প্রায় সব দেশের বেশিরভাগ স্যাটেলাইট প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবীর ছবি তোলে। এসব ছবি থেকেই গুগলম্যাপ তৈরি হয়। বিভিন্ন জায়গা সার্ভে করা হয়। আবহাওয়া, সামুদ্রিক ঝড়, হারিকেন ইত্যাদির পূর্বাভাস জানার চেষ্টা করা হয়। কোনো ব্যক্তি বা কোম্পানির ওপর গোয়েন্দাগিরি বা নজরদারিও এখান থেকে করা হয়। এবোটাবাদে অবস্থানকালে শায়খ ওসামা বিন লাদেনের ওপর নজরদারিও এই অরবিট থেকে করা হয়েছিল। আসলেই তিনি কি না—এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য তার পেছনে স্পাইং স্যাটেলাইট তাক করা ছিল। এই অরবিটের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ স্যাটেলাইটের নাম হাবল টেলিস্কোপ। এটি ১৯৯০ সাল থেকে ৩২ বছর যাবত কাজ করে যাচ্ছে। এই স্যাটেলাইট বিলিয়ন মাইল দূরের ছবিও তুলতে পারে। মহাকাশ গবেষণায় বিজ্ঞানীদের অনেক বড় সহায়ক এই স্যাটেলাইট। আমাদের এই বিশ্বের বয়স কত, মহাবিশ্ব কেমন গতিতে সম্প্রসারিত হচ্ছে—এসব অবিস্মরণীয় তথ্য এই টেলিস্কোপের সাহায্যেই আবিষ্কৃত হয়েছে। ব্ল্যাকহোল, সুপারনোভাও এই টেলিস্কোপের সাহায্যে আবিষ্কৃত হয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনও এই অরবিটে অবস্থিত। সারাবিশ্বের মহাকাশ বিজ্ঞানীরা এখানে যৌথভাবে গবেষণা করে। এই গবেষণা কেন্দ্রের মালিকানা নির্দিষ্ট কোনো দেশের নয়। আমেরিকা, রাশিয়া, ইউরোপ, জাপান ও কানাডা মিলে এই স্টেশন পরিচালনা করে। এই স্টেশন শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়; স্পেসওয়ারের জন্য নয়। পৃথিবীকে ঘিরে যত স্পেস স্যাটেলাইট ঘুরছে, তার বড় একটি অংশ প্রায় ৬৩% লো আর্থ অরবিটে থাকে। সুনির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, ১৯৫০ থেকে আজ পর্যন্ত ৮ হাজারের কিছু বেশি স্যাটেলাইট মহাকাশে প্রেরণ করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে এখন পর্যন্ত কর্মক্ষম আছে ৪,৮৫২টি। অর্থাৎ, বড়জোর ৫ হাজার বলা যেতে পারে। এগুলোর মধ্যে ৪,০৭৮ লো আর্থ অরবিটে প্রদক্ষিণ করছে।

২. মিডিয়াম আর্থ অরবিট। পৃথিবী থেকে ২,০০০ কিমি উপর পর্যন্ত উচ্চতার স্পেসকে মিডিয়াম আর্থ অরবিট বলা হয়। এই অরবিটে মাত্র ১৪১টি স্যাটেলাইট কাজ করে; যা মোট স্যাটেলাইটের ৬%। এই অরবিট বিশ্বের সবার জন্যই অত্যন্ত মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অত্যন্ত মূল্যবান স্যাটেলাইটগুলো এখানেই প্রদক্ষিণ করে।

আধুনিক সিস্টেমকে শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য এই স্যাটেলাইট সিস্টেম অপরিহার্য। মডার্ন টেকনোলজির জন্য এই স্যাটেলাইটগুলো অক্সিজেনের ভূমিকা পালন করে। এগুলো না থাকলে আধুনিক অনেক কিছু অচল হয়ে পড়বে। অর্থাৎ, এগুলোই জিপিএস ও গ্লোনাস স্যাটেলাইট। জিপিএস অর্থাৎ গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেমের নাম তো সবাই শুনেছি। এটা মূলত মার্কিন মিলিটারি স্যাটেলাইটের একটি কনস্টেলেশন। এই কনস্টেলেশনে ৩০টির মতো স্যাটেলাইট আছে। সবসময় ২২ থেকে ২৪টি স্যাটেলাইট সক্রিয় থাকে। এই স্যাটেলাইটগুলো এক নেটওয়ার্কের মতো কাজ করে। মিলিসেকেন্ড সময়ের হিসাবও ঠিকঠিক বলে দেয়। দুনিয়ার প্রতিটি মিটারের নির্ভুল অবস্থান বলে দেয়। আমরা বর্তমানে অন্যকে হোয়াটসঅ্যাপ বা অন্য কোনো মাধ্যমে যে লোকেশন পাঠাই, সেটার যথাযথ অবস্থান এখানকার স্যাটেলাইটগুলোই নির্ণয় করে দেয়। এই স্যাটেলাইটের লোকেশন নির্ণয়ে মাত্র কয়েক মিটার এদিক-সেদিক হতে পারে। স্যাটেলাইটসমূহের সম্মিলিত নেটওয়ার্ককে স্পেস সায়েন্সের পরিভাষায় কনস্টেলেশন বলা হয়। জিপিএস একটি স্যাটেলাইট কনস্টেলেশন। এটার সেবা সবার জন্য ফ্রি। মার্কিন এয়ার ফোর্সের ডেল্টা-৮ এই কনস্টেলেশনের দায়িত্বে আছে।

এই কনস্টেলেশনের মূল উদ্দেশ্য মানবসেবা নয়, পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে থাকা হাজারো মার্কিন বেসগুলোর নিরাপত্তার দিক দেখাই তার প্রধানতম কাজ। এটাই বিশ্বের একমাত্র মিলিটারি সেটেলাইট নেটওয়ার্ক, যেটা সিভিলিয়ানকেও সেবা প্রদান করে। আমরা যত স্যাটেলাইট ম্যাপ এবং অন্যান্য সেবা গ্রহণ করি, সবই আসে এই জিপিএস নেটওয়ার্ক থেকে। এই স্যাটেলাইটের কারণে আমরা দুনিয়ার যেকোনো প্রান্তেই নিশ্চিন্তে চলে যেতে পারি। হারিয়ে যাওয়ার কোনো আশঙ্কাই থাকে না। নেট কানেকশন থাকলে ভালো; না থাকলেও স্যাটেলাইট থেকে ম্যাপ দেখা যায়। জিপিএসের মাধ্যমে আমরা বেছে নিতে পারি, কোন বাহনে গেলে আমার ভ্রমণে বেশি সুবিধা হবে। বাসে, ট্রেনে নাকি বিমানে? পায়ে হেঁটে নাকি সাইকেলে? জাহাজে নাকি নৌকায়? সমুদ্রে চলাচলকারী নৌযানসমূহও এর মাধ্যমে গভীর সমুদ্রে দিকনির্ণয় করতে পারে। আমেরিকার মতো রাশিয়ারও নিজস্ব একটি সিস্টেম আছে। সেটাকে গ্লোনাস (GLONASS) বলা হয়। এটাও আমেরিকান জিপিএস সিস্টেমের মতো সেবা প্রদান করে। বিশ্বব্যাপী রাশিয়ান মিলিটারির নিরাপত্তার দিকটা দেখে।

যারা একটু বেশি নির্ভুল তথ্য পেতে চায়, তারা জিপিএস সিস্টেমের পাশাপাশি গ্লোনাসেও একবার যাচাই করে নেয়। এতে করে ভুলের মাত্র কমে আসে। এই ছিল দুটি আর্থের কথা। এই দুটি আর্থের উপরে আরেকটি আরবিট আছে। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর জায়গা। এটাই পরাশক্তিগুলোর গ্রেট গেইমের প্রধানতম ক্ষেত্র।

৩. জিওস্টেশনারি (জিয়োসেন্ট্রেক) আর্থ অরবিট। এই অরবিটের অবস্থান ভূপৃষ্ঠ থেকে ৩৫,০০০ বা ৪০,০০০ কিমি উপরে। এখানে যে স্যাটেলাইট থাকে, সেগুলো পৃথিবীর চারপাশে একবার চক্কর দিতে ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেন্ড সময় নেয়। পৃথিবীও একবার তার অক্ষ ঘুরে আসতে ঠিক এতটা সময় নেয়। এই স্যাটেলাইটগুলো এক জায়গায় স্থির থাকে। বাড়ির ছাদে ডিশ এন্টেনা দেখি। এই এন্টেনায় নির্দিষ্ট কোনো জায়গায়, নির্দিষ্ট কোনো দিকে, বিশেষ কোনো চ্যানেলের সিগনাল পাওয়া যায়। আমরা সেই চ্যানেল ধরতে চাইলে, এন্টেনাকে সেদিকে স্থির তাক করে রাখি। এন্টেনা সামান্য এদিক-ওদিক হলেই সিগনাল পাওয়া যায় না। এন্টেনাকে ঘুরিয়ে আমরা মূলত জিয়োস্টেশনারি অরবিটে থাকা স্যাটেলাইটের সাথে এডজাস্ট করি। সেখান থেকে কাঙ্ক্ষিত চ্যানেলটি সম্প্রচারিত হচ্ছে। একবার এন্টেনা নির্দিষ্ট স্যাটেলাইটের সাথে ফিক্স হয়ে গেলে সবসময় চ্যানেলটা দেখতে পারি। কারণ, সেই ট্রান্সমিশন স্যাটেলাইটের পজিশন কখনো পরিবর্তন হয় না। সবসময় একই ডিরেকশনে থাকে। এই হাই আর্থ অরবিটেই টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানির স্যাটেলাইট, টিভি চ্যানেলের স্যাটেলাইট, রেডিও স্টেশনের স্যাটেলাইট, গোপন যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত স্যাটেলাইটগুলো প্রদক্ষিণ করে। এই অরবিটে আমেরিকার বলতে গেলে একচ্ছত্র আধিপত্য ও মনোপলি। এখানে আমেরিকার সেইসব স্যাটেলাইট থাকে, যেগুলো তাকে যেকোনো হামলার আগেই সতর্কবার্তা পাঠায়। এখানকার স্যাটেলাইটের মাধ্যমেই মার্কিন প্রেসিডেন্টের ফোনলাইন, গোপন সামরিক বার্তা, কূটনৈতিক তথ্য আদান-প্রদান ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এসব কারণেই এই অরবিটে গ্রেট গেইমের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ে।

নিজের স্পেস এসেট (মহাকাশ সম্পদ) রক্ষা করা প্রতিটি রাষ্ট্রের জন্যই খুবই জরুরি। এ কারণেই চীন, রাশিয়া, আমেরিকা নিজেদের স্পেস অ্যাসেটস হেফাজত করার জন্য নিজস্ব স্পেস আর্মি ইতিমধ্যেই গঠন করে ফেলেছে। চীন ও রাশিয়ার তুলনায় আমেরিকায় তথ্য অনেক বেশি উন্মুক্ত। অনেক

সহজেই বইপত্র ও নেট থেকে আমেরিকার তথ্য সংগ্রহ করা যায়। এই তিন দেশ কীভাবে নিজেদের স্পেস অ্যাসেটস রক্ষা করে, কোন এসেটকে কীভাবে ব্যবহার করে, এটা আমেরিকাকে দিয়ে বোঝার চেষ্টা করব। বাকি দুই দেশও বেশ আর কম এমন কিছুই করে থাকে।

ভূপৃষ্ঠ থেকে সবচেয়ে উপরে জিওস্টেশনারি অরবিটে থাকা মার্কিন স্পেস অ্যাসেটসকে দেখাশোনা ও পরিচালনা করা হয় নেব্রাস্কা স্ট্র্যাটেজিক সেন্টার থেকে। এখানে আমেরিকার চারটা স্যাটেলাইট কাজ করে। এগুলোই আমেরিকাকে যেকোনো বিপদে আগাম সতর্কবার্তা দেয়। যেকোনো আণবিক বা মিসাইল হামলার আগেই আমেরিকা এসব স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সংবাদ পেয়ে যায়। পুরো মার্কিন নিরাপত্তা এই চারটির স্যাটেলাইটের ওপর নির্ভরশীল। প্রায় ২২,০০০ মাইল উপরে থাকা স্যাটেলাইটগুলোর কোনো একটিও খোয়া গেলে বা অকেজো হয়ে পড়লে আমেরিকা অনেকটা কানা হয়ে যাবে। পৃথিবীর এক চতুর্থাংশ জায়গা আমেরিকার কবজার বাইরে চলে যাবে। এই স্যাটেলাইট সিস্টেম পুরোদমে সক্রিয় থাকাবস্থায় পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকেই আমেরিকার দিকে ইন্টারকন্টিনেন্টাল মিসাইল ছোড়া হলে প্রতিক্রিয়ায় নেব্রাস্কা স্ট্র্যাটেজিক সেন্টারে একটা স্বয়ংক্রিয় সিস্টেম চালু হয়ে যায়। সে সিস্টেম আমেরিকার দিকে ধেয়ে আসা মিসাইলকে অকেজো করার জন্য পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করে অথবা জবাবি হামলা করে। আমেরিকার স্ট্র্যাটেজিক সেন্টারে পৃথিবীর সমস্ত টাইমজোন হিসেবে ঘড়ি ঝোলানো আছে। ঘড়িগুলো এখন কোন শহরে কয়টা বাজছে—তার নিখুঁত সময় দেয়। ২৪ ঘণ্টায় একদিন হয়। পুরো পৃথিবীতে ২৪টা টাইমজোন আছে। এছাড়া আরো তিনটা ঘড়িও দেয়ালে ঝোলানো থাকে। এই ঘড়িগুলো মিসাইল হামলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটা ঘড়ি রেড ইম্প্যাক্ট, আরেকটা ব্লু ইম্প্যাক্ট এবং আরেকটাকে বলা যেতে পারে গ্রিন ইম্প্যাক্ট প্রকাশ করে। লাল ঘড়ি দেখায় আমেরিকা থেকে ছোঁড়া মিসাইল ঠিক কখন লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানবে। নীল ঘড়ি দেখায় আমেরিকার উদ্দেশ্যে ছোঁড়া মিসাইল ঠিক কখন এসে আমেরিকার ওপর আঘাত হানবে। সবুজ ঘড়িটা হলো সেফক্লক বা নিরাপদ ঘড়ি। এটা ব্যবহৃত হয় স্ট্র্যাটেজিক সেন্টারে কাজ করা কর্তকর্তাদের নিরাপত্তার কাজে। এই ঘড়িটা চলতে শুরু করতেই কর্মকর্তারা যত দ্রুত সম্ভব বাক্স-প্যাটরা গুছিয়ে মহাশূন্যে উড়াল দেয়। এই কাজটা সেন্টারের লোকেরা নিয়মিত করে থাকে। বিপদকালীন পরিস্থিতির মহড়া হিসেবে। মহাশূন্যে

উড়াল দেওয়ার কারণ হলো, ভূমি তখন শত্রুপক্ষের আক্রমণের কারণে অনিরাপদ হয়ে যায়। মহাশূন্যে বসেই পাল্টা আক্রমণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বা পেন্টাগন থেকে যে নির্দেশ আসে সেটা বাস্তবায়ন করা হয়।

আমেরিকার এতসব নিরাপত্তাব্যবস্থা, সতর্কতা ও সুরক্ষার আয়োজন সবই জিওস্টেশনারি (জিয়োসেন্ট্রেক) আর্থ অরবিট সুরক্ষিত ও সক্রিয় থাকার ওপর নির্ভরশীল। এই স্যাটেলাইটগুলোকে সুরক্ষিত রাখার জন্য আমেরিকাকে দিনরাত সতর্ক থাকতে হয়। অন্য কোনো দেশ যেন এই স্যাটেলাইটগুলোকে আঘাত করতে না পারে, এগুলো চলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে না পারে, সেজন্য আমেরিকা জীবনবাজি রেখে সক্রিয় থাকে। আমেরিকার এতসব সতর্কতা সত্ত্বেও চীন ও রাশিয়া এসব মার্কিন স্যাটেলাইটের ওপর আক্রমণ করার মতো সক্ষমতা অর্জন করে ফেলেছে। নিজের ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য চীন যেভাবে জলে-স্থলে আমেরিকার সামরিক স্থাপনার ঠিক কাছাকাছি নিজের (ইনস্টলেশন) স্থাপনাও নিয়ে আসে, এখন অন্তরীক্ষেও চীন তাই করছে। জিওস্টেশনারি অরবিটেও আমেরিকান স্যাটেলাইটের ঠিক কাছাকাছিতে চীনও নিজের স্যাটেলাইট স্থাপন করে রেখেছে। রাশিয়ার স্যাটেলাইট তো ছিলই। রাশিয়ান স্যাটেলাইটগুলো শুধু মার্কিন স্যাটেলাইটের আশেপাশেই যে ঘুরঘুর করে তাই নয়, প্রয়োজনে রাশিয়ান স্যাটেলাইটগুলো এক অরবিট থেকে আরেক অরবিটেও স্থানান্তরিত হতে পারে। এটা অনেক উচ্চ দক্ষতা আর নৈপুণ্যের কাজ।

রাশিয়া ও চায়না নাকের ডগায় থাকার কারণে আমেরিকা আগের মতো নিজের অতি গোপন ম্যাসেজ ও পরিকল্পনাগুলো গোপনে করতে পারে না। রাশিয়া ও চায়না সেখানেও আমেরিকার নিরাপত্তাকে তুমুলভাবে বিঘ্নিত করে চলেছে। জিওস্টেশনারি অরবিটে থাকা মার্কিন স্যাটেলাইটগুলো যেসব অতি গোপন বার্তা ও টেলিফোন কল আদান-প্রদান করে, সেগুলো রাশিয়ান ও চায়নিজ স্যাটেলাইট ইন্টারসেপ্ট করে ফেলে। যেসব সাংকেতিক বার্তা দুনিয়ার কেউই উদ্ধার (ডিকোড) করতে পারে না, রাশিয়া ও চায়নার এক্সপার্টরা অনায়াসেই মার্কিন বার্তাগুলো ডিকোড করে ফেলে। মার্কিন স্যাটেলাইট কর্তৃপক্ষ এখন আর আগের মতো শতভাগ নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারে না। অন্যদিকে আমেরিকাও একই কাজ করে। তারাও রাশিয়া ও চীনের অতিগোপন দুর্বোধ্য বার্তা চুরি করে। এজন্য তারা লো-আর্থ অরবিট

থেকে শুরু করে হাই-আর্থ অরবিট পর্যন্ত গোয়েন্দা স্যাটেলাইট ছড়িয়ে রেখেছে।

মহাকাশে সবার আগে আমেরিকারই ইজারাদারি ছিল। তারাই মহাকাশের অবিসংবাদিত শক্তি ছিল। শক্তি ও প্রযুক্তির দিক থেকে চীন ও রাশিয়ার চেয়ে আমেরিকা বহুদূর এগিয়ে। চীন ও রাশিয়ার সামনে চ্যালেঞ্জ হলো, আমেরিকার সুপার পাওয়ারগিরি ঘুচিয়ে দেওয়া। আমেরিকার সামনে চ্যালেঞ্জ হলো, চীন ও রাশিয়াকে কাছে ঘেঁষতে না দেওয়া। উভয় দেশকে পিছিয়ে দেওয়া। হাত-পা ভেঙে ল্যাংড়া বানিয়ে রাখা। হ্যাঁ, এই যুদ্ধে চীন ও রাশিয়ার হারানোর খুব বেশি কিছু নেই। তারা তো এমনিতেই পিছিয়ে আছে। যত হারানোর ভয় সবই আমেরিকার।

এখন এমন শক্তিশালী স্যাটেলাইট আবিষ্কৃত হয়েছে, যেটা প্রতিপক্ষের আস্ত স্যাটেলাইটকেই অপহরণ করে নিয়ে আসে অথবা বিপক্ষ স্যাটেলাইটের সমস্ত তথ্য চুরি করে ফেলে। ক্ষেত্রবিশেষে প্রতিপক্ষ স্যাটেলাইটকে অকেজো করে দেয়। স্যাটেলাইট চুরিতে রাশিয়া খুব দ্রুত হাত পাকিয়ে তুলছে। এ বিষয়ে রাশিয়ার প্রযুক্তিশক্তি দিনদিন বেড়েই চলছে। এ ধরনের স্যাটেলাইটকে কামিকাজি (Kamikaze) স্যাটেলাইট বলা হয়। ২০১৪ সাথে রাশিয়া এমন একটি স্যাটেলাইট ছেড়েছিল। বাহ্যিকভাবে দেখতে সেটা ছিল গোবেচারা আবহাওয়ার সংবাদ দানকারী স্যাটেলাইটের মতো। সাধারণত স্যাটেলাইটগুলো মহাকাশে পৌঁছার পর সেগুলোর বিভিন্ন অংশ আলাদা হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। স্যাটেলাইটের মূল অংশ নির্ভার হয়ে আপন কাজে লেগে পড়ে। রাশিয়ার ছোঁড়া স্যাটেলাইটও এমনিভাবে নিজের অতিরিক্ত অংশগুলো খসিয়ে মহাকাশে ঘুরতে শুরু করল।

মার্কিন এয়ারফোর্সের স্পেস ডিপার্টম্যান্টের একটি টিমের কাজ হলো, দিনরাত বিদেশি স্যাটেলাইটগুলোর দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখা। তারা চীন ও রাশিয়ার প্রতিটি স্যাটেলাইট, মহাকাশযান ও স্পেস স্টেশনগুলোকে সার্বক্ষণিকভাবে নজরদারিতে রাখে। শুধু মূল স্যাটেলাইটকেই নয়, স্যাটেলাইটগুলো থেকে পৃথক হওয়া টুকরাগুলোর দিকেও শ্যেনদৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। মার্কিন কর্মকর্তারা কয়েক সপ্তাহ পর অবাক হয়ে দেখল, রাশিয়ান কামিকাজি স্যাটেলাইট থেকে পৃথক হওয়া একটা টুকরা আচানক সক্রিয় হয়ে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াতে শুরু করল; অথচ এতদিন এটাকে অকেজো ও

রদ্দিমাল বলেই মনে হয়েছিল। মূল স্যাটেলাইট থেকে আলাদা হওয়া অংশগুলো মহাকাশের জঞ্জাল হিসেবে বিবেচিত হয়। সেই টুকরাটির জীবন্ত হয়ে ওঠা ছিল এক নাটকীয় মোড়। এ ধরনের ঘটনা ঘটে সাধারণত কামিকাজি স্যাটেলাইটের ক্ষেত্রে। রাশিয়ান স্যাটেলাইটটি দেখতে-শুনতে মোটেও কামিকাজি স্যাটেলাইটের মতো ছিল না। বাস্তবে সেটা কামিকাজি স্যাটেলাইটই ছিল। আমেরিকার চোখকে ফাঁকি দেওয়ার জন্যই রাশিয়ান কর্তৃপক্ষ সেই টুকরাটিকে 'স্পেস ডেব্রিস'-এর মতো নিষ্ক্রিয় করে রেখেছিল। কোনো স্যাটেলাইট ধ্বংস হওয়ার পর যেসব ধ্বংসাবশেষ মহাকাশে ঘুরে বেড়ায়, সেগুলোকে স্পেস ডেব্রিজ বা স্পেস জাংক বলা হয়। প্রতিটি স্যাটেলাইটেই কিছু অংশ এমন থাকে, যেগুলোর কাজ স্যাটেলাইটকে আকাশ পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে। এরপর সেসব অংশের আর কোনো কাজ থাকে না। মহাকাশে পৌঁছার পর অতিরিক্ত অংশগুলো মূল কাঠামো থেকে আলাদা হয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে। এগুলোকেও স্পেস ডেব্রিজ/স্পেস জাংক বলা হয়। ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে কর্মরত বিজ্ঞানীদের ফেলে দেওয়া জিনিসও স্পেস ডেব্রিজের অন্তর্ভুক্ত হয়। মহাকাশ জুড়ে এমন অসংখ্য ডেব্রিজ-জঞ্জাল ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিছু জঞ্জাল পরস্পরে ধাক্কা খেয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়, কিছু জ্বলে যায়। বহু ডেব্রিজ মহাকাশে থেকে যায়। বিভিন্ন অরবিটে ঘুরে বেড়াতে থাকে। মহাকাছে একটা অরবিটের নামই হয়ে গেছে 'গ্রেভইয়ার্ড অরবিট'।

রাশিয়ার সেই কামিকাজি স্যাটেলাইটের নাম ছিল কসমস ২৪৯৯। রাশিয়ার সেই কামিকাজি স্যাটেলাইটকে মার্কিন স্পেস মিশনের কর্মকর্তারা তৎক্ষণাৎ পাকড়াও করে ফেলেছিল। মার্কিন কর্মকর্তারা আত্মরক্ষার অংশ হিসেবে এমন কাজ প্রতিনিয়তই করে থাকে। রাশিয়া ও চায়না এখনো এ ক্ষেত্রে আমেরিকার সাথে টক্কর দেওয়ার মতো অবস্থায় পৌঁছতে পারেনি।

আমেরিকা, চীন ও রাশিয়া নিজেদের স্পেস কার্যক্রমকে সুরক্ষিত রাখার জন্য বিশেষ স্পেস আর্মি গঠন করছে। এই বাহিনী প্রচলিত আর্মির চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এসব স্পেস সেনারা মাঠে-ময়দানে নয়, বদ্ধ কামরায় বসে কাজ করে। তারা ট্যাংক-কামান দিয়ে যুদ্ধ করে না; কিন্তু তাদের প্রত্যেকের সামনে বিরাট-বিরাট মনিটর খোলা থাকে। এসব সেনাকে ডিডিও তথা ডিফেন্স ডিউটি অফিসার বলা হয়। প্রতিটি ডিডিওকে মহাকাশের নির্দিষ্ট কোনো স্টেশন, নির্দিষ্ট কোনো এলাকা, নির্দিষ্ট কোনো ইনস্টলেশনের দিকে নজর

রাখতে বলা হয়। ডিডিও নিজের শিফটে নির্ধারিত স্থাপনার দিকে চোখ পাকিয়ে বসে থাকে। অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়লে নোট রাখে। উক্ত স্থাপনায় আমেরিকার জন্য ক্ষতিকর কোনো তৎপরতা চালানো হচ্ছে না তো? ডিডিওর সামনে যে স্ক্রিন থাকে, সেটাতে মহাকাশের চিত্র থ্রি-ডি মাত্রায় দৃশ্যমান হয়। ডিডিও বসে বসে সেই থ্রিডি চিত্রকে মাউসের সাহায্যে ডানেবামে নিয়ে ও জুম করে দেখে। ডিডিও অতি ক্ষুদ্র চুলের মতো বস্তুকেও অনেক বড় করে পরীক্ষা করে দেখতে পারে।

রাশিয়া, চায়না ও আমেরিকা তাদের স্পেস আর্মির কাজের সুবিধার্থে 'স্পেশাল রিয়েলটাইম একশন' সফটওয়্যার এই কাজের জন্য ডিজাইন করেছে। এই সফটওয়্যারের সাহায্যেই স্পেস আর্মি কাজ করে। ডিডিওকে শুধু সারাক্ষণ চোখ-কান খোলা রাখতে হয়। বাকি কাজ সফটওয়্যারই করে দেয়। মহাকাশে একেকটি বস্তু ঘণ্টায় কয়েকশ মাইল গতিতে ছুটে যায়। গুলির চেয়েও দশগুণ বেশি গতিতে আনাগোনা করে। স্পেস ডেব্রিস, মিসাইল সবকিছুই এমন পাগলা গতিতে ছোটে। অতি সাধারণ বস্তুও গতির কারণে প্রাণঘাতি অস্ত্রে পরিণত হয়। কারণ মহাকাশে কোনো রেজিসট্যান্স-প্রতিরোধ নেই। যদি ছোট্ট একটি টুকরাও মহাকাশ স্টেশন বা স্যাটেলাইটের দিকে ছুটে আসতে দেখা যায়, তাহলে ডিডিও সেটাকে উপেক্ষা করতে পারে না। কারণ এক সেকেন্ড গুরুত্ব না দেওয়ার অর্থ হবে, সেই কামিকাজি স্যাটেলাইট বা স্পেস ডেব্রিজ এর মধ্যে আরো কাছে চলে আসা। ঘটনাক্রমে সেই ছুটে আসা বস্তুটা যদি সত্যি সত্যিই স্পেস সেন্টারের গায়ে এসে লাগে, তাহলে সেই সেন্টার বা ইনস্টলেশন নিমেষেই টুকরো-টুকরো হয়ে যাবে। আর সেই ছত্রভঙ্গ টুকরাগুলো মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে স্পেস ডেব্রিজের পরিমাণ বাড়িয়ে তুলবে। মহাকাশে বিদ্যমান স্পেস সেন্টারগুলোর অস্তিত্বকে আরো বেশি হুমকির মুখে ফেলবে। এজন্যই মহাকাশকে নিয়মিত অবজারভেশনে রাখা অতীব জরুরি কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়।

স্পেস আর্মি আরেকটি কাজ করে। শত্রুদেশের লেজার ওয়েপনের দিকেও নজর রাখে। লেজার ওয়েপন দিয়ে লো-আর্থ অরবিটে প্রদক্ষিণরত স্যাটেলাইটকে নিশানা বানানো যায়। এমন লেজার ওয়েপনের ব্যবহার সাধারণত উত্তর কোরিয়া, ইরান ও ইসরায়েলের মতো দেশগুলো করে থাকে। মার্কিন, ন্যাটো বা শত্রুদেশের স্যাটেলাইট লো-আর্থ অরবিট থেকে প্রতিপক্ষ দেশের ওপর গোয়েন্দাগিরি করে। এ ধরনের গোয়েন্দা তৎপরতা থেকে

সুরক্ষার জন্য লেজার ওয়েপন ব্যবহার করা হয়। ইরান ও উত্তর কোরিয়ার মতো দেশগুলো তাদের নিউক্লিয়ার স্থাপনাগুলো গোপন রাখতে চায়। শত্রুপক্ষ তাদের স্থাপনাগুলোকে শত্রুপক্ষের গোয়েন্দাবৃত্তি থেকে বাঁচানোর জন্য গোপন স্থাপনাগুলোর সাথেই লেজার ওয়েপন ইনস্টল করে রাখে। লো-আর্থ অরবিট থেকে কেউ গোয়েন্দাগিরি করতে চাইলে তার দিকে লেজার ওয়েপন ছোঁড়া হয়।

মোটকথা, স্পেসওয়ারে যুদ্ধরত স্পেস আর্মিও নিয়মিত সেনাবাহিনী ও সীমান্তরক্ষীদের মতো নিজ দেশের স্পেস সীমা সুরক্ষিত রাখার পেছনে জীবনবাজি রেখে সংগ্রাম চালিয়ে যায়। হ্যাঁ, তাদের যুদ্ধের ধরন ভিন্ন। এখন স্পেস আর্মির কাজ শুধু স্পেস সীমা সুরক্ষিত রাখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। প্রতিপক্ষের স্যাটেলাইট ধ্বংস করার কাজও শুরু হয়ে গেছে। চীন ও আমেরিকা এই কাজে নেমে পড়েছে। ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি সিচুয়ান প্রদেশ থেকে চীন একটা রকেট উৎক্ষেপণ করেছিল। মার্কিন স্পেস সোলজাররা সেই রকেটকে মনিটর করতে শুরু করে দিয়েছিল। একটু পর মার্কিনিরা ভীষণ অবাক হয়ে দেখল, রকেটটা তীব্র গতিতে নিজেদের এক ওয়েদার স্যাটেলাইট বা আবহাওয়ার পূর্বাভাস দানকারী স্যাটেলাইটের দিকে ছুটে যাচ্ছে। প্রতি সেকেন্ডে ৮ কিমি গতিতে ছুটে গিয়ে চায়নিজ রকেটটি নিজেদের স্যাটেলাইটের ওপর আছড়ে পড়ে। রকেটটি ছিল মূলত স্পেস মিসাইল। এটি চীনের পক্ষ থেকে স্যাটেলাইট ধ্বংস করার সফল পরীক্ষা। চীনের জানা ছিল, তাদের এই কার্যক্রম বিশ্বের আরো নানা দেশ পর্যবেক্ষণ করছে। চীন এই ঘটনার মাধ্যমে গোটা দুনিয়াকে এই বার্তা দিয়েছে, তারা চাইলে মহাকাশে থাকা যেকোনো স্যাটেলাইট ধ্বংস করে দিতে সক্ষম। তাদের কাছে স্যাটেলাইট ধ্বংসকারী প্রযুক্তি আছে। মহাকাশের কোনো স্যাটেলাইটই তাদের কবজার বাইরে নেই। আমেরিকা এখন গায়ে পড়ে স্পেসওয়ার শুরু করার আগে দশবার ভাববে, চীন কী করতে পারে।

চীন এই কাজ লো-আর্থ অরবিটের চেয়ে কিছুটা উপরে করেছিল। এজন্য পুরো বিশ্বে চীনের বিরুদ্ধে নিন্দার ঝড় উঠল। কারণ, এই বিস্ফোরণের ফলে মহাকাশে অসংখ্য ডেব্রিজ ছড়িয়ে পড়েছে। এমনিতেই আগের ডেব্রিজ নিয়ে সবাই ভীষণ চিন্তিত, নতুন করে আরো ডেব্রিজ ছড়ানো মারাত্মক অপরিণামদর্শিতা। চীনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠল, চীন গায়ে পড়ে মহাকাশকে রণক্ষেত্র বানাচ্ছে। চীন মহাকাশকে আরো বেশি জঞ্জালপূর্ণ করে

ফেলেছে। চীন এই বিস্ফোরণের মাধ্যমে আগের জঞ্জালের সাথে আরো প্রায় ৩,০০০ টুকরা যোগ করেছে। এর একেকটি টুকরা পটেনশিয়াল মিসাইলের মতো ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে যেকোনো স্যাটেলাইটের জন্য। এমনকি এসব টুকরা মহাকাশ ছেড়ে পৃথিবীতেও আছড়ে পড়তে পারে।

পুরো দুনিয়া যখন চীনের নিন্দায় সরব হয়ে উঠেছিল, তখন আমেরিকা কী করেছিল? ১৯৯৮ সালে ইন্ডিয়ার আণবিক বোমা বিস্ফোরণের জবাবে পাকিস্তানও আণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। ঠিক এভাবেই চীনের পরীক্ষার কয়েক সপ্তাহ পরে ২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমেরিকাও সাগর থেকে একটি মিসাইল উৎক্ষেপণ করে। এই মিসাইলটা আঘাত হেনেছিল নিজেদেরই একটি স্যাটেলাইটকে। এটাকে আমেরিকা 'অপারেশন বার্ন ফ্রস্ট' নাম দিয়েছিল। দেখতে-শুনতে সাদামাটা পরীক্ষা হলেও পুরো বিশ্বের বুঝতে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হয়নি, এই পরীক্ষা ছিল চীনের জবাবি আয়োজন। চীন যেভাবে পরোক্ষভাবে আমেরিকাকে সতর্ক করেছিল, আমেরিকাও চীনকে সতর্ক করেছে। তার কাছেও এন্টি স্যাটেলাইট মিসাইল আছে। শুধু তাই নয়, আমেরিকা চাইলে স্থল থেকে তো বটেই, সমুদ্র থেকেও মিসাইল উৎক্ষেপণ করতে পারে। আমেরিকা চাইলে যেকোনো অরবিটে, যেকোনো স্যাটেলাইটকে, যেকোনো জায়গায়, যেকোনো সময় ধ্বংস করতে সক্ষম। সুতরাং চীনি ভাইলোগ, সামহালকে। এভাবেই লেজার, মিসাইল, এটমিক বোমা, কামিকাজি স্যাটেলাইটের আকৃতিতে মহাকাশে যুদ্ধাস্ত্রের এক ভয়ংকর প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। বিশ্বের নানাপ্রান্তে মোতায়েনকৃত সেনাদের সাথে যোগাযোগ রাখা, বিশ্বের নানাপ্রান্তে থাকা নিজেদের সামরিক স্থাপনার সুরক্ষা, প্রতিপক্ষের ওপর নজর রাখা, মহাকাশে অবস্থিত অবকাঠামো চালানোর জন্য আমেরিকা, রাশিয়া ও চীন—তিন দেশই ছোট ছোট সেলও মহাকাশে ছেড়ে দিচ্ছে। এগুলোকে ন্যানো বা মাইক্রো স্যাটেলাইট বলা হয়। এগুলো আকার-আকৃতিতে এতই ছোট যে, হাতের মুঠোয় নিয়ে ঘোরা যায়। আমাদের মাথার ওপর এমন হাজারো মাইক্রো/ন্যানো স্যাটেলাইট প্রদক্ষিণ করে বেড়াচ্ছে।

ন্যানো/মাইক্রো স্যাটেলাইটের সংখ্যা প্রতি বছর হু হু করে বাড়ছে। ক্ষুদে স্যাটেলাইটের জনপ্রিয়তা, কার্যকারিতা ও উপযোগিতা বেড়ে যাওয়ার কারণ, এগুলোকে ডিটেক্ট করা বা মিসাইলের মাধ্যমে টার্গেট করা বড় স্যাটেলাইটের তুলনায় দুরূহ। চলমান গ্রেট গেইমের জেরে ভূপৃষ্ঠে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যদি নাও বাধে, মহাকাশে লাগবেই। মহাকাশে যদি সত্যি সত্যি যুদ্ধ বেধেই যায়

তাহলে সেই যুদ্ধ আমাদেরকে কমপক্ষে ১০০ বছর পিছিয়ে দিবে। পৃথিবীর যুদ্ধে যতই ক্ষয়ক্ষতি হোক, দুদিন আগে বা পরে ক্ষতি কাটিয়ে ওঠা যায়। মহাকাশ যুদ্ধের ধাক্কা কেউই সামাল দিয়ে উঠতে পারবে না। মহাকাশ যুদ্ধ লাগলে আমরা কেমন ক্ষতির সম্মুখীন হবো? স্পেসওয়ারে ব্যবহৃত হবে লেজার, এন্টি স্যাটেলাইট মিসাইলসহ আরো ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রশস্ত্র। এই যুদ্ধের প্রভাব বিদ্যুৎ গতিতে পৃথিবীতে আছড়ে পড়বে। টেলিভিশন বন্ধ হয়ে যাবে। ইন্টারনেট কানেকশন ধীরগতির হতে হতে একসময় পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে। এটিএম মেশিন কাজ করা বন্ধ করে দিবে। গাড়ির ট্র্যাকিং সিস্টেম জ্যাম হয়ে যাবে। জাহাজের নেভিগেশন সিস্টেম কাজ করবে না। স্টক মার্কেটে ট্রেডিং বন্ধ হয়ে যাবে। অনলাইন ট্রানজাকশন বন্ধ হয়ে যাবে। উন্নত রাষ্ট্রে ট্রাফিক সিগন্যাল, রেলওয়ে সিগনাল আচানক বন্ধ হয়ে যাবে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। অটোমেটিক গাড়িগুলো একটা আরেকটার সাথে ধাক্কা খেয়ে অকেজো হয়ে পড়ে থাকবে। পাওয়ার গ্রিড বন্ধ হয়ে যাবে। এর ফলে পানি সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে। এমনকি স্মার্টফোনও কাজ করবে না। এ তো সামান্য কয়েকটা উদাহরণ তুলে ধরা হলো। এসব কারণে পুরো দেশ তো বটেই, বিশ্বজুড়ে পরিস্থিতি উত্তাল হয়ে উঠবে। সরকারব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সরকারগুলোর পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসতে আসতে এমন অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে, যা কাটিয়ে ওঠা আর কখনোই সম্ভব হবে না। সবকিছু ঝিরঝিরে সাদাকালোর মতো হয়ে যাবে।

নির্বাচন কারসাজি

আমেরিকা ও রাশিয়া একে অপরের নির্বাচন নিয়ে খেলা করে। এ সম্পর্কে বলা যায়, শুরু তো আমেরিকা করেছিল, খতম করেছে পুতিন। আমেরিকা হয়তো রাশিয়ান নির্বাচনে সামান্য হালকা-পাতলা টুংটাং বীণা বাজিয়েছে; কিন্তু মার্কিন নির্বাচন নিয়ে রাশিয়া রীতিমতো ব্যান্ড বাজিয়ে দিয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত ২০১৩ সালের মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতা থেকে। প্রতিযোগিতাটা হচ্ছিল মস্কোর ক্রুকস হলে। ৯ নভেম্বরের শীতল দিন। সেবার মিস ইউনিভার্স নির্বাচিত হয়েছিল ভেনিজুয়েলার গ্যাব্রিয়েলা। এই প্রতিযোগিতা আমেরিকার ডোনাল্ড ট্রাম্পও উপস্থিত ছিল। মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতার আয়োজকও ছিল ট্রাম্প। জেনে-বুঝে অনেক চিন্তাভাবনা করেই প্রতিযোগিতার ভেন্যু

হিসেবে মস্কোকে বেছে নিয়েছিল ট্রাম্প। ভেতরের খবর হলো, ট্রাম্প মস্কো যাওয়ার পেছনে মূল কারণ সুন্দরী প্রতিযোগিতা ছিল না; প্রতিযোগিতার অন্তরালে রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট পুতিনের সাথে সাক্ষাৎ করাই ট্রাম্পের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। পুতিনের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে চাচ্ছিল ট্রাম্প। রাশিয়াতে নিজের 'বিজনেস এম্পায়ার' প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছিল। ট্রাম্প চাচ্ছিল, মস্কোতে ট্রাম্প টাওয়ার নামে গগনচুম্বী ও দৃষ্টিনন্দন এক ভবন নির্মাণ করবে। আমেরিকাতেও এমন টাওয়ার আছে। টাওয়ারের টপ ফ্লোরে নিজে থাকার জন্য একটা পেন্টহাউজ আছে।

তখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ছিল বারাক ওবামা। সে সময় আমেরিকা তো বটেই, পুরো বিশ্বের কারোরই বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না যে, ট্রাম্পের মতো একজন আগাগোড়া ব্যবসায়ী ও অরাজনৈতিক ব্যক্তি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হতে পারে। বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হলে যে তরুণ উদ্বোধনী গান গাওয়ার কথা ছিল, আর যে রাশিয়ান বিলিওনিয়ার এই শোয়ের জন্য ২০০ মিলিয়ন (২০ কোটি) ডলার ফান্ড দিয়েছে, দুজনেই মূলত একই পরিবারের লোক। আগালোরোপ পরিবার রাশিয়ান না হয়েও পুতিনের সাথে যোগসাজশ করে রাশিয়ায় ব্যবসা করে। আগালোরোপ পরিবারই ট্রাম্পের সাথে মিলে মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল। বলাবাহুল্য, উভয়পক্ষের কাছেই ব্যবসায়িক স্বার্থই প্রাধান্য পেয়েছিল। বিলিওনিয়ার আরেস আগালোরোপ পুতিনের কাছ থেকে সরকারি ঠিকাদারি পেত। ট্রাম্প এজন্যই আগালোরোপকে দলে ভিড়িয়েছে, যাতে নিজের ব্যবসায়িক পরিকল্পনার ফাইলটা দ্রুত স্বাক্ষর করিয়ে নিতে পারে।

কারো ধারণা হতে পারে, মিস ইউনিভার্স, মিস আর্থ, মিস ওয়ার্ল্ড এসব আয়োজন সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে খোঁজার জন্য করা হয়ে থাকে? কস্মিনকালেও নয়। এসব প্রতিযোগিতার আয়োজন হয় মার্কেটিং গেমিংসের অংশ হিসেবে। এসব প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বহু মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে নেয়। এর মাধ্যমে কেউ নিজের ব্যবসাকে প্রমোট করে; কেউ নির্দিষ্ট কোনো পণ্যকে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চায়। প্রতিযোগিতার মাধ্যমে একজনকে বিশ্বসুন্দরী আখ্যা দিয়ে নিজেদের কিছু প্রোডাক্টস প্রমোট করা উদ্দেশ্য থাকে। প্রতিযোগিতা জয়ী হওয়া সুন্দরীকে নিজেদের কোম্পানির ব্র্যান্ড এম্বেসেডার বানাতে চায়। প্রতিযোগিতার আড়ালে এমনি হাজারো স্বার্থের খেলা চলে। এটা শুধু সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতাই নয়; বরং এটা কিছু

কোম্পানি ও এন্টারপ্রেনরের বিজনেস ভেঞ্চার হয়ে থাকে। এই প্রতিযোগিতার প্রচারস্বত্ব, কোথায় অনুষ্ঠিত হবে, কোন চ্যানেলে সম্প্রচার হবে, সম্প্রচারকালে কোন এ্যাড দেখানো হবে—এসব নিয়ে বহু টানা-হ্যাঁচড়া হয়।

সেবার মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতার পর ডোনাল্ড ট্রাম্প মিস গ্যাব্রিয়েলার সাথে ছবি তুলেছিল। সাথে আগালোরোপও ছিল। সেই সময় ট্রাম্প আরেকটা কাজ করেছিল। একটি লেটার অব ইনটেন্টে সাইন করেছিল। সেটা ছিল মস্কোতে ট্রাম্প টাওয়ার বানানোর অনুমোদন চুক্তি। তারপর থেকেই ট্রাম্প ক্রমাগত পুতিনের প্রশংসা করতে শুরু করে দিয়েছিল। আরো নিশ্চিত করে বলতে গেলে, ট্রাম্প যখন থেকে মস্কোতে বিউটি কনটেস্ট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তখন থেকেই পুতিনের প্রশংসা শুরু করেছিল। ২০১৩ সালের ১৮ জুন ট্রাম্প টুইট করেছিল, আপনার কী মনে হয়, প্রেসিডেন্ট পুতিন আমাদের মস্কো সুন্দরী প্রতিযোগিতায় আসবেন? যদি সত্যি সত্যি তিনি আসেন, তাহলে তিনি আমার বেস্ট ফ্রেন্ড হয়ে যাবেন।

সুন্দরী প্রতিযোগিতা শেষ হয়ে যাওয়ার পরও ট্রাম্প আরো কিছুদিন মস্কোতে অবস্থান করেছিল। ট্রাম্প তখনো পুতিনের প্রশংসা করে গেছে। একবার এটাও বলেছে, আমি যখন মস্কোতে ছিলাম, তখন সুন্দরী প্রতিযোগিতা চলাকালে একবার পুতিন আমার সাথে যোগাযোগ করেছিল। তিনি 'সো নাইস'-চমৎকার মানুষ। মিস ইউনিভার্স চলাকালে ট্রাম্প বহু চেষ্টা করেছে পুতিনের সাথে সাক্ষাতের জন্য; কিন্তু সফল হয়নি। ট্রাম্পই বলেছে, একবার পুতিন আমাকে সাক্ষাতের জন্য ডেকেছিল। আমি রওনাও করেছিলাম। ট্রাফিক জ্যামের কারণে টাইমিং মেলেনি। ট্রাম্প নিরাশ হয়নি। মস্কোতে ট্রাম্প টাওয়ার বানানো ও পুতিনের সাথে সাক্ষাতের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখল। ট্রাম্প যেকোনো মূল্যে মস্কোতে ট্রাম্প টাওয়ার বানাতে বদ্ধপরিকর ছিল। সমস্যা ছিল, তখন রাশিয়া ও আমেরিকার কূটনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক ছিল না। মার্কিন ব্যবসায়ীদের জন্য রাশিয়ায় ব্যবসা করা কঠিন ছিল।

দুই দেশের সম্পর্ক খারাপ হওয়ার কারণ ছিল, ২০১১ সালে রাশিয়ার জাতীয় নির্বাচনে পুতিনের দল ইউনাইটেড রাশিয়া জিতে গিয়েছিল। বিরোধীরা নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগে বিশাল বিক্ষোভ শুরু করে দিয়েছিল। আমেরিকা ও পশ্চিমা দেশগুলো রাশিয়ান জনগণের দাবিকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিল। মার্কিন ও পশ্চিমা মিডিয়াতে পুতিনবিরোধী তুমুল প্রচারণা শুরু

গিয়েছিল। পুতিনবিরোধী একেকটি মিছিলে ব্যাপক জনসমাগম হচ্ছিল। ঠান্ডা সত্ত্বেও লোকজন বিপুল উৎসাহ ও ক্ষোভ নেয় রাস্তায় নেমে ছিল। পশ্চিমা মিডিয়ার সমর্থন পুতিনবিরোধী বিক্ষোভের আগুনে যেন ঘি ঢেলে। বিক্ষোভকারীরা পুতিনকে চোর, ধোঁকাবাজ এমনকি ইঁদুর পর্যন্ত বলেছে। দেশে বিরাজমান অবস্থা পুতিনের জন্য ভীষণ অস্বস্তিকর ছিল। মস্কো থেকে সাইবেরিয়া পুরো রাশিয়া বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছিল। ৩ মাস পরেই রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। পুতিন সেই নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ছিল। পুতিনবিরোধী এই জনরোষ অব্যাহত থাকলে নিশ্চিতভাবে পুতিন হেরে যাবে। সদ্য সমাপ্ত হওয়া ডুমা নির্বাচনে পুতিনের দল গত নির্বাচনের চেয়ে ১৫% ভোট কম পেয়েছিল।

দেশে চলমান বিক্ষোভকে পুতিন বিদেশি ষড়যন্ত্র আখ্যা দিলো। আমেরিকা ও পশ্চিমকেই এই বিক্ষোভের ইন্ধনদাতা মনে করত। পুতিনের অনুমান অনেকাংশে সত্যও ছিল। এসব প্রতিবাদ মার্কিন ষড়যন্ত্র। পুতিন সরাসরি বলেছে, এসব হলো মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব হিলারি ক্লিনটনের কারসাজি। পুতিন বলেছিল, আমি জানি, মিস ক্লিনটন তার পোষা কিছু অভিনেতাকে আমার বিরুদ্ধে রাস্তায় নামিয়ে দিয়েছে। পুতিনবিরোধী নজিরবিহীন প্রতিবাদ-বিক্ষোভের পরও ২০১২ সালের মার্চে পুতিন দ্বিতীয়বারের মতো রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে গিয়েছিল। ৬০% ভোট পেয়েছিল পুতিন। জয়ের পর মস্কোর ম্যানস স্কয়ারে অশ্রুসজল চোখে ভেজা গলায় বিজয় ভাষণে বলেছিল, 'আমরা এক অবাধ, সুষ্ঠু ভোটে জিতে গিয়েছি।' আমেরিকা আবার ময়দানে অবতীর্ণ হলো। আমেরিকা ও ইউরোপ নির্বাচনী ফলাফলে গভীর সন্দেহ প্রকাশ করল। পশ্চিমা মিডিয়ার শীর্ষ ম্যাগাজিন ইকোনোমিস্টে লেখা হয়েছে, দুনিয়া আগে থেকেই জানত পুতিনই প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবেন। সেই জয় এজন্য নয় যে, তিনি অনেক প্রসিদ্ধ। তিনি জিতেছেন এজন্য যে, এই নির্বাচনে তাকে জিততেই হবে। তিনি জেতার জন্য যা যা করা দরকার, সবই করেছেন। তিনি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নির্মম শক্তিতে দমন করছেন। মার্কিন শীর্ষ পত্রিকা নিউইয়র্ক টাইমস লিখেছিল, এই নির্বাচন অত্যন্ত বিতর্কিত। নির্বাচনী পর্যবেক্ষকগণ এই নির্বাচনে সুস্পষ্ট প্রতারণা ও কারচুপির প্রমাণ পেয়েছে।

নিউইয়র্ক টাইমস ও পশ্চিমা মিডিয়ার এহেন খোলামেলা সমালোচনা ছিল পুতিনের গালে কষা থাপ্পড়। মিডিয়ার বিষবাণ পুতিনের বিজয় আনন্দকে

তেতো করে দিয়েছিল। পুতিন আগে থেকেই আমেরিকা ও পশ্চিমের প্রতি ক্ষুব্ধ ছিল, এবারের সমালোচনা পুতিনকে চরমভাবে খেপিয়ে দিলো। পুতিন এর প্রতিশোধ নেওয়ার সুচতুর পরিকল্পনা আঁটল। রাশিয়া শুরু থেকেই ইউক্রেনকে নিজের অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করে। বিশেষ করে পুতিন প্রশাসন এমনটাই মনে করে। ২০১৪ সালে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ছিল পুতিনের অনুগত ভিক্টর ইউনোকোভিচ। ২০১৩ সালে ইউক্রেনের পশ্চিমাংশে ভিক্টরের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হয়ে গিয়েছিল। ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চল ছিল রাশিয়া লাগোয়া। এই অঞ্চলের লোকজন রাশিয়া-পুতিনের সমর্থক। ইউক্রেনের পশ্চিমাঞ্চলের লোকজন কট্টর রাশিয়া-পুতিনবিরোধী ছিল। পশ্চিমাঞ্চলের আন্দোলনকে 'ডিগনিটি মুভমেন্ট' (ভাবগম্ভীর-মর্যাদাপূর্ণ আন্দোলন) আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। পশ্চিমা মিডিয়া তাদের চিরাচরিত স্বভাবমতো এই আন্দোলনের সমর্থনে আদাজল খেয়ে নামল। আন্দোলনের প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল, পুতিন সমর্থিত প্রেসিডেন্টকে হটিয়ে নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন কাউকে দেশ নেতা নির্বাচিত করা; ভিক্টরের বিরুদ্ধে গাদ্দারির মামলা দায়ের করা। বিক্ষোভকারীরা রাস্তাঘাট বন্ধ করে দিয়েছিল। পুরো অঞ্চলকে অচল করে দিয়েছিল। অসংখ্য লোক মারা গিয়েছিল।

২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে এই আন্দোলন সাফল্যের মুখ দেখল। ততদিনে ১২১ জন মানুষ মারা পড়েছে এবং ২ হাজারের মতো আহত হয়েছে। দেশের অর্থনীতির বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ক্ষতি হয়েছে। আন্দোলন সফল হয়েছিল এভাবে, প্রেসিডেন্ট ভিক্টর ও আন্দোলনকারীদের মধ্যে একটা সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো যে, নতুন নির্বাচন দেওয়া হবে। চুক্তি বাস্তবায়নের দিন প্রেসিডেন্ট ভিক্টর রাজধানী কিয়েভ ছেড়ে মস্কো পালিয়ে গেল। পশ্চিমা মিডিয়াতে উথালপাতাল প্রচারণা শুরু হয়ে গেল। পুতিনের সাহায্যেই ভিক্টর মস্কো পালিয়ে যেতে পেরেছে। গাদ্দারির মামলা থেকে বাঁচার জন্যই ভিক্টর পালিয়েছে। ভিক্টরের অনুপস্থিতিতেই মোকদ্দমা চালানো হয়েছিল। ২৪ জুন, ২০১৯ সালে মামলার রায় বের হয়। আদালত ভিক্টরকে গাদ্দার আখ্যা দিয়ে ১৩ মাস কারাদণ্ড দিয়েছিল। ভিক্টর ছিল রাশিয়ান বংশোদ্ভূত (এথনিসিটি) পূর্বাঞ্চলের অধিবাসী। এতদাঞ্চলের বিপুল ভোটেই ভিক্টর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিল। এই অঞ্চল ছিল ভিক্টরের স্ট্রংহোল্ড।

ভিক্টরের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালানো, ভিক্টরকে অভিযুক্ত করে দণ্ড দেওয়াকে পুতিন মোটেও ভালো চোখে দেখল না। এসবকে পুতিন পশ্চিমা ষড়যন্ত্র আখ্যা

পেয়েছিল। পুতিনের এই দাবি অনেকাংশে সত্যও ছিল। পুতিন আমেরিকার দিকে সরাসরি অভিযোগ দায়ের করে বলল, ইউক্রেনের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে আমেরিকা অন্যায়ভাবে নাক গলাচ্ছে। প্রমাণস্বরূপ রাশিয়া একটা অডিও রেকর্ড ইন্টারনেটে ছেড়ে দিলো। অডিওতে শোনা গেছে, মস্কোয় অবস্থানরত দুজন মার্কিন কূটনীতিবিদ আলোচনা করছে, ইউক্রেনে কীভাবে ভিক্টরকে হটানো যায়—এ বিষয়ে। এর প্রতিক্রিয়ায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া জানাল। রাশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে বলল, রাশিয়া মার্কিন দূতাবাসের ভেতর গোয়েন্দাগিরি করছে। কূটনীতিবিদদের কথোপকথন ইন্টারসেপ্ট করছে। কূটনৈতিক শিষ্টাচার বহির্ভূত কাজ করছে। ওবামার মতে, এ সবকিছু সরাসরি পুতিনের হুকুমে হচ্ছিল। এবার আমরা উপরোক্ত তিনটি পয়েন্ট আরেকবার ঝালিয়ে নিই :

ক. ২০১১ সালের ডিসেম্বরে ডুমা অর্থাৎ রাশিয়ান পার্লামেন্ট নির্বাচন।
খ. ২০১২ সালে পুরো রাশিয়া জুড়ে পুতিনবিরোধী প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রতিবাদ।
গ. ২০১৩ সালে ইউক্রেনে ডিগনিটি মুভমেন্ট।
ঘ. ২০১৪ সালে রাশিয়া কর্তৃক ক্রিমিয়া দখল। প্রতিক্রিয়ার রাশিয়ার ওপর আমেরিকার নিষেধাজ্ঞা।

উপরোক্ত চারটি ঘটনাতেই পশ্চিম ও আমেরিকার দিক থেকে পুতিন প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিল। এ কারণে আমেরিকা ও পশ্চিমের প্রতি পুতিন ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে পশ্চিম ও আমেরিকার এহেন খোলামেলা হস্তক্ষেপে পুতিন যারপরনাই নাখোশ। পুতিনকে হটানোর জন্য আমেরিকা কতটা বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারে—পুতিন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিল। পুতিন সরাসরি কিছু বলতেও পারছিল না, সইতেও পারছিল না। পুতিন তলে তলে সুযোগ খুঁজছিল। পশ্চিমা ও আমেরিকাকে তার হিসেব কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য তক্কে তক্কে ছিল। এসব ঘটনার দুই বছরেরও কম সময় পরে আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছিল।

আমেরিকায় যখন নির্বাচনী ডামাডোল শুরু হয়, তখন প্রশাসন কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে। নিরাপত্তার দিকটা আগের তুলনায় কম গুরুত্ব পেতে শুরু করে। কোনো কোনো বিষয়ে রাজনৈতিক ঐক্যও কমে আসে। বড় কোনো সমস্যা দেখা দিলে সরকারি দল ও বিরোধী দলের ঐক্য কঠিন হয়ে যায়। তখন একে

অপরের বিরুদ্ধে হিংসা-বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিয়ে নির্বাচন জেতাটাই মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদেশেও প্রায় এমনই হয়। এই ভঙ্গুর (ভালনারেবল) সময়ে শত্রুরা তৎপর হয়ে ওঠে। স্বার্থ উদ্ধারে লেগে পড়ে। এই সময়টাতেই পুতিন জবাবি হামলা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। ২০১৬ সালের নির্বাচন আমেরিকার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তখন পুরো দুনিয়ার অর্থনীতি অত্যন্ত নাযুক অবস্থায় ছিল। আফগানিস্তান থেকে যেকোনো মূল্যে পালিয়ে আসতে চাচ্ছিল আমেরিকা। চীন-রাশিয়ার ক্রমবর্ধমান প্রভাব-প্রতিপত্তি আমেরিকার শরীরে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছিল। ওবামার দ্বিতীয় দফার মেয়াদ শেষ হওয়ার পথে। দুইবারের পর আমেরিকায় কেউ আর প্রেসিডেন্ট হতে পারে না। ডেমোক্র্যাটদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রিপালিকান শিবির থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নধাঁচের এক লোক প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হয়েছিল। পুরো আমেরিকা জুড়েই তার নামডাক ছিল। এই লোক প্রথাগত রাজনীতিবিদ ছিল না। নির্বাচনী প্রচারণাতেও রাজনৈতিক নিয়মনীতির তোয়াক্কা করছে না। সেই লোক ছিল ঝানু ব্যবসায়ী, সেলিব্রেটি, রিয়েলিটি শো হোস্ট, প্লেবয়। এই লোক ছিল পুতিন ভক্ত ডোনাল্ড ট্রাম্প।

পুতিন ঠিক করল, নির্বাচনের আগে সৃষ্ট এই নিরাপত্তা দুর্বলতাকে কাজে লাগাবে। পাশাপাশি তার প্রতি ট্রাম্পের দুর্বলতাকে কাজে লাগাবে। মিসাইল, আণবিক বোমা, প্রক্সিবাহিনী, সংবাদমাধ্যম, পত্রপত্রিকা, ম্যাগাজিন, মেশিনগান—এসবকিছু পুরোনো শীতল যুদ্ধের অস্ত্র। আদি গ্রেট গেইমের অংশ। এখন নতুন যুগে নতুন হাতিয়ার ময়দানে এসে গেছে। এই হাতিয়ার পুতিনের হাতে বেশ ভালোভাবেই ছিল। সেই হাতিয়ারের নাম সোশ্যাল মিডিয়া। পুতিনের নির্দেশে অনলাইন ট্রলের জন্য বিপুল পরিমাণে ফৌজ ভর্তি করা হলো। এদের প্রধান কাজ ছিল, রাশিয়ার পক্ষে যায় এমন ফেকনিউজকে পাগলের মতো ছড়িয়ে দেওয়া। পাশাপাশি ফেকনিউজ সৃষ্টি করাও এই বাহিনীর অন্যতম দায়িত্ব। এই বাহিনী পুতিনকে হিরো বানিয়ে নানা মিথ্যা গালগল্প ছড়াত। পুতিন ও রাশিয়াবিরোধীদের কাপড় খুলে ছেড়ে দিত। বিশেষ করে আমেরিকাকে নির্বোধ, বেকুব ও কাণ্ডজ্ঞানহীন প্রমাণ করার সামান্যতম সুযোগও হাতছাড়া করত না। এটা ছিল গ্রেট গেইমের ক্ষুদ্রতম অংশ। এই গ্রেট গেইমের আসল কৃতিত্ব অন্য জায়গায় ছিল। রাশিয়ান ট্রল বাহিনীর কয়েকজন চৌকশ ও ধুরন্ধর এজেন্ট সুকৌশলে মার্কিন রাজনীতির একেবারে অন্দর মহলে ঘুচে যেতে সক্ষম হলো। এরা আমেরিকান

রাজনীতিবিদ ও বিভিন্ন মার্কিন দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হ্যাক করে নিয়ে আসত।

এই হ্যাকাররাই খেলা জমিয়ে দিলো। এই পর্যায়ে খেলা বেশ জমজমাট হয়ে উঠল। ২০১৬ সালের মার্কিন নির্বাচনকে পুতিন ফুটবল ম্যাচের মতো গ্রহণ করল। হিলারি ক্লিনটন আর ট্রাম্পের নির্বাচন শুধু মার্কিন নির্বাচন থাকল না, রাশিয়া-আমেরিকান লড়াইয়ে পরিণত হয়েছিল। না, মার্কিন কর্তৃপক্ষ এই লড়াইয়ে পুতিনের ধারেকাছেও ঘেঁষতে পারেনি; বরং পুতিনের মারাত্মক সব ড্রিবলিংয়ে মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগ এদিক-সেদিক ছিটকে পড়েছিল। মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগ একেবারেই যে কিছু টের পায়নি, তা নয়। ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর, মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগ এফবিআই, ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ন্যাশনাল কমিটিকে একটি গোপন বার্তা পৌঁছে দিয়েছিল। এই কমিটি তখন দলের পক্ষ থেকে কে পরবর্তী প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হবে, সেটা নির্ধারণে ব্যস্ত। এফবিআই জানাল, আপনাদের দলীয় কম্পিউটার থেকে কিছু হ্যাক হয়েছে। এখন আপনাদের প্রতিটি সদস্যের কম্পিউটারে সেই হ্যাকার ইচ্ছামতো ঢুকতে পারছে। কুখ্যাত রাশিয়ান হ্যাকার গ্রুপ এপিটির ভেতরে গোয়েন্দাগিরি করেও এফবিআই বেশ কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিল। এফবিআই সেই সূত্রে জানতে পেরেছিল, ড্যামোক্র্যাটরা রাশিয়ান হামলার শিকার হয়েছে। শুধু তাই নয়, রাশিয়ান হ্যাকাররা মার্কিন সরকারি দপ্তর, বিভিন্ন থিংক ট্যাংক ও রাজনৈতিক দলগুলোর নেটওয়ার্কে ঢুকে পড়েছিল। এফবিআই এদেরকেও হ্যাকিংয়ের ব্যাপারে সতর্ক করেছিল।

ডেমোক্র্যাট দলের যে আইটি বিশেষজ্ঞকে এফবিআই সতর্ক করেছিল, সে লোক বিষয়টাকে মোটেও গুরুত্ব দেয়নি। এই অবহেলার জন্য ডেমোক্র্যাট দলকে চড়া মাশুল গুনতে হয়েছিল। কয়েকদিনের মধ্যে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সমস্ত নেটওয়ার্ক ও হিলারির নির্বাচনী প্রচারণার সমস্ত তথ্য রাশিয়ান হ্যাকারদের হাতে চলে গিয়েছিল। চুরিকৃত তথ্যগুলোকে মুন্সিয়ানার সাথে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছিল। রাশিয়ান হ্যাকাররা শুধু ডেমোক্র্যাট নয়, রিপাবলিকান নেটওয়ার্কও হ্যাক করেছিল। রিপাবলিকান পদপ্রার্থী ট্রাম্পের আশেপাশে পুতিনের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ লোকদেরকে ইতিমধ্যে মোতায়েন করা হয়েছিল। ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারণার চিফ স্ট্র্যাটেজিস্ট ও চেয়ারম্যান ছিল পল মানাপোর্ট। এই লোক অনেক আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান ও জর্জ বুশের নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিয়েছিল। সবচেয়ে চমকপ্রদ বিষয়

হলো, এই লোক আমেরিকা থেকে ১০ বছর গায়েব ছিল। সে তখন রাশিয়ায় ছিল। যেকোনো উপায়েই হোক, পুতিনের একদম কাছের লোকে পরিণত হয়েছিল। পুতিনের পক্ষ থেকে তাকে ইউক্রেনে পাঠানো হয়েছিল। পুতিন তাকে ভিক্টর ইয়ানুকোভিচকে নির্বাচনে জেতানোর দায়িত্ব দিয়েছিল। পলের পরামর্শেই ভিক্টর ডিগনিটি মুভমেন্টে বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালিয়েছিল।

রাশিয়ান শিল্পপতি ওলিগার্ক (Oligrach) ওলিব দারাপাস্কার পরামর্শকের দায়িত্বও পালন করেছিল পল। এই সময় পল মাল্টি মিলিয়ন ডলার কামিয়ে নিয়েছিল। সে টাকা লুকিয়ে আমেরিকায় ফিরে এসেছিল। দেশে এসেও জালিয়াতিসহ নানা ধরনের অনিয়মের সাথে জড়িয়ে পড়েছিল। মার্কিন পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছিল। ২০১৯ সালে অর্থাৎ নির্বাচনী প্রচারণার পর নিউইয়র্কের আদালত তাকে ৭ বছরের কারাদণ্ড দেয়। এর মানে পলের অপরাধ প্রমাণিত হয়েছিল। পল এখনো জেলেই আছে। পল ছাড়া আরো কয়েকজন লোক ছিল, যারা পুতিনের অতি নিকটজনদের সাথে বছরের পর বছর কাজ করে এসেছে। রাশিয়ান হ্যাকাররা আমেরিকার দুটি দলেই তাদের চর ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল। ডেমোক্র্যাটদের কম্পিউটার হ্যাক হলেও রিপাবলিকান দলের নির্বাচনী প্রচারণার খোদ চেয়ারম্যানই রাশিয়ার মদদপুষ্ট ছিল।

ট্রাম্পের আরেক ঘনিষ্ঠ দোস্ত ছিল রব গোল্ডস্টোন। এই লোক জাতিতে ব্রিটিশ ছিল। এর সাহায্যেই ট্রাম্প ২০১৩ সালে মস্কোয় মিস ইউনিভার্স শো-র আয়োজন করেছিল। এই রবই মস্কোতে ট্রাম্প টাওয়ার নির্মাণের জন্য কাজ করেছিল। টাওয়ার নির্মাণের প্রস্তুতিমূলক কাজগুলোও সে করছিল। এই লোক ২০১৬ সালের জুনে ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারণার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সদস্য, ট্রাম্পের ছেলে ট্রাম্প জুনিয়রকে একটা ই-মেইল পাঠিয়েছিল, 'আমার কাছে অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর ও মজার বিষয় আছে। সরাসরি সাক্ষাৎ হলে বলব।' ই-মেইলে হালকা ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল। ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারণায় কাজে লাগবে, এমন কিছু ডকুমেন্ট রাশিয়ান কর্তৃপক্ষের কাছে আছে। এসব ডকুমেন্ট ফাঁস হলে হিলারির রাজনৈতিক ক্যারিয়ারকে নিমেষেই ধূলোয় মিশিয়ে দিবে। আপনার পিতাকে নিশ্চিতরূপে প্রেসিডেন্ট বানিয়ে দিবে। এই তথ্যগুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর, চরম গোপনীয়। এসব তথ্য পুতিন ও রাশিয়ান সরকারের পক্ষ থেকে ট্রাম্পের জন্য তোহফা হিসেবে পেশ করা হবে। এই ই-

...রেলের ঘটনা কোনো কন্সফিরেসি থিউরি নয়, এগুলো পত্র-পত্রিকাতেও প্রকাশ পেয়েছে। সার্চ দিলেই এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য হাতের নাগালে এসে যাবে। তথ্য আদান-প্রদানের জন্য ট্রাম্প টাওয়ার নির্মাণের নাম করে একটা মিটিংয়ের আয়োজন করা হলো। মিটিংটা হবে, এ কথা ই-মেইলে ছিল। মিটিংটা হয়েছিল কি না, সেটা নিয়ে নিশ্চিত কোনো সংবাদ নেই। ট্রাম্প এই মিটিংয়ের কথা বরাবরই অস্বীকার করে এসেছে। তবে আগের ই-মেইল চালাচালির বিস্তারিত তথ্য গোয়েন্দাদের কাছে মজুদ আছে।

গোপনে, লোকচক্ষুর অন্তরালে যখন এতকিছু হচ্ছিল, মার্কিন নাগরিক হিসেবে ট্রাম্পের উচিত ছিল, এসব বিষয় গোয়েন্দা বিভাগকে জানানো। শত্রু দেশের চরের সাথে সম্পর্ক রাখা তো মারাত্মক অপরাধ। ট্রাম্পের বলা উচিত ছিল, আমেরিকার নির্বাচনে রাশিয়া ইন্টারফেয়ারেন্স করছে। এই সংবাদ সরকারকে তাৎক্ষণিকভাবে জানানো ট্রাম্পের জাতীয় দায়িত্ব ছিল। বাস্তবে ট্রাম্প শিবির এমনকিছু করেনি। উল্টো ট্রাম্প শিবির সমস্ত তথ্য গোপন রেখে ভরপুর ফায়দা লুটেছে। এটা ছিল চরম দেশবিরোধী কাজ। ট্রাম্প নিজের প্রচারণায় ধর্মীয় চেতনা, দেশভক্তি, দেশপ্রেমের কথা বলতে বলতে মুখের ফেনা বের করে ফেলেছিল।

ইতিহাস সাক্ষী, যারাই জাতীয়তাবাদ, ধর্মীয় চেতনা, দেশপ্রেমের সাহায্যে নিজেদের দলীয় এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে চেয়েছে, তারা আসলে জাতিকে ধোঁকা দিয়েছে। ঈমানদারি, সততা, দেশপ্রেম প্রচারণার বিষয় নয়। এই বিষয়গুলো অক্সিজেনের মতো নিত্য অপরিহার্য বিষয়। গবেষণায় দেখা গেছে, যারা কথায় কথায় এসব বলে নিজেদের কোনো দলীয় বা গোষ্ঠীগত এজেন্ডা বাস্তবায়ন করার খায়েশ রাখে, তারা মূলত এসব চেতনার কথা বলে নিজের ভেতরকার চোরকেই লুকাতে চায়। ঠিক এ ধরনেরই কিছু একটা ডোনাল্ড ট্রাম্প করে চলছিল। সে রাশিয়ানদের কাছ থেকে সাহায্যও নিচ্ছিল, নিয়মিত ই-মেইল চালাচালিও করছিল। অন্যদিকে 'আমেরিকা ফার্স্ট, আমেরিকা সবার আগে, এই স্লোগান দিয়ে মুখের ফেনা বের করে ফেলছিল। নিজেকে সবচেয়ে বড় দেশপ্রেমিক আখ্যায়িত করত। ট্রাম্প সরাসরি বলত, আমি প্রেসিডেন্ট হয়ে হিলারি ক্লিনটনকে জেলে পুরব।

সস্তা জনপ্রিয়তা ও ভাঁড়ের মতো লোক হাসানোর জন্য ট্রাম্প প্রতিপক্ষের নিত্যনতুন নাম রাখত। হিলারিকে ক্রেজি হিলারি, ক্রুকড হিলারি, হার্টলেস

হিলারি, লাইন হিলারি বলে ডাকত। হিলারির পরিবারকে ওয়াইল্ড বুল বলে ডাকত। দ্বিতীয়বার যখন বাইডেনের বিরুদ্ধে নির্বাচনী প্রচারণায় নামল, তখনো তার পুরোনো অভ্যাস ছাড়তে পারেনি। বাইডেনকে ওয়ান পারসন জো, বেসম্যান জো, বিজিং জো, চায়না জো, করাপ্ট জো, ক্রেজি জো, হাইডেন জো, পয়েটপ্রো জো, স্লিপি জো, স্লিপি ক্রিপি জো, স্লো জো ইত্যাদিসহ আরো বহু নামে ডাকত। তার এসব কথা সোশ্যাল মিডিয়াতে হটকেকের মতো ভাইরাল হয়ে যেত। রাশিয়ান ট্রলবাজরা সেটাকে আরো কয়েকগুণ ভাইরাল করে দিত। ট্রাম্প তো এমনটাই চাইত। এসব করে নতুন প্রজন্মের কাছে ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা হু হু করে বেড়ে যেত।

যে সময় ট্রাম্প ও রাশিয়ান কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে হিলারির বিরুদ্ধে যোগসাজশ করে গোপন তথ্য আদান-প্রদান করছিল, স্পর্শকাতর তথ্য লেনদেন করছিল, তখন মার্কিন মিডিয়াতে ব্রেকিং নিউজ প্রচারিত হচ্ছিল, ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ও হিলারির নেটওয়ার্ক সিস্টেমকে রাশিয়ান হ্যাকাররা কয়েক মাস থেকে হ্যাক করে রেখেছে। রাশিয়ান হ্যাকারদের কাছে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির অগণিত ডাটা চলে গিয়েছিল। ট্রাম্প এ বিষয়টাকে উপজীব্য করে হিলারি ও তার পার্টিকে নিয়ে হাসি-মশকরা করতে শুরু করে দিলো। যে নিজের কম্পিউটারকে নিরাপদ রাখতে পারে না, সেই লোকই কিনা বলে, আমি আমেরিকাকে নিরাপত্তা দিব। অন্যদিকে ডেমোক্র্যাট শিবির পাল্টা জবাব দিলো, রাশিয়ানরা আমাদের ওয়েবসাইট হ্যাকিং করার কারণ হলো, ট্রাম্পকে নির্বাচনে জিতিয়ে দেওয়া।

ডেমোক্র্যাটরা এই হ্যাকিংয়ের ঘটনাকে তদন্ত করা ও রাশিয়ানরা ট্রাম্পকে কীভাবে সাহায্য করছে, এটা বের করার জন্য একটি সাইবার ইনভেস্টিগেশন ফার্ম 'ফিউশন জিপিএস'-কে ভাড়া করেছিল। এই ফার্মের লোকেরা ব্রিটেন ও রাশিয়ান গোয়েন্দাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ৩ পৃষ্ঠার একটি রিপোর্ট তৈরি করেছিল। তাতে বলা হয়েছে, ২০১৩ সালে ট্রাম্প যখন মস্কোতে মিস ইউনিভার্স আয়োজনে গিয়েছিল, তখন রাশিয়ান গোয়েন্দা সংস্থা এফএসবির লোকেরা ট্রাম্পের কিছু গোপন ভিডিও ফুটেজ ধারণ করেছিল। এসব ভিডিওতে ট্রাম্প পতিতাদের সাথে অপ্রীতিকর অবস্থার দৃশ্যও ধারণ করা হয়েছে। এই তথ্য এজন্যই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ট্রাম্প ছিল আমেরিকার সম্ভাব্য প্রেসিডেন্ট। রাশিয়ানরা এই ভিডিও ব্যবহার করে ট্রাম্পকে ব্ল্যাকমেইল করতে পারত। ডেমোক্র্যাট কর্মকর্তারা এই তথ্যগুলো এফবিআইয়ের কাছে জমা

গিয়েছিল। এফবিআই প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অঘোষিতভাবে তদন্ত শুরু করে দিলো। এই তদন্ত নির্বাচনের পরও চলতে থাকল।

নির্বাচনের আর বেশি দেরি নেই। রাশিয়া একশনে নেমে পড়ল। রাশিয়া নিজে মাঠে না নেমে আমেরিকার মোস্ট ওয়ান্টেড জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জকে কাজে লাগাল। হিলারিকে যেদিন আনুষ্ঠানিকভাবে ডেমোক্র্যাট দলের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দেওয়া হবে, তার ঠিক একদিন আগে ২২ জুলাই ২০১৬ সালে জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ একটা টুইট করল। সে টুইটে রাশিয়ার পক্ষ থেকে সরবরাহ করা তথ্যগুলো শেয়ার করা হয়েছিল। এই একটা টুইট মার্কিন নির্বাচনের গতিপ্রকৃতি আমূল বদলে দিয়েছিল।

রাশিয়ার পক্ষ থেকে দেওয়া তথ্যগুলো কী ছিল?
গ্রেট গেইমে জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জের কী ভূমিকা?
ট্রাম্প তাকে বারবার আই লাভ ইউ কেন বলে?

বারাক ওবামার বিবৃতি থেকে লোগো সরিয়ে ফেলতে বলেছিল এফবিআই, কেন? চীনে ওবামা ও পুতিনের মধ্যকার ওয়ান-টু-ওয়ান বৈঠকে একে অপরকে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছিল। কেন?

জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ

এই পর্যায়ে জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ গ্রেট গেইমে প্রবেশ করল। জুলিয়ান উইকিলিকসের প্রতিষ্ঠাতা। ইরাকে মার্কিন বাহিনীর চরম নির্যাতনের গোপন ভিডিও প্রকাশ করে জুলিয়ান বিশ্ব মিডিয়ার পাদপ্রদীপে এসেছিল। উইকিলিকসের ফাঁস করা প্রথম ভিডিওতে দেখা গেছে, ২০১০ সালে মার্কিন ড্রোন আট জনেরও বেশি সাধারণ ইরাকি নাগরিককে হত্যা করেছে। এর মধ্যে রয়টার্সের সাংবাদিকও ছিল। মার্কিন কর্তৃপক্ষ এই ধরনের ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে থাকে। জুলিয়ান মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে এসব প্রকাশ করেছিল। ড্রোন থেকে ফায়ার করার সময় মার্কিন অপারেটররা যে ভাষায় কথা বলছিল, সেটা চরম আপত্তিকর ছিল। ইরাকে মার্কিন সেনাদের বর্বরতা ও তাদের পাশবিক মানসিকতা দেখে পুরো বিশ্বজুড়ে নিন্দার ঝড় বয়ে গিয়েছিল। নিহতদেরকে আমেরিকা সন্ত্রাসী সাব্যস্ত করার জন্য নানা অপকৌশল করে গেছে। এরা সবাই নিতান্তই ছাপোষা নাগরিক ছিল। নিত্যদিনের মতো চাকুরি শেষে নিশ্চিন্ত মনে ক্লান্ত দেহে ঘরে ফিরছিল।

মার্কিন সেনারা তাদেরকে বেছে বেছে এক এক গুলি করে ঠান্ডা মাথায় খুন করেছিল। তাদের বিবেকে সামান্যতম দংশন হয়নি।

আমেরিকা অভিযোগ করেছিল, রাশিয়ান হ্যাকারদের সাথে নিয়েই জুলিয়ান এসব ভিডিও ফাঁস করেছে। আমেরিকার ভাষ্যমতে, রাশিয়ান হ্যাকাররা আমেরিকা-ইউরোপের অতিগোপন ডকুমেন্ট চুরি করে জুলিয়ানের হাতে তুলে দিত। জুলিয়ান সেসব সময়-সুযোগ বুঝে ফাঁস করত। এসব ভিডিও বা তথ্য ফাঁসের দ্বারা মার্কিনবিরোধী শক্তির উপকার হতো। অন্যায়ভাবে হ্যাকিংয়ের অভিযোগে ব্রিটিশ পুলিশ জুলিয়ানকে আটক করে লন্ডন কারাগারে পাঠিয়েছিল। আমেরিকা চেয়েছিল, জুলিয়ানকে আমেরিকায় নিয়ে বিচার করতে। আমেরিকার বারবার আবেদন সত্ত্বেও ব্রিটিশ আদালত জুলিয়ানকে মার্কিন কোর্টের কাছে সোপর্দ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। যেদিন মার্কিন ডেমোক্র্যাট পার্টি হিলারিকে তাদের দলীয় প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা দিবে, তার একদিন আগে জুলিয়ান একটা টুইট করে জানাল, সিরিজ আকারে ডেমোক্র্যাট পার্টির ২৫ হাজার অফিসিয়াল ই-মেইল প্রকাশ করতে চলেছে। পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ ধরে জুলিয়ান ধারাবাহিকভাবে সেই মেইলগুলো রিলিজ করেছিল। এখনো উইকিলিকসের ওয়েবসাইটে সেই ৩৪ হাজার ৪৪১টি ডকুমেন্টস মজুদ আছে। প্রতিবার নতুন ডকুমেন্টস রিলিজ হওয়ার পর ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রকাশ্য জনসভায় বলত, আই লাভ উইকিলিকস, আই লাভ ইউ বলে নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করত। তখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ছিল বারাক ওবামা। হিলারির সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। হিলারি ক্লিনটন ওবামা প্রশাসনের প্রথম পর্বে পররাষ্ট্রমন্ত্রীও ছিল। ওবামা রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার কারণে হিলারির পক্ষে সরাসরি কোনো বক্তব্য দিতে পারছিল না। মার্কিন নির্বাচনে রাশিয়ার অবৈধ হস্তক্ষেপ নিয়ে আমেরিকায় তখন তদন্ত চলছিল। রাশিয়ার পরোক্ষ সমর্থন ও সহযোগিতায় ট্রাম্প ক্রমাগত হিলারি ও ডেমোক্র্যাট শিবিরের ওপর হামলা চালিয়ে গিয়েছিল।

রাশিয়ান হ্যাকাররা ডেমোক্র্যাট পার্টির ই-মেইল হ্যাক করেই ক্ষান্ত হলো না, তারা আরেকটি বড় ধরনের ঘটনা ঘটাল। হিলারির নির্বাচনী প্রচারণা পরিষদের প্রধান জন ফডেস্টার ই-মেইলও হ্যাক করতে সক্ষম হয়েছিল। নির্বাচনের ৮ মাস আগে এপ্রিলে জন ফডেস্টা গুগলের পক্ষ থেকে একটা ই-মেইল পেল। তাতে বলা হয়েছিল, কেউ একজন আপনার পাসওয়ার্ড হ্যাক করার চেষ্টা করছে। পাসওয়ার্ড রিসেট করার জন্য অতি দ্রুত নিচের লিংকে

ক্লিক করুন। হ্যাকাররা এই পদ্ধতি অহরহ ব্যবহার করে থাকে। গুগল বা প্রসিদ্ধ কোনো প্রতিষ্ঠানের অফিসিয়াল ডিজাইন নকল করে ই-মেইল পাঠানো হয়। লিংকে ক্লিক করলেই হ্যাকারের হাতে কম্পিউটারের নিয়ন্ত্রণ চলে যায়। জন ফডেস্টা সাথে সাথে লিংকে ক্লিক না করে সতর্কতাবশত নিজেদের সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্টদের কাছে পাঠাল। এক্সপার্ট ই-মেইল দেখার সাথে সাথে ধরে ফেলল, এটা হ্যাকারদের পক্ষ থেকে এসেছে। রিপ্লাইতে জন ফডেস্টাকে লিখল :

This is illegitimate e-mail
'এটা অবৈধ ই-মেইল।'

এই সিকিউরিটি এক্সপার্ট এক ঐতিহাসিক টাইপিং মিসটেক করে বসেছিল। ইলিজিটিমেট লেখার সময় ভুল করে 'আইএল (il)' টাইপ করতে ভুলে গিয়েছিল। জন ফডেস্টা দেখল এক্সপার্ট এই মেইলকে 'লেজিটিমেট' মানে বৈধ বলেছে, সাথে সাথে লিংকে ক্লিক করল। পরিণতি যা হওয়ার তাই হলো। পুরো নেটওয়ার্কের নিয়ন্ত্রণ হ্যাকারের হাতে চলে গেল। হ্যাকার কালবিলম্ব না করে ডেমোক্র্যাট দলের সমস্ত নির্বাচনী তথ্য ডাউনলোড করে নিল। কয়েক মাস পর্যন্ত ডেমোক্র্যাটদের খবরও ছিল না তাদের কতবড় সর্বনাশ হয়ে চলছে। ডেমোক্র্যাট সাইবার এক্সপার্টরা যখন হ্যাকিং ধরতে পারল, ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে। ডেমোক্র্যাট পার্টি হ্যাকারকে ধরার জন্য ক্রাউডস্ট্রাইক (CROWDSTRIKE) নামক একটি সাইবার সিকিউরিটি ফার্মের সহযোগিতা নিল। ক্রাউডস্ট্রাইক কাজে নেমে পড়ল। তারা জানাল Fancy Bear ও Cozy Bear নামক দুটি রাশিয়ান হ্যাকিং গ্রুপ এই কাজের সাথে জড়িত। রাশিয়ানরা ধরা পড়ল কীভাবে? দুইভাবে তাদের ট্রেস বের করা গেছে,

ক. তারা রাশিয়ান ভাষা ও পদ্ধতিতে কোডিং করেছিল।

খ. তাদের কাজের সময়ের সাথে পূর্ব রাশিয়ান অফিস টাইমের পুরোপুরি মিল। অর্থাৎ, ক্রেমলিনে যে সময় অফিস চলে, হ্যাকাররা সে সময়ই সাধারণত সাইবার চৌর্যবৃত্তি করেছে। রাশিয়ান অফিস-আদালত ছুটির সময় হ্যাকাররাও কাজে বিরতি দিয়ে ছুটিতে যেত।

এই ই-মেইলগুলোই জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জের হাতে এসেছিল। এই ই-মেইল ফাঁসের ঘটনা ট্রাম্পকে নিরঙ্কুশ সুবিধা দিয়েছিল। রাশিয়ান কর্তৃপক্ষ

পরিকল্পনা করেই ট্রাম্পকে এই সুবিধা দেয়। রাশিয়ান হ্যাকারদের এসব কর্মকাণ্ডের বিবরণী নিয়মিত ওবামার কাছে পৌঁছছিল। ওবামা সরাসরি পুতিনের সাথে কথা বলার সিদ্ধান্ত নিল। মার্কিন নির্বাচনের তিন মাস আগে ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বরে চীনে জি-২০ সামিট হচ্ছিল। এখানেই পুতিন ও ওবামার সাক্ষাৎ হলো। রুদ্ধদ্বার বৈঠকে অনুবাদক ছাড়া আর কেউ ছিল না। বন্ধ কামরায় দুই প্রেসিডেন্টের মধ্যে কী কথাবার্তা হয়েছে, তার প্রকাশ্য বিবরণীতে বলা হয়েছে, দুজনের মধ্যে ইউক্রেন ও সিরিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে কথাবার্তা হয়েছে। আলোচনার আসল বিষয় অফিসিয়াল বিবৃতিতে ছিল না। ওবামা মূলত পুতিনকে সতর্ক করেছিল। রাশিয়া যদি মার্কিন নির্বাচন নিয়ে নাক গলানো বন্ধ না করে, তাহলে এর পরিণতি হবে ভয়াবহ। দুজনের এই বৈঠক নির্ধারিত সময়ের চেয়েও দীর্ঘায়িত হয়েছিল। দুজনের চেহারাতেই ক্লান্তি-বিরক্তি ও নৈরাশ্যের ছাপ স্পষ্ট ছিল। পুতিন সে সময় কোনো মন্তব্য করেনি। এর চার দিন আগে মার্কিন নির্বাচনে হ্যাকিং সম্পর্কে যখন তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, পুতিন তখন মার্কিন মিডিয়া ব্লুমবার্গকে অত্যন্ত অর্থপূর্ণ উত্তর দিয়েছিল। হয়তো ওবামার সাথে বৈঠকেও পুতিন একই উত্তর দিয়েছিল। পুতিন ব্লুমবার্গকে বলেছিল, আমি এ ব্যাপারে কিছুই জানি না। রাশিয়া কখনো রাষ্ট্রীয়ভাবে এসব করে না। ইন্টারভিউকারীকে পুতিন পাল্টা প্রশ্ন করেছিল, মার্কিন নেটওয়ার্ক কে হ্যাক করেছে, এটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ নাকি এই হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে মার্কিন জনগণের সামনে যে গোপন বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে, সেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ? পুতিন একটি বিষয়ের দিকে ইশারা করেছিল। হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে ফাঁস হওয়া ডকুমেন্টের সাহায্যে মার্কিনিরা জানতে পেরেছিল, ডেমোক্র্যাট কর্তৃপক্ষ হিলারিকে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেওয়ার জন্য বাড়তি চেষ্টা করেছে। বিপরীতে অন্য প্রার্থী বার্নি স্যান্ডার্সকে কম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। পুতিন এটাকে ডেমোক্র্যাট পার্টির অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি বলতে চাচ্ছিল। উইকিলিকসে ফাঁস হওয়া তথ্যেও এর সত্যতা মিলছিল। পুতিন ধূর্ত কৌশলে অভিযোগের তির উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল।

বারাক ওবামা চাচ্ছিল, মার্কিন নির্বাচনে রাশিয়ান হ্যাকার ও ক্রেমলিনের এই নোংরা অনুপ্রবেশের বিস্তারিত চিত্র মার্কিন জনগণের সামনে নিয়ে আসতে। ওবামা প্রকাশ্যে প্রমাণ করতে চাচ্ছিল, রাশিয়া নির্লজ্জভাবে প্রকাশ্যে ট্রাম্পকে নির্বাচনে জিতিয়ে আনার নোংরা খেলায় মেতে উঠেছে। ওবামা আহরিত সমস্ত

তথ্য-উপাত্ত সিনেটের সামনে পেশ করল। ওবামা আহ্বান জানাল, সমস্ত সিনেটর মিলে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যৌথ বিবৃতি দিতে হবে। সিনেট এমন জয়েন্ট স্টেটম্যান্ট দিতে অস্বীকৃতি জানাল। সিনেটে ব্যর্থ হয়ে ওবামা এবার নিরাপত্তা সংস্থাগুলোকে যৌথ বিবৃতি দিতে বলল। এই প্রস্তাব নিয়েও তুমুল আলোচনা-বিতর্ক হলো। সুস্পষ্ট কোনো প্রমাণ ছাড়া বিবৃতিতে পুতিনের নাম উল্লেখ করা হবে কি হবে না? কয়েকবার বৈঠকের পর সিদ্ধান্ত হলো, রাশিয়ান হামলার কথা মার্কিন জনগণকে জানানো হবে; তবে পুতিনের নাম সরাসরি না দিয়ে ইশারায় কাজ সারা হবে। মার্কিন কূটনীতিবিদরা অনেক ভেবেচিন্তে একটা বিবৃতি দাঁড় করালো। আমেরিকার প্রায় সব সংস্থা একে একে এতে স্বাক্ষর করল। এফবিআই, সিআইএ, এনএসএ, ডিএইচএস ইত্যাদি। অপ্রত্যাশিতভাবে একেবারে শেষমুহূর্তে এফবিআই নিজেদের লোগো সরিয়ে নিল। তারা যুক্তি দেখাল, এফবিআইয়ের কাজ হলো অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার দিক দেখা। এই বিবৃতির মাধ্যমে কোনো একটি দল নির্বাচনে বাড়তি সুবিধা পাবে। নির্বাচনের ঠিক আগমুহূর্তে একটি দলের ক্ষতি ও একটি দলের উপকার হয়, এমন কিছুর সাথে এফবিআইকে না জড়ানোই উত্তম।

শেষে ঠিক হলো, হোয়াইট হাউজের দুটি এজেন্সি ডিএইচএস ও এনএসএর মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা সরকারিভাবে এই বিবৃতি প্রকাশ করবে। এই দুটি সংস্থা আমেরিকার সমস্ত নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর মিলনস্থল বলা যেতে পারে। ২০১৬ সালের ৭ অক্টোবর প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। এরপর মার্কিন নির্বাচনের মাত্র এক মাসের চেয়ে কিছু সময় বাকি থাকবে। এই বিবৃতি প্রকাশিত হলে, আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর সংবাদ হতো। মার্কিন প্রশাসন আরেকটি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে লিখিতভাবে অভিযোগ করছে। আমেরিকার ইতিহাসে এমনটা আগে কখনো ঘটেনি। এখানেও আরেকটা নাটক মঞ্চস্থ হলো। রাশিয়ান হ্যাকার, পুতিন, জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ, ট্রাম্পসহ সবাই যেন এই সংবাদকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য মুখিয়ে ছিল। এমনকি প্রকৃতিও। এই সংবাদের বিরুদ্ধে যেন গোটা দুনিয়া একাট্টা হয়ে গিয়েছিল। এই আণবিক বোমাসদৃশ বিবৃতি প্রকাশের কয়েকদিন আগে ৫ মাত্রার সামুদ্রিক হ্যারিকেন ম্যাথিউ পূর্ব মার্কিন উপকূলীয় অঞ্চলে প্রচণ্ড বেগে আছড়ে পড়ল। ৬০০ এর বেশি মার্কিনি মারা গিয়েছিল। এই হ্যারিকেনে আমেরিকার সাড়ে ১৬ বিলিয়ন ডলারের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। গোটা মার্কিন মিডিয়া এই সংবাদে সয়লাব হয়ে গিয়েছিল। এই তুফান প্রত্যাশিত ছিল।

কয়েক সপ্তাহ আগে থেকেই এই তুফানের সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছিল। অপ্রত্যাশিতভাবে আরেকটা তুফানও আঘাত হানল। ৭ অক্টোবরে রাশিয়াবিরোধী বিবৃতি প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল। ঠিক সেদিনই ওয়াশিংটন পোস্টে ট্রাম্পের পুরোনো ভিডিও প্রকাশিত হলো। ২০০৫ সালে ধারণকৃত ট্রাম্পের এক গোপন কথোপকথনের রেকর্ড ছিল। আমেরিকার এক টিভি শোতে বিলি বুশ নামক এক নারীর সাথে ট্রাম্প কথোপকথনটা করেছিল। ট্রাম্পকে বলতে শোনা গেছে, টাকার বিনিময়ে ট্রাম্প চাইলে যেকোনো নারীর সাথে 'সময়' কাটাতে পারে। এমনকি ট্রাম্প চাইলে সেসব নারীকে যেভাবে ইচ্ছা ধরে নিয়ে যেতে পারে। যে নারী সম্পর্কে ট্রাম্প মন্তব্য করছিল, তাকে পুরো আমেরিকা চিনত। সে নারীর ঘর-সংসার ছিল। তার স্বামীও প্রসিদ্ধ ছিল। এই সংবাদের ধাক্কায় ওবামার বিবৃতির গুরুত্বকে একদম তলানিতে ঠেকাল। এরপর আকেটা সংবাদ এলো। এবারের আক্রমণ ছিল জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জের পক্ষ থেকে। বিকেল ৪:৩২ মিনিটে উইকিলিকসে ঘোষণা দেওয়া হলো, তারা হিলারির নির্বাচনী প্রচারণার প্রধান জন ফডেস্টার ব্যক্তিগত ই-মেইল প্রকাশ করতে যাচ্ছে। এই সংবাদের ধাক্কায় ওবামার বিবৃতির প্রকাশকে আরো পিছিয়ে দিলো। ট্রাম্পের কিছু ম্যাজিকাল ফলোয়ার ছিল। তারা ট্রাম্পের এহেন নোংরা কথোপকথনেও বিন্দুমাত্র রাগ করল না। তারা আগের মতোই ট্রাম্পের প্রতি অন্ধ অনুরক্ত থাকল। উল্টো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ট্রাম্পে আগের চেয়ে বেশি প্রসিদ্ধি পেতে লাগল। হিলারি আশায় আশায় ছিল, গোয়েন্দা সংস্থার তদন্তের ফলাফল তার জন্য অনুকূল ফল বয়ে আনবে। উল্টো ট্রাম্প আরো লাভবান হয়ে গেল। ব্রিটিশ ফার্ম ক্যামব্রিজ এনালিটিকার সাহায্যে ফেসবুক থেকে মার্কিন ভোটারদের ব্যক্তিগত তথ্য হাতিয়ে নিয়েছিল। অনেক ফেইক আইডির নিয়ন্ত্রণ পেয়ে গিয়েছিল। ফেসবুকের এই মহা দুর্বলতার জন্য মার্ক জুকারবার্গকে ওয়াশিংটনে বিচারিক জেরার মুখে পড়তে হয়েছিল। জুকারবার্গকে বারবার কোর্টে হাজিরা দিতে হয়েছিল। জুকারবার্গ এ কথা স্বীকার করেছিল, ফেসবুক থেকে ব্যক্তিগত তথ্য পাচার হয়। পুতিনও এই ঘটনার সাথে জড়িয়ে পড়েছিল। পুতিনের কাছেও ডাটা চলে গিয়েছিল। রাশিয়ার এক তেল ব্যবসায়ীর মাধ্যমে ডাটাগুলো পুতিন হস্তগত করে।

পুতিনের সাইবার আর্মি ও ট্রাম্পের ফেসবুক আর্মি মিলে হাজারো ফেইক টুইটার-ফেসবুক একাউন্ট বানিয়েছিল। একেকজন বিশটিরও বেশি একাউন্ট

দিয়ে নিজেদেরকে আমেরিকান সাজিয়ে বিভিন্ন ওয়েবসাইট ও পত্রিকার খবরে কমেন্ট করতে শুরু করে। ট্রাম্পের পক্ষে, হিলারির বিপক্ষে। প্রত্যেক হাজারো কমেন্ট পোস্ট করা হতো এমন আইডি থেকে। ক্যামব্রিজ এনালিটিকা ৫০ লাখেরও বেশি রিয়েল আইডির ডাটা হ্যাক করে ট্রাম্পের হাতে তুলে দিয়েছিল। প্রোফাইলের মালিকরা টেরও পায়নি, তাদের সমস্ত তথ্য ট্রাম্পের হাতে চলে গেছে। ক্যামব্রিজ এনালিটিকার একজন কর্মী ক্রিস্টোফার উইলি এই সংবাদ ফাঁস করে দিয়েছিল। ক্রিস্টোফারের মোট ১৭ পৃষ্ঠার স্টেটম্যান্ট আমেরিকার আইন বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছিল। ক্রিস্টোফার এই বক্তব্য মার্কিন বিচার বিভাগের সামনে পেশ করেছিল। ক্রিস্টোফার সবিস্তারে তুলে ধরেছিল, কীভাবে ক্যামব্রিজ এনালিটিকা, ফেসবুক ও রাশিয়া মিলে মার্কিন নির্বাচনকে ট্রাম্পের অনুকূলে প্রবাহিত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। ক্রিস্টোফার এসব তথ্য ব্যবহার করে বইও লিখেছিল।

২০১৮ সালের এপ্রিলে জুকারবার্গ মার্কিন সিনেট কমিটির সামনে স্বীকার করেছিল, 'ফেসবুক ফেইক নিউজের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যর্থতা। আমি ফেসবুকের অপব্যবহার রোধে ব্যর্থ হয়েছি। আমি মার্কিন জনগণের কাছে এজন্য ক্ষমাপ্রার্থী। আমি ফেসবুক সংস্কারের ওয়াদা করছি।'

এটা ছিল জুকারবার্গের কথার কথা। এখনো ফেসবুক মিথ্যা সংবাদের জন্য দেদারসে ব্যবহৃত হচ্ছে। জুকারবার্গের স্বীকারোক্তিতে ফেসবুকের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের ফেসবুক প্রোফাইল ডিলিট করতে শুরু করে দিয়েছিল। সে ধাক্কায় ১১৯ বিলিয়ন ডলার ক্ষতির মাশুল গুনেছিল ফেসবুক। আজও পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি আনইনস্টল হওয়া অ্যাপের শীর্ষে আছে। এজন্য ফেসবুক নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে দৌড়ঝাঁপ শুরু করে দিয়েছে। নিজেদেরকে নতুন নামে পরিচিত করার চেষ্টা করছে। নাম দিয়েছে মেটা। বলা যেতে পারে, নাম পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে। ইনস্টাগ্রাম ও হোয়াটসঅ্যাপ কিনেছে। যাতে ফেসবুকের মৃত্যু হলে বিকল্প মাধ্যম ধরে জীবিত থাকতে পারে।

২০১৬ সালের ৮ নভেম্বর নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হলো। পুরো দুনিয়া হতবাক হয়ে গেল। ট্রাম্প কম ভোট (৪৬.১%) পেয়ে বেশি আসন নিয়ে

জিতে গেছে। হিলারি বেশি ভোট (৪৮.২%) পেয়ে হেরে গেছে। চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশের সময় রাশিয়ার ডুমায় অধিবেশন চলছিল। ট্রাম্পের জেতার সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে ডুমার সদস্যরা আনন্দে তালি বাজিয়েছিল। বিজয় অনুষ্ঠানে ট্রাম্প বলেছিল, রুশ প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে সুন্দর একটি অভিবাদন-চিঠি পেয়েছি। নির্বাচনে জেতার পঞ্চম দিন ট্রাম্প ও পুতিন ফোনালাপও করেছিল। রাশিয়া-মার্কিন সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ব্যাপারে দুজনে জোর দিয়েছিল। ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে ওবামা ঘোষণা দিয়ে নির্বাচনের ফুল রিভিউর নির্দেশ জারি করেছিল। রিভিউতে আবারো পরিষ্কার হয়েছিল, মার্কিন নির্বাচনে রাশিয়ার হাত ছিল। মার্কিন তদন্তকারী দল রিপোর্টে বলেছিল, রাশিয়ান সরকার রাষ্ট্রীয় মিডিয়া, তৃতীয়পক্ষের হ্যাকার, পয়সা দিয়ে কেনা সোশ্যাল মিডিয়ার ট্রলারদের মাধ্যমে মার্কিন নির্বাচনের ফলাফলকে নিজেদের মর্জিমতো চালানোর চেষ্টা করেছে। রিপোর্টে ১৭ বার ট্রাম্পের নাম ছিল। রিপোর্টে বলা হয়েছিল, ট্রাম্পকে জেতানোর ব্যাপারে রাশিয়ান সরকারের সুস্পষ্ট অবস্থান ছিল। মার্কিন পত্রপত্রিকায় এ বিষয়ে ব্যাপক লেখালেখি হয়েছে। অসংখ্য বইও লেখা হয়েছে। ট্রাম্প ও পুতিন উভয়ে এ ধরনের অপবাদকে হাস্যকর আর ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছিল। তারা বলেছিল, নির্বাচনে রাশিয়ান হস্তক্ষেপের কথা সম্পূর্ণ বানোয়াট।

এসব ঘটনায় রাশিয়ান কৌশল আর মার্কিন অসহায়ত্ব পরিষ্কার হয়ে যায়। অন্যদিকে চীনও খুব দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। প্যাসিফিক ওশনে চীনকে কোনঠাসা করার জন্য আমেরিকা হেন কাজ নেই করছে না। চীনবিরোধী দেশগুলোকে নিয়ে আমেরিকা মহাজোট গঠন করেছে। কারণ, চীন প্যাসিফিক ওশন, ইন্ডিয়ান ওশন, আটলান্টিক ওশন ও সাউথ চায়না সি-তে আমেরিকার চেয়েও মজবুত সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করছে। এ ধরনের ঘাঁটি এখনো সংখ্যায় কম হলেও অত্যন্ত দ্রুতগতিতে আধুনিক হয়ে উঠছে। পরিমাণেও বাড়ছে। প্যাসিফিক ওশনে মোতায়েন করা মার্কিন সেনা অফিসারদের মতে, আমাদের সামরিক প্রযুক্তি এখনো চীনের চেয়ে অনেক এগিয়ে। তবে এই এগিয়ে থাকার ব্যবধান দিনদিন দ্রুতগতিতে কমে আসছে। চীন যে হারে অগ্রসর হচ্ছে, এই ব্যবধান বেশিদিন থাকবে না। চীনের সাথে আমেরিকা যুদ্ধ করবে—কয়েক বছর আগেও এটা অলীক কল্পনা ছিল। এখন অবস্থা বদলে গেছে। প্যাসিফিক ওশনকে চীনের থাবা থেকে বাঁচাতে আমেরিকা, ব্রিটেন ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে ত্রিদেশীয় সামরিক জোট গড়ে উঠেছে। এটাকে অকাস (AUKUS) বলা

হয়। এই জোটে আমেরিকাই মূল খেলোয়াড়। আস্ট্রেলিয়াকে গড়ে তোলার কাজ চলছে। আমেরিকা ও ব্রিটেন ছাড়া অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে চীনের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো অসম্ভব। অস্ট্রেলিয়ার চারিদিকেই প্রশান্ত মহাসাগর। আশেপাশে চীনের চেয়ে বড় কোনো নৌশক্তি নেই। নৌশক্তির সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হলো বিমানবাহী রণতরী ও সাবমেরিন।

সাবমেরিন বা ডুবোজাহাজ সাধারণত ডিজেল বা বিদ্যুৎচালিত হয়ে থাকে। সবচেয়ে শক্তিশালী হলো নিউক্লিয়ার সাবমেরিন। বর্তমানে বিশ্বে মাত্র ছয়টি দেশের কাছে নিউক্লিয়ার সাবমেরিন আছে। আমেরিকার কাছে ৬৮টি নিউক্লিয়ার সাবমেরিন আছে। রাশিয়ার কাছে ২৯, চীনের কাছে ১২টি, ব্রিটেনের কাছে ১১টি, ফ্রান্সের কাছে ৮টি, ইন্ডিয়ার কাছে ১টি আছে। নিউক্লিয়ার সাবমেরিন বছরের পর বছর সাগরতলে ডুব দিয়ে থাকতে পারে। রিফুয়েলিংয়ের জন্য বারবার সমুদ্রপৃষ্ঠে ভেসে উঠতে হয় না। ডিজেল ও ইলেকট্রিকচালিত সাবমেরিনকে বারবার উঠে আসতে হয়। ইলেকট্রিক ও ডিজেলচালিত সাবমেরিন আকারে ছোট হয়ে থাকে। সহজেই রাডার এসব সাবমেরিনকে ডিটেক্ট করে ফেলে। নিউক্লিয়ার সাবমেরিন আকারে বিশাল হয়ে থাকে। চলাচলে কোনো আওয়াজ হয় না। এজন্য রাডার ডিটেক্ট করতে পারে না। রাডার দিয়ে নিউক্লিয়ার সাবমেরিনকে ডিটেক্ট করা, মরুভূমিতে সুঁই খোঁজার চেয়েও কঠিন। নিউক্লিয়ার সাবমেরিন থেকে কোনো মিসাইল ছোড়া হলে শুধু তখনই সেটার উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। এসব মিসাইল কনভেনশনালও হতে পারে, নিউক্লিয়ার ওয়ারহেডবিশিষ্টও হতে পারে। চীনের এমন নিউক্লিয়ার সাবমেরিনসমৃদ্ধ নৌবহরকে ঠেকানোর জন্যই মূলত অকাস গঠিত হয়েছে। আমেরিকা-ব্রিটেন মিলে অস্ট্রেলিয়াকে একটি নিউক্লিয়ার সাবমেরিন দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। চীন অত্যন্ত শক্তভাষায় এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়েছে। চায়নিজ সংবাদ সংস্থার মতে, অস্ট্রেলিয়া ইতিমধ্যে নিজেকে চীনের দুশমন ঘোষণা করে দিয়েছে। অস্ট্রেলিয়া যত অস্ত্রই কিনুক, চীনের কাছে একটা মার্কিন কুকুরের চেয়ে বেশি গুরুত্ব বহন করে না। যদি কখনো এসব ঠুনকো অস্ত্রের ধোঁকায় পড়ে চীনের মোকাবেলায় আসার চেষ্টা করে, তাকে নিষ্ঠুরভাবে পেটানো হবে। এটা তো ছিল চায়নিজ পত্রিকার বক্তব্য। চীনা পররাষ্ট্র দপ্তরও কঠিন প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। বলেছে, আমেরিকা ও ব্রিটেন খুবই স্বল্পবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে। ত্রিদেশীয় সামরিক জোট বানানো নিতান্তই দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ। এই তিন দেশের শীতলযুদ্ধ মানসিকতার সাজা তাদেরকেই ভোগ করতে হবে।

আমরা জানি, আশির দশকে রাশিয়া ও আমেরিকার শীতলযুদ্ধে অপরকে ছোট করার জন্য, নিচু করার জন্য সারাক্ষণ মেতে থাকত। রাষ্ট্র নিজ বলয়ের দেশকে অস্ত্র দিয়ে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রক্সিযুদ্ধের উসকানি দিত। চীন শুরু থেকেই আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়ার ক্রমবর্ধমান দহ মহরম দেখে আসছিল। অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে বড় বাণিজ্যসঙ্গী ছিল চী চীনে ওয়াইন ব্যবসা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। অস্ট্রেলিয়ার ৩৯% ওয় চীন ক্রয় করত। আমেরিকার সাথে সম্পর্কের শাস্তি দেওয়ার জন্য অস্ট্রেলি থেকে আমদানিকৃত ওয়াইনের ওপর ২০০% ট্যাক্স বসিয়ে দিয়েছে। চল গ্রেট গেইমে চীন কতটা মরিয়া হয়ে লড়তে শুরু করে দিয়েছে, এটি একটি নমুনা। চায়নিজ সংবাদ মাধ্যম নিয়মিত ত্রিদেশীয় জোটের বিরু কিছু না-কিছু না বললে শান্তি পায় না। চীন বলে, এই জোট আণবিক অস্ত্রে চোরাচালানের সাথে জড়িত। এমনিভাবেই চীন ও রাশিয়া একা বা যৌথভা আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ জারি রেখেছে, আমেরিকার ইজারাদারিকে প্রতিনিয়ত চ্যালেঞ্জ করে চলছে। আমেরিকাও তাই। জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে উভয়পক্ষের যুদ্ধ জারি আছে। কূটনীতি, অর্থনীতি ও সমরনীতিতে মরণপ লড়াইয়ের প্রস্তুতি চলছে।

নেভাল ওয়ার : নৌযুদ্ধ

সাগরে আমেরিকা ও চীনের গ্রেট গেইম নতুন মাত্রায় চলে গেছে। পেন্টাগন এই বছর চীনের কাছে তার পাঁচটি বিমানবাহী রণতরী মোতায়েন করতে যাচ্ছে। অর্থাৎ আমেরিকা তার ৫০% নৌশক্তি চীনের নাকের ডগায় বসাতে চলছে। চীনকে বন্দুকের নিশানায় রাখতেই এই ব্যবস্থা।

একটি এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারে কয়েক ডজন যুদ্ধবিমান রাখা যায়। বিমানবাহী রণতরীকে ভাসমান শহরও বলা হয়। কারণ, এটি বছরের পর বছর উপকূলে ভেড়া ছাড়াই সাগরে ভেসে থাকতে পারে। একটি শহরে যা যা থাকা দরকার, তার সবই নির্দিষ্ট পরিমাণে একটি এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারে থাকে। আজ পর্যন্ত সবচেয়ে বড় যুদ্ধাস্ত্রের নাম 'এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার'। একমাত্র পরাশক্তির কাছেই এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার থাকে। এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার শৌর্যবীর্যের প্রতীক। আণবিক বোমা ছোড়া থেকে শুরু করে বিমান বহরে হামলা—সবকিছুই এর মাধ্যমে সম্ভব। এটি সাধারণত বিমানবাহী রণতরী হিসেবে পরিচিত হলেও, এটিকে মোবাইল এয়ারবেস, নেভাল ক্যারিয়ার ও ফ্লোটিং

নৌবহরেও বলা হয়। এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের কারণে পৃথিবীর কোনো অঞ্চলই মার্কিন হামলা-থাবার বাইরে নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত আমেরিকা প্রতিটি যুদ্ধে ব্যাপক সাফল্যের সাথে এই যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করে আসছে। বর্তমানে এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার আমেরিকার 'স্ট্যাটাস সিম্বল'-মর্যাদার প্রতীকে পরিণত হয়েছে। সারা বিশ্বের সমর বিশেষজ্ঞদের একটি চোখ সবসময় মার্কিন এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারগুলোর দিকে নিবদ্ধ থাকে। আমেরিকা কোনো এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিতে শুরু করলে বিশ্বমিডিয়াতে আলোড়ন ওঠে, বোধহয় গুরুতর কিছু ঘটতে চলছে? পেন্টাগন এই অস্ত্র দিয়েই চীনকে টার্গেট করছে। আঙ্কেল স্যাম (আমেরিকা) স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, একমাত্র চায়নিজ ড্রাগনই তার বৈশ্বিক সামরিক শক্তি এবং ক্ষয়িষ্ণু বিশ্বব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে, বিকল্প হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। চীন ধীরে ধীরে সেটা করেও চলছে। এজন্যই আমেরিকা আগ্রাসী আর বেপরোয়াভাবে চীনকে চারিদিক থেকে ঘেরাও করতে শুরু করেছে। অন্য ভাষায় বলতে গেলে, আমেরিকা চীনকে হয়রানি করছে, উত্যক্ত করে চলছে। এটা পরিষ্কার, চায়নিজ ড্রাগনও ঘুমিয়ে নেই। চায়নার সামরিক শক্তি এখনো আমেরিকার মতো নয়। মার্কিন এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারকে টেক্কা দেওয়ার জন্য চীনও পুরোদমে মাঠে নেমে পড়েছে।

আমরা দেখার চেষ্টা করব, এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার বিশ্বশক্তির লড়াইয়ে কেন এত গুরুত্বপূর্ণ? মার্কিন এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের মোকাবেলা করার জন্য চীন কীভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছে? চীন কি আমেরিকার নৌপ্রযুক্তি ও শক্তিকে হারাতে পারবে?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বর্তমানে ১১টি বিমানবাহী রণতরী আছে। এর মধ্যে প্রথম ১০টি রণতরী একই নকশায় তৈরি হয়েছে। সেগুলোর আকার-প্রকার ও সামরিক শক্তি প্রায় অভিন্ন। ১০টি রণতরী যথাক্রমে, নিমিটজ আইজেনহাওয়ার, কার্ল ভিনসন, থিওডোর রুজভেল্ট, আব্রাহাম লিঙ্কন, জর্জ ওয়াশিংটন, জন স্টেনিস, হ্যারি ট্রুম্যান, রোনাল্ড রিগান এবং জর্জ বুশ। বেশিরভাগ নাম সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রপতিদের নামেই পরিচিত।

এগারোতম এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের নাম জেরাল্ড ফোর্ড। এটাকে অত্যাধুনিক রণতরী বলা যেতে পারে। জেরাল্ড ফোর্ড এখন পর্যন্ত বিশ্বের বৃহত্তম এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার। এটাকে সুপার ক্যারিয়ার বলা হয়। মার্কিন

রণতরীগুলো পারমাণবিক শক্তি দিয়ে চলে। এ কারণে রণতরীগুলো বছরের পর বছর স্থলঘাঁটি থেকে দূরে সমুদ্রে থাকতে পারে। জেরাল্ড ফোর্ড ছাড়া বাকি ১০টি ক্যারিয়ারের প্রতিটিতে অন্তত ৬০টি বিমান বা হেলিকপ্টার দাঁড়াতে পারে। প্রতিটি ক্যারিয়ারে ৫২০০ জন কর্মী কাজ করে। সুপার ক্যারিয়ার জেরাল্ড ফোর্ডে অতিরিক্ত ১৫টি যুদ্ধবিমান বা হেলিকপ্টার দাঁড়াতে পারে। মোট ৭৫টি বিমান এখানে পার্ক করা যাবে। আকারে বিশাল হওয়া সত্ত্বেও জেরাল্ড ফোর্ডে অন্য মার্কিন ক্যারিয়ারের তুলনায় কম ক্রু (কর্মী) প্রয়োজন হয়। ৪৫০০ ক্রু দিয়েই কাজ চলে যায়। কর্মীসংখ্যা কম হওয়া সত্ত্বেও জেরাল্ড ফোর্ড অন্য ক্যারিয়ারের তুলনায় অনেক বেশি কাজ দেখাতে সক্ষম। এটার অতি উন্নত প্রযুক্তি ক্রু ঘাটতি পুষিয়ে দেয়। কম কর্মী নিয়ে বেশি যুদ্ধবিমান ওড়ানো যায়।

এই ১১টি ক্যারিয়ারের বাইরে আমেরিকা আরো দুটি সুপার এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার (জন এফ কেনেডি, ইউএসএস এন্টারপ্রাইজ) নিয়ে কাজ করছে। জন এফ কেনেডির ৯০ শতাংশ কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেছে। ক্যারিয়ারটি আগামী বছর (২০২৫) মার্কিন নৌবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করার সম্ভাবনা আছে। তৃতীয় আরেকটি সুপার ক্যারিয়ার (ডরিস মিলার) নির্মাণের পরিকল্পনাও চলছে। ডরিস মিলার ছিলেন একজন কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকান, যিনি পার্ল হারবারে আকস্মিক আক্রমণে জাপানি জেটগুলোকে গুলি করে নামিয়েছিল। ডরিস জাপানি হামলার হাত থেকে বহু মার্কিন সেনার জীবন বাঁচিয়েছিল। তার সম্মানে নতুন ক্যারিয়ারের নামকরণ করা হয়েছে।

হিসাব মেলালে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আমেরিকার কাছে ১৪টির মতো এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার থাকবে চারটি সুপার ক্যারিয়ারসহ। এতগুলো এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার আর কোনো দেশের নেই। চীন ছাড়া আর কোনো দেশেরই দুটির বেশি এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার নেই। বর্তমান বিশ্বে মোট ২৭টি এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার আছে। এর মধ্যে ১১টি আমেরিকার হাতে।

আমেরিকার মোকাবেলায় এই মুহূর্তে চীনের হাতে তিনটি বিমানবাহী রণতরী আছে। সংখ্যায় অত্যন্ত অপ্রতুল। ক্ষমতার ভারসাম্য আনার জন্য চীন দ্বিমুখী কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে :

ক. যুদ্ধ বেধে গেলে মার্কিন রণতরীগুলোকে চীনের ধারেকাছেও ঘেঁষতে না দেওয়া। এমন ব্যবস্থা প্রস্তুত রাখা, রণতরীগুলো কাছে ঘেঁষার আগেই যাতে ধ্বংস করে ফেলা যায়।

৫. নতুন ও উন্নত বিমানবাহী রণতরী নির্মাণ শুরু করে দেওয়া।

এ কৌশলের আওতায় চীনের কাছে বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র ও টর্পেডো আছে। এর মধ্যে দুটি ভূমি থেকে উৎক্ষেপণযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র (DF-26 ও DF-21-D) খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দুটি ক্ষেপণাস্ত্রই ভ্রাম্যমাণ যানে বসানো হয়। এজন্য এগুলোকে নড়াচড়া ও স্থানান্তর করা খুবই সহজ। মিসাইলগুলো ভয়াবহ ধ্বংসাত্মক, এগুলোকে 'ক্যারিয়ার-কিলার (রণতরী খেকো) মিসাইলও বলা হয়। দুটির মধ্যে প্রথম DF-26 বেশি ধ্বংসাত্মক। এটি ৪০০০ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত সমুদ্রপৃষ্ঠের যেকোনো লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে পারে। এটি এটমিক ওয়ারহেডও বহন করতে পারে। অর্থাৎ এটি একটি পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র।

আরেকটি ক্ষেপণাস্ত্র DF21D-এর পাল্লা ২১০০ কিলোমিটারের বেশি। এটি প্রায় ৬০০ কিলোগ্রাম বারুদ বহন করতে পারে। চীন উভয় মিসাইল দক্ষিণ চীন সাগরে কৃত্রিমভাবে নির্মিত দ্বীপে স্থাপন করছে। বিশেষ করে বিতর্কিত প্যারাসেল এবং স্প্র্যাটলি দ্বীপপুঞ্জে ক্ষেপণাস্ত্রগুলি প্রচুর পরিমাণে পাঠানো হচ্ছে।

চীনের কাছে তৃতীয় আরেকটি অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার মিসাইল আছে। সেটার নাম DF-17 Hypersonic। এটির পরিসীমা ২৪০০ কিলোমিটারের বেশি। এটিও পারমাণবিক অস্ত্রও বহন করতে পারে। এই মিসাইলের আরেকটি ক্ষমতা হলো, এটিতে হাইপারসনিক গ্লাইড সিস্টেম ইনস্টল করা আছে। হাইপারসনিক মানে শব্দের গতির চেয়েও পাঁচগুণ দ্রুতগতিতে চলে যে বস্তু। বারুদও এই গ্লাইড ভেহিক্যালে পূর্ণ থাকে। ক্ষেপণাস্ত্রটি উৎক্ষেপণের পরপরই গ্লাইড ভেহিক্যালটি রকেট সিস্টেম থেকে পৃথক হয়ে যায়। গ্লাইড যানটি কোনো জ্বালানি ছাড়াই বাতাসে ভেসে লক্ষ্যপানে ছুটে যায়। এর মধ্যে বিভ্রান্ত করার পূর্ণ ক্ষমতা আছে। এটি গতিপথ পরিবর্তন করতে পারে। এটার উচ্চগতি এবং গতিপথ পরিবর্তন করার ক্ষমতার কারণে যেকোনো ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পক্ষে এটাকে শনাক্ত করা ও ধ্বংস করা অসম্ভব না হলেও বেজায় কঠিন বলতে হবে। এটি শত্রুর বিমানবাহী রণতরীর জন্য একটি মৃত্যুঅস্ত্র।

চীনের কাছে আরেকটি অস্ত্র আছে। সেটাকে জল-স্থল-অন্তরীক্ষ থেকে ফায়ার করা যায়। এটি হলো YJ-12 সুপারসনিক ক্রুজ মিসাইল। এটি সাধারণত

জাহাজ থেকে ছোড়া হয়। তবে এর দ্বিতীয় সংস্করণ YJ-12A-কে চায়নিজ দূরপাল্লার বোমারু জেটবিমান জিয়ান-৬ থেকে ছোড়া যায়। এর তৃতীয় সংস্করণ YJ-12B-কে স্থলভিত্তিক লঞ্চার থেকে ছোঁড়া যায়। এই মিসাইল শব্দের গতির চেয়ে তিনগুণ দ্রুত চলে ৪০০ থেকে ৫০০ কিলোমিটার দূরের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে পারে। গতির পাশাপাশি গতিপথও পরিবর্তন করতে পারে। DF-17-এর মতো এটাকে শনাক্ত করাও কঠিন। লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানার আগেই এটাকে ধ্বংস করা যে কোনো আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য এক বড় চ্যালেঞ্জ।

এসব প্রজেক্টাইল (ক্ষেপণাস্ত্র) ছাড়া সাবমেরিনও চীনের অন্যতম প্রধান অস্ত্র। চায়নিজ ডুবোজাহাজগুলো আমেরিকান এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের রাডার সিস্টেমকে ফাঁকি দিয়ে ক্যারিয়ারের একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে যেতে পারে। ১৮ বছর আগে ২০০৬ সালে এই সাবমেরিনগুলির একটি প্রদর্শনী হয়েছিল। সে সময় চায়নিজ 'সং ক্লাস' সাবমেরিন আচানক আমেরিকান রণতরী 'কিটি হক'-এর এর খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছিল। কিটি হক এখন ব্যবহৃত হয় না। সাবমেরিনটি চাইলে টর্পেডো দিয়ে কিটি হককে আঘাত করতে পারত। তখন হামলা করা নয়, আমেরিকাকে চমকে দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল। কিছুক্ষণ সমুদ্রপৃষ্ঠে সাঁতার কাটার পর সাবমেরিনটি আবার প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। চীন বলতে চেয়েছিল, তোমার কাছে দৈত্যাকার এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার থাকলে এটাকে ধ্বংস করার ক্ষমতাও আমাদের আছে। অতএব বুঝেশুনে অগ্রসর হোন।

মার্কিন যুদ্ধজাহাজের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি চায়নিজ শ্যাং-২ শ্রেণির পারমাণবিক সাবমেরিন। এটাকে চীনের সেরা সাবমেরিন বলে মনে করা হয়। এই সাবমেরিনে YJ-82 এন্টি-শিপ মিসাইল ও YU-6 ওয়ার গাইডেড টর্পেডো মোতায়েন করা থাকে। এই দুটি অস্ত্রকে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করে মার্কিন ক্যারিয়ারকে ডুবিয়ে দেওয়া সম্ভব। যদি আমেরিকার প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ভেদ করে লক্ষ্যবস্তুতে যথাযথভাবে আঘাত করতে পারে আরকি।

চীন এমন একটি অস্ত্রও তৈরি করেছে, যেটা ক্ষেপণাস্ত্র এবং টর্পেডো উভয়টা হওয়ার ক্ষমতা আছে। এটি একটি সুপারসনিক হাইব্রিড ওয়েপন। উৎক্ষেপণের পর মিসাইলের মতো শব্দের চেয়ে আড়াইগুণ বেশি দ্রুতগতিতে ১০ হাজার মিটার উপর দিয়ে উড়ে যায়। ২০০ কিমি পর্যন্ত ওড়ার পর নিচে

নেমে প্রায় সমুদ্রপৃষ্ঠ ঘেঁষে উড়তে থাকে। এভাবে ১০ কিমি চলার পর সাগরজলে ডুব দিয়ে টর্পেডোতে পরিণত হয়। এভাবে ১০ কিমি গিয়ে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে পারে।

এসব অস্ত্র নির্মাণের প্রধানতম উদ্দেশ্যই হচ্ছে, মার্কিন সমরাস্ত্রের মোকাবেলা করা। এসব ক্ষেপণাস্ত্র এবং টর্পেডো ছাড়া চীনের অস্ত্রভান্ডারে আরো অনেক কিছু আছে। প্রযুক্তি ও সমরাস্ত্রের বিকাশে চায়নিজ পিপলস লিবারেশন আর্মি আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজও করছে। সেটা হলো, সেনা ও নৌবাহিনীর প্রশিক্ষণ। কারণ, সুদক্ষ প্রশিক্ষণ ছাড়া এই প্রযুক্তি এবং সমরাস্ত্র অকেজো। চীন তার অস্ত্রের মাধ্যমে তাই করছে। চায়নিজ নেভি আমেরিকান যুদ্ধজাহাজ ধ্বংস করার অনুশীলন অব্যাহত রেখেছে। ২০২৩ সালে চায়নিজ বাহিনী কম্পিউটার সিমুলেশন (ডামি) ব্যবহার করে ইউএস সুপার ক্যারিয়ার জেরাল্ড ফোর্ডকে ধ্বংস করার মহড়া দিয়েছে। মহড়ার সুবিধার্থে কৃত্রিম দৃশ্য তৈরি করা হয়েছিল। দৃশ্যে দেখা গেছে, মার্কিন জাহাজ এক চীনা দ্বীপের দিকে যাচ্ছে। চায়নিজ বাহিনী জল-স্থল-আকাশ থেকে কমপক্ষে ২৪টি হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে ক্যারিয়ারটিকে ধ্বংস করেছে। ক্ষেপণাস্ত্রগুলো অল্প দূরত্ব থেকে ও কিছু বেশি দূরত্ব থেকে নিক্ষেপ করে পরীক্ষা করা হয়েছিল। কিছু মিসাইল চীনের বিখ্যাত গোবি মরুভূমি থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল। সেখান থেকে সমুদ্র এক থেকে দুই হাজার কিলোমিটার দূরে। পুরো প্রক্রিয়াটি অনলাইনে সম্পন্ন হয়েছে। সামরিক বিশেষজ্ঞরা এই কম্পিউটার মহড়াকে বাস্তবের বিকল্প বিবেচনা করেন না। বাস্তব যুদ্ধে ভৌগলিক অবস্থান, আবহাওয়া, আকস্মিক দেখা দেওয়া সমস্যাসহ আরো বহু বাধা আসতে পারে। এসব কারণে অস্ত্রের নির্ভুল-নিখুঁত ব্যবহার বাধাগ্রস্ত হতে পারে। ভার্চুয়াল অনুশীলন আধুনিক সমর মহড়ারই একটি অংশ।

চীনের এতসব লম্ফঝম্প মার্কিন সামরিক কর্মকর্তারা বসে বসে দেখছে—ব্যাপারটা এমন নয়। তারাও চীনের বিরুদ্ধে আরো শক্ত কিছু নিয়ে শক্তি বাড়িয়ে চলছে। আমেরিকাও প্রতিনিয়ত তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আপডেট করছে। আমেরিকা কী করছে? সেটা দেখা যাক। বর্তমানে আমেরিকান নৌ শক্তির সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, বিশ্বের নানাপ্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বিস্তীর্ণ খোলা সমুদ্রে এর ১১টি বিমানবাহী রণতরী শনাক্ত করা অত্যন্ত কঠিন। জল-স্থল ও আকাশ থেকে এগুলোর হদিস বের করা সহজ কাজ নয়। এই দানবীয়

সামরিক জাহাজগুলো কখনোই এক জায়গায় স্থির থাকে না; প্রতিনিয়ত চলা ওপর থাকে। এগুলোর ওপর টানা নজরদারি করা শুধুমাত্র মহাকাশ থেকে সম্ভব। এ কাজের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন অনেক স্যাটেলাইটও মহাশূন্যে ছেড়েছে চীন। এগুলোকে বলা হয় স্মার্ট স্যাটেলাইট। ২০২২ সালের মে মাসে একটি চীনা স্মার্ট স্যাটেলাইট, আমেরিকান ক্যারিয়ার হ্যারি ট্রুম্যানকে নিউইয়র্ক ছেড়ে যাওয়ার পর থেকে ক্রমাগত ট্র্যাক করে গিয়েছিল। কথা হলো, যদি চীনা উপগ্রহগুলো সমস্ত ইউএস এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের অবস্থান শনাক্ত করেও ফেলে, টেকনিক্যালি এগুলোকে ধ্বংস করা খুবই কঠিন। প্রায় অসম্ভব। কেন? রণতরীগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার দিকে তাকালেই বিষয়টা পরিষ্কার হবে :

ক. ক্যারিয়ারগুলো এতই বিশাল, কয়েকটি ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে ধ্বংস করা অসম্ভব। ক্যারিয়ারগুলোও পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র দ্বারা সজ্জিত। এসব ক্যারিয়ার একা থাকে না। সাথে যুদ্ধজাহাজের একটি বহর থাকে। প্রতিটি এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের চারপাশে কমপক্ষে ১০ থেকে ১৫টি জাহাজ থাকে। সেগুলোর প্রতিটিই পুরোদস্তুর যুদ্ধজাহাজ। কয়েকটি সাবমেরিনও এর স্ট্রাইক গ্রুপের অংশ। বিমানবাহী রণতরী, যুদ্ধজাহাজ ও সাবমেরিন সমন্বিত মিসাইল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত থাকে। প্রতিরক্ষাব্যবস্থা কয়েকটি স্তরে কাজ করে। শত্রুর কোনো ক্ষেপণাস্ত্র একটি স্তরকে ফাঁকি দিয়ে নিরাপত্তাবলয়ে ঢুকে গেলেও দ্বিতীয় স্তরে গিয়ে সেটি বাধাগ্রস্ত হয়। নিরাপত্তা বলয়ের প্রতিটি স্তরে অ্যান্টি-মিসাইল প্রজেক্টাইল মোতায়েন থাকে। এত বাধা অতিক্রম করে কোনো আক্রমণকারী মিসাইল রণতরীর কাছে ঘেঁষা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। এ ছাড়া রণতরীতে সদাপ্রস্তুত থাকে ফাইটার জেট, আগাম সতর্কব্যবস্থা শত্রুর আক্রমণকে ব্যর্থ করতে একযোগে কাজ করে।

খ. আমেরিকান জেনারেলরা আত্মবিশ্বাসী থাকেন, তাদের ভাসমান সামরিক জাহাজে সফল আক্রমণ করা, সেগুলোকে ডুবিয়ে দেওয়া প্রায় অসম্ভব কাজ। রণতরী ডোবাতে হলে অনুরূপ রণতরী হাজির করতে হবে। এ কারণেই ক্ষেপণাস্ত্রের পাশাপাশি চীন তার বিমানবাহী রণতরী তৈরি করছে।

বর্তমানে চীনের মাত্র তিনটি বিমানবাহী রণতরী আছে। লিয়াওনিং, শানডং ও ফুজিয়ান। প্রথম দুই রণতরীতে প্রায় ৫০টি যুদ্ধবিমান বা হেলিকপ্টার থাকতে পারে। তৃতীয়টিতে অন্তত ৬০টি ফাইটার জেট বা হেলিকপ্টার

ধরাতে পারে। এটি চায়নিজ নৌবাহিনীর সবচেয়ে উন্নত মোবাইল এয়ারবেস। ২০২২ সালে এর নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছিল। মোবাইল এয়ারবেসটি ২০২৪ সালের মে মাসে পরীক্ষামূলক সফর সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। ২০২৫ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে এটাকে চায়নিজ নৌবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হতে পারে। এ ছাড়া আরো তিনটি বিমানবাহী রণতরী ২০৩৫ সালের মধ্যে ড্রাগন নৌবহরের অংশ হতে পারে। তার মানে ১১ বছর পর মোট ৬টি চায়নিজ ভাসমান এয়ারবেস ১১টি আমেরিকান ক্যারিয়ারের বিপরীতে সাগরে মোতায়েন থাকবে।

চীনের ভালো করেই জানা আছে, ৬টি রণতরী দিয়ে আমেরিকার বিরুদ্ধে শক্তিতে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারবে না। চীন ক্যারিয়ারের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি গুণগত মান উন্নয়নেও নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। ২৬ বছর আগে ১৯৯৮ সালে চীন এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার কার্যক্রম শুরু করেছিল। চীন ইউক্রেনের কাছ থেকে একটি পুরোনো অর্ধনির্মিত বিমানবাহী রণতরীর কাঠামো কিনেছিল। রণতরীটি সোভিয়েত নৌবাহিনী নির্মাণ করছিল। কাজ শেষ করার আগেই আফগান জিহাদের ধাক্কায় সোভিয়েত ভেঙে খানখান হয়ে গিয়েছিল। ১৯৯১ সালে ইউক্রেন সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্বাধীন হয়েছিল। তখন অনেক কিছুর সাথে এই অসমাপ্ত ক্যারিয়ার ইউক্রেনের দখলে এসেছিল। এটার নির্মাণকাজ সম্পন্ন করার মতো অবকাঠামো ইউক্রেনের ছিল না। রণতরী নির্মাণ প্রকল্প স্থগিত হয়েছিল।

সাত বছর পর ১৯৯৮ সালে, এক চীনা ব্যবসায়ী ইউক্রেনের কাছ থেকে রণতরীর কাঠামোটি ২০ মিলিয়ন ডলারে কিনেছে। চায়নিজ ব্যবসায়ী বলেছিল, অসম্পূর্ণ রণতরীতে সামুদ্রিক ক্যাসিনো বানাবে। এই রণতরীর ব্যবহার সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক খাতে হবে। চায়নিজ ব্যবসায়ীটি ছিল ছদ্মবেশি গোয়েন্দা। চায়নিজ নৌবাহিনীর ফ্রন্টম্যান। সেই লোক জাহাজটি কিনে সোজা চায়নিজ নৌবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করেছিল। চীনা প্রকৌশলীরা দিনরাত কাজ করে খোলসটিকে পরিপূর্ণ রণতরীতে রূপান্তরিত করেছিল। ২০১২ সালে এটি 'লিয়াওনিং' নামে চায়নিজ নৌবাহিনীতে যুক্ত হয়েছিল। এর মাধ্যমে চীনও এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারাধীন অভিজাত দেশের তালিকায় নাম লেখাতে সক্ষম হয়েছিল। অন্য কথায়, সামরিক পরাশক্তি হওয়ার পথে আরেক ধাপ এগিয়ে গেল। চীনা প্রকৌশলীরা লিয়াওনিং রণতরীর মডেল আপডেট করে, একই ডিজাইনের উপর ভিত্তি করে আরেকটি নতুন এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার

'শানডং' নির্মাণ করেছিল। শানডং শতভাগ চায়নিজ প্রযুক্তি ও কাঁচামা তৈরি প্রথম রণতরী। শানডং গত ৬ বছর ধরে চায়নিজ নৌবাহিনীর অং এই দুটি রণতরীর ডেক থেকে যুদ্ধবিমান উড্ডয়নের জন্য পুরোনো 'স্কি জাম্প পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। এই পদ্ধতি আজকাল মার্কিন রণতরীগুলো বর্জন করা হয়েছে।

চীন কেন পুরানো প্রযুক্তিতে নতুন ক্যারিয়ারগুলো নির্মাণ করছে? এর কার আছে। একটি ফাইটার জেট উড়তে ঘণ্টায় ২৪০ থেকে ৩৭০ কিমি গতি প্রয়োজন। জেটগুলো ধীরে ধীরে এই গতি অর্জন করে। এজন্য বিমানঘাঁটিতে দুই থেকে তিন কিলোমিটার দীর্ঘ রানওয়ে তৈরি করা হয়। বিমান যাতে প্রয়োজনীয় গতিতে পৌঁছে টেক অফ (উড্ডয়ন) করতে পারে।

প্রচলিত এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারে রানওয়ের দৈর্ঘ্য বেশির চেয়ে বেশি ৩০০ ফুটের মতো হয়ে থাকে। এই সংক্ষিপ্ত রানওয়েতে ফাইটার জেট কয়েক কিলোমিটার দৌড়ানোর প্রয়োজনীয় জায়গা পায় না। এই সমস্যা সমাধানের জন্য সাধারণত দুটি কৌশল ব্যবহার করা হয় :

ক. পুরোনো কৌশলের নাম 'স্কি জাম্প'। আধুনিক পদ্ধতির নাম 'ক্যাটাপল্ট'। স্কি জাম্প কৌশলে এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের রানওয়ের শেষপ্রান্ত র‍্যাম্প আকারে সামান্য উত্থিত হয়ে হয়ে থাকে। জাহাজের ডেক থেকে টেক অফ করার সময় বিমানের ডগা আকাশমুখী হয়ে যায়। উত্থিত র‍্যাম্প বিমানকে ধাক্কা দেয়। ধাক্কা খেয়ে বিমানটি আকাশের দিকে ছিটকে যায়। এতে বিমান বাড়তি গতি লাভ করে। এই পদ্ধতিটি সহজ আর সাশ্রয়ী। কারণ, স্কি জাম্প ব্যবস্থায় প্রতিটি বিমান ওড়ানো জন্য আলাদা প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না। তবে সমস্যা হলো, টেক অফের সময় বিমানের গতি খুবই কম থাকে। এজন্য টেক অফের সময় ইঞ্জিনের সর্বশক্তি ব্যয় করতে হয়। বিমান যত ভারী, 'স্কি জাম্প' থেকে উড়াল দেওয়া তত বেশি কঠিন। সেজন্য ভারী বিমান যেমন আর্লি ওয়ার্নি প্লেন, ট্রান্সপোর্ট এয়ারক্রাফট এই প্রযুক্তিতে উড়তে পারে না। শুধু জেট ফাইটার বা খুব হালকা বিমান উড়তে পারে।

খ. দ্বিতীয় অসুবিধা হলো, হালকা বিমানেও অতিরিক্ত অস্ত্র ও জ্বালানি ট্যাঙ্ক যুক্ত করা যায় না। কারণ, ওজন বেশি হলে স্কি জাম্পে ব্যর্থ হবে। তাই এই কৌশলে হালকা বিমান টেক অফ করে। ভারী যুদ্ধবিমানের

মোকাবেলায় এই হালকা জেটগুলো আদর্শ যুদ্ধাস্ত্র নয়। ভারতীয় বিমানবাহী রণতরী 'বিক্রান্ত' ও 'বিক্রমাদিত্য'-ও স্কি জাম্প র‍্যাম্প ব্যবহার করে। রাশিয়ান ক্যারিয়ারগুলোও তাই।

স্কি জাম্পের বিপরীতে নতুন পদ্ধতির নাম 'স্টিম ক্যাটাপল্ট'-ধোঁয়ার গুলতি। বিমানটা ক্যারিয়ারের ডেকের ওপর দিয়ে ছুটে যায়, পেছনে লেজের মতো বাষ্প রেখে যায়। ক্যাটাপল্ট কৌশলের কারণে ধূম্র নির্গত হয়। ক্যারিয়ারের ৩০০ ফুট লম্বা ডেকের উপর দিয়ে টেক অফ করতে চলা বিমানের গতি তীব্রতর করার জন্য বিমানকে বিশেষ ধরনের গুলতির সাহায্যে ধাক্কা দেওয়া হয়। এতে করে বিমান অল্প জায়গা দৌড়েই ভূমির রানওয়ের গতি লাভ করে। গুলতি দিয়ে যেভাবে পাথর ছোড়া হয়, বিমানকেও সেভাবে ছোড়া হয়। পার্থক্য হলো, এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের গুলতি বিমান সর্বোচ্চ গতি লাভ করা পর্যন্ত বিমানের চাকা টেনে নিয়ে যায়। স্টিম ক্যাটাপল্ট পদ্ধতি স্কি জাম্পের চেয়ে অনেক বেশি ব্যয়বহুল। তবে এর সুবিধা হলো, ভারী বিমানও উড়ানো যায়। প্রয়োজনীয় সমস্ত সরঞ্জাম, অতিরিক্ত জ্বালানি ও অস্ত্রসহ বিমান উড়তে পারে।

আধুনিক ক্যারিয়ারে সাধারণত তিন থেকে চারটি ক্যাটাপল্ট থাকে। ক্যাটাপল্ট পদ্ধতি স্কি জাম্পের চেয়ে বেশি কার্যকর। স্কি জাম্প থেকে একটি বিমান উড্ডয়ন করতে করতে ক্যাটাপল্ট পদ্ধতিতে তিন-চারটি বিমান উড্ডয়ন করে ফেলে।

আমেরিকার ১১টি এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের মধ্যে ১০টিতেই ক্যাটাপল্ট পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। স্কি জাম্প এবং ক্যাটাপল্ট পদ্ধতির গুণগত পার্থক্যের কারণে পশ্চিমা বিশেষজ্ঞরা প্রথম দুটি চীনা ক্যারিয়ার নিয়ে উপহাস হাসি-মশকরা করত। পশ্চিমারা বিদ্রুপ করে বলত, এগুলো প্রশিক্ষণের জন্য হলে ঠিক আছে, প্রকৃত যুদ্ধে এগুলো আমাদের আধুনিক ক্যারিয়ারের মোকাবেলা করতে পারবে না।

চায়নিজ ড্রাগন বেশিক্ষণ পশ্চিমা টিটকিরি সহ্য করতে পারেনি। সর্বশেষ নির্মিত রণতরী 'ফুজিয়ান'-এ তিনটি ক্যাটাপল্ট ইনস্টল করা হয়েছে। চায়নিজ বিশেষজ্ঞরা ক্যাটাপল্ট প্রযুক্তিকে উন্নতও করেছে। এটি বাষ্পের পরিবর্তে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক সিগন্যাল ব্যবহার করে পরিচালিত হয়। মার্কিন বিমানবাহী রণতরী জেরাল্ড ফোর্ডেই শুধু এই প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে। এই

প্রযুক্তিতে একটি টারবাইন থেকে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক সিগন্যাল পাঠানো হয়। ডেকের ওপর বিমান যে শাটলের সাহায্যে চলে, ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক সিগন্যাল সে শাটলকে ধাক্কা দেয়। এই পদ্ধতি স্টীম ক্যাটাপল্ট পদ্ধতির চেয়ে অনেক দ্রুতগতির। খরচও অনেক কম। এ কারণেই মার্কিন সুপার ক্যারিয়ার জেরাল্ড ফোর্ডের ডেক থেকে অন্য ক্যারিয়ারের তুলনায় ৩৩% বেশি দ্রুত বিমান ওড়াতে পারে। এই হিসেবে বলা যায়, চীনের ফুজিয়ান রণতরী আমেরিকার ১০টি রণতরীর চেয়ে ভালো অবস্থানে আছে। তার মানে এই নয়, চীন অনতিবিলম্বে মার্কিন নৌবাহিনীকে পরাজিত করতে চলেছে। দুই দেশের নৌশক্তির পার্থক্য আসমান-জমিনের। প্রথমত সংখ্যার পার্থক্য। সংখ্যায় ভারসাম্য আনতে অনেক বছর লাগবে। একটি বিমানবাহী রণতরী নির্মাণ করতে কমপক্ষে ৫ থেকে ১০ বছর সময় লাগে। পর্যাপ্ত সম্পদ ও প্রযুক্তি সত্ত্বেও মার্কিন সুপার এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার জেরাল্ড ফোর্ড বানাতে আট বছর লেগেছিল। রণতরী নির্মাণ বলতে বড় রণতরীই নয়, একই সাথে বড় রণতরীর নিরাপত্তার জন্য পুরো স্ট্রাইক গ্রুপও নির্মাণ করা হয়। স্ট্রাইক গ্রুপে অনেক যুদ্ধজাহাজ থাকে ও সাবমেরিন থাকে। সেগুলো তৈরি করতে হয়। এছাড়া প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ক্রু প্রয়োজন হয়। তাদের তৈরি করতেও সময় লাগে। সবকিছু গুছিয়ে তুলতে অপরিমেয় অর্থ, দীর্ঘ সময়, অনমনীয় সংকল্প, অবিচল ধৈর্য ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ প্রয়োজন।

চায়নিজ ও মার্কিন নেভির মধ্যে আরেকটি বড় পার্থক্য হলো, ইঞ্জিন। চীনের বর্তমান এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারগুলো তেল বা ডিজেল ইঞ্জিন দিয়ে সজ্জিত। এ কারণে রি-ফুয়েলিংয়ের জন্য বারবার সাগর থেকে তাদের ঘাঁটিতে ফিরতে হয়। বিপরীতে, আমেরিকান ক্যারিয়ারের ইঞ্জিনগুলি পারমাণবিক চুল্লি দ্বারা চালিত হয়। এই জাহাজগুলো ভূমি থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে খোলা সাগরে বছরের পর বছর থাকতে পারে। রি-ফুয়েলিংয়ের ঝামেলা নেই।

সত্যি বলতে, দুই দেশের এই পার্থক্যটা বর্তমানের। ভবিষ্যতেও এই পার্থক্য থাকবে—এটা নিশ্চিত করে বলা যায় না। চীন যে হারে অগ্রসর হচ্ছে, পার্থক্য দূর হতে বেশি সময় লাগার কথা নয়। চীনের জন্য অসাধ্য সাধন করা অসম্ভব কিছু নয়। বলা হচ্ছে, শীঘ্রই চায়নিজ রণতরীতেও নিউক্লিয়ার রিয়েক্টর বসানো হবে।

চায়নিজ ও মার্কিন রণতরীর মধ্যে তৃতীয় পার্থক্য হলো, চীনা জাহাজে জ্বালানি সংরক্ষণ এবং যুদ্ধবিমান মেরামত সুবিধার অভাব আছে। প্রশিক্ষিত

ক্রুর সংখ্যাও বেজায় কম। একটি এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার পরিচালনার জন্য হাজার হাজার প্রশিক্ষিত কর্মী প্রয়োজন। এসব ক্রুদের মধ্যে সামরিক বিশেষজ্ঞ, রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীসহ আরো বহু ক্যাটাগরির ক্রু প্রয়োজন হয়। এজন্য আমেরিকার সমকক্ষ রণতরী নির্মাণে চীনকে শুধু প্রযুক্তি নিয়েই নয়, মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রতিও নজর দিতে হবে। চায়নিজরা এজন্য প্রস্তুতিও নিচ্ছে। আমেরিকার মতো একটি শক্তিশালী নৌবহর তৈরি করতে চীনের কমপক্ষে ৪০ থেকে ৫০ বছর লাগবে। একটি জাতির জীবনে অর্ধ শতাব্দী খুব বেশি সময় নয়। চোখের পলকে বছর চলে যায়। বাঁক নিতেই শতাব্দী চলে যায়। আগামী কয়েক দশকের মধ্যে চীন চ্যালেঞ্জগুলো কাটিয়ে উঠতে পারে।

যতদিন পর্যন্ত চীন আমেরিকার পর্যায়ে পৌঁছতে না পারে, একটি কথা নিশ্চিত করে বলা যায়, এই শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত আমেরিকার চেয়ে বড় নেভাল পাওয়ার অর্জন করতে পারবে—এমন কোনো দেশ নেই। আমেরিকা, রাশিয়া ও চীনের গ্রেট গেইমে বিমানবাহী রণতরীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একই সাথে স্পেস মিশনগুলোও চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকর ভূমিকা পালন করবে।

তাইওয়ান : তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘনঘটা

তাইওয়ানের অবস্থান

১. ইস্ট ও সাউথ চায়না সি-র সংযোগস্থলে অবস্থিত একটি দ্বীপরাষ্ট্র। চীন থেকে ১২০ বা ১৫০ কিমি দূরে অবস্থিত। আয়তন ৩৬,১৯৭ বর্গ কিমি। ১৬৭টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত। সবচেয়ে বড় দ্বীপের আয়তন ৩৫,৮০০ বর্গ কিমি। বাকি ১৬৬ দ্বীপ খুবই ছোট ছোট। ২ কোটি ৪০ লাখের মতো জনসংখ্যা। ৮০% জনগণ শহরে বাস করে। মাথাপিছু আয় ৩৫ হাজার মার্কিন ডলারের চেয়েও বেশি। তাইওয়ানে আছে বিশ্বের উন্নততর যোগাযোগ ব্যবস্থা। এখানকার জনগণ প্রায় সবাই চায়নিজ 'হান' গোষ্ঠীভুক্ত। হানরা জনসংখ্যায় বিশ্বের সবচেয়ে বড় জাতিগোষ্ঠী। চীন থেকে এখানে এসে আবাদ হয়েছিল।

তাইওয়ানের ইতিহাস

২. খ্রিস্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে চীন থেকে কিছু মানুষ এসে তাইওয়ানে বসতি গেড়েছিল। এই ধারা অব্যাহত ছিল। ১৬২৪ সালে প্রথমবারের মতো ইউরোপিয়ান শক্তি তাইওয়ান দখল করেছিল। তারা ছিল ডাচ বেনিয়া।

১৬৬১ সাল পর্যন্ত তাইওয়ান ডাচদের দখলে ছিল। তারপর চায়নিজ হান গোত্রের লোকেরা নিজস্ব শাসন কায়েম করেছিল। ১৬৮৩ থেকে ১৮৯৫ পর্যন্ত চীনের কিং (Qing) রাজবংশ তাইওয়ানকে নিজেদের শাসনাধীনে রেখেছিল। ১৮৯৫ সালে প্রথম চীন-জাপান যুদ্ধের পর, চীনের অন্য এলাকার মতো তাইওয়ানও জাপানের অধীনে চলে গিয়েছিল। ১৯১২ সালে তাইওয়ানিরা কিং রাজবংশকে হটিয়ে স্বাধীন সরকার গঠনের ঘোষণা দিয়েছিল। নাম দিয়েছিল রিপাবলিক অব চায়না। তাইওয়ান তখনো জাপানেরই অংশ ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান হেরে যাওয়ার পর চীন থেকে কবজাকৃত সমস্ত এলাকা চীনের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছিল। তখন চীন আমেরিকা ও ব্রিটেনের সম্মতিতে তাইওয়ানকে নিজের শাসনাধীনে নিয়ে এসেছিল। আজ সেই আমেরিকা-ব্রিটেনই তাইওয়ানকে স্বাধীন দেখতে চাইছে। ১৯৪৭ সালে তাইওয়ানে সরকারবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছিল। চায়নিজ সরকার ভয়ংকর রক্তপাত ঘটিয়ে আন্দোলন দমন করে। ধারণা করা হয়, প্রায় ২৮ হাজার তাইওয়ানিকে হত্যা করা হয়েছিল। তাইওয়ানের ইতিহাসে সেটা ছিল এক মর্মান্তিক অধ্যায়।

১৯২৭ সাল থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত চীনে গৃহযুদ্ধ চলেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর চায়নিজ সেনাপ্রধান চিয়াং কাইশেক কমিউনিস্ট বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়ে তাইওয়ানে এসে আশ্রয় নেয়। চিয়াং কাইশেকের সাথে ১.৫ মিলিয়ন অনুসারীও তাইওয়ানে চলে এসেছিল। এটা ছিল ১৯৪৯ সালের ঘটনা। মাও-এর কাছে হারার আগে চিয়াং কাইশেক পুরো চীনকে শাসন করেছিল। এজন্য তাইওয়ানে চলে যাওয়ার পরও নিজেকে পুরো চীনের শাসক মনে করত। একদিন আবার মূল চীন দখলে আনবে—এমন স্বপ্ন দেখত।

৩. ১৯৬০-১৯৭০ সালের সময়টা ছিল কোল্ডওয়ারের। একদিকে আমেরিকা, আরেকদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন। মাও সে-তুংয়ের নেতৃত্বে চীনে কমিউনিস্ট শাসনব্যবস্থা কায়েম ছিল। এজন্য আমেরিকার নেতৃত্বাধীন জাতিসংঘ তাইওয়ানকেই প্রকৃত চীন আখ্যা দিয়ে জাতিসংঘে বরণ করে নিয়েছিল। ১৯৭০ সাল নাগাদ প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল, ছোট্ট একটি দ্বীপরাষ্ট্র কীভাবে মূলচীন হতে পারে? অন্যদিকে মূলচীন কত বিশাল। চিয়াং ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত তাইওয়ান শাসন করেছে। চিয়াং কাইশেক তাইওয়ানে মার্শাল ল জারি করেছিল। ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত তাইওয়ানে সামরিক শাসন বলবৎ ছিল। চিয়াং কাইশেকের সরকারকে কুমিনটাং (Kumantang) বা 'কেএমটি' বলা হতো। বাবার মৃত্যুর পর ছেলে চিয়াং চেং রাষ্ট্রপ্রধান হয়েছিল।

তাইওয়ানের উন্নতি ও উত্থান

৪. তাইওয়ানের উন্নতির দৌড় শুরু হয়েছিল ১৯৭১ সাল থেকে। এই সালে জাতিসংঘ তাইওয়ানকে বাদ দিয়ে গণচীনকে তার আসল সদস্য ঘোষণা করেছিল। চীনকে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যপদও দেওয়া হয়েছিল। বিশ্বশক্তির এহেন পিঠটানে তাইওয়ান নিজের অস্তিত্ব নিয়ে ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়ল। নিজেকে বঞ্চিত ভাবতে শুরু করল। বঞ্চনার এই অনুভূতিকেই তাইওয়ান শক্তিতে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। ১৯৪৯ সাল থেকে তাইওয়ানই জাতিসংঘে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য ছিল। নতুন সিদ্ধান্তের কারণে তাইওয়ান আর বিশ্বের চোখে স্বাধীন কোনো দেশ থাকল না। বর্তমানে শুধু ১৫টি দেশ তাইওয়ানকে স্বাধীন দেশ হিসেবে মানে।

৫. ১৯৭৬ সালে মাও সে-তুং মারা গেল। তারপর চীনের ক্ষমতায় এলো দেং জিয়াওপিং। উদারপন্থী ছিল। ১৯৭৮ সালে দেং জিয়াও চীনের অর্থনৈতিক সংস্কারে হাত দিয়েছিল। চায়না পুরো দুনিয়ার বিনিয়োগকারীদেরকে চীনে আমন্ত্রণ জানাল। আমেরিকা ভেবেছিল, চীন থেকে ধীরে ধীরে কমিউনিজম বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এই আশাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমেরিকা পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় ১৯৭৯ সালে চীনের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। ১৯৪৯ থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত সময়কালকে তাইওয়ানে শ্বেতসন্ত্রাস (White Terror) নামে আখ্যায়িত করা হয়। এই সময় রাজনৈতিক কারণে এক লাখেরও বেশি মানুষকে জেলে পোরা হয়েছে। এক হাজারেরও বেশি মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। একদিকে মাও সে-তুং মানুষকে কমিউনিস্ট না হওয়ার অপরাধে হত্যা করত। যদি শুধু সন্দেহও হতো—এই লোক কমিউনিজমবিরোধী, তার আর প্রাণে বাঁচার উপায় ছিল না। অন্যদিকে তাইওয়ানে ছিল চিয়াং কাইশেক। তাইওয়ানে যারাই চিয়াংয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াত, তাকে কমিউনিস্ট সমর্থক আখ্যা দিয়ে হত্যা করা হতো। মাও ও চিয়াং দুজনেই নির্মম স্বৈরশাসক। তারপরও তাইওয়ানে গণতন্ত্রের বিকাশ হয়েছে, যা চীনে হয়নি।

৬. ১৯৮৮ সালে ক্ষমতায় বসে লী টেং হুই। লী টেং হুই মূলত তাইওয়ানে সাংবিধানিক সংস্কারসাধন করে। তাকেই তাইওয়ানের ফাদার অব ডেমোক্রেসি বলা হয়। ২০০০ সালে তাইওয়ানে প্রথমবারের মতো চিয়াংয়ের দল কেএমটির বাইরের কেউ রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হয়েছিল। তার নাম চেন সুই

বিয়ান। এই সময় চীনেও গণতান্ত্রিক আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। ১৯৮৯ সালে চীন গণতন্ত্রের প্রায় দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। হাজারো ছাত্রজনতা গণতন্ত্রের দাবিতে চীনের রাজপথে নেমে এসেছিল। চায়নিজ সরকার এই আন্দোলনকে কঠোর হস্তে দমন করেছিল।

৭. ২০০০ সালে চায়নিজ সরকারের পক্ষ থেকে তাইওয়ানকে একটা প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, আসো আমরা 'এক দেশ, দুই নীতি' পলিসিতে এক হয়ে যাই। মূলচীনে কমিউনিস্ট শাসন চলবে আর তাইওয়ানে স্বাধীনভাবে গণতন্ত্র। তাইওয়ানকে একপ্রকার স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হবে। তাইওয়ান এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল। ২০০০ সালে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট চেন সুই বিয়ান বলেছিলেন, আমরা পুরোপুরি স্বাধীনতা চাই। ২০১৬ সালে ডেমোক্র্যাটিক প্রগ্রেসিভ পার্টি ভোটে জয়ী হয়। প্রেসিডেন্ট হন সাই ইং ওয়েন। তাকে অত্যন্ত যোগ্য প্রেসিডেন্ট হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ২০২০ সালে তিনি দ্বিতীয়বারের মতো নির্বাচিত হন।

৮. প্রায় ৬৩.৭% জনগণ নিজেদেরকে তাইওয়ানি বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করে। ৩০.৪% লোক নিজেদেরকে চায়নিজ ও তাইওয়ানি উভয় পরিচয় এক সাথে দিতে পছন্দ করে। মাত্র ২.৪% লোক নিজেদেরকে চায়নিজ বলে। মাত্র ১০% জনগণ চীনের সাথে এক হতে চায়। গণতান্ত্রিক অধিকার র‍্যাঙ্কিংয়ে তাইওয়ান ৩২তম স্থানে আছে। এশিয়ায় ৩ নাম্বারে আছে। অন্যদিক চীন পড়ে আছে বহুদূর পেছনে।

৯. ১৯৭৯ সালে আমেরিকা একটা আইন পাস করেছিল, চীন কখনো তাইওয়ান আক্রমণ করলে আমেরিকা সাথে সাথে তাইওয়ানের সাহায্যে পৌঁছে যাবে। এতদিন তাইওয়ান বিষয়ে জাপান নীরবতা অবলম্বন করে আসছিল। গত বছর জাপানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেছিল, গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে তাইওয়ানকে অবশ্যই সুরক্ষা দিতে হবে। চীন যদি তাইওয়ানে হামলা করে, আমরাও আমেরিকার সাথে যুদ্ধে শামিল হতে দ্বিধা করব না।

১০. জাতিসংঘ চীনের অনুকূলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর প্রথমে চিয়াং কাইশেক তারপর তার পুত্র তাইওয়ানকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়ার কার্যকর পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছিল। তাইওয়ানে শিল্পায়ন (Industriazation) ও টেকনোলজিকে খুবই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হলো। মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স, মাইক্রোচিপস, কম্পিউটার ও কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট এক্সেসরিজ

বানানোর দিকে মনোযোগ দিয়েছিল। টেক্সটাইলেও তাইওয়ান বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিল। ১৯৮০ সালেই তাইওয়ান অর্থনৈতিক পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। ১৯৫০ সালে তাইওয়ানে বার্ষিক মাথাপিছু আয় ছিল মাত্র ১৭০ ডলার। আজ তাইওয়ানের মাথাপিছু আয় জাপানের চেয়েও বেশি। তাইওয়ানের নারী-পুরুষ দিনরাত এক করে পরিশ্রম করতে শুরু করেছিল। ৯০ দশকে তাইওয়ানি কোম্পানিগুলোকে চীনে বিনিয়োগ করার সুযোগ দেওয়া হলো। তাইওয়ানি কোম্পানিগুলো তখন অল্প কদিনেই প্রায় ৬০ বিলিয়ন ডলারের চেয়েও বেশি বিনিয়োগ করেছিল। এলসিডি মনিটর, এলইডি লাইট, ল্যাপটপ, কম্পিউটার, সেমি-কন্ডাকটর বানানোতে তাইওয়ান অতুলনীয় দক্ষতা অর্জন করেছে। পৃথিবীর ৬৫%-এরও বেশি সেমি কন্ডাকটর তাইওয়ানে নির্মিত হয়। এক হিসাব মতে, এক বছরেই তাইওয়ান চীনে ২৫ বিলিয়ন ডলার মূল্যের যন্ত্রপাতি ও ইলেকট্রনিক প্রডাক্ট রপ্তানি করেছে। আমেরিকায় ১৬ বিলিয়ন ডলার ও জাপানে ১০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের ইলেকট্রনিক পণ্য রপ্তানি করেছে। এটাই তাইওয়ানের আসল শক্তি।

তাইওয়ান নিয়ে চীন ও আমেরিকার পলিসি

১১. তাইওয়ানের কিছু লোক পুরোপুরি স্বাধীনতা চায়। তবে বেশিরভাগ লোক এই সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান চায়। তাদের মতে তাইওয়ানকে পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিলেই আর কোনো সমস্যা থাকবে না। ২০০৪ সালে চীন এক আইন পাস করে যে, তাইওয়ান যদি স্বাধীন হতে চায়, তাহলে তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এই চীনা আইনকে তাইওয়ান খুবই ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে।

২০১৬ সাল থেকে সুই ইং ওয়েন (Tsai In Wen) তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট। তিনিও তাইওয়ানের পরিপূর্ণ স্বাধীনতাপন্থী। ২০১৬ সালে ট্রাম্প জয়ী হওয়ার পর তাকে ফোন করে অভিনন্দন জানিয়েছিল। এই ফোন ছিল ১৯৭৯ সালের পর আমেরিকার সাথে তাইওয়ানের প্রথম অফিসিয়াল যোগাযোগ। চীনের কঠোর বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৯৭৯ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত আমেরিকা তাইওয়ানের সাথে প্রকাশ্যে অফিসিয়াল সম্পর্ক না থাকলেও নিয়মিত সমরাস্ত্র সরবরাহ করে গেছে। ২০১৮ সালে চীন সারা বিশ্বের কোম্পানিগুলোকে সতর্ক করে দিয়েছে, কোনো কোম্পানি যদি নিজেদের মানচিত্রে তাইওয়ানকে চীন থেকে আলাদা দেখায়, তাহলে চীন তার সাথে সবধরনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করবে।

১২. ২০২০ সালে হংকংয়ে চায়নিজ ক্রমবর্ধমান দমন নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন ফুঁসে উঠে। তখন তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সাথে যোগাযোগ বাড়িয়ে দিয়েছিল। ট্রাম্প হংকংয়ে আন্দোলনকারীদের প্রকাশ্য সমর্থন জানিয়েছিল। নানাভাবে সাহায্য করেছিল। তখন চীন-আমেরিকার মাঝে কঠিন বাকযুদ্ধও চলেছিল কিছুদিন। ২০২২ সালে স্পিকার ন্যান্সি পেলোসির তাইওয়ান সফর নিয়ে জল কম ঘোলা হয়নি। তাইওয়ান নিরাপত্তার জন্য আমেরিকার ওপর ভরসা করে বসে থাকেনি। তারাও আত্মরক্ষার সবধরনের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে। সামরিক শক্তিতে তাইওয়ান র‍্যাঙ্কিংয়ে বিশ্বের প্রথম ২০ দেশের মধ্যেই থাকে। এক হিসেব মতে, তাইওয়ানের নিয়মিত ও রিজার্ভ মিলিয়ে সেনাসংখ্যা প্রায় ৪ লাখ। তাইওয়ান প্রতি বছর প্রতিরক্ষা খাতে ১৩ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে থাকে। তাইওয়ানের আছে ৩০০-এর মতো যুদ্ধবিমান; ৪টি সাবমেরিন; ৪০০-এর বেশি যুদ্ধজাহাজ। তাইওয়ানের কাছে এফ সিক্সটিন ও মিরেজ যুদ্ধবিমানও আছে। তিন বছর আগে তাইওয়ান আমেরিকার কাছ থেকে ৬৬টি এফ সিক্সটিন কেনার চুক্তি করেছে। বলাবাহুল্য, চীন এই চুক্তির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে।

১৩. উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, গত কয়েক বছরে তাইওয়ান থেকে চীনে চলে যাওয়া মানুষের সংখ্যা এক মিলিয়ন ছাড়িয়ে গেছে। তাইওয়ানে বর্তমান ক্ষমতাসীন দল (ডিপিপি) স্বাধীনতাপন্থী হিসেবে পরিচিত। ১৯৮৬ সালে যখন দলটি গঠিত হয়েছিল, তখন তারা স্বাধীনতাপন্থী ছিল না; মধ্যপন্থী ছিল। চীনের কর্তৃত্ববাদী শাসনই দলটিকে ক্রমশ কঠোর অবস্থানের দিকে ঠেলে দিয়েছে। ২০০০ সালে স্বাধীনতার পক্ষে প্রচারণা চালিয়ে প্রথমবারের মতো ক্ষমতায় এসেছিল। অন্যদিকে চিয়াং কাইশেকের দল (কেএমটি) আগে স্বাধীনতার পক্ষে সোচ্চার থাকলেও এখন তারা চীনের সাথে পুনরেকত্রীকরণের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে।

তাইওয়ান এক আধাস্বাধীন দ্বীপরাষ্ট্র। ছয়দিক থেকেই তাইওয়ানকে ঘিরে রেখেছে চীন। তাইওয়ানের ডানে-বামে, উত্তরে-দক্ষিণে, উপরে-নীচে সবদিক থেকেই চায়নিজ নৌ-বহর, বিমানবহর, মিসাইল ও রকেট ঘিরে রেখেছে। চীন নিয়মিত তাইওয়ানের নাগের ডগায় এসে সামরিক মহড়া চালায়। তাইওয়ানের ওপর দিয়ে বোমারু বিমান চালিয়ে যায়। চীন প্রতিনিয়ত তাইওয়ানকে উসকানি দিয়েই যায়। কদিন আগে চীন এমন এক ভয়ংকর সামরিক মহড়া চালিয়েছিল; পুরো বিশ্ব ভীষণ উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করছিল,

...জানি ইউক্রেনের চেয়েও ভয়াবহ যুদ্ধ লেগে যায়। না, চায়নিজ মিসাইল-গুলো তাইওয়ানের সীমানায় এসে পড়লেও, স্থলভূমিতে পড়েনি; জলভূমিতে পড়েছে। আমেরিকা-তাইওয়ান এটুকু সহ্য করে নিয়েছে। বড় কোনো সমস্যা হয়নি। শুধু তাইওয়ানি জেলেরা সপ্তাহ-দশদিন মাছ শিকারে যেতে পারেনি আর তাইওয়ানি বাহিনী ২৪ ঘণ্টা যুদ্ধাবস্থায় প্রস্তুত হয়েছিল। তাইওয়ানের বিলিয়ন-বিলিয়ন ডলার বাণিজ্যিক ক্ষতি হয়েছে। মহড়া চলাকালে মার্কিন নৌ-বহর পরিপূর্ণ সতর্কাবস্থায় তাইওয়ানের পূর্ব দিকে অবস্থান নিয়েছিল।

১৪. সমস্যা শুরু হয়েছিল আমেরিকার ৮২ বছর বয়েসি স্পিকার ন্যান্সি প্যালোসি তাইওয়ান সফর করার পর থেকে। ন্যান্সি ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের চারটি দেশ (সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান ও মালয়েশিয়া) সফরে এসেছিল। সফর শেষ করে যাওয়ার সময় আচানক তার বিমান মোড় ঘুরিয়ে তাইওয়ানে অবতরণ করে। ন্যান্সি এমনটা কেন করল? পুরো দুনিয়ার পিলে চমকে দেওয়া ঘটনা জন্ম দেওয়ার পেছনে ন্যান্সির উদ্দেশ্যটা কী ছিল?

১৫. ৩১ জুলাই ২০২২ সালে মার্কিন সরকারি ওয়েবসাইট (www.speaker.gov)-এ একটি প্রেস রিলিজ প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে বলা হয়, মার্কিন হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভের স্পিকার ন্যান্সি প্যালোসি ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে সফরে যাচ্ছে। সফরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছিল, নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও অভ্যন্তরীণ সরকারব্যবস্থার উন্নয়ন বিষয়ে আলোচনা করার জন্য যাচ্ছে। প্রেস রিলিজে উপরোক্ত ৪টি দেশের নামই ছিল শুধু। তাইওয়ানের নামগন্ধও ছিল না।

১৬. এই প্রেস রিলিজ প্রকাশিত হওয়ার আগ থেকেই আমেরিকা জুড়ে ফিসফাস শুরু হয়ে গিয়েছিল। ন্যান্সি সামনের বার ডেমোক্র্যাট দলের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারে। এজন্য 'হেডম জাহির' (শো অফ পাওয়ার)-এর জন্য তাইওয়ানও যেতে পারে। এপ্রিলের ৭ তারিখ জাপানি ফুজি নিউজ নেটওয়ার্ক (এফএনএন) কোনো গোপন সূত্রের ভিত্তিতে ছেপে দেয়, ন্যান্সি তাইওয়ানও যাবে। ন্যান্সি হয়তো মার্কিন ভোটারদের আকৃষ্ট করার জন্যই এমনটা করে থাকতে পারে। এরপর পুরো দুনিয়ার সংবাদমাধ্যমে রীতিমতো ন্যান্সির সফর ঘিরে সংবাদ-বিশ্লেষণের সয়লাব বয়ে যেতে শুরু করেছিল। গত ২৫ বছরের মধ্যে এই প্রথম এত উচ্চপদস্থ কর্মরত

কোনো মার্কিন কর্মকর্তার তাইওয়ান সফর। চীন আগ থেকেই ন্যান্সির প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখছিল। চীন কঠিন ভাষায় আমেরিকাকে হুমকি দিয়ে বলেছিল, ন্যান্সি তাইওয়ান সফর করলে তার ফলাফল হবে ভয়াবহ। আগুন নিয়ে খেললে পুড়ে মরতে হয়। চীন যেকোনো পরিস্থিতির জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে আছে।' এর চেয়ে কঠিন হুমকি আর হতে পারে না।

১৭. চীন মনে করে আদিকাল থেকেই তাইওয়ান চীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ১৯৪৯ সাল থেকে সেখানে একটি স্বাধীন সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত আছে। তাইওয়ানের এই সরকারকে চীন স্বীকার করে না। তাইওয়ানের ব্যাপারে চীনের এমন কঠোর আপসহীন মনোভাব জানতে হলে একটু পেছনে যেতে হবে।

১৮. মাও সে-তুং ও চিয়াং কাইশেক। একজন বর্তমান চীনের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট, আরেকজন তাইওয়ানের। চিয়াং কাইশেক চায়নিজ সেনা কর্মকর্তা ছিল আর মাও ছিল চায়নিজ কমিউনিস্ট পার্টির নেতা। চল্লিশের দশকের মাঝামাঝিতে চীনে লেগে থাকা ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ থামানোর জন্য চিয়াং কাইশেক আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছিল; এমনকি একটি জাতীয় সরকার গঠনও করেছিল। পুরো চীনকে এই সরকারের অধীনে এক পতাকাতলে জমায়েত করতে সক্ষম হয়েছিল। চিয়াং কাইশেক মঙ্গোলিয়াকেও চীনের অন্তর্ভুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছিল। ১৯৪৩ সালের ১০ অক্টোবরে এই জাতীয় (ন্যাশনালিস্ট) সরকারের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিল। চিয়াং কাইশেক আমেরিকা ও ইউরোপের কাছে সমাদৃত ছিল। পশ্চিমারা তাকে সমর্থন করত। চায়নিজ কমিউনিস্ট পার্টি মাও সে-তুংয়ের নেতৃত্বে আগে থেকেই চীনে একটি কমিউনিস্ট রাষ্ট্র কায়েমের জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। চিয়াং কাইশেক রাষ্ট্রগঠনের পর কমিউনিস্টরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দিলো। আগে চিয়াং ও মাও পরস্পর বন্ধু না হলেও শত্রু ছিল না। ১৯৪৮ সাল নাগাদ মাওবাহিনী চীনের প্রতিটি ফ্রন্টে চিয়াংয়ের বিরুদ্ধে জিততে শুরু করেছিল। কমিউনিস্টদের কাছে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ক্রমশ ভূমি হারিয়ে পিছু হটতে হটতে নিজের লোক-লশকর নিয়ে আজকের তাইওয়ান দ্বীপে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। তার নাম দিলো 'রিপাবলিক অব চায়না'। ঘোষণা দিলো, এটাই মূল চায়না। মূলভূমি চায়না আমাদেরই অংশ। শীঘ্রই আমরা 'মেইনল্যান্ড' দখল করে নিব।

১. ওদিকে মাও সে-তুং মূলচীনকে 'পিপলস রিপাবলিক অব চায়না' নাম দিয়ে রাষ্ট্রগঠন করল। প্রথম দিন থেকেই চায়নিজ কমিউনিস্ট পার্টি নিজেদের এক নাম্বার মিশন ও ভিশন বানিয়েছে : তাইওয়ানসহ পুরো চীনকে তারা আবার এক করবে। এই কথা তারা স্কুল-কলেজের পাঠ্য বইয়ে, সভা-সমিতিতে ও হাটে-মাঠে হরহামেশাই বলে বেড়াতে লাগল। কিছুদিন আগে চায়নিজ কমিউনিস্ট পার্টির শততম বার্ষিক সভায় প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং বলেছে : তাইওয়ান সমস্যার সমাধান করা, চীনকে পুনরায় একত্র করা চায়নিজ কমিউনিস্ট পার্টির ঐতিহাসিক মিশন। এই মিশন থেকে দুনিয়ার কেউ আমাদের হটাতে পারবে না।

২০. তাইওয়ানে গিয়ে চিয়াং কাইশেকেরও এই মত ছিল : চীন দুই নয়; এক। চিয়াং কাইশেক তাইওয়ানে গিয়ে সরকার গঠন করার পর স্বাধীনতা ঘোষণা করেনি। একদিক থেকে এটা চিয়াং কাইশেকের ভুল ছিল। অন্যদিকে তাইওয়ান নিয়ে চায়নিজ কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থানও দিনদিন কঠোর থেকে কঠোরতম হয়েছে। চীন দুই নয়; এক—এই চিন্তাকে 'একচীন নীতি' বা ওয়ান চায়না পলিসি বলা হয়। চীনের সমস্ত পররাষ্ট্রনীতি এই ওয়ান চায়না পলিসি অনুসারে পরিচালিত হয়। ওয়ান চায়না নীতিতে বিশ্বাসী না হলে চীনের সাথে কোনো ধরনের চুক্তি বা লেনদেন করাই অসম্ভব।

২১. ওয়ান চায়না পলিসির কারণেই আমেরিকার ক্ষমতাসীন সরকারপ্রধান তো বটেই, তাইওয়ানে উচ্চপদস্থ কোনো সরকারি কর্মকর্তার সফরও চীন একটুও বরদাশত করে না। আজ পর্যন্ত স্রেফ একজন মার্কিন প্রেসিডেন্ট (আইজেনহাওয়ার) তাইওয়ান সফর করেছে। সে ১৯৬০ সালে তাইওয়ান সফর করে চিয়াং কাইকেশের সাথে একাত্ম ঘোষণা করেছিল। এটা সম্ভব হয়েছিল, কারণ তখন মার্কিন-চীন দ্বিপাক্ষিক কূটনৈতিক সম্পর্কই ছিল না। তখন চীন ভয়াবহ দারিদ্র্যের শিকার ছিল। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে মাও সে-তুং লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা করছিল। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়েছিল। তারপর ১৯৯৭ সালে আরেকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা তাইওয়ান সফরে এসেছিল। সে ছিল রিপাবলিকানদের পক্ষ থেকে নির্বাচিত হাউস স্পিকার ন্যুট গ্যাংরিচ।

২২. ন্যান্সি পেলোসি জুলাইয়ের শেষদিকে আমেরিকা থেকে উড়াল দিয়ে পার্ল

হারবারে গিয়ে মার্কিন সেনাঘাঁটিতে সেনা কর্তকর্তাদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছিল । তারপর ১ আগস্ট মালয়েশিয়া, তারপর সিঙ্গাপুর, তারপর ২ আগস্ট তাইওয়ান গিয়েছে। ন্যান্সি এত দীর্ঘ ঘুরপথ পাড়ি দিয়ে তাইওয়ান যাওয়ার একটা কারণ, সাউথ চায়না সি-তে চায়নিজ নৌঘাঁটি ও নৌবহর গিজগিজ করছে। সংঘাত এড়ানোর জন্যই মূলত এই ঘুরপথ অবলম্বন। কুয়ালালামপুর থেকে উড়াল দিয়ে ইন্দোনেশিয়ার হাজারো দ্বীপের ওপর দিয়ে তিন ঘণ্টা অতিরিক্ত সময় লাগিয়ে তাইওয়ানের পেছন দিয়ে রাজধানী তাইপে পৌঁছেছিল। এখানে দুই দিন অবস্থান করেছিল। ন্যান্সি তাইওয়ানবাসীর ভূয়সী প্রশংসা করে তাদেরকে পৃথিবীর সবচেয়ে স্বাধীন জাতিগুলোর অন্যতম বলেছিল । ন্যান্সি সেই পুরোনো মার্কিন ঘোষণাই পুনর্ব্যক্ত করে : 'আমরা কখনো কোনো অবস্থাতেই তাইওয়ানকে একা ছেড়ে দিব না। তাইওয়ানকে বন্ধু হিসেবে পেয়ে আমেরিকা গর্বিত ছিল, গর্বিত থাকবে।'

চীনের সাথে ন্যান্সির টক্কর আজকের নয়, অনেক পুরোনো। ১৯৯১ সালে ন্যান্সি বেইজিং সফর করেছিল। ন্যান্সি তখন জুনিয়র কংগ্রেসওম্যান। সে সফরে ন্যান্সি একটা কাজ করেছিল, বেইজিংয়ের তিয়েনআনমেন স্কয়ারে গিয়ে একটি ব্যানার তুলে ধরেছিল। সেটাতে লেখা ছিল, 'গণতন্ত্রের জন্য প্রাণ দেওয়া মানুষগুলোর প্রতি শ্রদ্ধা।' ১৯৮৯ সালে চীন তিয়েনআনমেন স্কয়ারে এক গণহত্যা চালিয়েছিল। ছাত্রজনতা চীনে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য বিক্ষোভ শুরু করেছিল। চায়নিজ কর্তৃপক্ষ প্রতিবাদকারীদের ওপর ট্যাংক চালিয়ে দিয়েছিল। বিপুল সংখ্যক বিক্ষোভকারী মারা গিয়েছিল। কিছু প্রাণ বাঁচিয়ে হংকংয়ে আশ্রয় নেয়। হংকং এখন চীনের অংশ হলেও তখন ব্রিটেনের অধীনে ছিল। ন্যান্সি চীন যাওয়ার আগে হংকং গিয়েছিল। সেখান চীন থেকে পালিয়ে আসা গণতন্ত্রকামীদের সাথে সাক্ষাৎ করেছিল। এই গণতন্ত্রকামীরাই ন্যান্সিকে একটি কালো ব্যানার দিয়েছিল। ন্যান্সি সেটা ব্যাগে লুকিয়ে চীন নিয়ে তিয়েনআনমেন স্কয়ারে উড়িয়েছিল। ব্যানারে লেখা ছিল : গণতন্ত্রের জন্য প্রাণ দেওয়া মানুষগুলোর প্রতি শ্রদ্ধা।

২৩. ন্যান্সির বয়েস তখন ৬১ ছিল। এখন ৮৩। চায়নিজ পুলিশ দৌড়ে এসে ন্যান্সিকে জোরজবরদস্তি করে নিরস্ত করেছে। ন্যান্সি সেদিন আরেকটা কাজ করেছিলেন, তিয়েনআনমেন স্কয়ারে একটি সাদা ফুল রেখেছিল এখানে নিহত ছাত্রজনতার স্মরণে। ন্যান্সি ২০১০ সালে চায়নিজ সরকারবিরোধী বিপ্লবী লিউ

জিয়াওগোকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়ার জন্য নরওয়ের রাজধানী অসলো গিয়েছিল। এর ৯ বছর পর ন্যান্সি ওয়াশিংটন ডিসিতে বিখ্যাত ট্যাংকম্যানের স্ট্যাচু অবমুক্ত করেছিলেন। ১৯৮৯ সালে চীন তিয়েনআনমেন স্কয়ারে গণতন্ত্রের দাবিতে বিক্ষোভরত ছাত্রজনতাকে দমন করার জন্য ট্যাংক বহর পাঠিয়েছিল। এক অজ্ঞাতনামা অসমসাহসী চায়নিজ একাই চলন্ত ট্যাংকের সামনে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। সেই ট্যাংকম্যানের স্মরণেই স্ট্যাচুটি স্থাপন করা হয়। ন্যান্সি তিব্বত, উইঘুর ও হংকং ইস্যুতেও বেশ সোচ্চার থাকে। ২০১৯ সালে আমেরিকা হংকংয়ের মানবাধিকার ও গণতন্ত্রনীতি আইন পাস করে, ২০২০ সালে আমেরিকা উইঘুর মানবাধিকার আইন পাস করে। উভয় আইনে ন্যান্সি স্বাক্ষর করেছে।

২৪. আচ্ছা, চায়নিজ সরকার ছোট্ট এক তাইওয়ান নিয়ে এতটা স্পর্শকাতর কেন থাকে? এর উত্তরের সাথে জড়িয়ে আছে বর্তমান চায়নিজ প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং। ২০১৮ সালে চীনে একটা আইন পাস হয়েছিল। একজন প্রেসিডেন্ট শুধু দুই বার রাষ্ট্রপ্রধান থাকার যে আইন ছিল—সেটা হটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। গত ১০ বছরে শি জিনপিং নিজের সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীকে নির্মমভাবে নির্মূল করেছে। নিজের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে, শি জিন চায়নিজদের মাঝে জাতীয়তাবাদ উসকে দিয়েছে। তাইওয়ান সেই জাতীয়তাবাদেরই বলি। পুতিনও এই ধাঁচে দেশ শাসন করছে। ইউক্রেন ও রাশিয়ার মাঝে চলমান যুদ্ধ মূলত পুতিনের ব্যক্তিগত যুদ্ধ। তাইওয়ানেও একই কথা প্রযোজ্য। এটা শি জিনপিংয়ের একার লড়াই হয়ে দঁড়িয়েছে।

২৫. ন্যান্সির তাইওয়ান সফরের প্রতিক্রিয়ায় চীন বড় কয়েকটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আমেরিকার সাথে অনুষ্ঠিতব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা বৈঠক বাতিল করে দিয়েছিল। তাইওয়ানকে সবদিক থেকে ঘিরে চারটি স্থানে সামরিক মহড়া শুরু করেছিল।

২৬. তাইওয়ান ছোট একটি দ্বীপরাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও প্রতিবছর চীনের সাথে দ্বিপাক্ষিক বার্ষিক লেনদেনের পরিমাণ ৩২৮.৩ বিলিয়ন ডলার। রপ্তানিতে তাইওয়ানই এগিয়ে ছিল। ন্যান্সির সফরের পর করোনা ভাইরাসের অজুহাত দেখিয়ে চীন বেশ কয়েকবার বিপুল অঙ্কের তাইওয়ানি আমদানি বন্ধ করে দিয়েছিল। চীনে ঢুকতে দেয়নি। চায়নিজ হ্যাকাররা অনবরত তাইওয়ানি

ওয়েবসাইটগুলোর ওপর হামলা চালিয়ে গিয়েছিল। নান্সির সাথে বৈঠকে কী কী কথা হয়েছে, সেটা উদ্ধার করার জন্যই মূলত হামলা করা হয়েছে। এই সফরে মূলত সব উপকার ন্যান্সিরই হয়েছে। পুরো বিশ্ব ও আমেরিকান জনগণের কাছে তার নাম পৌঁছে গেছে, যা পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কাজে আসতে পারে। তাইওয়ানের ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্টও রাজনৈতিকভাবে উপকৃত হয়েছিল; দীর্ঘমেয়াদে দ্বীপ রাষ্ট্রটির সমস্যা আরো গভীর ও আরো জটিল হয়ে উঠেছে।

২৭. একটি সফরের কারণে তিনটি দেশে রীতিমতো তুফান বয়ে গেছে। আমেরিকার অনেকেই এই সফরকে দায়িত্বজ্ঞানহীন বলেছে। তাইওয়ান আশঙ্কায় পড়ে গিয়েছিল, চীন না আবার রাশিয়ার মতো হামলা করে বসে। ইউক্রেন যেভাবে বিপদে পড়েছে, তাইওয়ানের ক্ষেত্রেও এমনটা হতে পারে। ইউক্রেনের মতো তাইওয়ানও যদি চীনের কাছে ভূমি হারিয়ে বসে?

২৮. ওদিকে চীনও আশঙ্কায় থাকে। আমেরিকা যেভাবে ধীরে ধীরে তাইওয়ানকে মদদ দিয়ে শক্তিশালী করে তুলছে, একদিন হয়তো ওয়ান চায়না পলিসি হুমকির মুখে পড়বে। আমেরিকার দেখাদেখি বিশ্বের অন্য দেশও যদি তাইওয়ানকে গুরুত্ব দিতে শুরু করে? চীন জানে, তাইওয়ানকে আত্মীকরণের পথে একমাত্র বাধা অমেরিকা। আমেরিকা পেছনে না থাকলে তাইওয়ানকে দখল করে নেওয়া চীনের জন্য মুশকিল কিছু নয়। ন্যান্সির সফরের কিছুদিন পরই চায়নিজ কমিউনিস্ট পার্টির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ২০তম এজলাস অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। সেখানে শি জিনপিংকে তৃতীয়বারের মতো কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান হওয়ার প্রস্তাব পাস করা হবে। এর আগে কেউ তৃতীয় দফায় কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান হয়নি। এমতাবস্থায় তাইওয়ানকে মোক্ষম এক জবাব দিতে না পারলে শি জিনপিংয়ের ভাবমূর্তিতে কিছুটা হলেও আঁচড় লাগবেই।

২৯. এই সফরের কারণে আমেরিকাও ভয় পেয়েছিল। চীন যদি তাইওয়ানে হামলা করেই বসে, আমেরিকা তার জবাব দিবে কীভাবে? চীন যদি তাইওয়ানের কোনো একটা অংশকে দখল করে নেয় বা তাইওয়ানের ১৬৬টি দ্বীপের মধ্যে কোনো একটিও যদি দখল করে নেয়, সেক্ষেত্রে আমেরিকা কতদূর পর্যন্ত যাবে? ১৯৫৫ সালে চীন ও তাইওয়ানের মধ্যে একটি চুক্তি

সাইনো এমেরিকান ডিফেন্স এগ্রিমেন্ট) স্বাক্ষরিত হয়েছিল। ১৯৬০ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার উক্ত চুক্তির পাঁচবছর পূর্তি উৎসবে যোগ দিতেই মূলত তাইওয়ান এসেছিলেন। উক্ত চুক্তিতে লেখা ছিল, আমেরিকা তাইওয়ানের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা করবে। এই চুক্তির কার্যকারিতা ১৯৭৯ সালের জানুয়ারিতে শেষ হয়ে গিয়েছিল। মূল ভূখণ্ড চীনের সাথে আমেরিকার কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। সম্পর্কটা এই শর্তের ভিত্তিতে হয়েছিল যে, আমেরিকা তাইওয়ানের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে ওয়ান চায়না পলিসিকে স্বীকৃতি দিবে। আমেরিকা তাই করেছিল।

৩০. ১৯৮২ সালে মার্কিন কংগ্রেস সর্বসম্মতভাবে ছয় দফা (সিক্স এশুরেন্স) নীতিমালা বিল পাস করেছে। এই ছয় দফা ছিল চীনের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের মৌলিক নীতিমালা। চার নাম্বার নীতিমালা ছিল, তাইওয়ানের নিরাপত্তার প্রশ্নে আমেরিকা কোনো প্রকার সমঝোতা করবে না। চতুর্থ দফাটির ওপর আমেরিকা আজও অবিচল আছে।

৩১. আমেরিকার সপ্তম নৌবহরের হেডকোয়ার্টার জাপানে। তাইওয়ানের নিরাপত্তার জন্যই মূলত প্যাসিফিক ওশনে এই মার্কিন নৌবহর দশকের পর দশক ধরে তাইওয়ানের পূর্বপাশে অবস্থান করছে। এখন প্রশ্ন হলো, যুদ্ধ তো বাঁধেনি, তাহলে আমেরিকা এখন কী করবে? আমেরিকা এরপর আরো উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা তাইওয়ানে পাঠাবে। তাইওয়ানকে আরো অস্ত্রশস্ত্র দিবে। এক বছর আগেও তাইওয়ানের সাথে ৭৫ কোটি ডলারের অস্ত্রবিক্রয় চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। তখন চীন অনেক হৈ চৈ করেছিল। যদি চীনের দিক থেকে পরিস্থিতি আরো সঙ্গিন করে তোলা হয়, তাহলে আমেরিকা এটা করতে পারে, ১৯৯৫-১৯৯৬ সালের মতো সপ্তম নৌবহর চীন ও তাইওয়ানের মধ্যবর্তী স্ট্রেইটে (প্রণালী) মোতায়েন করে পেশীশক্তি (শো অফ পাওয়ার) প্রদর্শন করতে পারে। আমেরিকা এমন কিছু করলে চায়নিজ সরকারের ওপর মারাত্মক চাপ সৃষ্টি হবে। এজন্য চীন হাউকাউ করলেও একটা সীমায় গিয়ে থেমে যেতে বাধ্য হয়।

৩২. চীন আগে দুয়েকবার তাইওয়ান দখলের চেষ্টা একেবারেই যে করেনি, তা কিন্তু নয়। সফল হতে পারেনি। বর্তমানে চীন ও তাইওয়ানের মধ্যে কি যুদ্ধ বেধে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে?

আমাদের মতে, নিকট ভবিষ্যতে এমনটা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। আমেরিকা এখন পর্যন্ত রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের চাপ সামাল দিতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। পৃথিবী আপাতত আর কোনো যুদ্ধের বোঝা বহন করতে প্রস্তুত নয়। ইউরোপের তো বলতে গেলে ইউক্রেন সমস্যা নিয়ে নাভিশ্বাস উঠে গেছে। শ্রীলঙ্কার মতো ছোট দেশ দেউলিয়া হয়ে গেছে। বাংলাদেশে উন্নয়নশীল অর্থনীতিও ধুঁকছে। ইউরোর মূল্য এক ডলারে নেমে এসেছিল। পাকিস্তানের অবস্থা তো শোচনীয়। ২০২৩ সাল ইতিহাসের ভয়াবহতম অর্থনৈতিক মন্দার বছর হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এহেন পরিস্থিতিতে আমেরিকা-ন্যাটো চীনের সাথে কোনো যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে পুরো বিশ্ব তো বটেই, ইউরোপেও যা কিছু সুখ-সুবিধা আছে, তা বন্ধ হয়ে যাবে। পুরো দুনিয়ার অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়বে। যেসব রাষ্ট্র বেশি রপ্তানি করে, তারাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ, আমদানিকারকদের কাছে টাকা না থাকলে তারা কিনবে কীভাবে? মোদ্দাকথা, যুদ্ধ লাগলে পুরো দুনিয়া ক্ষতির সম্মুখীন হবে। এজন্যই বলা যায়, আপাতত যুদ্ধের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

৩৩. ঘটনাচক্রে যুদ্ধ বেধে গেলে উভয়পক্ষেরই যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়া আছে। বলাবাহুল্য সে যুদ্ধ ডেকে আনবে অকল্পনীয় ধ্বংস। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং-কে বলেছিল : 'প্রস্তুতি নিয়ে, ঘোষণা দিয়ে শুরু করা যুদ্ধের চেয়ে না চাইতে লেগে যাওয়া যুদ্ধের ভয়াবহতা অনেক বেশি হয়'।

আরেকটা প্রশ্নও সামনে আসে। চীনের সামরিক প্রস্তুতি তো মোটামুটি সবারই কমবেশ জানা। তাইওয়ানের প্রস্তুতি কেমন? ছোট্ট একটা দ্বীপরাষ্ট্র তাইওয়ান। মূলচীন তার চেয়ে ২৬৫ গুণ বড়। তাইওয়ান চীনের ০.৩৭% (জিরো পয়েন্ট থ্রি সেভেন পার্সেন্ট), অর্থাৎ একশভাগের এক ভাগের চেয়েও ছোট। চীনের জনসংখ্যা ১৪১ কোটি আর তাইওয়ানের জনসংখ্যা ২ কোটি ৩০ লাখ। নিজের চেয়ে হাজার হাজার গুণ বেশি শক্তিশালী চীনের বিরুদ্ধে তাইওয়ান কীইবা আর প্রস্তুতি নিবে?

৩৪. ১৯৯৪ সালে একটা ঘটনা ঘটেছিল। তৎকালীন তাইওয়ানিজ প্রেসিডেন্ট লি সাউথ আমেরিকা সফর শেষ করে ফিরছিল। রিফুয়েলিংয়ের জন্য আমেরিকার হনলুলুতে লির বিমান অবতরণ করেছিল। প্রেসিডেন্ট বিমান

বেকে নামতে চাইলে আমেরিকা তাকে ভিসা দেয়নি। পুরো রাত বিমানেই কাটাতে হয়েছে লিকে। প্রেসিডেন্ট লি খুবই অপমান বোধ করেছিল । মার্কিন কংগ্রেসেও এ নিয়ে কথা উঠেছিল। কংগ্রেসের বক্তব ছিল, আমাদের বন্ধু রাষ্ট্রের প্রধানের সাথে এমনটা করা উচিত হয়নি। এ নিয়ে আমেরিকার মনে কিছুটা অপরাধবোধ ছিল। ওদিকে চীন বলতে শুরু করে দিলো, আমেরিকা লির বিমানকে নামার অনুমতি দিয়ে ঠিক করেনি। এর এক বছর পর ১৯৯৫ সালে আরেকটি ঘটনা ঘটেছিল। প্রেসিডেন্ট পড়াশোনা করেছিল এক মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে। ভার্সিটির পক্ষ থেকে লিকে লেকচার দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। মার্কিন নিয়ম অনুযায়ী, মার্কিন কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বাইরের কোনো স্কলারকে লেকচারের জন্য দাওয়াত দিলে মার্কিন কর্তৃপক্ষ তাকে ভিসা দিয়ে দেয়। লির প্রসঙ্গে এলে আমেরিকা দ্বিধায় পড়ে গেল। ভিসা দিবে কি দিবে না। তখন বিল ক্লিনটনের শাসনকাল ছিল। মার্কিন কর্তৃপক্ষ চীনকে উসকাতে চাচ্ছিল না। ক্লিনটন ভিসার ব্যাপারে চীনের নাখুশি থেকে বাঁচার জন্য কংগ্রেসে ভোটাভুটির ব্যবস্থা করল। ভিসা দেওয়ার পক্ষে সবাই স্বতস্ফূর্তভাবে ভোট দিলো। প্রেসিডেন্ট লি ভিসা পেয়ে গেল। এতে চীন মহাখাপ্পা হয়ে গেল। চায়নিজ মিডিয়া প্রেসিডেন্ট লিকে গাদ্দার আখ্যা দিয়ে বলল, এই লোক ওয়ান চায়না পলিসির শত্রু। প্রতিক্রিয়ায় তাইওয়ানের নাকের ডগায় এসে সামরিক মহড়া শুরু করে দিলো। ক্লিনটন পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে তাদের সপ্তম নৌবহরের সবচেয়ে বড় বিমানবাহী রণতরী 'ইউএসএস ইন্ডিপেন্ডেন্ট'-কে চীন ও তাইওয়ানের মাঝামাঝি ১২০ মাইল প্রস্থের তাইওয়ান স্ট্রেইটে এসে টহল দিতে বলল। এটা ছিল চায়নার প্রতি অনেক বড় হুমকি। চায়না কোনো উপায়ান্তর না দেখে পিছু হটে গেল। পরোক্ষভাবে চায়না মেনে নিয়েছিল, আমেরিকা এক নাম্বার সুপার পাওয়ার।

৩৫. কিন্তু এখন ১৯৯৫ সাল নয়। আমেরিকা আগের আমেরিকা নেই; চীনও সেই চীন নেই। তাইওয়ানও আগের মতো নেই। তাইওয়ানের অত্যন্ত শক্তিশালী এয়ার ডিফেন্স জোন (এডিআইজেড-এডিজ) আছে। অপরিচিত (আনআইডেন্টিফায়েড) কোনো বিমান এই জোনে প্রবেশ করলেই মিসাইল ছুড়ে সেটাকে ভূপাতিত করা যাবে। চীনা বিমানগুলো এডিজের বিন্দুমাত্র পরোয়া করে না। চায়নিজ বিমান গায়ে পড়ে এডিজের সীমা লঙ্ঘন করে। একেকদিন অসংখ্যবার এই শয়তানি করে। ২০২১ সালে তাইওয়ানে চীন

বাড়াবাড়ি রকমের সীমালঙ্ঘন করেছিল। চীন যদিও হামলা করেনি, কিন্তু চায়নিজ বিমানের এহেন বেয়াড়া আচরণে তাইওয়ানকে সারাক্ষণ সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থায় থাকতে হয়েছে। একটি রাষ্ট্রকে সর্বোচ্চ সামরিক সতর্ক থাকতে হলে বিপুল পরিমাণ অর্থ, শ্রম ও সময় ব্যয় করতে হয়। চীন এখন পর্যন্ত হামলা না করলেও কখনো করবে না—এমন নিশ্চয়তা তো নেই। হঠাৎ করে এক সাথে শতাধিক বিমান একযোগে হামলা করে তাইওয়ানের বিমানবন্দরগুলো ধ্বংস করে দিতে পারে। এজন্যই তাইওয়ানকে সতর্ক থাকতে হয়।

৩৬. চায়নার এই শয়তানি থামানোর জন্য আমেরিকা ১৯৯৫ সালের মতো আবারো তাইওয়ান স্ট্রেইটে বিমানবাহী রণতরী মোতায়েন করল; কিন্তু এবার ঘটনা আগের মতো ঘটল না। মার্কিন সামরিক বিশেষজ্ঞদের মতেই চায়নিজ নেভি এখন মার্কিন নেভির চেয়েও বড় হয়ে গেছে। মার্কিন রণতরীর উপস্থিতিতেই চায়নিজ বিমানগুলো আগের চেয়ে তিন-চারগুণ বেশি করে তাইওয়ানের আকাশসীমা লঙ্ঘন করতে শুরু করে দিলো। আমেরিকা বাধ্য হয়ে রণতরী পিছু হটিয়ে নিল। এর মাধ্যমে পরোক্ষভাবে এটা প্রমাণিত হলো, আমেরিকা এখন আর নিরঙ্কুশভাবে নাম্বারওয়ান অবস্থানে নেই। চীন যেকোনো মূল্যে তাইওয়ানকে নিজ মানচিত্রের অন্তর্ভুক্ত করবেই। এ বিষয়ে চীন আপসহীন। তবে আপাতত সরাসরি হামলায় যাবে না। এর প্রধান পাঁচটি কারণ হিসেবে বলা যায় :

০১. আমেরিকা যদিও তাইওয়ানকে কাগজে-কলমে স্বাধীন দেশ মানে না, তবুও তাইওয়ানের সাথে আমেরিকা জড়িয়ে আছে। ইউক্রেনে আমেরিকা সরাসরি যুদ্ধে জড়ায়নি। ইউক্রেনকে আমেরিকা কখনো এই আশ্বাস দেয়নি যে, তাদের বিরুদ্ধে কেউ যুদ্ধ করলে আমেরিকা বা ন্যাটো তার সাহায্যে ছুটে যাবে; কিন্তু তাইওয়ানকে আমেরিকা এ কথা অসংখ্যবার বলেছে এবং বাস্তবে এসেছেও। তাইওয়ান ইউক্রেন নয়। চীন হামলা করে মোয়ার মতো তাইওয়ানকে খেয়ে ফেলবে।

০২. আমেরিকা তো পরে আসবে। তাইওয়ান পুরো দেশকে একটি সুরক্ষিত দুর্গের মতো বানিয়ে রেখেছে। বিশেষ করে পূর্বে প্যাসিফিক ওশানের দিকে পাহাড়ি-জঙ্গুলে এলাকা পৃথিবীর সবচেয়ে সুরক্ষিত স্থানগুলোর একটি

হলে মনে করা হয়। সামরিক বিশেষজ্ঞদের মতে, তাইওয়ান দখল করতে হলে চীনের প্রয়োজন ২০ লাখ সেনা। এটা শুধু স্থলবাহিনীর সংখ্যা। বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীর হিসাব এর বাইরে। কারণ, কোথাও আক্রমণ করতে গেলে আক্রান্ত শক্তির তুলনায় তিন থেকে পাঁচগুণ বেশি সেনা প্রয়োজন হয়। তাইওয়ানের অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত ও উন্নত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেনা সংখ্যা প্রায় ৩ লাখ। আর রিজার্ভ ফোর্স মিলিয়ে এই সংখ্যা প্রায় ৪ লাখের কাছাকাছি হবে। চীনের আপাতত এতবড় সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি নেই।

০৩. চীন আক্রমণ করলে তাইওয়ানকে খুব বেশি লড়তে হবে না। শুধু আমেরিকা এসে পৌঁছা পর্যন্ত চায়নিজ ফৌজকে ঠেকিয়ে রাখতে পারলেই হবে। তাইওয়ানের কাছে এর চেয়ে বেশি সামর্থ্য আছে। মনে রাখতে হবে, তাইওয়ান শুধু আমেরিকার জন্যই নয়, ফিলিপাইন, লাওস, ভিয়েতনাম অর্থাৎ সাউথ চায়না সি-র উপকূলে থাকা দেশগুলোর জন্যও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাইওয়ান চীনকে এখন পর্যন্ত মেইনল্যান্ডে ঠেকিয়ে রেখেছে। তাইওয়ান চীনের কবজায় চলে গেলে এসব দেশও হুমকির সম্মুখীন হবে।

০৪. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো, তাউওয়ানের ওপর চীনের হামলা করার কোনে প্রয়োজনই নেই। বিশ্বের উল্লেখযোগ্য কোনো দেশ তাইওয়ানকে স্বাধীন দেশ হিসেব স্বীকৃতি দেয় না। পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যে ধরনের রেষারেষি, চীন-তাইওয়ানের মধ্যে সেরকম কেনাকেনি নেই। উভয় দেশই নিজেকে আসল চায়না মনে করে। উভয় দেশই নিজেকে অন্যের তুলনায় ভালো চায়নিজ প্রমাণের চেষ্টা করে। তাইওয়ান চীনের সবচেয়ে বড় বিনিয়োগকারীদের অন্যতম। পর্যটন শিল্পেও চীন অনেক লাভবান হচ্ছে। ২০১৯ সালে তাইওয়ান থেকে চীনে ঘুরতে আসা পর্যটকের সংখ্যা ছিল ৮ লাখেরও বেশি। তাইওয়ানে হামলা করলে চীনেরই ক্ষতি।

হংকংয়ের উদাহরণ দেওয়া যায়। হংকং চীনেরই অংশ ছিল। কিন্তু মাঝে ১০০ বছর ব্রিটেনের অধীনে ছিল। চীন চাইলে যেকোনো সময় হংকং দখল করে নিতে পারত; কিন্তু চীন চেয়েছিল বিষয়টা রাজনৈতিকভাবে সমাধান করতে।

তাই করেছিল। তাইওয়ান চীনের মূল ভূখণ্ড থেকে ১২০ বা এর কমবেশি কিমি দূরত্বে অবস্থিত। তাইওয়ানের কিনমিন দ্বীপ চীন থেকে মাত্র ১৫ কিলোমিটার দূরে। এখানে তাইওয়ানের কোনো সেনা থাকে না; তারপরও চীন এই দ্বীপকে কবজায় নেয়নি। চীনের একটা লিখিত নীতি আছে, চীন নিজের এলাকাকে নিজের সাথে জুড়ে রাখার জন্য কখনো রক্ত ঝরাবে না। যুদ্ধ ছাড়া সমাধান করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাবে।



দীমুকারাতিসলাম[১]

১. জুমহুরিয়ত এক মিথ্যা প্রবঞ্চনা। আমরা এক মিথ্যা প্রবঞ্চনার পেছনেই দৌড়ে মরছি। হুঁশ ফিরছে না কিছুতেই।

২. আসহাবে কাহফের সবাই মিলে একজনকে টাকা (وَرِق) দিয়ে পাঠিয়েছে, বাজার ঘুরে দোকান ঘেঁটে হালাল (أَزْكَىٰ) খাবার নিয়ে আসতে। বেচারা বাজারে গিয়ে আবিষ্কার করল, দিনকাল অনেক অনেক বদলে গেছে। সাথে করে আনা আগের টাকা এখন আর চলছে না। মানুষ ও সরকারব্যবস্থার সাথে সাথে মুদ্রাব্যবস্থাও বদলে গেছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কত যে বেলা পেরিয়ে গেছে—টেরও পাওয়া যায়নি। পাক্কা তিন শ নয় বছর এক ঘুমে কাবার। টাকা তো চলল না, এখন কী হবে? পাক্কা মুমিন সাহসী যুবকটি অবাক।

৩. বিবিকে নিয়ে সুখের সংসার। খোশহালে দিন কেটে যাচ্ছে। আজিজে মিসর বাজার থেকে সুন্দর এক বালক কিনে আনলেন। ঘরোয়া সমস্যা দেখা দিলো :

> يُوْسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۚ وَ اسْتَغْفِرِيْ لِذَنْۢبِكِ ۖۚ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخٰطِـِٕيْنَ
>
> 'ইউসুফ! তুমি এ বিষয়টাকে একদম পাত্তা দিয়ো না। আর হে নারী! তুমি নিজ অপরাধের জন্য ক্ষমা চাও। নিশ্চয় তুমিই অপরাধী ছিলে।'[২]

আজিজ অবাক। যে স্ত্রীকে বিশ্বাস করতেন, ভালোবাসতেন, যে বিবির প্রতি সীমাহীন আস্থা ছিল, সে বিবি আর 'আজিজা' (প্রিয়া) নেই। আগের মতো বিশ্বস্ত নেই। বেচারা আজিজের সামনে তিক্ত বাস্তবতা। এতদিন ঘোরে ছিলেন।

---

১ গণতন্ত্রকে আরবিতে 'জুমহুরিয়াহ' বলা হয়। দিমুকারাতিয়াহ-ও বলা হয়। আরবি 'দিমুকারাতি আর ইসলাম মিলে 'দিমুকারাতিসলাম হয়েছে। গণতন্ত্রপন্থীরা যেভাবে গণতন্ত্র আর ইসলাম মিশিয়ে জগাখিচুড়ি বানায়, নামটা সেদিকে ইঙ্গিত করছে।

২ সুরা ইউসুফ : ২৯

৪. জিনেরা মনে করেছিল, সুলাইমান এখনো জীবিত। তারা পুরোদমে কাজ করে যাচ্ছিল। ভূমিকীট সুলাইমানের লাঠি খেয়ে ফেলার পরই তারা বুঝতে পেরেছিল, এতদিন তারা ভ্রমে ছিল। নির্মাণকাজে তারা লাঞ্ছনাকর শাস্তির অংশ হিসেবে বাধ্য হয়ে যোগ দিয়েছিল। আলাইহিমুস সালাম।

৫. কল্পিত ভ্রান্তভ্রমের ঘেরাটোপে বসবাসের মেয়াদ দীর্ঘ হওয়ার চেয়ে গ্লানিকর আর কিছু হতে পারে না। সবচেয়ে বিধ্বংসী ভ্রান্তভ্রম হলো, কোনো কিছুকে পবিত্র মনে করে তার পেছনে ছোটা। দীর্ঘদিন পর যখন দেখা যায়, এতদিন 'পবিত্র' মনে করে যার পেছনে দৌড়েছে, সে একজন ভণ্ড। যার পেছনে জীবন-যৌবন সব বিলিয়ে দিয়েছে, সে একজন প্রতারক। তখন নিজের জীবন নিজে নিয়ে নিলেও মনের সংক্ষুব্ধ ক্ষোভ প্রশমিত হতে চায় না।

ভ্রান্তভ্রম দীর্ঘ হওয়াটা চরম গ্লানির। এই ভ্রমে পড়ে থাকার মেয়াদ ক্ষুদ্র হওয়াও কম পরিতাপের নয়। কোনো কারণে অল্প সময়ে ভ্রম ছেড়ে এলে মনে হতে থাকে, ইশ কেন ছেড়ে এলাম, মনে হয় ভালো কিছু ছিল। ক্ষুদ্র ও দীর্ঘসময় ভ্রান্তভ্রমে পড়ে থাকার মাঝে আমার অবস্থা, ঘুটঘুটে আঁধারে কর্দমাক্ত কণ্টকাকীর্ণ বনভূমি দিয়ে পথচলা পথিকের মতো। কাঁটা বাঁচিয়ে চলতে গেলে কাদা থেকে বাঁচা যায় না। কাদা বাঁচিয়ে চলতে গেলে কাঁটার খোঁচা অবধারিত।

৬. এসব কল্পভ্রম শয়তানের বড় অস্ত্র। কল্পভ্রম বহুতল বিশিষ্ট দালানের মতো। প্রতিটি তলায় আছে আশা ও ভয়ের বাথান। আছে তাৎক্ষণিক প্রাপ্তির আশা আর বঞ্চনার ভয়। একতলা থেকে আরেক তলায় গেলে দেখতে পাব, নতুন কিছু আশা, নতুন কিছু ভয়। প্রতিটি তলায় আছে কিছু লাভ কিছু ক্ষতি। প্রতিটি লাভেই কিছু ক্ষতি আছে, প্রতিটি ক্ষতির সাথেই কিছু লাভ আছে। এভাবে প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির ঘোরে একের পর এক তলা বাইতে বাইতে শেষে এমন এক তলা সামনে আসে, যাতে শুধু ক্ষতি আর ক্ষতি। লাভের কোনো চিহ্নই নেই। অতীত কৃতকর্মের কারণে সুযোগ পেয়ে শয়তান ক্রমে ক্রমে এই ধ্বংসগহ্বরে নামিয়ে এনেছে। আমি যদি শুরুতে ফটক দিয়ে প্রবেশ না-ই করতাম, শয়তান কি এই সুযোগ পেত?

৭. ইসলামে গণতন্ত্রের কোনো স্থান নেই। অস্তিত্ব নেই। গণতন্ত্রেও ইসলামের কোনো স্থান নেই। অস্তিত্ব নেই। কেউ এর ব্যতিক্রম কিছু বললে তার কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। কোনো 'জ্ঞানী' এমন কথা বললে বুঝতে হবে, তিনি সত্য

জানেন না অথবা তিনি জ্ঞানপাপী। আর কোনো জাহেল কথাটা বললে, তার জাহালত (অজ্ঞতাই) আমার জন্য যথেষ্ট। জাহেলের কথায় আমি কান দেব কেন?

৮. গণতন্ত্র (জুমহুরিয়াত) সর্বসম্মতিক্রমে 'কুফর'। গণতন্ত্রের অনুসারী হওয়া আর লাত-ওজ্জা-হুবালের অনুসারী হওয়ার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। কেউ পার্থক্য করতে চাইলে তাকে বলা যেতে পারে, হ্যাঁ, দুইয়ের মাঝে নাস্তিকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার পার্থক্য। একটা অপরটাকে স্বীকৃতি দেয়। একটা আরেকটা অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেয়। যেমন :

ক. নাস্তিকতা বিশ্বজগতের অস্তিত্বদানকারীর অস্তিত্ব অস্বীকার করে।

খ. ধর্মনিরপেক্ষতা বিশ্বজগতের অস্তিত্বদানকারীর শাসনব্যবস্থাকে সৃষ্টজীব থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

গ. গণতন্ত্র অস্তিত্বদাতার ইচ্ছাকে অস্তিত্বের ইচ্ছার কাছে বন্ধক রাখে। অস্তিত্ব অর্থাৎ, সৃষ্টিকুল চাইলে স্রষ্টাপ্রদত্ত শাসনব্যবস্থা চালু করতে পারবে, না চাইলে বাতিল করতে পারবে; অকার্যকরও রাখতে পারবে।

৯. যে ব্যক্তি আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করেও আল্লাহর হুকুম অস্বীকার করল বা ইচ্ছা বা পরিকল্পিতভাবে আল্লাহর হুকুমকে শাসনব্যবস্থা থেকে দূরে রাখল, সে প্রকারান্তরে ওই ব্যক্তির মতো, যে আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার এবং আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। কারণ, যে রব-ইলাহ শাসন করতে পারে না, নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, সে রব-ইলাহ থাকা না-থাকা সমান।

১০. যারা স্রষ্টার ইচ্ছাকে সৃষ্টির ইচ্ছার কাছে বন্ধক রাখে, তারা মূলত ইলাহের উলুহিয়ত (প্রভুত্ব) ছিনিয়ে নিয়ে সৃষ্টির হাতে সে উলুহিয়ত (প্রভুত্ব) সোপর্দ করেছে। এখন অবস্থা হয়েছে এমন, রাস্তাঘাট-ব্রিজ বানানোর মতো 'আল্লাহ'-ও হয়ে পড়েছেন জনগণ, সিনেটর-সংসদ ও সদ্য-বিধায়কদের হাতের পুতুল। তারা চাইলে যেমন রাস্তা-ব্রিজ হয় এবং না চাইলে হয় না, তদ্রূপ তারা চাইলে আল্লাহ থাকবেন, আল্লাহর শাসন থাকবে আর না চাইলে থাকবে না। তারা না চাইলে আল্লাহর আদেশ আর আদেশ থাকবে না, আল্লাহর নিষেধও আর নিষেধ থাকবে না।

১১. গণতন্ত্র মানে, সমস্ত ক্ষমতা (الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) মানুষের হাতে। তারা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করলে আল্লাহর আইন কার্যকর হবে। প্রত্যাখ্যান করলে

আল্লাহর আইন নিষ্ক্রিয় অকার্যকর থাকবে—এ কেমন ইলাহ-উপাস্য? যে ইলাহকে নাস্তিক অস্বীকার করে, যে ইলাহকে ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি সবকিছু থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, যে ইলাহকে গণতন্ত্র ও তার অনুসারীদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়?

১২. গণতন্ত্র হলো ধর্মনিরপেক্ষতার আদরের কন্যা। ধর্মনিরপেক্ষতা হলো নাস্তিকতার প্রিয় কন্যা। উভয়টাই খোদাদ্রোহিতা নামক এক ভয়ংকর পিতার সন্তান। এদের এক বোনকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার অর্থ হলো, অপর বোনকেও এক সাথে বিয়ের খাহেশ রাখা। এক বোনকে বিয়ে করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই আরেক বোনের সাথে বিয়ে হয়ে যাবে। গণতন্ত্র থাকলে তার হাত ধরে একসময় না একসময় ধর্মনিরপেক্ষতা আসবেই। কোনো গণতান্ত্রিক দেশে 'রাষ্ট্রধর্ম' নামক সাংবিধানিকভাবে কিছু থাকলেও সেটার পরিবর্তন আসবেই। অথবা কাগজে কলমে রাষ্ট্রধর্ম থাকলেও মূলত সবকিছু ধর্মনিরপেক্ষ পদ্ধতিতেই চলবে। এর ব্যতিক্রম হওয়ার জো নেই; একদিন আগে বা পরে।

১৩. পার্লামেন্টে ভোটাভুটি হবে। নারী ও পুরুষ সমান মিরাস পাবে কি পাবে না—এ বিষয়ে। অথবা সমকামীদের বিয়ে বা অন্যান্য সামাজিক অধিকার নিয়ে। বিশুদ্ধ গণতন্ত্রের দাবি মতে এমনই হয়ে থাকে। পার্লামেন্ট সদস্য হিসেবে আমাকে ভোটাভুটিতে অংশ নিতে হবে। আমি প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিই বা বিপক্ষে—উভয় অবস্থাতেই আমি ইসলাম অস্বীকার করলাম, বিশুদ্ধ গণতন্ত্রে ঈমান আনলাম।

১৪. আল্লাহর বিধান সঠিক না ভুল—এ বিষয়ে কখনো কোনো অবস্থাতেই গণভোট অনুষ্ঠিত হতে পারে না; শরিয়ত এমন গণভোট সমর্থন করে না। এ কথা জানা থাকার কারণে আমি গোড়াতেই যদি গণভোট প্রত্যাখ্যান করি, তাহলে আমি ইসলামের প্রতি ঈমান আনলাম, গণতন্ত্রের সাথে কুফরি করলাম।

১৫. জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে গণতন্ত্রের সবচেয়ে শক্তিশালী দিক হলো, গণতন্ত্রে যেকোনো বিষয়কে জনগণের সম্পৃক্তিতে ভোটের মুখোমুখি দাঁড় করাতে পারে।

১৬. ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে গণতন্ত্রের সবচেয়ে দুর্বল ও নিকৃষ্ট দিক হলো, গণতন্ত্রে যেকোনো বিষয়কে জনগণের সম্পৃক্তিতে ভোটের মুখোমুখি দাঁড় করাতে পারে।

১৭. এর চেয়ে স্পষ্টতর আর কোনো চিত্র হতে পারে না। ইসলামোক্র্যাটরা যতই কালো কুফরকে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও নানাবিধ কার্যক্রমের সবুজ রঙ দিয়ে রাঙানোর চেষ্টা করুক, তারা কোনোভাবেই গণতন্ত্রের গা থেকে কুফরের কালো চিহ্ন মুছে ফেলতে সক্ষম হবে না।

১৮. আমি যখন দেখব, কোনো ইসলামোক্র্যাট নিজের ভ্রান্তভ্রম ইসলাম থেকে সরিয়ে গণতন্ত্রের উপর চাপাতে পীড়াপীড়ি করে, অথবা নিজের ভ্রান্তভ্রম গণতন্ত্র থেকে সরিয়ে ইসলামের দিকে টেনে আনতে পীড়াপীড়ি করে, তাহলে বুঝতে হবে, এই লোক :

০১. হয় পরিস্থিতির চাপের শিকার। না হয়,
০২. তার বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তিতে সীমাবদ্ধতা আছে।

১৯. পরিস্থিতির চাপ তাকে নিজের ইসলামি পরিচয়ের অস্তিত্বকে নানা জোড়াতালি দিয়ে টিকিয়ে রাখতে বাধ্য করে। যখন দেখে, নিজের বিশুদ্ধ ইসলামি মূল্যবোধ বজায় রেখে রাজনীতির ময়দানে অবস্থান ধরে রাখতে পারছে না, তখন আপস করে নিজের কিছু বিশ্বাসে ছাড় দিয়ে পিছু হটে আসে।

২০. বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তির সীমাবদ্ধতা ইসলামোক্র্যাটকে মূল 'মাসআলা' বুঝতে বাধা দেয়।

২১. উভয় সমস্যাই একই সাথে নতিজা (ফলাফল) ও সবব (কারণ) হতে পারে। কখনো পরিস্থিতির চাপের কারণে বুদ্ধিবৃত্তিক দৈন্য দেখা দেয়, কখনো বুদ্ধিবৃত্তিক দৈন্যের কারণে পরিস্থিতির চাপ তৈরি হতে দেয়।

২২. কখনো পরিস্থিতি এতটাই সঙ্গিন হয়ে যায় যে, কোনটা 'কারণ' আর কোনটা ফলাফল—নির্ণয় করা দুরূহ হয়ে পড়ে। জটিল দুর্জ্ঞেয় এক গোলকধাঁধা—মুরগি আগে না ডিম আগের চির অমীমাংসিত রহস্যের মতো।

২৩. গণতন্ত্রকে 'শুরা' আর শুরাকে গণতন্ত্র প্রমাণ করতে গিয়ে একটি বিষয় ভুলে যায় বা ভুলে যাওয়ার ভান করে যে, শুরা আর গণতন্ত্র মৌলিকভাবে উভয়টার মানহাজ বা কর্মপদ্ধতি ও মূল কেন্দ্রীভূত বিষয়ই সম্পূর্ণ ভিন্ন। শুরায় মূল কেন্দ্র নিঃসন্দেহে আল্লাহ। গণতন্ত্রে মূল কেন্দ্রীভূত বিষয় 'জনগণ'। সত্যি বলতে গেলে, জনগণও গণতন্ত্রের মূল বিষয় থাকে না। একেক দেশে

গণতন্ত্রের মূলশক্তি একেকটি হয়। কোথাও নির্দিষ্ট দুটি দলই হয়ে পড়ে গণতন্ত্রের মূল চালিকাশক্তি; কোথাও হয়ে পড়ে ক্ষমতাশালী মহল।

২৪. মূলশক্তি অনুসারেই গণতান্ত্রিক পরিবেশে বিভিন্ন পক্ষদল তৈরি হয়। হিন্দু থাকে, মুসলিম থাকে, নাস্তিক থাকে, আস্তিক থাকে। কর্মকৌশল আর কর্মতৎপরতা অনুসারেই ফলাফল আসে। কখনো ধর্মের পক্ষে রায় আসে, কখনো বিপক্ষে।

২৫. গণতন্ত্রের সবচেয়ে বীভৎস দিক হলো, এর বীভৎসতা একই সাথে অত্যন্ত স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট। চশমার মতো। দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহারের কারণে শরীরের অঙ্গের মতো হয়ে গেছে। নাকের উপর থাকাবস্থাতেই কখনো কখনো ভুলে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে যায়।

২৬. গণতন্ত্র আমাকে জাদুগ্রস্ত করে রাখে। আকর্ষণীয় কর্মপদ্ধতি, ঠাঁটবাট আর নানা গালভরা আনুষ্ঠানিকতা দিয়ে; কিছু স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা দিয়ে: নির্বাচন ভোটবক্স, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা আর সাম্যের ফুলঝুরি দিয়ে। আমরা মনে করে বসি, এসবের নামই গণতন্ত্র। কেউ যখন এমন মধুর বিষয়কে কুফর বলে আখ্যায়িত করে, মন্ত্রমুগ্ধ আমি রাগে ক্ষোভে তেলেবেগুনে ফাঁৎ করে জ্বলে উঠি। সর্পদংশিত ব্যক্তির ন্যায় লাফ দিয়ে উঠি। চোখ ঠিকরানো বিস্ময়ে প্রশ্ন ছুড়ে মারি, এত্ত সুন্দর মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, নিজের পছন্দসই প্রার্থী বাছাইয়ের ঢালাও অধিকার, গণভোট, জাতির একান্ত নিজের আপন শাসন বুঝি 'কুফর'?

২৭. জ্বি না, গণতন্ত্রের বেশিরভাগই কুফর নয়; কিন্তু তারা আমার চোখে মায়াকাজল লাগিয়ে দিয়েছে। আমার দৃষ্টিকে মোহগ্রস্ত করে দিয়েছে। ভাগাড়-গোবর-মল-মূত্রময় পানিতে ভেসে থাকা অপরূপ পদ্মজগৎ দেখিয়ে আমাকে, এই দৃষ্টিনন্দন বাগান দেখিয়ে, অগোচরে নিচ থেকে উঠে এসে পদ্মপাতায় জমে থাকা—আপাত মিষ্ট; বাস্তবে—চরম দুর্গন্ধময় পানি ফোঁটা ফোঁটা করে পান করিয়েছে। নতুন স্বাদের জিভসুখ মোহে ভুলে গেছি—পদ্মপানির আসল বীভৎস ওয়াক থু 'স্বাদ'।

২৮. গণতন্ত্রে কুফুরি কোথায়? তার আদর্শিক দর্শনে। গণতন্ত্রের বেশিরভাগ কর্মকৌশল ও কর্মপদ্ধতিতে মৌলিকভাবে কুফরি নেই। এসব কর্মপদ্ধতি গণতন্ত্রেও আছে, খিলাফাহ-শুরাতেও আছে। পার্থক্য হয়ে যায় নিয়ন্ত্রাশক্তির

অঙ্গুলি হেলনে। এসব কারণে গণতন্ত্র কর্তৃক পরিচালিত 'ভোট-মতবিনিময়' আর খিলাফাহ ভাবিত 'শুরা'-তে আকাশ-পাতাল তফাত হয়ে যায়।

২৯. গণতন্ত্র মানে, জনগণের শাসন জনগণের জন্য। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি ও নির্ধারিত শাসনপদ্ধতির মাধ্যমে। জনগণ যা নির্ধারণ করবে, সেটাই অবশ্য বাস্তবায়িত হবে। আল্লাহ সেটা হারাম করলেও জনগণের রায়ে হারামটাই হালাল হয়ে যাবে। জনগণ যেটা প্রত্যাখ্যান করবে, সেটা অবশ্য প্রত্যাখ্যাত হবে। আল্লাহ কর্তৃক সেটা ধারণ-পালন করা 'ফরজ' হলেও।

৩০. গণতন্ত্রে জনগণই বিধানদাতা 'ঈশ্বর'। তারা এমন জনগণের বিধানদাতা ঈশ্বরে পরিণত হয়, যাদেরকে তারা সৃষ্টি করেনি। আল্লাহ হয়ে পড়েন নিছক সৃষ্টির 'হাতের পুতুলে', যাদের তিনি সৃষ্টি করেছেন। মা'আ যাল্লাহ।

৩১. আল্লাহ তাআলা এটা বলেননি, وَرَبُّهُم شورى بينهم 'তাদের রব তাদের মধ্যে শুরার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে'। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ 'তাদের বিষয় তাদের মাঝে শুরার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে'।

৩২. আল্লাহ তাআলা বলেননি, وشاورهم في الله 'হে নবী, আপনি তাদের সাথে আল্লাহর ব্যাপারে মাশওয়ারা করুন'। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ 'হে নবী, আপনি তাদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ করুন।'

৩৩. আল্লাহ তাআলা বলেননি :

> وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الشعبُ ودستورُه أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم
>
> 'সংবিধান ও জনগণ কোনো বিষয় নির্ধারণ করলে, মুমিন নারী-পুরুষের নিজেদের বিষয়ে আর কোনো এক্তিয়ার থাকে না।'

আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

> وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهٗٓ أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا
>
> 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন কোনো বিষয়ে চূড়ান্ত ফায়সালা দান করেন, তখন কোনো মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর নিজেদের

বিষয়ে কোনো এক্তিয়ার বাকি থাকে না। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করলে সে তো সুস্পষ্ট গোমরাহিতে পতিত হলো।'[১]

৩৪. একজন মানুষ হিসেবে আমার যেকোনো দীন বেছে নেওয়ার এক্তিয়ার আছে। কাউকে জোরপূর্বক ইসলামে দাখিল করা শরিয়ত সমর্থন করে না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَىِّ

'দীনের বিষয়ে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই। হেদায়াতের পথ গোমরাহি থেকে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে।'[২]

৩৫. আল্লাহর দুনিয়ায় জন্মসূত্রে বা অন্য কোনো উপায়ে একবার 'ইসলাম' নিজের দীন হয়ে গেলে আমার জন্য অন্য কোনো শরিয়ত, জীবনব্যবস্থা বা শাসনব্যবস্থা গ্রহণ করার এক্তিয়ার অবশিষ্ট থাকে না।

৩৬. মুসলিম হওয়ার সমস্ত শর্ত আমার মধ্যে বিদ্যমান। আমাকে অমুসলিম বলার সমস্ত প্রতিবন্ধকতা (মাওয়ানি')-ও আমার মধ্যে বিদ্যমান। এই বিশ্বাস থেকে যদি দাবি করি, একজন মুসলিম হিসেবে ইসলামি শরিয়াহ ছাড়া অন্য শরিয়াহ গ্রহণ করার পূর্ণ এক্তিয়ার আমার আছে, তাহলে নিজেকে স্বাধীন দাবি করা অংশত সত্য হলেও আমার মুসলিম দাবি করা পুরোটাই মিথ্যা।

৩৭. আপনি কিভাবে নিজেকে ইসলামি শরিয়াহর গণ্ডি ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার স্বাধীনতা দেন। অপরদিকে এভাবে আপনার ইসলাম ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়াকে কুফর আখ্যা দিতে ইসলামের স্বাধীনতাকে বাধা দেন? আপনি যদি নিজেকে ইসলাম থেকে বের করে নেওয়ার ব্যাপারে স্বাধীন মনে করেন, তাহলে আপনাকে এ কথাও স্বীকার করে নিতে হবে, ইসলামেরও আপনাকে কাফের বলার স্বাধীনতা আছে।

৩৮. আপনি এমন কী হয়ে গেছেন, আপনার ভ্রান্ত প্রবৃত্তির চাহিদাকে ইসলামের উপর চাপিয়ে দেবেন; উল্টোদিকে ইসলামকে বাধ্য করবেন, যেন আপনাকে ইসলামের গণ্ডিতে অন্তর্ভুক্ত এবং মুসলিম হিসেবে গণ্য করে?

---

[১] সুরা আহযাব : ৩৬

[২] সুরা বাকারা : ২৫৬

৩৯. তারা আমাকে বলেছে, এসব চোখ ধাঁধানো কর্মপদ্ধতি ও গালভরা বুলিই গণতন্ত্র। তাদের কথায় মোহগ্রস্ত হয়ে গিয়েছি। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, স্বাধীন সংবাদপত্র, জনগণের রায়, জনতার শাসন—এসব পরিভাষার অলীক চোরাটানে মোহিত হয়ে, এসব ফাঁপা ফোকরকে আরো বেশি করে চেটেপুটে রস বের করতে লেগে পড়েছি।

৪০. আমাকে ইসলামের মুখোশধারী কুফর দ্বারা ধোঁকা দিয়ে তারা আল্লাহকে পাশ কাটিয়ে মূলত 'জনতা'-কেই সবকিছুর হর্তাকর্তা ও অধিকর্তা বানিয়ে দিয়েছে। হায়, যদি আমি বুঝতে পারতাম, তাদের কথিত 'জনতা'-র আসল রহস্য কী? কে না জানে, জনতার নামে সবকিছু করা হলেও প্রকৃত প্রস্তাবে দেশ শাসনে জনতার খুব একটা দখল থাকে না। গণতন্ত্র আগাগোড়া পুরোই একটি ধোঁকা।

৪১. প্রচলিত গণতন্ত্রে জনতা বা জনগণ মানে, সর্বোচ্চ পর্যায়ের কিছু সামরিক কর্মকর্তা, কিছু শক্তিধর বিদেশি লেজুড় আমলা, কিছু টাকার কুমির, কিছু পরদেশে বিক্রি হওয়া প্রভাবশালী 'সাংবাদিক'। এই সীমিতসংখ্যক লোক জনতা/জনগণের নামে পুরো জাতিকে বার বার গণতন্ত্রের নামে ধোঁকা দেয়। সাধারণ মানুষের আকল-বুদ্ধি নিয়ে খেলা করে। সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করে। এই 'এলিট' শ্রেণি সাধারণ জনগণকে, বোধবুদ্ধিহীন জনতাকে, শিক্ষার্থীমহলকে জমকালো কথার ফাঁকালো ফুলঝুরি দিয়ে, পূর্বনির্দিষ্ট প্রার্থী বাছাইয়ের খোয়াড়ের দিকে দৌড়ে নিয়ে যায়। বুদ্ধিশুদ্ধিহীন 'জনতা' ভাবে, তারা স্বাধীনভাবেই প্রার্থী বাছাই করছে; অথচ তারা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে না, তাদেরকে পূর্বপরিকল্পিত ভাবেই এলিট শ্রেণির নিজস্ব প্রার্থীকে নির্বাচিত করতে বাধ্য করা হয়েছে।

৪২. মানুষ জন্মগতভাবে ধর্ম ও আদর্শপ্রবণ প্রজাতি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ধর্ম ও আদর্শ ছাড়া একজন মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব হতে পারে না। বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে মিথ্যা বা ভ্রান্ত ধর্মাদর্শ হলেও একটা কিছু আঁকড়ে ধরতে হয়। জীবনের নানা বাঁকে, ইতিহাসের নানা মোড়ে, পৃথিবীর নানা প্রান্তে মানুষকে যেসব চিন্তা আলোড়িত করেছে, মানুষ যেসব চিন্তা দ্বারা আবেগতাড়িত হয়েছে, খোঁজ নিলে দেখব, সেসব চিন্তার পেছনে কোনো না-কোনো ধর্ম, দর্শন বা আকিদা অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে।

৪৩. যেকোনো মতবাদ বা দর্শনে দুটি দিক থাকে :

১. তাত্ত্বিক দিক।
২. প্রায়োগিক দিক।

কোনো দর্শনের তাত্ত্বিক দিক বাদ দিয়ে শুধু প্রায়োগিক দিক গ্রহণ করা অসম্ভব। প্রায়োগিক দিক যতই আপাত নির্দোষ মনে হোক, তার গায়ে মূলতত্ত্ব বা দর্শনের ছাপ-গন্ধ লেগে থাকেই। শাখা থেকে মূলের রূপ-রস-গন্ধ পৃথক করা কখনো কিছুতেই সম্ভব নয়। গাছের পাতা থেকে কি গাছের পরিচয় মুছে ফেলা সম্ভব? ডাল থেকে গাছের শিকড়ের ডিএনএ দূর করা সম্ভব? গণতন্ত্রের আপাত নির্দোষ শাখাকেও সাময়িক কর্মপন্থা হিসেবে গ্রহণ করলে আমি প্রকারান্তরে মূল কুফরি গণতন্ত্রকেই আঁকড়ে ধরলাম।

৪৪. গণতন্ত্রের কিছু ধারা, কমিউনিজমের কিছু ধারার সাথে মিলে যায়। তারপর যতই সাদৃশ্য রাখুক, প্রতিটি ধারাতেই তার মূলের ছাপ থাকেই। একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, এটা গণতন্ত্র থেকে এসেছে আর ওটা কমিউনিজম থেকে।

৪৫. একটি 'দর্শন বা চিন্তা' আপন পরিচিত খোলস বদলে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি শাস্ত্রের শাখাজ্ঞানে নতুন রূপে প্রকাশ পেলেও—যতই রূপান্তরিত হোক—প্রয়োজনের সময় মূল দর্শনের পরিচয় প্রকাশ করেই। ফরাসি সাহিত্য সমালোচক রঁল বার্ত (Roland Barthes) (১৯১৫-১৯৮০)। সাহিত্য সমালোচনা বিষয়ে তার গ্রন্থ, The Death of the Author 'লেখকের মৃত্যু'(রচনাকাল : ১৯৬৭)। কারো কারো মতে, লেখক এখানে জার্মান দার্শনিক ফ্রেডরিক নিটশে (Friedrich Nietzsche) (১৮৪৪-১৯০০) দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। নিটশের মূল লেখাটি ছিল, The Death of God (ঈশ্বরের মৃত্যু)। নিটশের লেখাটি ছিল দর্শন বিষয়ে। রঁলের লেখা ছিল সাহিত্য বিষয়ে। পরিভাষাটি বিষয় বদলে সম্পূর্ণ নতুন শাস্ত্রে আত্মপ্রকাশ করলেও অভিজ্ঞজনেরা ঠিকই সেটার শেকড় বের করে ফেলেছেন। দর্শন ছেড়ে সাহিত্যে এসেও চিন্তাটি তার মূলরস ধরে রেখেছিল।

৪৬. বিভিন্ন 'বাদ-মতবাদ' মানবচিন্তা প্রসূত। এসব মানবসৃষ্ট মতবাদ স্থানকাল, পরিবেশ-পরিস্থিতি সাপেক্ষ। প্রায়োগিক রূপ থেকে মূল আকিদার ছাপ শতভাগ দূর হওয়াটা অসম্ভব। মূল দর্শনের প্রায়োগিক উপধারায় মূল দর্শনের ছাপ না থাকলে ধরে নিতে হবে মূল দর্শনটাই অসম্পূর্ণ; নাকেস।

৪৭. ইসলাম একটি দীন। পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এর নাম শরিয়াহ। শরিয়াহ মানে, শাসন বিধান আল্লাহর। নেতৃত্ব শরিয়াহর, কর্তৃত্ব উম্মাহর।

৪৮. শরিয়াহর বিধান বাস্তবায়িত হলে সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন পর্যন্ত ইসলামের রঙ থাকবেই। নিত্যনতুন বিষয়গুলো মানবীয় ইজতিহাদের অধীনে সমাধান করা হবে। ইজতিহাদ হবে মৌলিক উৎসের উপর ভিত্তি করেই। মূল উৎসবর্জিত ইজতিহাদ শরিয়াহ শাসনে গ্রহণযোগ্য হবে না। শরিয়াহ রাষ্ট্রে কোনো দায়িত্বশীল উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে শরিয়াহর মূল উৎস বাদ দিয়ে মনগড়া বা অন্য কোনো ধর্মদর্শন থেকে সমাধান হাওলাত করলে, সেটা হবে ইসলাম বা শরিয়াহ বিকৃতির শামিল।

৪৯. সতর্কতা, সচেতনতা ও জ্ঞাননিয়ন্ত্রণ ছাড়া গণতন্ত্র বা কুফর উদ্ভূত ভিন্ন কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা বিপজ্জনক। এসব কার্যক্রম ধীরে ধীরে ঈমান ও কুফরের সীমায় পৌঁছে দেয়। সবসময় সীমান্তের কাঁটাতার আর জমির আইলের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করতে করতে গরু-ছাগল একসময় অজান্তেই সীমান্ত বা আইলের ওপাশের ঘাসেও মুখ দিয়ে ফেলে। ঈমান-কুফরের সীমায় থাকলেও অজান্তেই অনেক সময় সীমানা পার হয়ে যায়। টেরটিও পাওয়া যায় না।

৫০. সম্রাট কনস্টানটাইনের মতো খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করার পর ধর্মসংস্কারে ব্রতী হলো। নিজের আগের পৌত্তলিক ধর্ম আর ততদিনে বিকৃত হয়ে পড়া খ্রিস্টবাদ মিলিয়ে জগাখিচুড়ি পৌত্তলিস্টান (وَثْنَصْرَانِيًّا) ধর্মের জন্ম দিলেন। সম্রাট খ্রিস্টান ধর্মের উন্নতিকল্পে অন্য ধর্মের সীমানায় হানা দিয়েছিলেন। পরিণতি? সীমা পেরিয়ে পৌত্তলিকতায় ঢুকে পড়েছিল। সংস্কারকার্য শেষে দেখা গেল, নতুন রূপে মূল খ্রিস্টান ধর্মের কিছু পরিভাষা ও নাম ছাড়া আর কিছুই বাকি থাকেনি।

৫১. ধর্মনিরপেক্ষ আর লিবারালরা ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে গোলযোগ ও হৈ চৈ করে মনে করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে, গণতন্ত্র নিছক ভোটবক্সের নাম নয়। গণতন্ত্র কিছু দর্শন, মূলনীতি ও নিয়মকানুনের সমন্বয়। ভোটের পর্যায়ে যাওয়ার আগে এসব মূলনীতির সমন্বয় আবশ্যক।

৫২. ভোট মানেই গণতন্ত্র নয়, এমপি-মন্ত্রী হওয়া মানেই গণতন্ত্র মেনে নেওয়া নয়, মিছিল-মিটিং মানেই গণতন্ত্র নয়। এসব বলে যারা নিষ্পাপচিত্তে গণতান্ত্রিক কর্মসূচিতে অংশ নেয়, তারা একসময় অজান্তেই গণতন্ত্রের মূল কুফরি দর্শনে গিয়ে উপনীত হয়। ব্যতিক্রম খুব কমই হয়। গণতন্ত্রের মূল

কুফরি দর্শন এড়িয়ে গণতন্ত্রের আংশিক কিছু কর্মধারা গ্রহণ করা মোটেও সম্ভব নয়। যতই বাঁধ দেওয়া হোক, একসময় না একসময় পানি সাগরে গিয়ে পড়েই। শুরুতে যতই শুদ্ধতা বজায় রাখুক, কিছুদিন পর আস্তে আস্তে শুদ্ধ থাকার মানসিকতায় ঘুণে ধরেই।

৫৩. আচ্ছা, এসব থাক। ধরে নিলাম, গণতন্ত্রের কিছু ধারা বাহ্যিকভাবে ইসলামের সাথে বিরোধপূর্ণ নয়। অথবা বলা যায়, ইসলাম গণতন্ত্রের কিছু ধারা ও কার্যক্রমকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে না। তাহলে আমরা কেন এসব পশ্চিমা পরিভাষা ব্যবহার করছি? এসব যদি ইসলামেই থাকে, তাহলে ইসলামি পরিভাষা ব্যবহার করাই কি যুক্তিযুক্ত নয়?

৫৪. পরিভাষা হলো আইডেন্টিটি তথা আত্মপরিচয়। আত্মপরিচয় মানে হলো, দীন, ভাষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার সমন্বয়। পরিভাষাগুলো হচ্ছে আয়নার মতো। মূল দর্শনের নির্যাস-ঝলক পরিভাষার আরশিতে প্রতিফলিত হয়। পরিভাষাগুলো বান্ডিল বা গাঁইটের মতো। পরিভাষাগুলোতে মূল দর্শনের শাখা-প্রশাখা জমাট করে কিছু অক্ষর-শব্দে ঘন সন্নিহিত করে রাখা হয়।

৫৫. প্রতিটি জাতির নিজস্ব পরিভাষাগুলো তাদের স্বকীয়তা ও আত্মপরিচয়ের দলিল। আমি অন্য জাতির পরিভাষা ব্যবহার করার মানে :

১. পরিভাষাটির গুরুত্ব ও মর্যাদা প্রকাশ করছি। সংশ্লিষ্ট জাতির শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিচ্ছি।

২. নিজের দৈন্য প্রকাশ করছি। আমার ভাষা ও স্বকীয়তাকে ক্ষুদ্র করছি; হেয় করছি।

৩. জেনে বা না জেনে তাদের দীনকে নিজের দীনের উপর প্রাধান্য দিচ্ছি। তাদের ভাষাকে আমার ভাষার উপর প্রাধান্য দিচ্ছি। তাদের সংস্কৃতিকে আমার সংস্কৃতির উপর প্রাধান্য দিচ্ছি। তাদের সভ্যতাকে আমার সভ্যতার উপর প্রাধান্য দিচ্ছি।

৫৬. বিজিত জাতির উপর বিজেতা জাতির এর চেয়ে শক্তিশালী জয় আর কী হতে পারে। পরাজিতের ভাষা-সংস্কৃতিকেই নিজের ভাষা-সংস্কৃতি দ্বারা বদলে দেওয়ার চেয়ে বড় জয় আর কিছু হতে পারে। বিজেতার ভাষা-সংস্কৃতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হওয়ার চেয়ে বড় ও ভয়ংকর পরাজয় আর কী হতে পারে?

৫৭. গণতন্ত্র ও শুরা দুটি সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী 'পরিভাষা'। পরিভাষা দুটি সাংঘর্ষিক বিপরীতমুখী সভ্যতা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। শুরার উৎস আল্লাহ, গণতন্ত্রের উৎস প্রাচীন পৌত্তলিক গ্রিক সভ্যতা। শুরার উৎস ঈমান, গণতন্ত্রের উৎস কুফর। শুরার উৎস তাওহিদ, গণতন্ত্রের উৎস শিরক। শুরার উৎস আখেরাত, গণতন্ত্রের উৎস দুনিয়া। শুরা ও গণতন্ত্র দুটি পরিভাষাই আক্ষরিক অর্থেই এমন সব শব্দ, অর্থ, ব্যঞ্জনা, আকিদা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ভাষা, সভ্যতা ধারণ করে যে, উভয় পরিভাষার সবকিছু আত্মস্থ করে কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, উভয়টাকে একসাথে আদর্শ বা কর্মপন্থা হিসেবে গ্রহণ করবে। দুটি পরিভাষা কখনো কিছুতেই এক দেহে, এক মনে, এক মাথায়, এক সমাজে, এক রাষ্ট্রে সফলভাবে প্রয়োগ হতে পারে না।

৫৮. পরিভাষাগুলো স্বভাবগতভাবেই উপনিবেশগন্ধী। জবরদখলদারবান্ধব। পরিভাষাগুলো উৎসদেশের পরিচয়বাহী শাস্ত্রের সভ্যতা-সংস্কৃতি, মূলতত্ত্ব ও দর্শনের প্রতিনিধিত্ব করে। পরিভাষাগুলো দেশ ও শাস্ত্রের বহির্বাস ও অন্তর্বাসের প্রতীক-নিশান। পরিভাষাগুলো কাগুজে মুদ্রা ও জাতীয় পতাকার মতো পরিচয়বাহী। পরিভাষাগুলো কাগজে-কাপড়ে উৎকীর্ণ সাঙ্কেতিক সাঁটলিপি বা এককথায় প্রকাশধর্মী বাক্যবন্ধের মতো।

৫৯. পরিভাষাগুলো সাম্রাজ্যবাদী শক্তির জবরদখল, জুলুম, লুটপাটের হাতিয়ার। এর বিপরীতে যারা পরিভাষা প্রত্যাখ্যান করে বুক চিতিয়ে দাঁড়ায়, তাদের এই প্রচেষ্টা প্রতিরোধ স্বাধিকার স্বতন্ত্র জাতিসত্তার লড়াই।

৬০. পরিভাষাগুলোতে যেমন অনেক কৌশল আর ধূর্ততা লুকিয়ে থাকে, পরিভাষা নির্ধারকরাও চরম চাতুর্য আর প্রতারণার আশ্রয় নেয়। তারা 'জবরদখলকে' নাম দিয়েছে উপনিবেশ। মানুষের রোষ-ঘৃণাকে হালকা করে দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যই তারা 'পরিভাষা' বদলে দেয়। তাদের চরম ন্যক্কারজনক কাজকে মানুষের কাছে হালকা করে তোলার জন্যই সহনীয় কোনো পরিভাষা নির্ধারণ করে। সুদকে বলে 'লাভ', ঘুষকে বলে স্পিডমানি। আরবিতে এসব পারিভাষিক শব্দচাতুর্যের কূটখেলা সবচেয়ে বেশি হয়েছে। কুরআন-সুন্নাহ-শারয়াহর সম্পূর্ণ বিপরীত বিষয়কে সহনীয় করে তোলার জন্য খবিসচক্র দীর্ঘমেয়াদে কত সূক্ষ্মভাবে যে চেষ্টা করে এসেছে—কল্পনাও করা যাবে না। সমকামীদের সেই প্রথম থেকেই (اللوطي) লূতি বলা হতো। কুচক্রি ওরিয়েন্টালিস্টদের সচেতন চক্রান্তে 'লূতির' স্থানে ব্যবহৃত হতে শুরু

করেছিল, شذوذ جنسي (ব্যতিক্রমী যৌনকামী)। এভাবে কিছুদিন চলল তারপর আমদানি হলো, مِثْلِيَّة (সমযৌনি)।

৬১. পরিভাষা বদলে দিয়ে তারা চরম ঘৃণিত বীভৎস একটি পাপের অসহনীয় রূপকে হালকা করার পাঁয়তারা করেছে। মানব স্বভাববিরোধী একটি ধিকৃত গুনাহকে সহনীয় করে তোলার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। 'লূতি' বললে যেভাবে কুরআন-সুন্নাহ-শরিয়াহ-স্বভাববিরোধী গুনাহের যে চরম ঘৃণিত দগদগে বনবনে একটি চিত্র ভেসে ওঠে, 'শুজুজ' বা 'মিসলিয়াহ' বললে সেভাবে ধর্মীয় ভাবোৎসারিত ঘৃণা সৃষ্টি হয় না। নতুন পরিভাষায় সামাজিকভাবেও চরম ধিকৃত বিষয়ও মোটামুটি স্বীকৃত হয়ে ওঠে। 'শুজুজ' শব্দে ধর্মীয় পাপের ছাপ নেই। বড়জোর প্রচলিত সমাজিক রীতিপ্রথা ও ঐতিহ্যের ব্যতিক্রম কিছু বোঝা যায়।

৬২. 'মিসলিয়্যাহ' বা সমযৌনি—এই শব্দে ধর্ম দূরের কথা, সামাজিকভাবে ব্যতিক্রম হওয়ারও কোনো ছাপ নেই। শুধু শব্দচাতুর্য দিয়ে চরম ঘৃণিত একটি পাপকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এক বিষয়ে পরিণত করেছে। 'মিসলিয়্যাহ'-সমযৌনি শব্দটির ব্যবহার চাতুর্যে অনেক সময় এই বিকৃত আচরণকে আকর্ষণীয় মনে হয়। সমকামীদেরও অচ্ছ্যুত-অন্ত্যজ মনে তো হয়ই না, মিডিয়ার গলাবাজিতে তারা নির্যাতিত ও অবহেলিত শ্রেণি হিসেবে পরিচিতি পাওয়াতে উল্টো তাদের প্রতি একশ্রেণির সহানুভূতি উথলে উঠে। দিনদিন এদের দল ভারি হয়ে চলছে। এদের খবিস কর্মের সুবিধার্থে বিশ্বের নানা দেশে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন হচ্ছে।

৬৩. এ ধরনের ছাতুরিমূলক ফাঁদ পাশ্চাত্য উৎসারিত আরো অসংখ্য পরিভাষাতে বিদ্যমান। মানবাধিকার, নারী স্বাধীনতা, নারীর ক্ষমতায়ন, মানবধর্ম, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান—এমন আরো অসংখ্য পরিভাষা। পরিভাষাগুলোকে তারা কোমল, তরল ও সহনীয় করে তোলে। এসব পরিভাষার আড়ালে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের কৃতকর্মকে আড়াল করার প্রয়াস চালায়।

৬৪. পরিভাষা নিয়ে আমাদের এত মাথাব্যথা কেন? পরিভাষা নিয়ে আমাদের স্বাতন্ত্র্যের লড়াই কেন শুরু করতে হবে? কেন আমাদের ধর্মীয় পরিভাষাগুলো পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে? কারণ, আমাদের স্বকীয়তা ফিরিয়ে আনতে হলে এর বিকল্প নেই। আমাদের দীন, ভাষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার পরিচয় এসব

পুরোনো পরিভাষাতেই নিহিত আছে। অনুপ্রবিষ্ট ধার করা চক্রান্তমূলক পরিভাষা সচেতনভাবে এড়িয়ে চলতে হবে। এই প্রত্যাখ্যানের প্রধান কারণ, ভিনদেশি পরিভাষার প্রতি অবজ্ঞা নয়; বরং নিজস্ব ধর্মীয় স্বনির্ভর পরিভাষা থাকতে আমরা কেন অন্যের কাছে ধার করতে যাব? আমরা একটু গভীরভাবে ভাবলেই বুঝতে পারব, আমাদের যা আছে, সেটা কত মহৎ আর বৃহৎ।

৬৫. শরিয়াহ নিয়ে বিতর্ক চলে না। 'গণতান্ত্রিক কার্যক্রমে' ইসলাম কোথায়? এ প্রশ্ন শুনলে কেউ কেউ তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে। সংসদ অধিবেশনে মিরাসে নারী-পুরুষের সমতা, লূতিদের তথাকথিত অধিকার নিয়ে ভোটাভুটির প্রস্তাব উঠলে ডেমোক্র্যাট মুসলিমরা ঈমানি জোশে ফুঁসে ওঠেন। তাদের এই ফুঁসে ওঠা অবশ্যই প্রশংসনীয়। এই ফোঁস করে ওঠা তাদের বুদ্ধিবৃত্তি কিছুটা হলেও অবশিষ্ট থাকার পরিচয় বহন করে। যদিও 'দীন' বলতে যা বোঝায়, তা হয়তো আর অবশিষ্ট নেই।

-দীন অবশিষ্ট নেই, এটা আবার কেমন কথা? দীন আছে বলেই তো ফোঁস করে উঠেছি।

-আচ্ছা, এখন কেন ফুঁসে উঠছেন? আপনি কি আগেই এই ভোটাভুটির 'ডেমোক্র্যাসি' মেনে নেননি? ডেমোক্র্যাসি মানে কি? মানে হলো, যেকোনো বিষয় সবার মতামতের ভিত্তিতে সংখ্যাধিক্যের অনুকূলে নির্ধারিত হওয়া নয়? আপনার কি জানা ছিল না, এই ভোটাভুটিতে একসময় 'আল্লাহ' বা শরিয়তও আসতে পারে? ঠিক এই ভোটাভুটির গণতন্ত্রই তো চেয়েছিলেন। আপনার দৃষ্টিতে এই ভোট তো কুফর ছিল না। ছিল নিছক মাধ্যম (টুলস) মাত্র। নিছক কর্মপ্রক্রিয়া মাত্র।

-কিন্তু পার্লামেন্টে অনুষ্ঠিত আলোচনা-ভোটাভুটি নিছক আলোচনা। আলোচনা মানেই সিদ্ধান্ত গ্রহণজাতীয় চূড়ান্ত কিছু নয়।

-আপনার জানা থাকা উচিত, আল্লাহর শরিয়ত নিয়ে ভোটাভুটি চলে না।

-আপনি আল্লাহর শরিয়ত কোথায় দেখলেন? আমরা আলোচনা করছি গণতন্ত্র নিয়ে, আপনি শরিয়ত টেনে আনলেন কেন? আমরা যে গণতন্ত্র বুঝি, যে গণতন্ত্রের চর্চা করি, সেটা কখনোই শরিয়তবিরোধী নয়। আমরা যে গণতন্ত্রের চর্চা করি, সেটা হলো শরিয়তের মূলনীতির অধীনে থেকে সুনির্দিষ্ট কিছু কর্মপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষের জীবনকে সুবিন্যস্ত ও সুশৃঙ্খল করে তোলা।

-আপনি এখন যে কর্মপ্রক্রিয়ার কথা বললেন, সেটা গণতন্ত্র নয়; শুরা। 'শুরা' মানে, আল্লাহর শরিয়তের ভিত্তিতে মুসলমান কর্তৃক মুসলিম ও অমুসলিমদের শাসন করা। আর 'গণতন্ত্র' মানে, জনগণের বাছাই করা ব্যক্তি ও মূলনীতির মাধ্যমে, জনগণ দিয়ে জনগণকে শাসন করা। এখন জনগণ যদি রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট কোনো শাসনব্যবস্থা বা বিচারব্যবস্থা গ্রহণ করে, এতে কারো দ্বিমত পোষণ করার উপায় থাকে না। জনগণ নির্ধারিত 'শাসনব্যবস্থা' ইসলামের অনুকূল হোক বা প্রতিকূল, কারোই কিছু বলার থাকে না। এখানে জনগণই সূচনা ও সমাপ্তি। প্রথম ও শেষকথা। এখানে আল্লাহ কোথায়?

-কেন আকাশে (সালাফি)?। স্থান-কাল-পাত্র ব্যতিরেকে বিরাজমান (আশআরী মাতুরিদী)?

-একজন মুসলমানের সবকিছুতে আল্লাহর ছাপ থাকবে। সংসদের ভোটাভুটিতে লূতিকে লিওয়াতাতের (সমকামীকে সমকামের) অধিকার দেওয়ার প্রশ্নে, পক্ষে ভোটদাতার সংখ্যা বেশি হলে লিওয়াতাত বৈধ হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, গণতন্ত্র এটুকু করেই ক্ষান্ত হবে না, লূতিকে লূতি নামে আখ্যায়িত করতেও নিষেধ করে দিবে। লূতিকে সাদরে বরণ করে নিতে বাধ্য করবে।

-কিন্তু আল্লাহ তো এর বিপরীত করতে বলেন?

-আমরা কথা বলছি, শুধুই জনগণের ইচ্ছা ও বাসনা নিয়ে।

-কিন্তু আল্লাহ?

-জি, আল্লাহ আপন মাকামে মা নিজ শান অনুযায়ী 'মওজুদ' (বিদ্যমান) আছেন। তবে আমাদের এই আলোচনা ও শাসনব্যবস্থায় তিনি মজুদ নেই। আমাদের আলোচ্য শাসনব্যবস্থায় আল্লাহ হাকাম (حَكَمٌ। তথা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী) নন। এখানে 'ব্যালটবক্স'-ই প্রথম ও শেষ 'হাকাম' তথা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী। আপনি শুরুতেই ব্যালটবক্সকে সিদ্ধান্তের ক্ষমতা দিয়ে রেখেছিলেন না? আপনি ব্যালটবক্সকেই যাবতীয় শক্তির আধার বলে মেনে নিয়েছিলেন না? ভোটবক্সকেই সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু মেনেই কর্মতৎপরতা শুরু করেছিলেন না?

-হ্যাঁ, তা করেছি; কিন্তু এখন যা ঘটতে চলেছে, সেটা তো সুস্পষ্ট কুফরি। আমি তো শরিয়তবিরোধী নয়—এমন বিষয়েই শুধু ব্যালটবক্সকে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলাম।

-এ আবার কেমন খেলা শুরু করলেন? আগেই তো বললাম, তাহলে এটা গণতন্ত্র নয়; শুরা।

-গণতন্ত্রের দেশীয় সংবিধানের চেয়েও শক্তিশালী কিছু মূলনীতি ও আদর্শ আছে। এসব মূলনীতি সমালোচনা ও ধরাছোঁয়ার উর্ধ্বে।

-জি, বিলকুল সহিহ; কিন্তু গণতন্ত্রের এসব 'পবিত্র' মূলনীতি গ্রহণ করার ব্যাপারেও আগে জনগণকে একমত হতে হবে। গণতন্ত্রের মূলনীতিগুলো ধরাছোঁয়া বা সমালোচনার উর্ধ্বে থাকবে কি থাকবে না—এটা নির্ধারণের অধিকারও জনগণের হাতে থাকে, আল্লাহর হাতে নয়। জনগণ একমত হলে গণতান্ত্রিক মূলনীতি গৃহীত হবে, একমত না হলে হবে না। আধুনিক যুগে বাস করা একদল 'মধ্যযুগী' একমত হয়ও না।

-কিন্তু আল্লাহ, দীন, ইসলাম এসব কোথায়?

-কথা বাড়াবেন না। জনগণই প্রথম ও শেষ কথা। আপনি এ বিষয়ে একমত?

-জি না, একমত নই।

-জামিল জিদ্দান (খুব ভালো)। গণতন্ত্রেও বিপরীত মত প্রকাশের সুযোগ আছে। আপনি গণতান্ত্রিক অবকাঠামোতেই একটি বিরোধী দল খুলে ফেলুন। দলীয় কর্মসূচি দিয়ে আপনার অমতের কথা জোর গলায় বলতে থাকুন। হ্যাঁ, মনে রাখবেন, আমরা সংসদেই আলোচনার ভিত্তিতে সবকিছু নিষ্পত্তি করব। উৎপাদন কমিয়ে দিলে সংখ্যাধিক্যের মতামতের ভিত্তিতে কাজের সময় 'সালাত-সিয়াম'-ও বাদ দিতে হবে। সন্ধ্যায় বাসায় ফিরেই সালাত করে নিবে।

-কিন্তু এটা তো কুফরি!

-হয়তোবা! আপনি এখন যতই হতবাক হন, আপনার গণতান্ত্রিক মস্তিষ্ক এমনটা চেয়েছে বলেই এ ধরনের আইন পাশ হতে পেরেছে।

৬৬. এটাই গণতন্ত্রের প্রকৃত রূপ-হাকিকত। আপনি যতই এর কদর্য রূপকে যতই সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে চান, এর কুফরির উপর ইসলামের প্রলেপ লাগাতে

চান, এমনটা করা কখনোই সম্ভব নয়। মিশরি পার্লামেন্টে এমন ঘটনাই ঘটেছিল। বিশিষ্ট মিশরি রাজনীতিবিদ রিফআত মাহজুব (১৯২৬-১৯৯০) হোসনি মোবারক সরকারের সংসদে স্পিকার ছিল। তার একটি উক্তিতে হুবহু এই চিত্রটাই ফুটে উঠেছিল। শরিয়াহবিরোধী একটি আইন পাশ হওয়ার সময় ইসলামি দলের সংসদ সদস্যগণ অনুষ্ঠিত ভোটাভুটিতে অংশ নিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে ভোটদানে বিরত থাকলেন। আইনটির বিপক্ষে ভোটসংখ্যার স্বল্পতার কারণে ইসলামবিরোধী আইনটি পাশ হয়ে গেল। ইসলামি দলের সংসদ সদস্যরা হৈ চৈ বাঁধিয়ে দিলে স্পিকার রিফআত মাহজুব বলেছিলেন :

'আপনারা আইনটির পক্ষে বা বিপক্ষে ভোটদানে বিরত ছিলেন। তারপরও আইনটি কীভাবে পাশ হয়ে গেল—এ নিয়ে আপনাদের আপত্তি। আপনারা আল্লাহর কাছে নিজেদেরকে এই আইন থেকে দায়মুক্ত ভাবছেন। আপনাদের একটি কথা স্মরণ রাখা উচিত, সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একটি আইন তখনই পাশ হতে পারে, যখন আইনটির পক্ষ-বিপক্ষ উভয়দিকে ভোট পড়ে। এমনকি কিছু সদসস্যের ভোটদানে বিরত থাকাও আইনপাশের গ্রহণযোগ্যতাকে শক্তিশালী করে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে এটাই মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বলে বিবেচিত। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোনো বিষয়ে গণভোটের আয়োজন করলে, সেখানে পক্ষে-বিপক্ষে ভোট দেওয়ার সুযোগ রাখা হয়। এমনকি কোনো পক্ষে ভোট না দেওয়ার সুযোগটাও গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। ধরে নেওয়া হয়, যারা ভোট দেয়নি, তারা যেকোনো সিদ্ধান্ত মেনে নিতে প্রস্তুত। আপনারা ভোটদানে বিরত থেকে মূলত শরিয়তবিরোধী একটি হারাম আইনকে বাস্তবায়নের পক্ষেই অবস্থান নিয়েছেন। এখন হাউকাউ করে লাভ নেই। সংসদীয় ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ মানেই 'গণতন্ত্রের মূল্যবোধ ও মূলনীতিকে মেনে নেওয়া'।'

৬৭. এই হলো গণতন্ত্রের খোলাসা। তাঁরা বদলে দেওয়ার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে গণতন্ত্রে যোগ দিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, সিস্টেমের ভেতরে গিয়ে সিস্টেম বদলাবেন। বেলা শেষে দেখলেন, অজান্তে-অগোচরে গণতন্ত্রই তাদের আমূল বদলে দিয়ে বসে আছে। গণতন্ত্র হলো, একটি বাহ্যিক সুন্দর সুশোভিত আকর্ষণীয় পদ্মময় জলাশয়। পদ্মফুলের সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে ফুল কুড়ানোর বাসনায় জলাশয়ে নেমে দেখে পুঁতি-দুর্গন্ধময় পানিতে গলা ডুবে গেছে।

এতদূর এসে ফিরেও যাওয়া যাচ্ছে না। বাধ্য হয়ে থাকতে হলো। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, দুর্গন্ধটা আর তেমন নাকে লাগছে না, সয়ে গেছে; বরং চোখের দেখা পদ্মসৌন্দর্য, নাকে শোঁকা পাঁক দুর্গন্ধকে ছাপিয়ে গেছে। বলাবাহুল্য, নাকের চেয়ে চোখের শক্তি বেশি।

৬৮. মিশরী ইসলামি সাংসদরা ভেবেছিলেন, তারা 'তাদরিজ-তাদাররুজ'[১]-এর পন্থা অবলম্বন করেছেন। দিন শেষে দেখা গেল, তারা ইস্তেদরাজের শিকার হয়ে বসে আছেন। তারা গণতন্ত্রে যোগ দেওয়াকে হুদায়বিয়া ভেবেছিলেন; সংবিৎ ফিরে পেয়ে দেখেন, সেটা ছিল 'ওহুদ'।

৬৯. হুদায়বিয়া : চুক্তিটিকে আপাত পরাজয় মনে হলেও বাস্তবে সেটি ছিল ইসলামের বিরাট বিজয়। যুদ্ধবিরতি হওয়াতে নবীজি সা. পরম নিশ্চিন্তে দিকে দিকে ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন।

ওহুদ : রণেভঙ্গ দিয়ে কাফেরদের পলায়ন করতে দেখে মুসলমানগণ

---

[১] তাদরিজ-তাদাররুজ : এটা সাধারণত মুমিনের ক্ষেত্রে হয়। এক মনযিলের পর আরেক মনযিল, এক স্তরের পর আরেক স্তর পার হওয়া। বান্দার শত নাফরমানি, অবাধ্যতা, না-শোকরি ও অকৃতজ্ঞতা সত্ত্বেও রব্বে কারিম বান্দাকে অফুরন্ত নেয়ামতের সাগরে ডুবিয়ে রাখেন। নেয়ামত পেয়ে কিছু বান্দা আরো বেপরোয়া হয়ে যায়। আচানক আল্লাহর পাকড়াও এসে হাজির হয়।

ইস্তেদরাজ : এটা সাধারণত কাফেরের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। ইস্তেদরাজ আল্লাহর স্বীকৃত কর্ম। কুরআন ও সুন্নাহে আল্লাহর ইস্তেদরাজের প্রমাণ আছে :

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ

'আর যারা আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে আমি তাদের এমনভাবে পর্যায়ক্রমে পাকড়াও করব যে, তারা জানতেই পারবে না [সূরা আরাফ : ১৮২]।'

নবীজির ভাষ্যেও ইস্তেদরাজের পরিচয় আছে :

إذا رأيْتَ اللهَ يُعْطِي العبدَ مِنَ الدُّنيا على مَعاصيه ما يُحِبُّ، فإنَّما هو استِدراجٌ. ثمَّ تلا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ:

তুমি যখন দেখবে নাফরমানি সত্ত্বেও আল্লাহ বান্দাকে দুনিয়ার নায-নেয়ামত দান করছেন, তুমি বুঝে নেবে এটা ইস্তেদরাজ। তারপর নবীজি তেলাওয়াত করেছেন :

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰۤى اِذَا فَرِحُوْا بِمَاۤ اُوْتُوْۤا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ

'তাদেরকে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, তারা যখন তা ভুলে গেল, তখন আমি তাদের জন্য সমস্ত নেয়ামতের দুয়ার খুলে দিলাম। অবশেষে তাদেরকে যে নেয়ামত দেওয়া হয়েছিল, তাতে আমি তাদেরকে অকস্মাৎ ধরলাম। ফলে তারা সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে গেল। [সূরা আনআম : ৪৪; উকবা বিন আমের রা. । সিলসিলা সহিহাহ : ৪১৩ ।]

ভেবেছিলেন, চূড়ান্ত বিজয় বুঝি পদচুম্বন করেছে। গনিমত সংগ্রহে নেমে পড়লেন। তখনই খালিদের নেতৃত্বে নেমে এসেছিল বিপর্যয়।

৭০. কাফেররাই লেখা ও খেলার নিয়ম ঠিক করেছে। কাফেররাই গণতন্ত্রীদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। খেলার মাঠে মজা ধরে রাখার জন্য মাঝেমধ্যে দুয়েকবার ছোটখাটো জয়লাভের সুযোগ দিয়েছে। এসব ছোটখাটো জয় দেখে কেউ আরো লোভী আর কেউ আরো আশাবাদী হয়ে উঠেছে। এসব যৎকিঞ্চিত জয়প্রাপ্তি পাতা ফাঁদের 'রুটির টুকরার' মতো। ঘোড়ার সামনে লাঠিতে ঝুলিয়ে রাখা খড়ের যষ্টির মতো। রুটির লোভে ইঁদুর ফাঁদে প্রবেশ করে। খড়ের নাগাল পাওয়ার জন্য ঘোড়া আরো জোরে দৌড়ায়। রুটির নেশায় এমন মগ্ন হয়ে যায়, ফাঁদটা চোখে পড়ে না। কখনো ফাঁদ থেকে ছুটে গেলে প্রভুরা রুটির আরেকটি টুকরা দেয়। নতুন করে আবার ফাঁদে পড়ে। এভাবেই চলছে। কিছু পাওয়ার নেশায় আরো বেশি করে জড়িয়ে পড়ে 'ফাঁদে'। একসময় আর 'রুটির' প্রয়োজন হয় না। এমনিতেই আটকা পড়ে যায়। তাদের দেখাদেখি অন্যরাও এসে যোগ দেয়। এদের দেখিয়ে কাফেররা নতুন নতুন ইসলামি দলকে এই মেহনতে শামিল করে। কাফেররা এর মাধ্যমে তিনটি আশাতীত সাফল্য অর্জন করে, স্বপ্নেও তারা এমন সাফল্য লাভের কথা কল্পনা করেনি :

১. ঈমান-আকিদায় আযিমত থেকে রুখসতের পর্যায়ে নামিয়ে আনে। আপসহীন থেকে আপসকামিতে নামিয়ে আনে। ঈমানি রাজনীতির সাথে কুফরি ধর্মনিরপেক্ষতা মিলেমিশে এক বিতিকিচ্ছিরি জগাখিচুড়ি তৈরি করতে সক্ষম হয়।

২, কাফেররা গণতন্ত্রদীক্ষিত ইসলামি দলগুলোকে তাদের বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে শুরু করে। বিশেষ করে কাফেরদের এজেন্ট দল/সংগঠনগুলোকে মুসলিম দেশে বৈধতা গ্রহণযোগ্য করে তোলার ক্ষেত্রে গণতন্ত্রী ইসলামি দলগুলোকে ভরপুর কাজে লাগায়।

৩. কাফেররা গণতন্ত্রী ইসলামি দলগুলো ব্যবহার করে অন্যান্য গণতন্ত্রবিরোধী ঘরানাগুলোতে বিশৃঙ্খলা ও গণ্ডগোল সৃষ্টি করে। গণতান্ত্রিক দলগুলোকে আদর্শ ও অনুকরণীয়রূপে প্রতিষ্ঠিত করে গণতন্ত্রবিরোধীদের কার্যক্রমকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে। তাদেরকে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও ভিনদেশি গোপন শক্তির বা চর এজেন্ট 'তোহমত' দেয়।

৭১. আস্তে আস্তে অবস্থা দাঁড়ায় এমন, ইসলামি গণতান্ত্রিকরা আল্লাহ তাআলাকে ছেড়ে 'জনগণ আর ভোটবক্স'-এর পূজা করতে শুরু করে। নিজেদের ঈমান-আকিদার সীমায় থেকে যেসব বিষয়ে কিছুতেই ছাড় দেওয়া চলে না, সেসব বিষয়েও কল্পনাতীত ছাড় দিতে শুরু করে। এই চরম ছাড়-আপসমূলক পদক্ষেপ নিতে গেলে যদি কোনো কর্মী প্রশ্ন করে, তখন মুখস্থ করা উত্তর—আমরা ঈমানে পৌঁছার জন্য আপাতত সাময়িক কৌশল হিসেবে এই পন্থা অবলম্বন করেছি। এই উত্তরে নেতা-কর্মী সবাই বেশ তুষ্ট থাকে।

৭২. নানা আপস-মীমাংসা করে, জনগণকে নানা আশ্বাসে তুষ্ট করে, সব বাধা ডিঙিয়ে ঘটনাক্রমে কোনো রাজনৈতিক দল যখন ক্ষমতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়, জনগণও ইসলামি দলটির সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়ে ভোট দেয়, তখন বৈশ্বিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তার আসল রূপে আবির্ভূত হয়। গণতন্ত্রের মোড়লদের দন্তনখর আর হিংস্র থাবা বেরিয়ে পড়ে। ইসলামি দলটি হাড়ে হাড়ে টের পায়, এতদিন কুফর-শিরক মিশিয়ে, নানা ছলছাতুরি আর কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে যে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে চেয়েছিল, সেটা অর্জনের পর্যাপ্ত শক্তি তাদের নেই। বিশ্ব গণতন্ত্রের ডিলাররা একের পর এক দাবি-দাওয়া ও আবদার পেশ করতে থাকে। নানা বিধিনিষেধের বেড়াজালে ইসলামি দলটির হাত-পা শেকলে বেঁধে ফেলার যাবতীয় আয়োজন সম্পন্ন করে ফেলে। একদিক থেকে জাতিসংঘ ও আরেকদিক থেকে বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ টুটি চেপে ধরে। বিশ্বমোড়লরা সব রাস্তা বন্ধ করে ইসলামি দলটিকে ছোট্ট একটি সুড়ঙ্গমুখে এনে জড়ো করে। তাদের কথামতো সুড়ঙ্গে প্রবেশ করতে অস্বীকার করলে, সামরিক বাহিনী দিয়ে বা অন্য কোনো উপায়ে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে নির্বাচনের ফলাফল বানচাল করে। দলের মাথাদের জেলে পোরা হয়। শুরু হয় গুম-খুনের মচ্ছব। আর যারা এখনো মোহ ভঙ্গ না হওয়ার কারণে সব দাবি-দাওয়া মেনে নিয়ে সুড়ঙ্গে প্রবেশ করে, তারা দেখে, সুড়ঙ্গটির ভেতরে চার দেয়ালে যাবতীয় ঈমান বিধ্বংসী ধারালো ছুরির ফলা লকলক করছে। একটু এদিক-সেদিক হলেই ঈমানবিরোধী ছুরির ফলায় ঈমান রক্তাক্ত-ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে। এসব মেনে নিয়েও যারা সুড়ঙ্গপথে সামনে বাড়ে, সুড়ঙ্গের ওপাশে বেরিয়ে দেখে তারা ইসলামমুক্ত একটি নামসর্বস্ব ইসলামি দলে পরিণত হয়েছে।

এখানেই শেষ নয়, এই নামসর্বস্ব ইসলামি দলটিকে দিয়ে দেশে অন্য যত ইসলামি দল আছে, তাদের শায়েস্তা করে নির্মূল করা হয়। একসময় এই

নামসর্বস্ব ইসলামি দলটিকেও রেহাই দেওয়া হয় না। হয় সেটাকে ক্ষমতার মসনদ ছাড়তে হয়, না হয় জেল-কবর বরণ করে ক্ষমতা ছাড়তে হয়। এরা জেলে গিয়ে দেখে, তাদের আগেও যারা এই ময়দানে ছিল, তারাও জেলে। এদেরকেও ব্যবহার করে জেলে ছুড়ে ফেলা হয়েছে।

৭৩. হ্যাঁ, যেসব ইসলামি দল দন্তনখরহীন থাকে, তাদেরকে আপন গতিতে চলতে দেওয়া হয়। তাদের থেকে দুয়েকজন মেম্বর-চেয়ারম্যান, কখনো এমপি-মন্ত্রী হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। এসব মেম্বার-চেয়ারম্যান ও এমপি-মন্ত্রীদের দিয়ে সাময়িক কিছু ভালো কাজও হয়। এমনকি নির্দিষ্ট মাত্রার ইসলামের সেবাও হয়। এসব হলো খুদ-কুড়ো। শিকারকে লোভ দেখিয়ে খেলার মাঠে রাখা। একটা সীমা পর্যন্ত ইসলামি দলগুলোকে ছাড় দেওয়া হয়। কারণ, এভাবে খেলার মাঠে না রাখলে এরা অন্য কোনোদিকে বা 'চরম' কোনো পন্থার দিকে চলে যাবে। এই কৌশলটা বেশ কাজের। সারাবিশ্ব জুড়েই এই কৌশল কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে।

৭৪. এখন প্রশ্ন হলো, প্রচলিত রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থায় করণীয় কী?

ভোট দেওয়া থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকবে?

মেম্বার-চেয়ারম্যান, এমপি-মন্ত্রী হওয়ার সুযোগ সম্পূর্ণ পরিহার করবে?

দেশ-বিদেশের প্রতিষ্ঠিত ও নির্ভরযোগ্য ইফতা বিভাগের ফতোয়া অনুযায়ী কাজ করাই বেশি নিরাপদ। রক্তগরম করে এমন কিছু করা মোটেও উচিত হবে না, যার কারণে স্থানীয় মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর ব্যাপক বিপর্যয় নেমে আসে।

৭৫. ইসলামি রাজনীতিবিদগণ দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে একসময় আবিষ্কার করে, তারা কল্পিত ঈমানি বন্দরে পৌঁছার জন্য যে কুফরের সাথে আপস করেছিল, সে আপস তাদেরকে কাঙ্ক্ষিত বন্দরে নোঙর ফেলতে দেয়নি।

৭৬. শুরুতে যারা স্বাধীনতা ও সাম্যের মোহনীয় বুলিতে মুগ্ধ ও বিভ্রান্ত হয়ে গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন, তাদের ব্যাপারে না হয় না-জানার ওজর দেওয়া যায়। কিন্তু বর্তমানে গণতন্ত্রের যাবতীয় জারিজুরি হিংস্র দন্তনখর ফাঁস হয়ে যাওয়ার পরও এর সাথে লেপ্টে থাকার কী অজুহাত থাকতে পারে?

৭৭. কেউ কেউ বলেন, তারা বাধ্য হয়ে জুমহুরিয়াতে এসেছে। পরবর্তীদের বাধ্য করা হলে প্রথমদেরও কি বাধ্য করা হয়েছিল? কেউ কেউ বলেন, তারা

অংশ নেওয়ার আগে বাস্তবতা বুঝতে পারেনি। আচ্ছা, এখন তো বুঝতে পারছেন, তবুও কেন ছাড়তে পারছেন না। কুফরির পথ পাড়ি দিয়ে সাম্য ও স্বাধীনতা অর্জন করার আশায় কাল্পনিক কিছু প্রাপ্তির পেছনে ছোটা কতটা যুক্তিযুক্ত?

৭৮. রাখাল ছাগল চড়াচ্ছে। জবেহ করার জন্য মোটাতাজা, নাদুসনুদুস, হৃষ্টপুষ্ট করে তুলছে। ছাগল জেনেশুনেও মনের সুখে চরে বেড়াচ্ছে। সমানে ঘাস খেয়ে যাচ্ছে। এত সুন্দর চারণভূমিতে আনার জন্য রাখালের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে। গণতন্ত্রীরাও জানেন, তাদেরকেও একসময় জবেহ করা হবে। তারপরও তারা তাদের প্রভুদের প্রতি ভক্তিতে গদগদ আচরণ করে চলছে।

৭৯. তখন তিউনিসিয়ার প্রেসিডেন্ট ছিল হাবিব বুরকিবা (১৯০৩-২০০০)। ক্ষমতার মসনদে (১৯৫৭-৮৭) আরোহণ করার পর তার ঘাড়ে শয়তান সওয়ার হয়েছিল। শয়তান তার মাথায় কুবুদ্ধি যোগাল। তার মনে হলো, রমযানে রোযা রেখে কাজ করলে উৎপাদন কমে যায়। তাই রোযা না রাখাই উত্তম। বুরকিবা দাবি করেছিল, রোযা রাখার কারণে উৎপাদন কমে গেলে রোযা ভেঙে ফেলা বৈধ। সে ঘোষণা দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, রমযানে দিনের বেলা প্রকাশ্যে টিভিতে রোযা ভেঙেও দেখিয়েছিল। বুরকিবা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তখনকার (১৯৬০) প্রধান মুফতি শায়খ জুয়াইতের নাম ব্যবহার করেছিল। শায়খ জুয়াইত রহ. ভয়-ডরের ঊর্ধ্বে উঠে রাষ্ট্রীয় ফতোয়া জারি করেছিলেন যে, প্রেসিডেন্টের বক্তব্যের সাথে শরিয়তের বিধানের মিল নেই। দেশের অর্থনীতি ও উৎপাদনের দোহাই দিয়ে রমযানে রোযা না রাখার অজুহাত শরিয়তসম্মত নয়।

৮০. এই ফতোয়ার জেরে বুরকিবা শায়খকে প্রধান মুফতির পদ থেকে অপসারণ করেছিল। এরপর দুই বছর তিউনিসিয়াতে প্রধান মুফতির পদ শূন্য ছিল। ১৯৬২ সালে আল্লামা তাহের ইবনে আশুর রহ.-কে প্রধান মুফতির পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। বুরকিবা এবার আল্লামা ইবনে আশুরকে দিয়ে তার মনমতো ফতোয়া জারি করাতে চেয়েছিল। আল্লামা ইবনে আশুর রেডিওতে গিয়ে প্রথমে রমযানে রোযা ফরজ হওয়ার সপক্ষে অকাট্য যুক্তি তুলে ধরলেন। তারপর তিনি সেই ইতিহাসখ্যাত উক্তিটি করেছিলেন,

صَدَقَ اللهُ وَكَذَبَ بورقيبة

'আল্লাহ সত্য বলেছেন। বুরকিবা মিথ্যা বলেছে।'

৮১. এরপর সরকারের তরফ থেকে শায়খের গতিবিধি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করে দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু শায়খ আপস করেননি। বুরকিবা ১৯৬২ সালে তার রোযাবিরোধী অবস্থান থেকে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল। আজও তিউনিসিয়াতে প্রতি রমযানে প্রকাশ্যে রোযা ভাঙার মহড়া চলে। বুরকিবার মন্দকর্মের প্রভাব তিউনিসিয়া ছাড়িয়ে আরবের অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়েছে। তিউনিসিয়াতে জুমহুরিয়াত এখন কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে? শায়খ জুয়াইত ও শায়খ ইবনে আশুর তো আপস করেননি। শাসকের চোখ রাঙানিতে মাথা নোয়াননি। শরিয়তের অকাট্য বিধানকে আলোচনার বিষয় করেননি; কিন্তু জুমহুরিয়াতের পরিণতি কী হয়েছে? আজ তিউনিসিয়ার পার্লামেন্টে সংখ্যাধিক্যের ভোটেই নারী ও পুরুষ সমান মিরাস পাবে—এমন কুরআনবিরোধী বিধান পাস হয়েছে। মুসলিম নারীকে কাফের বিয়ে করতে পারার বৈধতা দিয়ে বিধান পাস হয়েছে। শরিয়তকে ছেলেখেলা বানিয়ে ছেড়েছে। তিউনিসিয়ান পার্লামেন্টে মদকে বৈধতা দিয়ে মদ আমদানিতে শুল্ক কমিয়ে মাগরিবের নামায পড়ার জন্য সেদিনের অধিবেশন দ্রুত শেষ করা হয়েছিল। হারামকে হালাল করার মতো কুফরি করে মাগরিব পড়তে যাওয়ার মতো পরিহাস আর কী হতে পারে?

৮২. একজন খ্রিস্টান পাদরির ধর্মবোধও আমার চেয়ে গভীর। যিনা-ব্যভিচার ছাড়া অন্য কোনো কারণেও খ্রিস্টান স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিলে তালাক কার্যকর হবে—মিশরি কোর্টের এমন রায় প্রত্যাখ্যান করে মিশরের কপটিক চার্চের পোপ শানূদা তৃতীয় (১৯২৩-২০১২) বলেছিল : 'আমরা ঐশী (বাইবেলীয়) আইনের বিপরীত কোনো কিছুতেই বরদাশত করব না। পৃথিবীর কেউই আমাদের মনগড়া কানুন চাপিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা বা অধিকার রাখে না'।

৮৩. তিউনিসিয়ার পার্লামেন্টে কুরআনী বিধানের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়া মুসলিম নামধারীর চেয়েও কপটিক পোপের 'ধর্মীয় আত্মমর্যাদাবোধ' বেশি। শুধু মিশরেই নয়, এমন ধর্মবোধের বহিঃপ্রকাশ খ্রিস্টবিশ্বে প্রতিনিয়ত ঘটেছে। স্পেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, যে গণতন্ত্র আমাদের 'খ্রিস্টীয় মূল্যবোধসম্পন্ন সংবিধানের বিপরীত, আমরা সে গণতন্ত্র স্বীকার করি না।

৮৪. ধর্মীয় মূল্যবোধবিরোধী আইন পাশ করতে যেখানে মুসলিম নামধারীরা দ্বিধা করে না, সেখানে খ্রিস্টানরা তাদের বিকৃত বাইবেলের ব্যতিক্রম আইন পাশের বিরোধিতায় আপসহীন থাকে। জার্মানিতে মুসলমানদের ঈদ-উৎসবে সরকারি ছুটি মঞ্জুর প্রসঙ্গে জার্মানির Christian Democratic Union of Germany দলের নেতা আলেক্সান্ডার ডব্রিনডট বলেছিল : 'এমনটা করা আমাদের খ্রিস্টীয় ঐতিহ্যের সাথে সাংঘর্ষিক। আমাদের খ্রিস্টীয় ঐতিহ্য তর্কাতীত ও প্রশ্নাতীত বিষয়'। সমস্ত বিতর্কের ঊর্ধ্বে।

৮৫. সমকামীদের অধিকার প্রশ্নে জার্মান চ্যান্সেলর এঞ্জেলা মার্কেল ও তার দল বুন্দেসট্যাগে 'না' ভোট দিয়েছিল, সেখানে মুসলিম সাংসদরা 'হ্যাঁ' ভোট দিয়েছিল। কারণ? লূতিরা এর বিনিময়ে মুসলমানদের অধিকার আদায়ে সহযোগিতা করবে। এ যেন অনেকটা ইসলামের প্রথম যুগে কুরাইশের প্রস্তাবিত : এক বছর তুমি আমাদের রবের পূজা করবে, আরেক বছর আমরা তোমার রবের পূজা করব'-এর বাস্তব নমুনা।

৮৬. জুমহুরিয়াতের মোহন ফাঁদ সম্পর্কে সতর্ক করতে গেলে জুমহুরিয়াতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ভাইয়েরা প্রবল আত্মবিশ্বাসের সাথে বলেছিলেন :

'দেশে যতই গণতন্ত্র চালু হোক, ইসলাম ও মুসলমানপ্রধান সমাজে কখনো কিছুতেই কুরআন ও সুন্নাহবিরোধী আইন পাস হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। এমন কিছু ঘটতে গেলে মুসলিম সাংসদরাই তা রুখে দেবেন। শত সমস্যা সত্ত্বেও প্রায় সব আরব দেশের সংবিধানেই লেখা আছে, ইসলামি শরিয়তের মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক কোনো বিধান পাশ করা যাবে না'। পাকিস্তানের সংবিধানেও এমন কথা আছে। এসব দেশে কি ইসলামবিরোধী কর্মধারা থেমে আছে? খোদ ইসলামপন্থীরাই তো অনেক দেশে শরিয়তবিরোধী আইন পাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করছেন। কোথায় গেল তাদের 'শরীয়তসম্মত সংবিধান'? তারা কি এখনো বোঝেনি যে, জুমহুরিয়ত তাদেরকে ধোঁকা দিয়েছে? গণতন্ত্র কখনোই মুসলমানদের উপযোগী শাসনব্যবস্থা ছিল না। গণতন্ত্র শুরু থেকেই আমাদের জন্য ছিল 'ট্রয়ের ঘোড়া'র মতো।

৮৭. খ্রিস্টপূর্ব ১১৮৪ সালের কাহিনি। প্রাচীন গ্রিকের ট্রয় নগরীতে ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। ট্রয় নগরী বর্তমানে তুরস্কের সীমায় পড়েছে। ট্রয়ের রাজপুত্র প্যারিস স্পার্টার রাজা মেনিলাসের সুন্দরী স্ত্রী হেলেনকে

অপহরণ করে এনেছিল। আর সে জন্য মেনিলাসের ভাই আর্গসের রাজা আগামেমন গ্রিক নগরসমূহের রাজাদের আহ্বান করেন ট্রয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। মেনিলাসের ভাই আর্গসের রাজা আগামেমন এক হাজার জাহাজ নিয়ে ট্রয়ের দিকে যাত্রা করে হেলেনকে ফিরিয়ে আনার জন্য; কিন্তু তারা সেখানে পৌঁছে হেলেনকে উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়। পরে যুদ্ধের কৌশল হিসেবে টানা ১০ বছর (১১৮৪-১১৯৪) ট্রয় নগরী অবরুদ্ধ করে রাখে; কিন্তু তাতেও তারা ব্যর্থ হয়। টানা ১০ বছর সফলতা না পাওয়ার পর তারা চিন্তা করে শক্তি দিয়ে তাদের হারানো যাবে না।

৮৮. এবার বুদ্ধি দিয়ে হারাতে হবে। তারা নতুন কৌশল অবলম্বন করল। বিরাট একটি কাঠের ঘোড়া তৈরি করল। যার নাম ছিল ট্রোজান হর্স বা ট্রয়ের ঘোড়া। এই বিরাট কাঠের ঘোড়াটি তৈরি করার পর তার ভিতরে এক দল সৈন্য লুকিয়ে ঘোড়াটি ট্রয় নগরীর দেয়ালের বাইরে রেখে এলো। বিরাট ঘোড়াটি তৈরি করেছিল এপিয়াস নামের একজন সুদক্ষ ছুতার। কাঠের ঘোড়াটি ফেলে রেখে পলায়নের ভান করে গ্রিকরা জাহাজে করে নিকটবর্তী টেনিডোস দ্বীপে অবস্থান করতে থাকে। গ্রিকরা ট্রয়বাসীদের বোঝানোর চেষ্টা যে, এই ঘোড়াটি তাদের অপরাজেয় হওয়ার স্মারক হিসাবে উপহার দেওয়া হয়েছে। ট্রয়রা আনন্দ উল্লাস করতে করতে ঘোড়াটিকে নগর দেয়ালের ভিতরে নিয়ে যায়। তাদের কৃতিত্ব ভেবে নিয়ে উৎসব করতে থাকে। তারা ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারেনি, ঘোড়ার ভিতরে লুকিয়ে আছে শত্রুপক্ষ।

৮৯. এরপর ঘটতে লাগল আসল কাহিনি। মধ্যরাতে যখন নগরবাসী ঘুমিয়ে পড়লো, সৈন্যরা কাঠের ঘোড়ার খোল থেকে বেরিয়ে এলো এবং নগরের দরজাসমূহ খুলে দিয়ে অন্য গ্রিক সৈন্যদেও ভেতরে ঢোকার সুযোগ করে দিলো। তারা ভিতরে ঢুকে ট্রয়বাসীদের উপর অর্তকিত হামলা করল। আর যায় কোথায়, শুরু হলো যুদ্ধ। প্রস্তুতি না থাকায় তারা হলো নাস্তানাবুদ। গ্রিক সৈন্যরা যাকে সামনে পেল তাকেই হত্যা করল। পুরো ট্রয় নগরীতে আগুন ধরিয়ে দিলো। দেখতে দেখতে এক সময় অপরাজিত ট্রয় নগরী ধ্বংসাবশেষে পরিণত হলো। এভাবেই গ্রিকরা বুদ্ধিবলে সেদিন জয় করেছিল ট্রয় নগরী। গণতন্ত্র হলো, মুসলিম দেশে পাশ্চাত্যের রেখে দেওয়া ট্রোজান হর্স।

৯০. গণতন্ত্র শুরু থেকেই ছিল পুনরায় মুসলিম বিশ্বে (Knights Templar) ক্রুসেডারদের ফিরিয়ে আনার প্রাসঙ্গিকতা তৈরির মাধ্যম। জুমহুরিয়াত হলো,

যুদ্ধক্ষেত্র সাফ করার আগে নিক্ষিপ্ত সর্বশেষ অগ্নিগোলা। জুমহুরিয়াত চর্চার মাধ্যমে মুসলিম সমাজ তার বিশুদ্ধতা হারাবে; সৃষ্টি হবে বিভক্তি ফাটল। বেশি কিছু জানতে হবে না, ভাবতে হবে না। শুধু একটু চিন্তা করে দেখলেই বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যাবে, মুসলিম বিশ্বে গণতন্ত্র চর্চা শুরু হওয়ার আগে আর পরের অবস্থাটা একটু কল্পনা করে দেখি তো? ঔপনিবেশিক শাসনের শত কুফল সত্ত্বেও তখনকার মুসলিম সমাজ কি আজকের মতো এতটা বিভক্ত ছিল?

৯১. জুমহুরিয়াত হলো, কুফরের পক্ষ থেকে আসা এক সমন্বিত ও সুপরিকল্পিত সংঘবদ্ধ আন্দোলন। এর উদ্দেশ্য, মুসলিম চিন্তা-মানস ও মেধাবুদ্ধিতে ফাটল তৈরি করা। মুসলিম চিন্তা ও মেধাকে মসিলিপ্ত করতে পারলে, মুসলিম মানসকে বিকৃত চিন্তাযুক্ত করতে পারলে, অজেয় ইসলামি দুর্গগুলো অনায়াসেই ধসিয়ে দেওয়া যাবে। ধ্বংস সাধনের কাজে মুসলিমরাই ব্যবহৃত হবে। অথচ কাফের ও মুশরিকরা তাদের ঐতিহ্যের দিকে ফিরছে। মুসলমানরা আপন ঐতিহ্য ছাড়ছে। গণতন্ত্র হলো ক্যান্সারের মতো। ইসলামেই আছে এর এনসার।

৯২. ইসরায়েলের সংসদের নাম 'নেসেট'। নেসেট একটি বিশেষ জাতীয়তাবাদী আইন পাশ করেছে। ইসরায়েল রাষ্ট্রের উপর গণতন্ত্রের প্রলেপ থাকলেও অলিখিতভাবে স্বীকৃত, ইসরায়েল একটি বিশুদ্ধ ইহুদি রাষ্ট্র। কুদস এ দেশের রাজধানী। ইসরায়েলে সরকারি কাজকর্মে হিব্রু তারিখ ও বর্ষ গণনা পদ্ধতিই ব্যবহৃত হয়। কাগজ-কলমে হিব্রুর পাশাপাশি আরবিও সরকারি ভাষা থাকলেও রাস্তার পাশে স্থাপিত নামফলক আর সীমিত কিছু ক্ষেত্র ছাড়া আরবির কোনো স্থান নেই বললেই চলে। ইসরায়েলে গণতন্ত্র দ্বিতীয় স্থানে আছে। রাষ্ট্রের সর্বত্র ইহুদিবাদেরই কর্তৃত্ব।

৯৩. গণতন্ত্র শুরু থেকেই ছিল আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের শক্তিশালী উপকরণ। অব্যর্থ যুদ্ধাস্ত্র। সুদূরপ্রসারী মারণাস্ত্র। গণতন্ত্র কখনোই নিছক নির্দোষ শাসনব্যবস্থা ছিল না। গণতন্ত্রের জনকরা বিশ্বব্যাপী আধিপত্য বিস্তারের জন্য তাদের এই 'ব্রহ্মাস্ত্র'-কে একেক দেশে একেকভাবে প্রয়োগ করেছে। এজন্য দেখা যায়, সবদেশে গণতন্ত্রের প্রকাশ ও প্রয়োগভঙ্গি এক নয়। যে দেশে যে 'ভার্সন' ও মডেল উপযোগী, সেখানে গণতন্ত্রের সে দেশীয় রূপান্তরিত রূপ কার্যকর হতে দেখা গিয়েছে। যথা :

ক. কোথাও সামরিক গণতন্ত্র।
খ. কোথাও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র।
গ. কোথাও ধর্মীয় গণতন্ত্র।
ঘ. কোথাও প্রজাতান্ত্রিক গণতন্ত্র।
ঙ. কোথাও স্বৈরাচারী গণতন্ত্র।

৯৪. আমেরিকা ও তার দোসররা বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রকে ব্যবহার করেছে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে নিজেদের 'ট্রেডমার্ক' হিসেবে। কমিউনিজমের সাহায্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্রমবর্ধমান সম্প্রসারণ ঠেকাতে আমেরিকা বিশ্বের আনাচে-কানাচে পরিবেশ-পরিস্থিতির উপযোগী করে (মডিফায়েড) গণতন্ত্র রপ্তানি করেছে।

৯৫. পশ্চিমারা মুসলিম ও তৃতীয় বিশ্বে গণতন্ত্র রপ্তানি করেছে সাম্য, স্বকীয়তা, স্বাধিকার, মানবাধিকার, জনগণের শাসন, সুবিচার, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, স্বাধীন বিচারব্যবস্থা ইত্যাদির লোভনীয় সুদৃশ মোড়কে। এসবের কৃত্রিম ভড়ং দিয়ে মুসলিম জনগণ ও বুদ্ধিজীবীদের মাথা কিনে নিয়েছে। চটকদার বিজ্ঞাপন দেখে জেনারেল শিক্ষিত অগণিত পোড় খাওয়া শিক্ষাবিদ-পণ্ডিত তো বটেই, অসংখ্য আখেরাতমুখী যবরদস্ত আলেমও গণতন্ত্রের উপরমিষ্ট-তলতিক্ত 'মিছরি'র শুধু টোপই নয়, ফেতনা ছাড়িয়ে ছিপশুদ্ধ গিলে বসে আছে।

৯৬. গণতন্ত্র হলো দুর্বল জাতি ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পশ্চিমা স্বার্থান্বেষী মহলের যুদ্ধের উপাদান। গণতন্ত্র কোনো শাসনব্যবস্থা নয়। গণতন্ত্রকে তারা সবসময়ই নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছে। গণতন্ত্রের মুলো ঝুলিয়ে তারা বহুদেশে নিজেদের নব্য উপনিবেশ স্থাপন করেছে। গণতন্ত্রকে তারা কমিউনিজমের বিরুদ্ধে নিজেদের স্বতন্ত্র আত্মপরিচয় হিসেবে দাঁড় করিয়েছে; প্রতিষ্ঠা করেছে। একেক দেশে একেক রকমের ভুয়া গণতন্ত্রের মোড়কে স্বাধিকার, সাম্য, সুবিচারের রঙিন ফানুস ব্যবহার করে তারা মুসলিম দেশগুলোর মাথা কিনে নিয়েছে। দখলে নিয়েছে প্রায় সব মুসলিম দেশ।

৯৭. উপনিবেশিক শাসন অবসানের পর সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সবাইকে গণতন্ত্রের সুবাসমাখা 'বিষাক্ত' পারফিউম শুঁকতে দিয়েছে। চকচকে সাদা মুলো দেখে ইসলামপন্থীদের সামনে ক্ষমতা লাভের সুযোগ তৈরি হলো। কেউ কেউ ক্ষমতায় আরোহণও করল। ছেড়ে চলে যাওয়া উপনিবেশিক শক্তিগুলো অন্য

রূপে ফিরে এলো। বেশিরভাগ মুসলিম দেশে সামরিক বাহিনীকে তাদের ক্রীড়নক হিসেবে রেখে গিয়েছিল। ইসলামপন্থীদের বিজয় দেখে দখলদার শক্তি তাদের তাবেদার সেনাদের মাধ্যমে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ক্ষমতার পরোক্ষ দখল নেয়। ইসলামপন্থীদের উপর নেমে আসে নির্যাতনের স্টিমরোলার।

৯৮. গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে সাধারণত ক্ষমতা প্রত্যাশী ইসলামিক দলগুলোর সামনে দুটি খিয়ার/অপশন রাখা হয় :

ক. ঈমান-আকিদা ঠিক রেখে কাঙ্ক্ষিত প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হওয়া।

খ. ঈমান-আকিদা হারিয়ে বা আপস করে কিছু প্রাপ্তিযোগের অধিকারী হওয়া। এটা সামরিক অভ্যুত্থানের চেয়েও ভয়ংকর আর বীভৎস।

৯৯. ফ্রান্স মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ধ্বজাধারী। কিন্তু ফরাসি দার্শনিক লেখক রজার গারাউডজ (Roger Garaudz) (১৯১৩-২০১২) যখন কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে ইহুদিদের পোড়ানো নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল, ফ্রান্সের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বাতাসে মিলিয়ে গিয়েছিল। ফরাসি আদালত এন্টি সেমিটিসিজমের অপরাধে জনাব গারাউডজকে এক বছরের সাজা দিয়েছিল।

১০০. আরেক মুক্তচিন্তার ধ্বজাধারী জার্মানি। ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যার শাস্তিটি পুনরায় বিচারব্যবস্থায় ফিরিয়ে আনা হবে কি না—এ বিষয়ে তুরস্কে গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। জার্মানিতে বাস করা প্রবাসী তুর্কিদের জন্য জার্মানিতে অবস্থিত তুর্কি কনসুলেটগুলোতে গিয়ে গণভোটে নিজের রায় দেওয়ার সুযোগ রাখা হলো। বাদ সাধল জার্মান সরকার। তারা প্রবাসী তুর্কিদের এই গণভোটে অংশ নিতে দেয়নি। কারণ? এভাবে ফাঁসির পক্ষে ভোট নেওয়া নাকি জার্মান আইন আর ইউরোপিয়ান মূল্যবোধ পরিপন্থী।

১০১. ১৯৬১ ভিয়েনা চুক্তিতে, ভিনদেশের মাটিতে থাকা দূতাবাস, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও স্থাপনা নিজ দেশের মতো সুরক্ষা পাবে, স্বাধীনতা ভোগ করবে। মেজবান দেশ চাইলেই মেহমান দেশের দূতাবাসে নাক গলাতে পারবে না। ভিনদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি প্রতিটি রাষ্ট্র শ্রদ্ধাশীল থাকবে। জনগণের রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে।

পশ্চিমা মোড়লরাও এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে; কিন্তু তাদের স্বার্থে আঘাত লাগলে এসব চুক্তি শিকেয় তুলে অন্য দেশে সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি। ইরানে মোসাদ্দেক থেকে মিশরে মুরসি পর্যন্ত দৃষ্টান্ত কম নয়।

এছাড়াও চিলি, গুয়াতেমালা, আর্জেন্টিনা, হাইতি, হন্ডুরাস, ব্রাজিল, ভেনিজুয়েলা ও তুরস্কে তাদের কালো হাত প্রসারিত হয়েছে।

১০২. নিজেদের সাম্য, স্বাধীনতার ধ্বজাধারিরা নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য মানবতার সমস্ত আবেদন-নিবেদনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বিশ্বের আনাচে-কানাচে রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছে। তখন তাদের মানবতাবোধ আস্তাবলে ছিল। এদিকে শার্লি হেবদোর জন্য তাদের মায়াকান্নার শেষ নেই। বিশ্বের দিকে দিকে নারী স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার কথা বলতে বলতে মুখের ফেনা বের করে ফেলেছে; কিন্তু গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী দেশেই যখন মুসলিম নারীদের হিজাব-নিকাব নিষিদ্ধ করা হয়, তখন মুখ দিয়ে টুঁ-শব্দটিও বের হয় না। তাদের গণতন্ত্র আর নিপীড়িত জনগণের গণতন্ত্রের ধরনে পার্থক্য আছে।

১০৩. মুসলিম 'হালাল খাবার'—এই চিন্তা তাদের 'মুক্তচিন্তা'-কে বিব্রত করে; কিন্তু ইহুদিদের কোশের (হালাল) খাবার তাদের মুক্তচিন্তাকে বিব্রত করে না। উলটো তাদেরকে গৌরবান্বিত করে। এই হলো তাদের ডাবল স্টান্ডার্ড।

১০৪. গণতন্ত্র কোনো নিছক কর্মকৌশল নয়, গণতন্ত্র একটি ধর্ম, দর্শন ও আকিদা। এই ধর্মের রব, 'আমি'-'জনগণ'। এই ধর্মের নবী, 'নাফ্স' তথা প্রবৃত্তি। এই ধর্মের কেবলা, 'স্বার্থ'।

১০৫. গণতন্ত্র তার ধর্মনিরপেক্ষ কার্যক্রমের মাধ্যমে মানবসভ্যতার ধ্বংস ডেকে আনছে। যেমনিভাবে ধ্বংস ডেকে আনছে তার দার্শনিক তত্ত্ব। গণতন্ত্রের সবচেয়ে ভয়ংকর দিক কী? আল্লাহকে সরিয়ে মানুষের হাতে নিজের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা দিয়ে দেওয়া। গণতন্ত্রে মানুষই সর্বেসর্বা হয়ে পড়ে। মানুষই তার শাসনপদ্ধতি নির্ধারণের অধিকারী হয়ে পড়ে। মানুষ জন্মগতভাবে শুদ্ধ হলেও শয়তানের কারণে মানুষের মধ্যে মন্দপ্রবণতা অত্যন্ত শক্তিশালী থাকে। সৌভাগ্যবান মানুষরাই শুধু নিজের মন্দপ্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

১০৬. মানুষ যখন নিজের হাতেই সব ক্ষমতা পেয়ে যায়, প্রথম প্রথম হয়তো কিছুদিন ঠিক থাকে, তারপর আস্তে আস্তে তার মধ্যে প্রবল হয়ে উঠতে থাকে আদিম প্রবণতাগুলো। সমাজে গতি আসে যুবশ্রেণির মাধ্যমে, নিয়ন্ত্রণ আসে বয়স্কদের মাধ্যমে। যুবশ্রেণির হাতে গণতান্ত্রিক ক্ষমতা কখনোই আল্লাহমুখী থাকে না।

১০৭. মানুষের চাহিদার কোনো শেষ নেই। দশ জনের দশ রকম চাহিদা। ধর্মহীন গণতন্ত্রের গতি সবসময় মানুষের চাহিদা অনুসারেই হয়ে থাকে। আল্লাহবিহীন গণতন্ত্রে মানুষের চূড়ান্ত গন্তব্য হয়ে ওঠে তার 'প্রবৃত্তি' আর ব্যক্তিগত 'স্বার্থ'। তার মন যা চায়, সে তার অনুসরণ করে। এজন্য দেখা যায়, ধর্মের বিপরীতে গিয়ে হলেও দলের স্বার্থ রক্ষা করতে সচেষ্ট থাকে। যে ব্যবস্থায় 'স্বার্থ' আর 'প্রবৃত্তি' হয়ে ওঠে চূড়ান্ত, সেখানে পরিণতি কী হতে পারে কল্পনা করা কি খুব কঠিন? যে আল্লাহর উবুদিয়্যত থেকে বেরিয়ে যায়, আল্লাহ তাকে সবকিছুর দাস বানিয়ে দেন।

১০৮. কেউ বলতে পারে, আমরা তো ধার্মিক আছি। আমাদের 'প্রবৃত্তি ও স্বার্থ' সবই দীনঘেঁষা। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ব্যবহার করে আমরা আমাদের ধর্মপ্রবণ 'প্রবৃত্তি ও স্বার্থ' কাজে লাগিয়ে দীন প্রতিষ্ঠা করব। চিন্তাটা সুন্দর; কিন্তু এমন কোনো নমুনা বিশ্বের কোথাও আছে? কেন 'অমুক' দেশ ধীরে ধীরে ইসলামের দিকে ফিরে আসছে না? সে দেশ ইসলামের দিকে ফিরে আসতে গিয়ে কৌশলগত কারণেই হোক বা অন্য কোনো কারণে হোক, সরাসরি হারাম বিষয়কে 'হালাল' বলেছে। আপনারাও কি শুরুতে এমন করবেন?

১০৯. আমরা জানি, অনেক মুসলিম দেশ দীর্ঘদিন ধরে স্বৈরাচারী অত্যাচারী একনায়কদের ক্লেদাক্ত নিপীড়নের অধীনে থাকতে থাকতে অতিষ্ঠ হয়ে স্বাধীনতা আর সুবিচারের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। মানুষ স্বভাবগতভাবেই স্বাধীনচেতা আর ন্যায়বিচারকামী। আসমান-জমিন, আলো-বাতাস সবই মানুষকে ইনসাফ ও শৃঙ্খলার বার্তা দেয়। আদল-ইনসাফ মানুষের মৌলিক স্বভাবজাত চাহিদার অন্তর্ভুক্ত।

১১০. মুসলিম হিসেবেও আমাদের কর্তব্য, ভূপৃষ্ঠে একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পৃথিবীকে আবাদ করার জন্য জানমাল ও চেষ্টা-সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। আমরা এই কাজের জন্য আদিষ্ট।

১১১. এই আদেশ পালন করতে গিয়ে আমরা প্রায় সবাই একই ভুল করে বসি। যে প্রশাসনিক অবকাঠামো ও ব্যবস্থাপনা স্বৈরাচারের শাসন সুদৃঢ় রাখে, আমরা সে অবকাঠামো ও ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়েই নিজেদের হারানো অধিকার, স্বাধিকার, মর্যাদা ও গৌরব ফিরে পেতে চাই। একবার ধোঁকা খাওয়া চলে; কিন্তু বারবার একই গর্তে পা দেওয়া মেনে নেওয়ার মতো নয়।

১১২. ইখলাসের সাথে নেক নিয়তে ভুল পথে মেহনতকারীর প্রতি সহানুভূতি জাগে, তার ত্যাগ-তিতিক্ষার জন্য সম্মান জানে, তার অক্লান্ত সংগ্রামের জন্য বিস্ময় জাগে; কিন্তু দিনশেষে তিনি তো একজন ব্যর্থ-পরিশ্রান্তই। তিনি নিয়ত আর ইখলাসের কারণে আল্লাহর কাছ থেকে মেহনতের বদলা পেয়ে যাবেন। পাশাপাশি ভুলপন্থা অবলম্বন করে লক্ষ্য অর্জনেও বাহ্যিক দৃষ্টিতে ব্যর্থ, এতে তো কোনো সন্দেহ নেই। তার পুরো মেহনতই হয়েছে সাগরে চাষের বীজ ফেলার মতো, বাতাসে সুতো বোনার মতো, বালু দিয়ে প্রাসাদ নির্মাণের মতো।

১১৩. যাদের সামনে মেহনতের সঠিক পথ সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়েছে, তাদের উচিত, আগে যারা ইখলাস ও বিশুদ্ধ নিয়তে ভুলপন্থায় মেহনত করেছেন, তাদের মেহনতকে হেলা না করা। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা সবার কর্তব্য। তাদের ভুলের উপর দিয়েই পরবর্তীরা সঠিক পথ খুঁজে পেয়েছে, শুধু এটুকুর জন্য তারা শুকরিয়া ও দোয়া পাওয়ার যোগ্য।

১১৪. আমরাও অন্য জাতির মতো। অন্য জাতির ক্ষেত্রে আল্লাহর সুনান প্রযোজ্য হয়, আমাদের উপরও আল্লাহর সুনান প্রযোজ্য হবে। আমরা ঈমানের দুর্বলতাবশত, ভীতি ও ধ্বংসাত্মক পরিবেশে বাস করার কারণে অধৈর্য হয়ে আল্লাহর 'নুসরত'-কে ত্বরান্বিত করতে চাই। পরিবেশের ভয়াবহতায় অসহায় বোধ করি, নানা 'আওহাম' বা কল্পনাপ্রসূত ভ্রমের শিকার হয়ে যাই। প্রচণ্ড নির্যাতনের শিকার হয়ে সিরাতে মুস্তাকিম থেকে বিচ্যুত হয়ে যাই।

১১৫. এহেন পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাআলা আমাদের উপর শত্রুর নির্যাতনের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেন। আমাদেরকে বিভিন্ন মেহনত-সংকটে ফেলার মাধ্যমে আমাদের ঈমান-আকিদাকে আরো বিশুদ্ধ করার প্রয়াস চালিয়ে যান। দুর্যোগ চাপিয়ে দিয়ে আল্লাহ আমাদেরকে 'তারবিয়াত' বা বিশুদ্ধ আকিদায় দীক্ষিত হওয়ার সুযোগ তৈরি করে দেন। এই ধারা চলতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের কলবে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ না থাকে। আমাদের সামনে একমাত্র আল্লাহর দেওয়া পথ ছাড়া আর কোনো পথ যেন না থাকে। সংকটের চূড়ান্ত ধাপে অল্পকিছু মানুষই ঈমান নিয়ে উতরাতে পারে। বেশির ভাগ মানুষই ইবতিলা (পরীক্ষা) মোকাবেলা করতে না পেরে, সংকটের তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে, মুখ থুবড়ে পড়ে; কুফুরিশক্তির অসহায় শিকার হয়ে পড়ে।

১১৬. গত শতকের গোড়ার দিকে কিছু বিভ্রান্ত তুর্কি ইতর প্রাচীন ইরান-তুরানীয় রীতি-ঐতিহ্য গ্রহণ করতে মরিয়া হয়ে গিয়েছিল। কিছু বুদ্ধিভ্রষ্ট আরব ঘৃণিত উপনিবেশিক শক্তির নোংরা প্রভাবে ধর্মমুক্ত আরব জাতীয়তাবাদের পূজারি হয়ে গিয়েছিল। অথচ মুহাম্মাদ সা.-কে নিয়েই আরবরা শতাব্দীর পর শতাব্দী বিশ্ব শাসন করেছিল। মুহাম্মাদ সা.-কে আঁকড়ে ধরেই তুর্কিরা শত শত বছর বিশ্বের একমাত্র অজেয় পরাশক্তি ছিল। ইহুদিরাও সুলাইমান আ.-এর আদর্শের উপর থেকেই একসময় বিশ্ব শাসন করেছিল। বিশ্বশক্তির মূলনাভি 'বাইতুল মুকাদ্দাসে'র অধিকর্তা ছিল।

১১৭. ইহুদি-খ্রিস্টান-ইরান-তুরানীয় প্রলোভনের শিকার হয়ে আরবরা মুহাম্মাদ সা.-কে ছেড়ে দিয়েছে। পরিবর্তে তারা জাহেলি যুগের খ্রিস্টান গাসসানি ও মুনযিরি (الغساسنة، والمناذرة) শাসকদের আদর্শ গ্রহণ করেছে। তুর্কিরা মুহাম্মাদ সা.-এর আদর্শ বর্জন করে তাদের প্রাচীন পৌত্তলিক 'ওঘুজ-করলুক-উইঘুর' (الأوغوز، والكرلوك، والأويغور) লোককথার নায়কদের শয়তানি আদর্শ গ্রহণ করে নিয়েছে। এছাড়া তুর্কিরা ইহুদি-খ্রিস্টানসহ অসংখ্য জাতি-উপজাতির আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হতে হতে এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল যে, তাদের নেতৃবৃন্দ প্রায় 'দুনমা ইহুদি' (يهود الدونمة)-তে পরিণত হয়েছিল।

১১৮. অন্যদিকে ইহুদিরা কী করেছে? ব্যবিলনের শাসক বুখতেনসর বাইতুল মুকাদ্দাস আক্রমণ করে গোটা শহর পুড়িয়ে দিয়েছিল। শহরের অধিবাসী ইহুদিদের উপর ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে জীবিতদের বন্দি করে ব্যবিলনে নিয়ে গিয়েছিল। ব্যবিলনে ধুঁকে ধুঁকে বেঁচে থাকা বনি ইসরায়েলই পরবর্তীতে নবী সুলাইমানের আদর্শ আঁকড়ে ধরেছিল তাদের পবিত্র ভূমি উদ্ধারের লক্ষ্যে। যাতে তারা আরবের গাসসানি, মুনযেরি ও তুর্কি কুরলুক ও ওগুজদের উপর শাসনছড়ি ঘোরাতে পারে। বর্তমানে তারা তাই করছে। গোটা আরব উপদ্বীপ তাদের পদতলে। সবাই আপন ঐতিহ্যে ফিরেছে, শুধু মুসলমানরা অন্যের ঐতিহ্যে বুঁদ হয়ে আছে।

১১৯. আকায়েদ সর্বদা সচেতন প্রচেষ্টায় অর্জন করতে হয়। সচেতন প্রচেষ্টায় শুদ্ধ রাখতে হয়। প্রচলিত সংস্কৃতিকর্মীরা সমাজে ধর্মীয় চেতনার মূলে কুঠারাঘাত করে চলেছে। মিডিয়ায় তাদের কুপ্রভাবে জনজীবনে ও গণমানুষের মনমানসে ধর্মভাব হ্রাস পাচ্ছে। এসব দুষ্ট প্রভাব কাটিয়েই একজন মুমিনকে নিজের আকিদা-বিশ্বাস অক্ষত রাখতে হয়; অক্ষুণ্ন রাখতে হয়।

১২০. সত্য কখনো ধামাচাপা দিয়ে লুকিয়ে রাখা যায় না। যতই লুকিয়ে রাখার অপচেষ্টা চালানো হোক, সত্য লকলকিয়ে বেরিয়ে আসবেই। অন্যদিকে কল্পিত ভ্রান্তভ্রমের পর্দা এতটাই পুরু যে, চর্মচক্ষু-মনশ্চক্ষু কোনোটা দিয়েই দেখা যায় না।

১২১. আমি কুরআন ও সুন্নাহর সংস্পর্শে থাকলে, বিশুদ্ধ মানুষদের সঙ্গ অবলম্বন করলে আমার মনমননে একধরনের 'রূহ' তথা নবপ্রাণের সঞ্চার হতে থাকবে। আমার চেতনার শিরা-উপশিরায় সচল থাকবে একটি ঈমানি বিদ্যুৎস্রোত। নবপ্রাণের এই পবিত্র বায়ু আমার কল্পিত ভ্রান্তভ্রমের প্রাচীর ভাঙতে শুরু করবে। ঈমানি রূহের নীরব অথচ শক্তিশালী আঘাতে ভ্রান্তভ্রম-প্রাচীরের ইট একে একে খসে পড়তে থাকবে। শেষ ইটটি ধসে পড়ার বিকট আওয়াজ চারিদিক প্রকম্পিত করে তুলবে। কারণ, শেষ ইটটা গিয়ে পড়বে গহ্বরে আগে পড়া ইটগুলোর উপর। এটা বাতিল পতনের আওয়াজ। এটা মিথ্যা ধসে পড়ার শব্দ। এটা অন্ধকার দূর হওয়ার ধ্বনি।

১২২. কারো জীবনে এমন কিছু ঘটা পরম সৌভাগ্যের। তিনি চরম ধ্বংসের সম্মুখীন হওয়া থেকে বেঁচে ফিরে এসেছেন। আশা করা যায়, তার আর কোনো ভয় নেই। রব্বে কারিম তাকে রক্ষা করবেন।

১২৩. আকল-বুদ্ধি ছাড়া 'মারেফাত' হাসিল হতে পারে না। মারেফাত-আল্লাহর যথার্থ পরিচয়। তাজরেবা বা অভিজ্ঞতা ছাড়া আকলবুদ্ধি পক্ক হয় না। হেকমত-প্রজ্ঞা হলো, মানুষের জ্ঞানপিঠে কালের দুর্যোগ-দুর্বিপাকের কশাঘাত। রব্বে কারিম আমাকে ও প্রতিটি মুসলমানকে সিরাতে মুস্তাকিম দান করুন। সিরাতে মুস্তাকিমে অটল রাখুন। আমিন।

।। আলহামদুলিল্লাহ ।।